রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর

প্রবাসী

'ইতিহাসের ধারা

'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলন

তৃতীয় খণ্ড



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর

প্রবাসী
ইতিহাসের ধারা

‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলন

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা ও ভূমিকা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
সুদীপ বসু

প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ
চন্দন বসু

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক
লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

নিবেদন

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনার প্রবাহে *প্রবাসী* দিকচিহ্নপ্রতিম। বস্তুত বিশ শতকের প্রত্যুষে প্রকাশিত এই সাময়িকপত্র বাঙালির রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাঁকবদলের কালবিন্দুকেই যেন চিহ্নিত করে রেখেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিপুল অর্জন নিশ্চিত হয়ে গেল, রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগাঢ় দেশচেতনার নানা স্রোত-প্রতিস্রোত যেভাবে উন্মথিত হল, সংস্কৃতির অন্য নানা আঙিনা যে সোনালি ফলনে সমাকীর্ণ হল, তার প্রতিভাস মিলে যাবে *প্রবাসী*-র অক্ষরসমারোহে, অলংকরণ, অঙ্গসজ্জা, আলোকচিত্র ও চিত্রবহুলতার আয়োজনে। *প্রবাসী* এবং তার জন্মদাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রায় সমার্থক শব্দ। *দাসী*, *প্রদীপ* বা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *মডার্ন রিভিয়্যু*—এগুলিও রামানন্দ-জীবন ও মননের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত থাকলেও *প্রবাসী* নামের সঙ্গে রামানন্দ নামের সমীপবর্তিতা বুঝি পূর্বতন দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় অধিকতর নিবিড়। *প্রবাসী* প্রকাশনার পূর্বে সম্পাদনাকর্মে তাঁর দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব ছিল, সম্পাদকের বৃত্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা ছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল। এসবের ধারাবাহিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে *প্রবাসী-র* পাতায়-পাতায় বছরের পর বছর।

প্রবাসী থেকে চয়ন করে বিবিধ প্রসঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলিত হল গ্রন্থাকারে। এই কাজটি সম্পাদন করেছেন প্রাজ্ঞ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং অধ্যাপক সুদীপ বসু। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর রসবোধ ও গবেষণাকর্মে প্রাবীণ্য এবং অধ্যাপক সুদীপ বসুর বিদ্যোৎসাহী উদ্যম এই সংকলন বাস্তবায়নের পথে আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রগান *প্রবাসী*-র উদ্দেশ্যে রচিত। পাণ্ডুলিপিচিত্র শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষের সহৃদয় সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই প্রকাশ করা গেল তৃতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে রামমোহন, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ। তৎসহ এদেশের সমাজ-সংস্কারের নানা দিক, অস্পৃশ্যতা, নারী নিগ্রহ—এবংবিধ বিষয়। উনিশ শতকের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের প্রভাব প্রবল। এঁদের সম্পর্কে বিশ শতকের প্রারম্ভের মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ পাওয়া

যাবে *প্রবাসী*-র পাতায়। পাঠক পেয়ে যাবেন বঙ্গদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায়।

পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশেও আমাদের আগ্রহ ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আশা করি এই সংকলন বাঙালি পাঠককে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ে উদ্দীপিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর

প্রবাসী
ইতিহাসের ধারা

'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলন

তৃতীয় খণ্ড

সূচি

রামমোহন ও ব্রাহ্ম-আন্দোলন

১৩৪৬ আষাঢ় – রাজা রামমোহন রায়—তাঁহার জীবনী, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও বিশ্বমানবতা। [নলিনীমোহন সান্যাল, এম এ লিখিত, গ্রন্থটি রামানন্দ কর্ত্তৃক সমালোচিত, 'পুস্তক পরিচয়'-এর অন্তর্গত] ১১৪

১৩৩৫ কার্তিক – "নিম্ন অধিকারী" ১৭৭

– রামমোহন ও বিবেকানন্দ ১৮৮

– রামমোহন ও শুদ্ধি ১১৯

– রামমোহনের অগ্রদৌত্য ১১৯

১৩৪১ কার্তিক – রামমোহন রায়ের স্মৃতি ১২০

১৩৪৩ কার্তিক – রামমোহন রায়ের চাকরী-গ্রহণের কারণ ১২৩

– রামমোহন রায়ের বিচার ১২৩

– রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি ১২৫

১৩৪৪ কার্তিক – রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দলিল ১২৫

– রামমোহন রায়ের গদ্য ১২৬

ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ :

১৩১১ ফাল্গুন – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১

,, চৈত্র – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কোথায়? [শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, লিখিত ; প্রবাসীর সূচিতে শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম উল্লিখিত] ১৪৪

১৩৪৫ চৈত্র – "তত্ত্ববোধিনী সভা" ১৫৪

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ – তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৪

১৩৪১ মাঘ – কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিসভা ১৫৫

১৩৪২ মাঘ – ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা ১৫৬

১৩৪৫ পৌষ – গরিফায় প্রস্তাবিত কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতিমন্দির ১৫৭

১৩৪৬ আশ্বিন – 'সুলভ সমাচার' ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী ১৫৮

১৩১২ আষাঢ় – স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার [মহেশচন্দ্র ঘোষ রচিত] ১৫৯

১৩২৬ অগ্রহায়ণ – শিবনাথ শাস্ত্রী ১৬৪

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ – ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত [*প্রবাসী*-সম্পাদক লিখিত 'আলোচনা' বিভাগের অন্তর্গত] ১৬৮

১৩১৩ আশ্বিন – চিত্র [*প্রবাসী*-তে আনন্দমোহন বসুর চিত্র মুদ্রিত ও সে সম্বন্ধে *প্রবাসী*-সম্পাদকের মন্তব্য] ১৬৯

– স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু [হেমলতা দেবী রচিত] ১৬৯

,, কার্তিক – আনন্দমোহন বসু [লাবণ্যপ্রভা বসু রচিত] ১৭৩

১৩২০ শ্রাবণ – স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৮

বিদ্যাসাগর ও সংস্কার আন্দোলন

সমাজের নানা রূপ

গিরিশচন্দ্র, রঙ্গালয়ে ও জাতীয় আন্দোলনে পতিতা নারী

প্রসঙ্গ নারীনিগ্রহ, নারীর অধিকার

নিগৃহীতা নারী :

নারীরক্ষা :

নারীর অধিকার :

রামমোহন ও ব্রাহ্ম-আন্দোলন

প্রাসঙ্গিক কথা

"প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আপতিত হওয়ার ফলে যে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষে তার প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়।"—বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্ম-আন্দোলন শুরু হয়। রামমোহন রায় সেই আন্দোলনের সূচনা করেন। রামমোহনের ভূমিকা অবশ্য কেবল ধর্মক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিলনা। তা প্রসারিত হয়েছিল সমাজসংস্কারে, নব শিক্ষানীতির প্রবর্তনে এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষার ব্যবহারে। রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে যুক্ত ছিল বলে, ধর্ম-বিষয়ক সংকলনের অগ্রে রামমোহন রায়কে স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য ভূমিকার কথাও যেহেতু *বিবিধ প্রসঙ্গ*-এ এসেছে, সেইজন্য তাঁর বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে *প্রবাসী* পত্রিকা ও অন্য পত্রিকাদিতে নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বাধিক অবশ্য রামমোহনপন্থী *প্রবাসী* পত্রিকাতেই। রামমোহনের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে স্বয়ং রামানন্দ লিখেছেন এবং অন্যদের লেখাও ছেপেছেন। বিস্ময়ের কথা তাঁর পত্রিকাতে রামমোহন-বিষয়ক রচনাসূত্রে নানাবিধ বিতর্কমূলক লেখাও বেরিয়েছিল। বিশেষ করে রামমোহনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কটাক্ষযুক্ত লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রবাসী*-তে লিখেছেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখাও রামানন্দ কম ছাপেন নি। সেই সঙ্গে নিজের দীর্ঘ বিবৃতিও প্রকাশ করেছেন। বিতর্ক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল কিনা আমরা সেবিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। তবে রামানন্দের অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা এবং সম্পাদকীয় সততার সমূহ প্রশংসা করতেই হয়।

এছাড়া রামমোহন ও সেবাধর্ম প্রসঙ্গেও একটি রচনা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রামমোহন ও টিলক প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির মতের প্রতিবাদ করতে সম্পাদককে দেখা গেছে।

রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্মসভা প্রসারিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজে। পরবর্তী অধ্যায়ে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গ আছে।

রামমোহন সম্বন্ধে সম্পাদকের সমাদরমূলক নিম্নের লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল :

- রামমোহন রায় শতবার্ষিকী (বিবিধ প্রসঙ্গ, ১৩৪০ কার্ত্তিক)
- রামমোহন সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী লোকদের মত (ঐ)

● রামমোহন রায় শতবার্ষিকী (১৩৪০ পৌষ)

● রামমোহন রায় (১৩৪০ মাঘ)

রামমোহন সম্বন্ধে অন্যান্য রচনা :

● শত বৎসর পরে—রমাপ্রসাদ চন্দ (১৩৪০ কার্ত্তিক)

● রামমোহন (কবিতা)—সুকুমার সরকার (১৩৩৬ পৌষ)

● রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চার ফল—রমাপ্রসাদ চন্দ (১৩৪৫ ভাদ্র)

রামমোহন রায় প্রসঙ্গে বিতর্কমূলক কয়েকটি রচনা :

● রামমোহন রায় ও রাজারাম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৬ অগ্রহায়ণ ; বর্তমান সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

● বিদেশে রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৬ পৌষ)

● রামমোহন রায় ও রাজারাম—ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (ঐ)

● "রামমোহন রায় ও রাজারাম"—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ, ঐ)

● রামমোহন রায় ও রাজারাম—প্রতুলচন্দ্র সোম (১৩৩৬ মাঘ)

● "রামমোহন রায় ও রাজারাম"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর (১৩৩৬ চৈত্র ; বর্তমান সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

● রামমোহন রায়ের সমালোচনা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৩৪০ ফাল্গুন ; বর্তমান সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

● রাজারাম রায়—রমাপ্রসাদ চন্দ (১৩৪২ পৌষ)

● রামমোহন ও রাজারাম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর (১৩৪২ মাঘ)

● "রামমোহন রায় ও রাজারাম"—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৩৪২ ফাল্গুন)

রামানন্দ উদারপন্থী ব্রাহ্ম। সেই উদারতা অ-ব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্বন্ধে কিছু সমাদরসূচক মন্তব্যে সমাপ্ত হয়নি। কেশবপন্থী অনেকের মতো তিনি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের বহির্ভূত মনে করতেন না। সেইজন্য আত্মসংকোচ, ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির ফলে হিন্দুসমাজ যখন বিপর্যস্ত, তখন তিনি নিজ সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করে প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টিকারী 'হিন্দু মহাসভা'-র প্রতি পক্ষপাত বোধ করেছিলেন। 'হিন্দু মহাসভা'-র নানা শ্রেয় সংস্কারমূলক প্রয়াসের প্রতি নিয়মিত সমর্থন জানিয়ে গেছেন। 'হিন্দু মহাসভা' আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর একটি অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন ('ময়মনসিংহে বঙ্গীয় হিন্দু প্রাদেশিক সম্মিলনী', ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ, *প্রবাসী*)।

স্মর্তব্য, সমাজসংস্কার কেবল বিদ্যাসাগরে আবদ্ধ ছিলনা। ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের মধ্যেও সে প্রয়াস যথেষ্ট দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য ধর্মসংস্কার নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন প্রথমদিকে সমাজসংস্কারে অতীব উদ্যোগী। পরে নিছক ধর্মোৎসাহী এমনকি নববিধান মত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজী শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসুর মধ্যে

ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার উভয় উদ্যোগই দেখা যায়। এই দুইজনই আবার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনেও জড়িত থাকতে চেয়েছেন। কেশবচন্দ্র সেন যখন মারা যান তখন *প্রবাসী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তাঁর শোকনিবন্ধ *প্রবাসী*-তে নেই। কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু লেখা *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বে *প্রবাসী* প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই এঁদের বিষয়ে সরাসরি শোকনিবন্ধ লিখিত হয়েছিল। এই সকল উৎকৃষ্ট শোকনিবন্ধগুলি একদিকে যেমন শ্রদ্ধাগাঢ়, অন্যদিকে তেমনই তথ্যমূলক ও সংযত। এদের মধ্যে আলোচ্য ব্যক্তিদের চরিত্র ও কার্যাবলির নানামুখী পরিচয় মেলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের এক পর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। পরবর্তীকালে তাঁর পরিচয় দাঁড়িয়েছিল কবি-দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসাবে। এই দ্বিতীয় ভূমিকার কথাই রামানন্দর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে (''দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', ১৩৩২ ফাল্গুন, *প্রবাসী*)। এ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের ছোটো বড়ো আরও অনেক নেতা ও কর্মীর শোকনিবন্ধ পাই। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে কোন্ সামাজিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ধর্মপ্রচার ও সেবাকর্মের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মকে বাংলা ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রসারিত করেছিলেন, সে কাহিনীও ইতিহাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। অনেক নীরব কর্মী, যাঁরা সারাজীবন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠায় দান করেছিলেন, তাঁদের 'ছোট' বলা সঙ্গত কিনা প্রশ্নের বিষয়। এইরকম দু-একজনের কথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে রামানন্দ শোকনিবন্ধে উপস্থিত করেছেন ('ললিতমোহন দাস', ১৩৩৯ মাঘ ; 'বিপিনবিহারী সেন', ১৩৪৩ মাঘ ; 'খাসিয়া পাহাড়ে যুগপ্রবর্তক নীলমণি চক্রবর্ত্তী', ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ)। স্মরণ রাখতে হবে ব্রাহ্মধর্মের ভাঁটার দিনে *প্রবাসী* পত্রিকার প্রকাশ এবং রামানন্দ ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মনেতা ও কর্মীদের পুরো জীবনেতিহাস লিখতে বসেননি। সেইজন্য তাঁর মন্তব্যাদি থেকে নিকট অতীতের ঝলকই দেখা যায়, তার বেশি নয়।

রামমোহন রায়

১৩০৮ আষাঢ়

রাজা রামমোহনরায়ের রাজনীতি

কুমারী কলেট রাজা রামমোহনরায়ের [যদৃষ্ট] একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য অনেক বৎসর ধরিয়া উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পুস্তক সমাপ্ত বা প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সংগৃহীত উপাদানসমূহ হইতে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করেন। সম্প্রতি উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি অবলম্বন করিয়া রাজা রামমোহনরায়ের ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। আমরা আজকাল যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি, রাজা রামমোহন রায়, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান অনেকগুলির আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সংবাদকৌমুদী নামক সংবাদপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় মফস্বলের আদালতগুলিতে জুরীর দ্বারা বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যে একটি আবেদন করা হয়। তৃতীয় সংখ্যায় বঙ্গদেশজাত তণ্ডুলের অধিকাংশ যাহাতে বিদেশীয় বন্দরে রপ্তানী না করা হয়, তজ্জন্য গবার্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ ও সংরক্ষণার্থ রাজা যে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন চরিতপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ইলবার্টবিলের সময় যে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল, আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই তাহা মনে থাকিতে পারে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যে নূতন জুরী আইন হয়, তাহাতে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে ইউরোপীয় বা দেশীয় খৃষ্টান বিচারকগণ ভারতবাসী যে কোন হিন্দুমুসলমান প্রজার অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ; কিন্তু হিন্দুমুসলমান বিচারকগণ দেশীয় বা ইউরোপীয় খৃষ্টানগণের অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না। দেশীয় লোকদের বিচারার্থ গ্র্যাণ্ডজুরী আহুত হইলে, তাহাতেও হিন্দু বা মুসলমান কোন ব্যক্তিই জুরর হইতে পারিবেন না। রামমোহন রায় [য] এই আইনের প্রতিবাদ করেন।

শ্রমজীবিগণের মঙ্গলার্থ রামমোহনরায় ভারতবর্ষে ইউরোপীয় মূলধন ও ধনীর আগমনের পক্ষপাতী ছিলেন। নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশ্য, যেরূপ অত্যাচারের ফলে নীলদর্পণ লিখিত হয়, এবং যাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া পাদ্রি লং সাহেব কারাগারে যান, রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় সেরূপ প্রজাপীড়ন ঘটিলে তিনি কখনই নীলকরদের পক্ষ সমর্থন করিতেন না। তিনি সংবাদ-কৌমুদীতে লেখেন যে নীলের আবাদ হওয়ায় অনেক পতিত জমির চাষ হইতেছে, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছে। চাষীরা নীলকরদিগের নিকট হইতে অধিক বেতন পাওয়ায় এখন আর জমিদার ও বড় বড় মহাজনদের স্বেচ্ছাচারিতার কবলীভূত হয় না। ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণ যত অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে বসবাস করেন, জমির এবং দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের ততই মঙ্গল। রাজা বলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস মোটের উপর নীলকরেরা অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীদের অধিক

উপকার করিয়াছেন।" কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে নীলকরদের মধ্যে অনেকে হঠকারিতার জন্য লোকের বিরাগভাজন হইয়াছে ; কিন্তু আংশিক অমঙ্গল ব্যতিরেকে কোন সাধারণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।" "দেশীয় লোকদের মধ্যে যদি কোন সম্প্রদায় নীলকরদিগকে আনন্দের সহিত দেশ হইতে তাড়িত দেখিতে চান, তাহা জমিদারসম্প্রদায় ; কেন না, অনেক স্থানে নীলকরেরা রায়তদিগকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে।" এখানে বলা আবশ্যক যে রাজা ভারতবর্ষে "ভদ্র" ইউরোপীয়গণের বসবাসেরই পক্ষপাতী ছিলেন। পরে এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিব।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে, চীন ও ভারতবর্ষে সকলকে বাণিজ্য করিতে দিবার অধিকার প্রার্থনার্থ, এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশস্থাপনে বাধা দূরীকরণার্থ পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার জন্য, একটি সভা হয়। রামমোহন রায় বলেন, "নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আমরা যতই মিশিব, সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের ততই উন্নতি হইবে।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা ভারতবর্ষের বিচার ও রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার রায়তদের সহিত সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারদের উন্নতি ও ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু রায়তদের কোন উন্নতি হয় নাই। "চাষীদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে এবিষয়ের উল্লেখ করিতে গেলেই আমার অত্যন্ত ক্লেশ হয়।" তাহাদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলেন। প্রজারা যে খাজনা দিতেছে, তাহা আর যেন বাড়ান না হয়। এখন তাহারা যে খাজনা দেয়, তাহা এত বেশী যে তাহা দিতে গিয়া তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় ; সুতরাং তাহাদের খাজনা কমাইবার জন্য সরকার বাহাদুর জমীদারদের দেয় রাজস্ব কমাইয়া দিউন। ইহাতে যে রাজস্বের হ্রাস হইবে, বিলাসসামগ্রীর উপর কর বসাইয়া ও অধিকবেতনভোগী কলেক্টরদিগের পরিবর্ত্তে অল্পবেতনভোগী দেশীয় কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাহার পরিপূরণ করা যাইতে পারিবে। তিনি আরও বলেন যে ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন আদর্শ ভূস্বামী আসিয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার সঙ্গে তিনি এই সর্ত্তটির উল্লেখ করেন, যে এই ইংরাজ ভূস্বামীরা যেন নিম্নশ্রেণীর লোক না হয়। প্রজাদের উন্নতির জন্য তিনি যে নীতির সমর্থন করেন, তাহা সাম্রাজ্যের পক্ষে কিরূপ হিতকর, তাহা গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হয়। তিনি বলেন, জমিতে রায়তদের স্থায়ী স্বত্ব স্বীকার করিলে তাহারা খুব রাজভক্ত হইবে। এই উদার নীতি অবলম্বনে আরও লাভ আছে। এক্ষণে যে স্থায়ী বৃহৎ সৈন্যদল পোষণ করিতে হয়, তৎপরিবর্ত্তে রাজভক্ত দেশরক্ষীর দল (militia) গঠিত হইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এই ব্যয়সংক্ষেপ বর্দ্ধিত ভূমিকর দ্বারা অধিক রাজস্ব আদায় অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর। এই যুক্তি সমর্থন করিবার জন্য তিনি পারস্যকবি সাদীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। তাহার অর্থ— "তোমার প্রজাদের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিয়ো, তাহা হইলে তোমার শত্রুদের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। কারণ, ন্যায়বান্ রাজার প্রজারাই তাঁহার সৈন্যের কাজ করে।"

ভারতবর্ষের বিচারপ্রণালীবিষয়ক প্রশ্নোত্তর নামক পুস্তকে রাজা নানাবিধ সংস্কারের প্রস্তাব করেন। তাহার মধ্যে এইগুলিই প্রধান—আদালতে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরাজীর ব্যবহার, দেওয়ানী আদালতে দেশী আসেসর (assessors) নিয়োগ, জুরীর বিচার (দেশী পঞ্চায়েৎপ্রথা যাহার সদৃশ) প্রবর্ত্তন, জজ এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের কার্য্য পৃথক্করণ, জজ এবং মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পৃথক্করণ, ভারতবর্ষের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন সংহিতাবদ্ধকরণ (codification), আইন করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান লোকদের পরামর্শ গ্রহণ। আর একখানি পুস্তকে তিনি বলেন, "দেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা কোম্পানীর রাজত্বের উপর নিশ্চয়ই বিরক্ত। বুদ্ধিমান ভারতবাসীদিগের অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, তাহারা যাহাতে যোগ্যতাবলে ক্রমোন্নতি অনুসারে রাজসরকারে উচ্চপদ পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।" তিনি মনে করিতেন ও বলিতেন যে উচ্চরাজপদ লাভ বিষয়ে ইংরাজ অপেক্ষা মুসলমান শাসন সময়ে আমাদের অবস্থা ভাল ছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হাউস্ অব্ কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কিরূপে সংস্কৃত হইতে পারে, তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন। রামমোহনরায় এই কমিটিতে নিজ মত জানাইবার জন্য একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। উহার আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপন। যে সনন্দের বলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতশাসন করিতেন, তদনুসারে ইউরোপীয়গণ অবাধে ভারতবর্ষে ভূমি ক্রয় বা বসবাস করিতে পারিতেন না। রাজা এই বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ বসবাসের স্বাধীনতা দিলে নয় প্রকার শুভফলের প্রত্যাশা করা যায়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা ভারতের কৃষি ও অর্থকর শিল্পের উন্নতি করিবে, দেশীয়দিগের নানা কু-সংস্কার দূর করিবে, গবর্ণমেণ্টকে অপেক্ষাকৃত সহজে শাসনবিষয়ে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করাইতে পারিবে, দেশীয় বা বৃটিশ অত্যাচারে বাধা দিবে, দেশে শিক্ষাবিস্তার করিবে, ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিলাতের লোককে বেসরকারী মত জানাইতে পারিবে, এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বলশালী করিবে। শেষ দুই শুভ ফল এই যে, যদি ভারতবর্ষ উদারনীতি অনুসারে শাসিত হয় এবং পার্লেমেন্ট মধ্যেমধ্যে ইহার অবস্থার অনুসন্ধান করেন, এবং রাজপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ আইনের দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বহুকাল ইংলণ্ডের উন্নত শাসনের অধীনে থাকিয়া উপকৃত হইবে, এবং প্রতিদানস্বরূপ ইংলণ্ডের মহত্ত্বের পোষণ করিবে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ঔপনিবেশিক ও তাহাদের বংশধরগণ ভারতবর্ষকে ইউরোপের খৃষ্টান দেশসমূহের সমান উন্নত করিতে পারিবে, এবং ইহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও লোকসংখ্যাবলে, ও ইউরোপের সাহায্যে, এশিয়ার অন্যান্য জাতিকে জ্ঞানদানদ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

তাহার পর কয়েকটি অসুবিধারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঔপনিবেশিকদিগের ঔদ্ধত্য ও প্রবঞ্চনাতে বৃটিশ নামে কলঙ্ক আসিতে পারে।

তজ্জন্য রাজা প্রস্তাব করেন যে অন্ততঃ প্রথম কুড়ি বৎসর কেবল চরিত্রবান্ ও ধনবান্ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকেই বসবাস করিবার অধিকার দেওয়া হউক, আইনের চক্ষে দেশী ও বিলাতী সকল প্রজাকে সমান করা হউক, এবং মফঃস্বলের আদালতসমূহ ইউরোপীয় উকীল নিযুক্ত করা হউক। তাহার পর রাজা বলেন যে কেহ কেহ মনে করেন যে যদি অনেক ভদ্র ইউরোপীয় অধিবাসীর সংসর্গে ও দৃষ্টান্তে ভারতবাসীরা ধনশালী, সমুন্নত ও জনহিতবুদ্ধি (public spirited) হইয়া উঠে, তাহা হইলে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিবাসীর দল আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে। তদুত্তরে রাজা বলেন, যে আমেরিকা ইংরাজের কুশাসনে বিদ্রোহী হইয়া ছিল। চলনসই রকমের সুশাসন থাকিলেও কোন উপনিবেশ যে স্বাধীন হইতে চায় না, কানাডা তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

Yet as before observed, if events should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make prodictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.

অর্থাৎ যদি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ঘটনাক্রমে পৃথক হইয়াই পড়ে, তাহা হইলেও দুটি স্বাধীন, একভাষাভাষী, তুল্য রীতিনীতি ও খৃষ্টান দেশের মধ্যে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলিতে পারিবে।

রাজা এই পুস্তিকাতে সাহসের সহিত সুদূর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে ইংরাজীভাষী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সামাজিক বিষয়ে কতকটা ইংরাজীভাবাপন্ন, স্বাধীন এবং এশিয়ার শিক্ষাগুরুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালে ইংরাজীর জ্ঞানও যে ভারতবর্ষে সম্যক্ বিস্তারলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সামাজিক নানা বিষয়ে, পানাহারে, শিষ্টাচারে, পোষাকে যে ইতিমধ্যেই অনেকটা ইংরাজীভাব আসিয়াছে, তাহা ত দেখাই

:। হয় ত সুদূর ভবিষ্যতে, অষ্ট্রেলিয়ার মত ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া, বা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেও পারে। রাজার জাপানের অভ্যুদয় পূর্ব্ব হইতে জানিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু শিল্পবিজ্ঞানে জাপান এশিয়ার (কিয়ৎপরিমাণে) বর্ত্তমান ও (আরও অধিক পরিমাণে) ভবিষ্যৎ শিক্ষাগুরু হইলেও, অধ্যাত্মরাজ্যে ভারত সম্ভবত এশিয়ার শিক্ষক হইবে। এ সকলই সম্ভব ; কিন্তু প্রশ্ন এই, রাজা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে খৃষ্টান দেশ কেন বলিলেন? রাজার জীবনচরিত-লেখিকা কুমারী কলেট খৃষ্টান ছিলেন। লেখিকার যে বন্ধু পুস্তকটি সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও তাহাই। কিন্তু তাঁহারাও বলেন যে রাজা খৃষ্টান ছিলেন না। মৃত্যুর পরেও তাঁহার দেহে যজ্ঞোপবীত ছিল, এবং মৃত্যুশয্যার শায়িত থাকিয়া তিনি ঘন ঘন "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতলেখক বলেন যে কেহ হয় ত বলিতে পারেন, যে, ভারতবর্ষ খৃষ্টান হইবে এই লোভ দেখাইয়া, তিনি হয় ত ইংরাজদিগকে নিজ প্রস্তাবে রাজী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান রাজার অকপট মহৎ চরিত্রের বিরোধী। তদ্ভিন্ন,

ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ স্বাধীন হইবে, একথাও ত ঐ পুস্তিকাতে ছিল। এ কল্পনা ইংরাজের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হইতে পারে না। সুতরাং রাজার চরিত্রে এরূপ কপটতার আরোপ করা যায় না। চরিতলেখক বলেন, রাজার নিজের পক্ষে এ কল্পনা প্রীতিকর না হইলেও তিনি হয়ত মনে করিতেন, ভারতবর্ষ প্রথমে খৃষ্টান হইবে এবং পরে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিবে। আমরা কিন্তু আর একটি ব্যাখ্যা সম্ভব মনে করি। এক অর্থে, দেশের প্রভাবশালী ও রাজশক্তিপরিচালক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে তদ্দেশের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। যেমন আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোক রোমানক্যাথলিক হইলেও বহুকাল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম তথাকার সরকারী ধর্ম্ম (state religion) ছিল। রাজার প্রস্তাবমত ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, ঔপনিবেশিক ও তাহাদের বংশধরগণ যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মকেই সরকারী ধর্ম্ম বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। আমাদের বোধ হয় রাজা মনে করিতেন, ভারতবর্ষের লোক ভবিষ্যতে খৃষ্টধর্ম্মের সারসত্যে বিশ্বাস করিবে। তাঁহার Precepts of Jesus নামক গ্রন্থে তিনি এই সারসত্যগুলি সঙ্কলন করেন। এই সারসত্যগুলি কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মেও অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও, ইংলণ্ডের পাঠক-সাধারণকে নিজের মনোগতভাব সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি বোধহয় "খৃষ্টান" অপেক্ষা অধিক উপযোগী শব্দ খুঁজিয়া পান নাই, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। প্রশ্নটি কিন্তু রহস্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষের জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের হানি করিবে, এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, আপাততঃ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে।

রাজার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলির আলোচনায় এখনও লাভ আছে। রাজা যেমন বলিয়াছিলেন, ইংরাজেরা এখনও তাহাই বলেন, যে বিলাতী মূলধন দ্বারা ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করা উচিত। এই উপায়ে শিল্পের উন্নতি ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ইউরোপীয় শিল্প ; টাকাগুলিও বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। রাজার প্রস্তাবের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই শিল্পোন্নতি ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা ইউরোপীয়গণকর্ত্তৃক সাধিত হইলে, টাকাটা বিদেশে যাইত না। এখন ইউরোপীয়গণের অনুকরণে ভারতবাসীরাও কলকারখানা করিতেছেন ; ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, এই অনুকরণ হয় ত আরও বিস্তৃত হইত। নীলকর ও চা-করেরাও একপ্রকার জমীদার ; কিন্তু তাহাদের দ্বারা ত রাজার কল্পিত দেশহিতকর কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইতেছে না? উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, তাহারা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই, এবং সম্ভবতঃ অধিকাংশস্থলে রাজার প্রার্থিত "চরিত্রবান্ ও ধনবান শিক্ষিত ব্যক্তি"ও নহে। ভারতবাসী ইংরাজ ও দেশের লোক একযোগে আন্দোলন করিলে যে রাজ-নীতিক্ষেত্রে শীঘ্র ফললাভ হয়, জুরী-বিজ্ঞাপনীজনিত আন্দোলনে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বার্থের ঐক্য না থাকায় এইরূপ আন্দোলন প্রায় ঘটে না। ইংরাজেরা ঔপনিবেশিক হইলে হয়ত আরও স্বার্থের ঐক্য এবং তাহার ফলস্বরূপ আমাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের সুযোগ হইত। অপরপক্ষে

আশঙ্কা এই যে আমরা হয় ত, যে যে দেশে ইউরোপীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথাকার আদিম-নিবাসীদিগের ন্যায় পদদলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম। কিন্তু একটা প্রভেদ আছে। আমরা তাহাদের মত অসভ্য বা সংখ্যায় কম নহি।*

১৩০৮ মাঘ

"শিষ্য" নাম দিয়া আমাদের একজন পাঠক লিখিয়াছেন—"রাজা রামমোহন রায়ের রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয়, ইয়ুরোপীয়গণ এতদ্দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হইলে, ভারতের ইষ্টানিষ্টের কি কি সম্ভাবনা ছিল, তদ্বিষয়ে রাজার মতসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা ভবিষ্যৎ ভারতকে 'খৃষ্টানদেশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে লেখকের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটী এই—"রাজা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে খৃষ্টান দেশ কেন বলিলেন?" (পৃঃ ১১১) লেখক মহাশয় প্রশ্নটীর তিনটী সমাধান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন, "প্রশ্নটী কিন্তু রহস্য পূর্ণ।"

প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পর হইতেই আমি রাজার গ্রন্থাবলী দেখিতেছিলাম। রাজা তদীয় "Remarks on Settlement in India by Europeans" নামক পুস্তিকার দ্বিতীয় প্যারায় ইয়ুরোপীয়গণের উপনিবেশদ্বারা ভারতের যেরূপ ইষ্টসাধন হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্যারার ৯ম দফায় তিনি লিখিয়াছেন—

"If however, events should occur to effect a separation between the two countries, then still the existence of a large body of respectable settlers *(consisting of Europeans and their deseandants professing Christianity)* and speaking the English language in common with the bulk of the people, *(as well as possessd of superior knowledge–scientific, mechanical and political)* would bring that vast empire to a level with *other Christian countries* in Europs &c. &c."

এক্ষণে লেখকমহাশয়ের উদ্ধৃত অংশটী (পৃঃ ১১০) ইহার পর পাঠ করিলে রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। পরে পাঠ করিবার একটী তাৎপর্য্য আছে। রাজা প্রথমতঃ ভারতের ভাবী মঙ্গলের আলোচনা করিয়া পরে অমঙ্গলের আলোচনা করিয়াছেন। দুইটী উদ্ধৃত অংশের ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য এতদূর যে পূর্ব্বটী ছাড়িয়া পরটীর অর্থ হঠাৎ করা যায় না। মদুদ্ধৃত অংশের "other Christian countries" ও বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

* রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থলের ছাঁচ লইয়া একটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। উহা এক্ষণে মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে রক্ষিত আছে। বসু মহাশয় উহার ফোটোগ্রাফ লইয়া চিত্র প্রকাশিত করিবার অনুমতি দেওয়ায় আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। মূর্ত্তিটি বিলাত হইতে আনিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায়। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় ভাঙ্গা অংশগুলি অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত জোড়া দিয়াছেন। সম্পাদক।

রাখিলেই সমুদয় সন্দেহ বিদূরিত হইয়া যায়। খৃষ্টান ঔপনিবেশিকগণ ধনে, বিদ্যাবলে, কৌশলে, ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে ভারতবাসীর অগ্রণী হইবে, এবং তাহাদিগের নামেই ভারত জগতে পরিচিত হইবে, এমত সংস্কারের অধীন হইয়াই রাজা ভবিষ্যৎ ভারতকে খৃষ্টানদেশ বলিয়াছেন ; এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না।"

১৩২৬ ভাদ্র

রামমোহনের সেবাধর্ম্ম

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

যেনোপায়েন দেবেশি! লোকঃ শ্রেয়ো সমশ্নুতে।
তদেব কর্ত্তব্যং ব্রহ্মজ্ঞের্ এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।

রামমোহনের সেবাধর্ম্ম সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম। সহজাত যাহা, instinctive যাহা, তাহা করিতে মানুষ বাধ্য। কেন বাধ্য তা সে নাও জানিতে পারে—প্রাণের টানে তা সে করেই। তার পশ্চাতে ইতিহাস থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা সব সময় জানে না। সেবা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন ধর্ম্ম ; কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বসাধারণ জনের সেবাই ব্রহ্মসেবা। ইহাই সেবাধর্ম্মের পারমার্থিক দিক্। প্রত্যেক মানুষ ব্রহ্মের মন্দির—আমার ইষ্টদেবতার আসন। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাত, আন্তর্জ্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক অত্যাচার অবিচার যা নরনারীর মুখে আমার ইষ্টদেবতার মুখ প্রকাশিত হইতে দেয় না, পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিকে লুক্কায়িত করে—তাদের বিপক্ষে যে সংগ্রাম তা আমার ইষ্টদেবতার মন্দির সম্মার্জ্জন, তাঁহার আসন পরিষ্করণ। রামমোহনের সেবাধর্ম্ম কেন সর্ব্বগত, কেন তাহা মানবজীবনের কোন বিভাগই পরিত্যাগ করে নাই, আমরা এইখানে তাহার আভাস পাইতেছি। মন্দির কিঞ্চিন্মাত্রও অপবিত্র থাকিলে দেবতার আবাহন হয় না। ইহাই সেবাধর্ম্মের পারমার্থিক তত্ত্ব, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট প্রকাশিত। নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস। সেইজন্যই লোকশ্রেয়-সাধনকে রাজা ব্রহ্মজ্ঞের সনাতনধর্ম্ম বলিয়াছেন। তবে সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বাধ্যও নয়, সমর্থও নয়। সেইজন্য সেবাধর্ম্মের একটা ব্যবহারিক দিকও রাজা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা প্রতিবাসীর সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের মত জানিয়া তার সেবা করা। ইহারই উপর মানুষের সকল সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে। রাজা বলিয়াছেন যে মানবের সকল ধর্ম্ম দুইটি মূল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা ও পরস্পর সৌজন্যে ও সাধু ব্যবহারে কালহরণ। পরস্পর সাধু ব্যবহারের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না (সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথাপরে)। এরূপ অজ্ঞলোকের অভাব নাই যারা প্রশ্ন করিতে পারে যে প্রতিবাসীকে এই চক্ষে দেখিব কেন? আমি কেবল আমারই সুখদুঃখের খবর নিতে বাধ্য। আমিই সব। আমার প্রতিবাসী আমিই, সুতরাং তার দুঃখ আমার, ইহাই সেবাধর্ম্মের ভিত্তি। নতুবা প্রতিবাসী আমার কে? কিন্তু প্রশ্ন এই, প্রতিবাসীর বাড়ীতে আগুন লাগিলে দৌড়াইয়া সে আগুন নিভাইতে যাই কেন? ইহার স্বাভাবিক উত্তর এই যে পরোপকারে মানুষ ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হয়। কেহ

বলিতে পারেন যে আমি ঈশ্বর মানি না, মানি কেবল নিজেকে এবং নিজের সুখদুঃখকে। আমার প্রতিবাসী তো আমিই, তার ঘর তো আমারই ঘর, সুতরাং আমার ঘরের আগুন আমি নিভাইব না কেন? এই যুক্তি শুনিয়া সকলে ঐ তার্কিকের জন্য সর্‌কারের বিষ্ণুতৈলসেবী অতিথিদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরের দরজা খুলিয়া ধরিবেন, সন্দেহ নাই। কেননা, এই যুক্তি মানুষকে সকল দুষ্কর্ম্মেও প্রবৃত্তি দিবে। আমার প্রতিবাসী তো আমিই, তার টাকাও আমার টাকা, সুতরাং সে টাকা আমি না লইব কেন, ইত্যাদি। যাহা হউক, প্রতিবাসী ও আমি এক না হইলেও তার বাড়ীর আগুন নিভাইবার জন্য ত্বরা করিবার কারণ আমার পক্ষে যথেষ্টই আছে: তার ও আমার ঘরের মধ্যে এক যোগসূত্র আছে। ঈশ্বরই যেন না মান, ব্রহ্মজ্ঞানীই যেন হও নাই, ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইতেই যেন চাও না, কিন্তু ঐ সূত্র ধরিয়া প্রতিবাসীর ঘরের আগুন যে তোমার ঘরে আসে, কতযুগ ধরিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া তো অঙ্গার হইতেছে, তবু কি তাও মান না? প্রতিবাসীর কলেরা বসন্ত প্লেগ হইলে তুমি ভয়ে সারা হও কেন? তুমিই সব, সুতরাং প্রতিবাসী মরিলে তুমিই মর বলিয়া কি? না, প্রতিবাসীর সঙ্গে তোমার এমন অঙ্গাঙ্গী যোগ যে তার ব্যাধি নিবারণ না করিলে ও-ব্যাধি তোমাকেও আক্রমণ করিবে। একবার এক আইরিশ রমণী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আশ্রয় না পাইয়া শেষে পুত্রকন্যাসহ টাইফয়েড রোগে গাছতলায় মরে। সে রোগ গ্রাম ছাইয়া ফেলায় স্থানীয় কাগজের সম্পাদক দুঃখ করিয়া লিখিলেন যে মহিলাটি যদিও জীবদ্দশায় আপনার ভগিনীত্ব সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হন নাই, মৃত্যুদ্বার দিয়া কিন্তু তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া গেলেন ; তিনি আমাদের ভগিনী না হইলে তাঁর রোগের উত্তরাধিকারী আমরা হইলাম কেন? আশা করি, আমিই আমার প্রতিবাসী এই মত স্বীকার না করিয়াও আমার ভাই ভগিনী পুত্র কন্যারই ন্যায় প্রতিবাসীরও দুঃখ দারিদ্র্য মূর্খতা দুর্নীতি দূর করিবার জন্য কেন আমি সচেষ্ট হইতে বাধ্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। প্রতিবাসীকে জ্ঞানধর্ম্মে অনধিকারী অস্পৃশ্য শূদ্র করিয়া রাখিলে দেশের ব্রাহ্মণগুলিও যে শেষে শূদ্রই হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আর আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না। আমি ও আমার প্রতিবাসী এক নই, একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হাতের এক বিন্দু রক্ত ক্ষয় হইলে সে বিন্দু পায়েরও ক্ষতি—অথচ হাত পা নয়, পা হাত নয়। সেই জন্য আমিই আমার প্রতিবাসী না হইয়াও প্রতিবাসীর মঙ্গল-চিন্তা আমারই মঙ্গল-চিন্তার ন্যায় করিব, তাহার অনিষ্ট নিবারণে প্রাণপণ করিব। সমাজ-স্থিতির জন্যই পরস্পরের সাহায্য করিব—যে ব্যবহারে আমার অতুষ্টি প্রতিবাসীর প্রতি সে ব্যবহার করিব না। ইহাই সেবাধর্ম্মের ব্যবহারিক দিক্। কিন্তু এই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সকলে সেবাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে—আলোচনা না করিলে কেহ সেবাব্রত গ্রহণ করিবে না, তাহা নহে। সেবাব্রত সহানুভূতির (Fellow-feelingএর) উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার সেবায় আত্মোৎসর্গ, স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন, ভ্রাতাভগিনীর মনস্তুষ্টি, সন্তানগণের মঙ্গল-চিন্তা—কোন সমাজতত্ত্ব বা-বৈদান্তিক ফিলজফির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমিই আমার পিতামাতা, সুতরাং তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য, এই হাস্যোদ্দীপক যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন পুত্র পিতামাতার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সহজেই মানুষ সেবাব্রত গ্রহণ করে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (Instinct)। মানুষ যেমন স্বার্থ খোঁজে, তেমনই পরার্থেও প্রাণ দেয়—তাহা এইরূপ কোন হাস্যকর যুক্তির তাড়নায় নয়। একজন কাশিলে অন্যের গলা সড়সড় করে, একজন হাই তুলিলে পার্শ্ববর্ত্তী হাই তুলে, একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া যে তার প্রতিবাসীর চক্ষে জল আসে তাহা আমিই আমার প্রতিবাসী এই তর্কের খাতিরেও নয় বা এই জ্ঞানলাভের জন্য তাহা বসিয়াও থাকে না। কেননা, উহা মানুষের সহানুভূতি নামক এক মূল বৃত্তির প্রভাব। উহা আট্‌কাইয়া রাখা যায় না। আমি আমার নিজের সুখ কেন চাই তাহার যেমন যুক্তি নাই, না চাহিলেও পারি ; তেমনি সর্ব্বদা যে দেখিতেছি, মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অন্যের জন্য প্রাণ দেয় তাহার পশ্চাতেও কোন যুক্তির প্রেরণা থাকে না। পশুপক্ষীও যে সন্তানের অনিষ্টের আশঙ্কা

Rajah Ram Roy – 48 Bedford Square
London

Ramrotun Mukerjah শ্রীরামরত্ন মুখুয্য –

Ramhurry Days

শ্রীরামহরি দাসস্য

রামমোহন রায়ের হাতের লেখা

দেখিলে নিজের প্রাণের মায়া ছাড়িয়া সন্তানকে রক্ষা করিতে যায়, তাহার পশ্চাতে কোন বেদান্ত ফিলজফি আছে বলিয়া শুনা যায় নাই। জীবের মধ্যে যে-সকল সহজাত বৃত্তি (Instinct) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হয়তো ইতিহাসের দিক্ হইতে আত্মরক্ষা (self-preservation) বংশ রক্ষা (Preservation of the species) প্রভৃতি আদিকারণে পরিপুষ্ট। মানুষ সামাজিক জীব। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ছাড়া সমাজস্থিতি অসম্ভব। মানুষের মধ্যে পরার্থপ্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইবার ইহাই কারণ। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই উভয়ের সামঞ্জস্যের উপর ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিবে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে—ইহাই রাজার নির্দ্দেশ। এখানে স্বার্থ ও পরার্থ একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেবাধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

রামমোহনের সেবাধর্ম্ম কি, আমরা তাহার পরিচয় পাইলাম। এখন জলপ্লাবনে একটু সাহায্য দুর্ভিক্ষে চাউল বিতরণ করিয়াই আমার ভাবি সেবাধর্ম্মনীতিকে অনুসরণ করিলাম। কিন্তু দেশের জ্ঞানদৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। অন্ধতার বড়াইটাই দেশে সকল বড়াইয়ের উপরে উঠিয়া বসিতেছে। যাহা হউক, প্রতিবাসীকে কেন ভাল বাসি তাহার উত্তর আমরা পাইয়াছি ; এখন দেখি আমিই আমার প্রতিবাসী, সুতরাং প্রতিবাসীর দুঃখ নিবারণ আমারই দুঃখ নিবারণ, এই ফিলজফিতে সেবাধর্ম্ম কূলে উঠে না অকূলে ভাসে। আমার প্রতিবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িত, সুতরাং আমিই দুর্ভিক্ষপীড়িত। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবা করিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়। আমি আমার প্রতিবাসীরূপে দুর্ভিক্ষেও পীড়া পাইলাম, আবার তাহা নিবারণ করিতে যাইয়া দ্বিতীয়বার কষ্ট উপার্জ্জন করি কেন? কষ্টটা এক আধারেই থাকুক না। বিশেষতঃ আমি আমার প্রতিবাসীরূপে উপবাস করিয়া মরি তাহাতে তোমার মাথাব্যথা কেন? আমি শতমুখে খাইতেছি, না হয় দুই মুখে না-ই খাইলাম—আমার এই উত্তরে যদি সেবাধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি না হয় আর ফিলজফারের চক্ষু কপালে না উঠে তবে তিনি যে প্রকৃতিস্থ সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ঘটিবে। যদি বল তুমি কি তোমার নিজের দুঃখও নিবারণ করিবে না? উত্তরে বলি, না। বরং অপরের কষ্ট নিবারণ করিতে যাইয়া নিজের কষ্টকে বরণ করিয়া লইব, ইহাই সেবাধর্ম্ম। সেবাধর্ম্ম নিজের সেবা নয়, পরের সেবা। Egoism যত বড়ই হউক না কেন—বিশ্বজোড়া হইলেও সেবাধর্ম্মের আসনের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র। রামমোহন যদি বামমার্গীয় বেদান্তের এই অহংসর্ব্বস্ববাদের উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না চাহিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ এই এবং সে কারণ তিনি আমর্হার্ষ্টকে জানাইয়াওছিলেন যে বেদান্তের একান্ত অদ্বৈতের উপর, সেবাধর্ম্ম কেন, কোন কর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হয় না। বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে দেশ ইতিপূর্ব্বে ছাইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক দেশে অকর্ম্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুখদুঃখটা অনুভূতি। আমি ছাড়া কিছু নাই, আমিই তো তোমার প্রতিবাসী, কিন্তু প্রতিবাসীর সুখদুঃখের অনুভূতি আমার মধ্যে কোথায়? সুতরাং ও সুখদুঃখ মিথ্যা। তত্ত্বের দিক হইতে এ বেদান্তের পরিণতি মায়াবাদে, ও জীবনের দিকে সন্ন্যাসে। কর্ম্মত্যাগে সুতরাং সেবাধর্ম্মের গঙ্গা প্রাপ্তি। যদি কোন বেদান্তী জীবনে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস আবেষ্টনের প্রভাব বা পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রমাণ করিবে, বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করিবে না। কেননা, বিষবৃক্ষে অমৃত ফলে না। আমার তোমার কাছে যতই উচ্চ হউক না কেন, বৈদান্তিকের কাছে সেবাধর্ম্মও শৃঙ্খল। সোনার শিকলে পা আট্‌কাইলেও তাহা বন্ধন। বৈদান্তিকের হস্তে সেবাধর্ম্মের পরিণতি—

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োরপি চ চিন্তয়েৎ॥

হাত কাটুক বা চন্দন চর্চ্চিত করুক, কাহারও কল্যাণ অকল্যাণ চিন্তা করিবে না। কাজির কাছে দুর্গোৎসবের পাঁতি আর বেদান্তের উপর সেবাধর্ম্মের

ভিত্তি—একই। উভয়েরই স্বর্গলাভ! একান্ত অদ্বৈতে সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মের বিনাশ। আমিই আমার প্রতিবাসী, এই ফিলজফিতে সেবাধর্ম্ম টিকিবে না। আমি ও আমার প্রতিবাসী এক নই, স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়াও একসূত্রে গ্রথিত—এই দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব—স্বতন্ত্র হইয়াই এক—এই তত্ত্বের উপর সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। তবে এই সূত্রটি যে কি তাহা বিভিন্ন অধিকারীর নিকট ও বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্নভাবে প্রতিভাত হইবে। সাধনায় সিদ্ধ রামমোহনের জ্ঞান ও অনুভূতির নিকট এই সূত্রটি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, আমি সেটি আশা করিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে সেবাধর্ম্মের কিছু আসিয়া যায় না।

আলোচনা

১৩২৬ পৌষ

বেদান্ত ও সেবাধর্ম্ম

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গত ভাদ্রের প্রবাসীতে সেবাধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে দেশ ইতিপূর্ব্বে ছাইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক দেশে অকর্ম্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুখদুঃখ অনুভূতি, * * সুতরাং ও সুখ দুঃখ মিথ্যা। তত্ত্বের দিক হইতে বেদান্তের পরিণতি মায়াবাদে ও জীবনের দিকে সন্ন্যাসে। কর্ম্মত্যাগে সুতরাং সেবাধর্ম্মের· গঙ্গাপ্রাপ্তি।"

ধীরেন্দ্র-বাবুর মত প্রাজ্ঞ দর্শনের অধ্যাপকের মুখে এসব, আরও এমনি সব কথা শুনিয়া দুঃখ হয়।

উদ্ধৃত বাক্যে ধীরেন্দ্র-বাবু বেদান্তের এবং বেদান্তবাদের উপর যাহারা সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে তাহাদের আক্রমণ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি আর কয়েকটি গুরুতর কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন যাহা যুক্তিতর্কের কাছে মোটেই টিকিবে না।

"বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে দেশ ছাইয়া যাইত।"

একথা সত্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত কথাগুলি অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া মানিতে হয়।

(১) "ইতিপূর্ব্বে" (অর্থাৎ বোধ হয় রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে) "দেশে" (সম্ভবতঃ বাঙ্গলা দেশে) বেদান্তবাদ দ্বারাই হিন্দুজাতির সমস্ত জীবন নিয়মিত হইত, অন্ততঃ ইহাই ছিল জীবনের প্রধান নিয়ামক।

(২) কোনও ধর্ম্ম বা মতবাদ গৃহীত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই দেশস্থ লোক সেই ধর্ম্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ্যবা পরোক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট বা প্রশংসিত সকল আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে। পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কৃত বা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

(৩) "ইতিপূর্ব্বে" (অর্থ পূর্ব্ববৎ) সেবাধর্ম্ম বলিয়া কোনও জিনিষ দেশে ছিল না।

ঐতিহাসিক হিসাবে এ তিনটি কথাই যে সম্পূর্ণ মিথ্যা সে বিষয়ে বোধ হয় ধীরেন্দ্রবাবু ধীর ভাবে বিচার করিলে কোনও সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ করিবেন না।

প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে বাংলা দেশে বেদ বা বেদান্তের মোটে প্রচার ছিল না। দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ন্যায় এবং জীবনের নিয়ামক হিসাবে স্মৃতিই একমাত্র শাস্ত্র স্বরূপে এদেশে অধীত বা অনুসৃত হইত। অন্ততঃ রঘুনন্দনের সময় হইতে যে এই প্রকার অবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পরাশরাদি নানা শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় রক্ষা করে না সে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অধম। রঘুনন্দন অবশ্য এ ব্যবস্থা খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু সমস্ত বেদের বীজস্বরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই স্বাধ্যায় রক্ষা হয়, তিনি এই মত ব্যক্ত

করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশ লোকই এইভাবে স্বাধ্যায় রক্ষা করিতেন বলিয়াই যে রঘুনন্দনের এ ব্যবস্থা সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। আরও পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে অন্ততঃ আদিশূরের আমল হইতে এ দেশ হইতে বেদ বেদান্ত নির্ব্বাসিত।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ঠিক এ অবস্থা না হইলেও বেদান্ত যে কোথাও জীবনের প্রধান নিয়ামক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে সকল যুগেই দ্বিজাতিগণের মধ্যে জীবনের নিয়ামক হিসাবে বেদান্ত অপেক্ষা স্মৃতির প্রাধান্য অনেক বেশী ছিল, একথা স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিলে অনায়াসেই দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি আর যাহাই হউক তাহা বেদান্ত বা মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্মৃতিশাস্ত্রে আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার দার্শনিক ভিত্তি কিছুই নাই। তবে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সহিত দর্শনের কথঞ্চিৎ সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে-সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত সাংখ্য ও যোগ দর্শনের কিছু সাহায্য আছে, বেদান্তের সঙ্গে তাহার মোটেই সংযোগ নাই।

সুতরাং প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস (cultural history) নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহাই বলিতে হয় যে বেদান্ত কখনও লৌকিক জীবনে খুব বেশী মাত্রায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য্যও লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ ও ধর্ম্মে প্রভেদ রক্ষা করিয়া লৌকিক জীবনের মায়াবাদ নিরপেক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথাটিও যে সম্পূর্ণ অসত্য তাহা ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, দেড় হাজার বৎসর হইল ইউরোপে এই ধর্ম্মমত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আজও নিত্য নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ যীশুখ্রীষ্টের মতের অনুশীলন করিতেছে। সে দিনও তো টলষ্টয় ইউরোপের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে লোকে খ্রীষ্টের বিধি এখনও শিখিতে ও অনুসরণ করিতে জানে নাই।

একটা সত্য যখন নূতন আবিষ্কৃত হয় তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় আনুসঙ্গিক সত্য আবিষ্কৃত হয় না। তাহা ছাড়া সত্যটা সর্ব্বদাই সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থামূলক উপাধিযুক্ত হইয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমে সেই উপাধিরও ভেদ হইয়া থাকে। ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস ও sociology তে এ ব্যাপার সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সেবাধর্ম্ম তাহার একটা অঙ্গ বলিয়া আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ বলেন যে অদ্বৈতবাদ যদি সত্য হয় তবে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে সে কথা গুরুতর দোষের হয় না। "ইতিপূর্ব্বে" কেহ সেবাধর্ম্মের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের এই নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন নাই বলিয়াই যে এ সম্বন্ধ নাই এ কথা বলা চলে না। যদি এ সম্বন্ধ থাকিত তবে "ইতিপূর্ব্বেই" সেটা আবিষ্কৃত হইয়া সেবাধর্ম্ম অনুসৃত হইত এ কথাও বলা চলে না।

তৃতীয় কথা এই যে সেবাধর্ম্ম জিনিষটা আমাদের দেশে ছিল না।

আজকাল যে আকারে সেবার অনুষ্ঠান হইতেছে সে আকারে ইহা ছিল না। দল বাঁধিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যে বিশিষ্ট আকারে আমরা হিতসাধন আজকাল আরম্ভ করিয়াছি তাহা ছিল না। কিন্তু সেবাধর্ম্মটাই কি ছিল না বা দেশ ছাইয়া ছিল না?

আমি অতীতের অন্ধ উপাসক নহি এবং অতীতে যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা আমাদের নাই বলিয়া খুব বেশী আপশোষ করা আমার অভ্যাস নয়। আমাদের ইদানীন্তন অতীতের চেয়ে যে বর্ত্তমান প্রায় সব বিষয়েই ভাল আমি তাহা বিশ্বাস করি। সেকালের লোকেরা যে সবাই দেবতা ছিলেন এমন ধারণা আমার নাই। ঠিক এখনকার মত সেকালেও অনেক নীচাশয় স্বার্থপর হিংসাপর লোক ছিল তাহা আমি জানি। কিন্তু সেবার আদর্শ হিসাবে যে সেকালের লোক আমাদের চেয়ে খুব নিকৃষ্ট ছিল তাহা আমি মনে করি না। হিন্দু সমাজে জীবনের আদর্শটা ছিল আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপনের আদর্শ। গৃহকর্ত্তা হইতে শিশু ও ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত সকলের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মের দ্বারা শাসিত, এবং সেই শাসনের ও নিয়মের

মূলমন্ত্র আমিটাকে চাপিয়া রাখিয়া জীবনটা দেব-গুরু-পিতৃ-অতিথির সেবায়, দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে আর্ত্তের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করা। কড়া শাসনে সেবাধর্ম্মের যে স্বাধীনতার গৌরব তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। একথাও সত্য যে অনেকে সে আদর্শ অনুশীলন করিত না বা বাহ্যতঃ অনুশীলন করিলেও অন্তরে অন্তরে সে নিয়মকে অভিশাপ দিত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সমস্ত সমাজের গাঁথুনীটা ছিল পরস্পরের সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমাদের সেবাধর্ম্মের আদর্শ হয় তো অনেকটা বেশী পরিসর লাভ করিয়াছে। আমাদের চিত্তের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, সহানুভূতির ক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হইয়াছে, সেবার প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে-সমস্ত ব্যাপারকে সেবাধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ বলিয়া আজ আমরা মনে করি সে কালের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের হয়তো সে-সব কথা কল্পনায়ও আসে নাই। তাহা ছাড়া আমাদের বর্ত্তমান কালের সেবাধর্ম্মের একটা গৌরব এই যে ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজের শাসনের উপর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে সেই প্রাচীন সেবাধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা কিছু তাহা নয়। যে অন্যোন্যা-নুকূল্যেব উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন সেবাধর্ম্ম ও আজকাব সেবাধর্ম্ম সেই ব্যাপারের পরিণতির ক্রমভেদ মাত্র। সুতরাং আজকালকার সেবার প্রণালী ভিন্ন হইলেও সেবাধর্ম্মটা যে নেহাৎ হালি জিনিষ, ইহা যে সেকালে ছিল না, একথা বলা চলে না। সেবাধর্ম্ম যে সেকালে ছিল ও দেশ ছাইয়া ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলাবাহুল্য যে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বেদান্তের অদ্বৈতবাদে সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতেই ইহার চরম প্রতিষ্ঠা। ধীরেন্দ্র-বাবু অদ্বৈতবাদকে অহং-সর্ব্বস্ব বলিয়াছেন। তিনি বোধহয় তর্কের উত্তেজনায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বেদান্তমতে অহং একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ। সুখ দুঃখ যদি না থাকে তবে অহং বলিয়াও কোনও জিনিষ নাই। ধীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে বেদান্তের যুক্তি, সুখ ও দুঃখ মিথ্যা, অতএব তোমার প্রতিবেশীর দুঃখ বিমোচন করিবার চেষ্টা বৃথা। (ধীরেন্দ্রবাবু অবশ্য পড়িয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্যের মতেও সুখ দুঃখ লৌকিক হিসাবে মিথ্যা নয়, সুতরাং Caird বা Hegel যাহাই বলুন বেদান্ত জানে এমন কোনও বৈদান্তিক একথা বলিবে না।) অতএব ধীরেন্দ্র বাবুর মতে এ মতবাদের উপর সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ধীরেন্দ্রবাবুর জানা আছে যে সেবাধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন গৌতম বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণ। তাঁহাদের ধর্ম্মমতেও সুখ দুঃখ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, এমনকি আত্মা পর্য্যন্ত মিথ্যা—এবং কোনও কোনও বৌদ্ধের মতে সমস্ত জগৎ শূন্য। এই মতবাদের উপর বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের চিরন্তন প্রশংসার উপর পাকা দাবী রাখিয়া গিয়াছে। শূন্যবাদের উপর যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ধীরেন্দ্রবাবুর তথা-কথিত বেদান্তধর্ম্মের উপর সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে কি গুরুতর আপত্তি আছে বুঝিতে পারিলাম না।

মায়া বা অবিদ্যার অর্থ যাহাই হউক এসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে বেদান্তমতে যতদিন জীব জীবরূপী থাকে ততদিন সে মায়ায় আবদ্ধ। মায়বদ্ধ জীবের লক্ষ্য মোক্ষ অর্থাৎ সেই বন্ধন হইতে মুক্তি। সেই মুক্তি-লাভের উপায় জ্ঞান ও কর্ম্ম। যখন বিবেক-জ্ঞান হয় তখন ব্রহ্মাত্ম-বোধ হয়, তখন মোক্ষ হয় তখন সুখ দুঃখে ভেদ থাকে না, ভালমন্দ ভেদ থাকে না। সমস্ত ভেদ লুপ্ত হইয়া আত্মার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হয়। তার মানে ইহা নয় যে বস্তু জীবের পক্ষেও সুখ দুঃখ সমান বা ভাল মন্দ সমান। তাহার পক্ষে, তাহার বিজ্ঞানে সুখ-দুঃখেরও বাস্তব সত্তা আছে। তাহার প্রতিবেশীরও বাস্তব সত্তা আছে। তাহার পক্ষে মোক্ষ লাভ করিতে হইলে এই সুখ-দুঃখানুভূতির ভিতর দিয়া মোক্ষের অনুশীলন করিতে হইবে। ধর্ম্ম এই অনুশীলনের একটি উপায়, দেব-পিতৃ-অতিথি- সেবা সেই ধর্ম্মের অঙ্গ। সুতরাং ইহা তাহার মোক্ষলাভের উপায়, তাহার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পন্থা স্বরূপ। অদ্বৈতবাদের মতামতের সম্বন্ধে আর যে বিবাদই থাকুক ইহার এই শিক্ষা সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

ধীরেন্দ্রবাবু যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহা অদ্বৈতবাদ নহে বিজ্ঞানবাদ। শারীরিক ভাষ্যেই এই মত খণ্ডিত হইয়াছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে।

সুতরাং অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সেবা-ধর্ম্মের বিরোধ নাই। "কাজির কাছে দুর্গোৎসবের পাঁতি আর বেদান্তের উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি একই" একথা বেদান্তবাদীর কাছে একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

ইহাই যদি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সেবা-ধর্ম্মের সম্বন্ধ হয় তবে ইহার বিশিষ্টতা কোথায়? একথা কি হিসাবে বলা চলে যে অদ্বৈতবাদেই প্রকৃত সেবা-ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা? একথা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন। অদ্বৈতবাদের বিশেষত্ব এইখানে যে এমতে সেবাধর্ম্মের মধ্যে অহঙ্কারের অবসর থাকে না। দয়ার উপর সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্ব্বের ও অহমিকার অবসর দেওয়া হয়, কেননা দয়ায় মূল এই যে যাহাকে দয়া করিতেছি আমি তাহা অপেক্ষা বড়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বলে যে একথা সত্য নয়। তুমি কাহাকেও দয়া করিতেছ না, তোমার কর্ত্তৃত্বই ইহাতে নাই—তোমার ব্রহ্মরূপী আত্মা এই সেবার পথ দিয়া মোক্ষের সন্ধান করিতেছে। তাহা ছাড়া জীব ব্রহ্ম এই কথা জানিয়া তুমি কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতে বা তোমা অপেক্ষা হীন ভাবিতে পার না। এইরূপে বেদান্তবাদ নিষ্কাম নিরহঙ্কার ও সশ্রদ্ধ সেবার সহায়তা করে বলিয়া আমি মনে করি। তাহা ছাড়া অদ্বৈতবাদে নিজের উপর শ্রদ্ধাবৃদ্ধি করে, নিজের কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত করে ও যাহা কিছু নীচ বা ক্ষুদ্র তাহা বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয়। "সোহহং" "শিবোহহং" এর ভিতরে স্পর্দ্ধার কথা থাকিতে পারে, কিন্তু সে স্পর্দ্ধা আমার এই রক্তমাংসময় শরীরের বা অহমিকাময় অন্তরের স্পর্দ্ধা নয়, আমার সারভূত যে বস্তু যাহা সৎ চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ সকল সত্য শিব এবং সুন্দরের যাহাতে পরিনিষ্ঠা সেই পরমাত্মার গৌরব। আপনাকে ঊর্দ্ধে টানিয়া লয়, নিজের শরীরমনকে সেই মহান বস্তুর সাময়িক আধার হইবার উপযোগী হইতে প্রবর্ত্তিত করে ; কেবল মাত্র শ্রেয়ের সন্ধানে, যাহা কিছু মঙ্গল যাহা কিছু উত্তম তাহারই অনুশীলনে নিযুক্ত করে। এই ভাবই সেবাধর্ম্মের অনুশীলনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভাব।

একটা কথা উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা করি। ধীরেন্দ্র-বাবু রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকবার লিখিয়াছেন। যাহা রাজা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই চরম সত্য এবং তিনি ছাড়া অন্য কেহ কোনও নূতন কথা বলিতে পারে না এবং বলিয়া থাকিলে তাহা অশ্রদ্ধেয় ; যদি কেহ রাজার কোনও মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করে তবে সে সর্ব্বতোভাবে গালি ও উপহাসের যোগ্য এবং সে কখনও রাজার নাম করিবার যোগ্য নয় ;—এমনি একটা ভাব ধীরেন্দ্র-বাবুর অনেক লেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ; এ প্রবন্ধেও প্রচ্ছন্নভাবে সেই ভাব দেখিতে পাইতেছি। আমি রামমোহন রায়কে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করি—কেবল ভারতের নয় পৃথিবীর একজন মহাপুরুষ বলিয়া গণনা করি। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত সকল কথাকে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে বা সব বিষয়েই তাঁহার মতের অনুসরণ করিতে হইবে এমন কথা আমি মানিতে পারি না। রামমোহন রায়ের এমন অন্ধ উপাসনা ও সঙ্কীর্ণ পূজাকে আমি তাঁহার স্মৃতির অবমাননা বলিয়া মনে করি। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে এমন অনেক মত বাহির করা যায় যাহা ধীরেন্দ্র-বাবু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অন্য অনেকে এমন থাকিতে পারে যাঁহারা অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার মত বর্ত্তমান কালে গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করিতে পারেন। যদি রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়া থাকি তবে আমরা এই-সকল মতান্তর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিব। কারণ রাজার জীবনের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা স্বাধীনতা, এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের শৃঙ্খল-মোচন। আজ যদি আমরা সেই রাজারই নামে আমাদের বুদ্ধির পায় নিগড় পরাইতে বসি, তবে তাঁহারই স্মৃতির অবমাননা করিব। পক্ষান্তরে স্বাধীন চিন্তার দ্বারা যদি আমরা আজ ধর্ম্ম কি আচার কি কর্ম্মঘটিত যে-কোনও নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে বা নূতন পন্থার

অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, তবেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিব এবং তাঁহারই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিব। সুতরাং কেহ একটা নূতন কথা বলিলে রাজার দোহাই দিয়া তাহাকে গালি পাড়া, কেহ নূতন কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিলে তাহার নূতনত্বের দাবী অস্বীকার করিতে যাওয়া রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

আলোচনা

১৩২৬ ফাল্গুন

বেদান্ত ও সেবাধর্ম্ম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গত ভাদ্রের প্রবাসীতে রামমোহন রায়ের সেবাধর্ম্ম নামে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় পৌষের সংখ্যায় তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। আলোচনাটিতে জ্ঞান আছে, গবেষণা আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকেরও মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিত। কিন্তু আমার সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে যাইয়া আধঘণ্টা কেবল মাথা চুল্‌কাইয়াছি, কোন সদুত্তর পাই নাই। শেষে উভয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া যে সমাধান করিয়াছি তাহা এই। নরেশ-বাবু আমার প্রবন্ধ ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই। তাই ফল হইয়াছে বিচারবিভ্রাট। দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি বলিয়াছি, 'বামমার্গীয় বেদান্তের এই অহংসর্ব্বস্ববাদ,'' নরেশবাবু সমাধান করিলেন ''ধীরেন্দ্রবাবু অদ্বৈতবাদকে অহংসর্ব্বস্ব বলিয়াছেন।'' বেদান্তবাদ মাত্রই অদ্বৈতবাদ নয়—বেদান্তের ডাহা দ্বৈত-বাদপক্ষীয় ব্যাখ্যাও আছে—ইহা নরেশ-বাবুর জানা না থাকিবার কথা নয়। যদি ভুলিয়া থাকেন তবে তাহা তর্কের ঝোঁকে। বেদান্ত বলিলেই অদ্বৈতবাদ বুঝিবার কোন সমীচীন কারণ নাই। নরেশ-বাবু ভুলিলেন কেন যে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের তস্য ত্বমসি এই ব্যাখ্যা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। আমি বেদান্ত কথাটাকেও বিশিষ্ট করিয়া দিয়াছি 'বামমার্গীয়' এই শব্দের দ্বারা। তবুও তিনি ভুল করিলেন। অদ্বৈতবাদও নানা রকমের। সেই জন্য আমি ''একান্ত অদ্বৈত'' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তবুও তিনি fallacy করিলেন এবং উল্টা চাপ দিয়া বলিলেন, ''তিনি (ধীরেন্দ্রবাবু) তর্কের উত্তেজনায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বেদান্ত-মতে অহং একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ।'' তর্কের উত্তেজনা ছিল না তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ভুল করিতে পারি এমন কিছু ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তিনিই ভুলিয়া গিয়াছেন, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে, যে, বেদান্তের নানা মতে অহংএর নানা স্থান আছে। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন যে 'সোঽহং'এর 'অহং' রক্তমাংসের শরীরের স্পর্দ্ধা নয়, কিন্তু আত্মার সারভূত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার গৌরব। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই 'অহং'ও একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ কি না? যদি উত্তর হয়, হাঁ, তবে 'মায়া' যাইয়া পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে এবং বেদান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবাক্য (ইহার ব্যাখ্যা যিনি যে ভাবেই করুন) মায়াসম্ভূত পদার্থ হইবে এবং মুক্তিতেও মানুষ মায়ার অতীত হইবে না। (খুঁজিলে এই নিম্নতর অর্থে মায়াস্পৃষ্ট ব্রহ্ম বেদান্তের কোন শাখাপ্রশাখায় পাওয়া যাইবে না, তাহা হলপ্ করিয়া বলিতে পারিব না।) অন্যদিকে যদি উত্তর হয়, এ 'অহং' মায়াসম্ভূত পদার্থ নয়, তবে ''বেদান্তমতে অহং একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ'' ইহা নির্ব্বিচারে বলা চলিবে না। নরেশবাবু এর বৃষের (Dilemma) যে শৃঙ্গই ধরুন না কেন, অন্য শৃঙ্গের খোঁচা খাইতেই হইবে।

যাহা হউক, বেদান্ত মহাগঙ্গা উপনিষদ্ গঙ্গে

াত্রী হইতে বাহির হইয়া সাগর-সঙ্গমের পথে নানা নালা জোলায় প্রবেশ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ও ময়লাদূষিত হইয়াছেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ ইহারই এক নালায় ঢুকিয়া কিঞ্চিৎ আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নরেশবাবু এক হেঁচ্‌কা টানে আমার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া দেশকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ধীরেন্দ্রবাবু গঙ্গা। অপবিত্র করিয়াছেন। আমি সুতরাং নাচার। বেদান্তের কত শাখাপ্রশাখা ডাল-পালা। বেদান্তবাদীর এই-সব শাখা-প্রশাখার সঙ্গে বাহ্যতঃ একটা যোগ থাকে। কিন্তু মনুষ্যপদবাচ্য মানুষমাত্রেরই নিজস্ব একটা বেদান্ত আছে। তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা (temperament), tradition, আবেষ্টনের প্রভাব যত বেশী, তিনি বেদান্তের কোন্ শাখাভুক্ত তার প্রভাব তত নয়। এইটি হইল জীবন দিয়া গড়া বেদান্ত। কড়ায় গণ্ডায় যে ইহার সঙ্গে কোন বেদান্ত, শাখার মিল থাকিতেই হইবে তাহা নয়। তবে মোটা মোটা কতকগুলি বিষয়ে মিল থাকে, এই পর্য্যন্ত। রামমোহন ঠিক যে সময়ে বেদান্তের নিন্দা করিয়া আম্‌হার্ষ্টকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই সময়েই বেদান্তের অধ্যাপনার জন্য পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। এই দুই বেদান্ত এক নয়। নরেশবাবু স্বীয় বেদান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। আমার বেদান্ত যে কি, আভাসে ইহার নিদর্শন তিনি ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই পাইতে পারিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমার মিল কোথায় তাহাও বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে দিক্ দিয়াই যান নাই। আমি যে একটা নালার বেদান্তের কথা বলিয়াছি, তিনি সেইটাকে স্বীয় বেদান্তের সঙ্গে একীভূত করিয়া আমার সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এইরূপ একটি বেদান্তের সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, "তত্ত্বের দিকে এ বেদান্তের পরিণতি মায়াবাদে, ও জীবনের দিবে সন্ন্যাসে। নরেশবাবু 'এ বেদান্তের' 'এ'টা তুলিয়া দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মুণ্ডপাত সাহায্যে আমার দ্বারা বেদান্তের অন্তর্জ্জলির ব্যবস্থা করাইয়া লইয়াছেন। ইহাতে ভুল বুঝিবার ও বুঝাইবার যথেষ্ট অবসর হয় নাই কি? ইহা স্বেচ্ছাকৃত তা বলিতেছি না। অভিনিবেশের অভাব নিশ্চয়ই। তবে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির লেখা নরেশবাবু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন এরূপ আশা করা আমার ধৃষ্টতা। সেই জন্যই তাঁহার এরূপ আক্ষেপ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে যে ধীরেন্দ্রনাথ-বাবুর মত প্রাজ্ঞ দর্শনের অধ্যাপকের মুখে এসব কথা শুনিয়া দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, এ দুঃখটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে বেদান্তের কোন কোনও শাখা তত্ত্বের দিকে মায়াবাদে ও জীবনের দিকে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে যাইয় পৌঁছিয়াছে এ কথা নরেশ-বাবু আমার মুখে শুনিলেন। শঙ্করের মধ্যেই যাহার বীজ ছিল এবং শঙ্করোত্তর বেদান্তে বিশেষ ভাবে পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রকারগণ যাহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যে একরূপ শূন্যবাদে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল একথা নরেশবাবুর মত লোকও জানেন না ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়। এই বেদান্ত সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে "মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছয়ন্নং বুদ্ধমেব তৎ"—ইহার মধ্যে কি একটুও অতিরঞ্জন আছে? কোনও কোনও বেদান্ত যে কত সহজে শূন্যবাদে যাইয়া পৌঁছায় তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যে বেদান্তীর সহিত বিবাদ করিয়াছি তিনি নিরীশ্বর অহংবাদী, তাঁহার কাছে 'আমি' ছাড়া আর কিছুই নাই, ঈশ্বরও নাই। নরেশবাবু বলিতেছেন এই 'আমি' কিন্তু মায়াসম্ভূত পদার্থ। এই দুই বৈদান্তিক একত্রিত হইলে 'পদার্থ' থাকে খালি 'শূন্য' ইহা, আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর নিজেই গীতার কর্ম্মপক্ষীয় শ্লোকগুলিকে সন্ন্যাসপক্ষে ব্যাখ্যা কারবার জন্য যেরূপ টানা-হিঁচ্‌ড়া করিয়াছেন তাহাতে আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে বেদান্তের প্রধান স্রোতেরও গতি কোন্ দিকে! দেশে যে শত শত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা তো সব বাম-মার্গীয়, তাহাদের তো কথাই নাই। ইঁহাদের মতবাদ নিংড়াইলে নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। অদ্বৈতবাদ ইহাদের হাতে এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিষ্ঠাচন্দনে সমান জ্ঞান না করিলে অদ্বৈত ব্যাহত হয়। সুতরাং সু কু পাপ পুণ্য একাকার হইয়া দেশের জাহান্নামে যাইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই-সব 'অহং

ব্রহ্ম' সন্ন্যাসীর মতবাদে উপাসনার জন্যই দ্বৈতভাব, ইঁহারা সেবা করিবেন কাহার? কিন্তু আমি যে বৈদান্তিকের সঙ্গে বিচার করিয়াছিলাম, তিনি ইঁহাদেরও এককাঠি উপরে। নরেশবাবু আমার প্রবন্ধটি পড়িবার কষ্ট একটু স্বীকার করিলেই দেখিতেন যে তিনি মানেন শুধু 'আমি' ঈশ্বরও মানেন না। আমার প্রতিবাসী আমিই, সেই জন্যই তার সেবা এবং ইহারই উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম, এরূপ বেদান্তী যাহাই হউন সেবাধর্ম্মী নহেন, কেন না, "Egoism যত বড়ই হউক না কেন,—বিশ্বজোড়া হইলেও সেবাধর্ম্মের আসনের পক্ষে ক্ষুদ্র"। যেহেতু "সেবাধর্ম্ম নিজের সেবা নয়, পরের সেবা"। নিজের সেবা ও পরের সেবা এক বস্তু নয় অন্ততঃ এই একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে নরেশবাবু আমার সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। কেন না, তাঁর নিজের মতেই সেবাধর্ম্ম "পরস্পরের সেবা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। নরেশবাবু হয়তো বলিবেন "ধীরেন্দ্রবাবু যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহা অদ্বৈতবাদ নহে, বিজ্ঞানবাদ"। "Pot-theism" কি "pan-theism" তাহার বিচার হইতেছে না, আমার বেদান্তী কি বলেন তাহারই বিচার করিয়াছি। তাহা বিজ্ঞানবাদ হয় হৌক, অদ্বৈতবাদ না হয় না হৌক—নামে কিবা আসে যায়। যিনি ঈশ্বরও মানেন না, মানেন কেবল 'একমেবাদ্বিতীয়ং' "আমি" এবং তিনি যখন নিজেকে বৈদান্তিক বলিতেছেন তখন তিনি বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী নহেন কেন? অদ্বৈতবাদও এক কছমের নয়, তার নমুনা পূর্ব্বেই দিয়াছি এবং বেদান্তমতও বহু। নরেশ-বাবু সকলকে আপনার কোঠায় ফেলিতে গিয়া নিজেই solipsismএ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁর solipsismএর আরও পরিচয় আছে। তিনি বলিতেছেন, "তাহার প্রতিবেশীরও বাস্তব সত্তা আছে।" নরেশবাবুর কাছে আছে স্বীকার করিতে হইবে, কেন না তিনি বলিতেছেন, আছে। কিন্তু যে বেদান্তী বলেন, আমি ছাড়া বস্তু নাই, ঈশ্বরও নাই, তাঁহার কাছেও প্রতিবেশীর বাস্তব সত্তা আছে কিরূপে ইহার ফিলজফিটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমায় মত মূর্খের পক্ষে ধরিয়া লওয়াটা যে একেবারেই অসম্ভব। আমি ত অদ্বৈতবাদী। আমিও স্বীকার করি আমি ও আমার প্রতিবাসী এক ঈশ্বররূপ সূত্রের সহযোগে 'সূত্রে মণিগণা ইব', আমিই আমার প্রতিবেশী। সুতরাং একই ব্রহ্ম আমি ও আমার প্রতিবাসীর আত্মারূপে প্রকাশিত বলিয়া আমারই মত আমার প্রতিবাসীরও বাস্তব সত্তা আছে। আমি তো ও-কথা প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্যস্থানীয় বেদান্তী এ কথা বলিতে পারেন কি? এই অদ্বৈতবাদকে "একান্ত অদ্বৈত" বলিয়াছি এবং ইহাতে সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মেরও বিনাশ বলিয়া কোনই অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ বেদান্তের সম্বন্ধেই বলিয়াছিলাম "কাজির কাছে দুর্গোৎসবের পাঁতি আর বেদান্তের উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি একই।" নরেশবাবুর মতে "এ কথা বেদান্তবাদীর কাছে একেবারেই অশ্রদ্ধেয়"। সব বেদান্তবাদীর কাছে নয় (অন্ততঃ তাঁহাদের মতবাদের পরিণতিতে) তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রধান বেদান্তবাদী কি বলেন? বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শঙ্কর ও বেদান্ত একই কথা। নরেশবাবু শঙ্করকে একাধিকবার প্রমাণ ধরিয়াছেন। বেদান্তের উপর কোন কর্ম্মের ভিত্তি আচার্য্য অনুমোদন করিবেন কি? তিনি অবশ্যই অবগত আছেন, গীতাকে কর্ম্মযোগ পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লোকমান্য তিলক মহাশয়কে শঙ্করপন্থীদিগের হস্তে কিরূপ নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে। তবে অন্য এক অর্থে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। অনেক সময়েই মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার মতবাদের উপরে উঠিয়া ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির অনুসরণ করে। সে কথা প্রবন্ধেই বলিয়াছি। ঐরূপ বেদান্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, যে, যদি কোন বেদান্তী জীবনে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করেন তবে তাহা তাহার পূর্ব্বাভ্যাস প্রভৃতির প্রভাব, বেদান্তের মহিমা নয়। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্কর নিজেই কি নহেন? তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় না কি যে সর্ব্বকর্ম্ম ন্যায়ের পক্ষে তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ মেধা কত জোরে পরিচালিত করিয়াছেন। অধ্যাপক গ্রীনের একটা উক্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা চলে এবং

তাহাতে একটুও অত্যুক্তি হইবে না যে Consistent Sankarism must be speechless. অথচ শঙ্করের মত কর্ম্মবীর জগৎ কয়জন দেখিয়াছে। ৩২ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র ভারতখণ্ডকে তোলপাড় করিয়া গেলেন। শঙ্কর বেদান্ত নয় কিন্তু আমার বিচার্য্য বেদান্তের সম্বন্ধেই একটা উক্তি করিয়াছিলাম সেজন্য নরেশবাবুর হাতে আমাকে কিরূপ নাকানিচুবানি খাইতে হইয়াছে, এখন সেই কথাই বলি। আমি লিখিয়াছিলাম, "বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে দেশ ইতিপূর্ব্বে ছাইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক দেশে অকর্ম্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" নরেশবাবু শেষেরটুকু গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যেটুকু গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই ভাষ্যটীকায় প্রবন্ধকলেবর পূর্ণ করিয়াছেন। আমার কথার মধ্যে তিনি তিনটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনটিই সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আত্মরক্ষা লইয়াই ব্যস্ত, ইতিহাসে প্রবেশের অবসর নাই। দেখি আমার কথার ঐ তিন সিদ্ধান্ত সত্য কি না। তার পূর্ব্বে "ইতিপূর্ব্বে"র কথা। নরেশবাবু বলেন "ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ বোধ হয় রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে)"—ইহা নিশ্চয়ই নয়। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ আমি যে মুহূর্ত্তে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। কেন না, রামমোহনের আবির্ভাবে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী লয়প্রাপ্ত হন নাই, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছেন মাত্র। এখন যাহা নরেশবাবুর মতে "অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া মানিতে হয়" তাহার কথা। আমি নীচে হইতে উপরের দিকে যাইব। ১। "ইতিপূর্ব্বে সেবাধর্ম্ম বলিয়া কোনও জিনিষ দেশে ছিল না।" নরেশবাবুর এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ হইতেছে। কেন না, প্লেগে-দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—এ কথা মিথ্যা হইলে দেশে প্লেগ নাই—এ কথা অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল না। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অকর্ম্মা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তা ছাড়া আরও কোটী কোটী কর্ম্মী দেশে আছে—তা তো আর অস্বীকার করি নাই। ইতিহাসের কথা জানি না, আমার লজিক্ বলে—একেবারে না থাকা ও ছাইয়া ফেলা এই দুয়ের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক আছে এবং সে ফাঁকটা একেবারেই একটুখানি নয়, যার মধ্যে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া সেবাধর্ম্ম বসিয়া থাকিতে পারে ও রহিয়াছে। সুতরাং নরেশবাবুর এটি একটি অপসিদ্ধান্ত। ২। কোনও ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক কোনও আচার ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়া না থাকিলেও অতঃপর আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না সে প্রশ্নই উঠে নাই। আমি বিচারের দ্বারা দেখাইতে চাহিয়াছি যে কোনও এক বৈদান্তিক মতের উপরে সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহকালেই হউক আর পরকালেই হউক সেবাধর্ম্ম তাহার মধ্য হইতে বাহির হইবে না। সুতরাং উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সুযোগ কাহারও কোনকালেই ঘটিবে না। কেন না Reason সর্ব্বকালিক। তবে ওরূপ বেদান্তী কালে সেবাধর্ম্ম যাজন করিতে পারেন কি না সে কথার উত্তর দিয়াই দিয়াছিলাম, নরেশবাবু প্রণিধান করেন নাই। ৩। প্রবন্ধ লিখিবার সময়েই আমি জানিতাম যে বাঙ্গালীর শরীর সেশ্বর ন্যায়ের দ্বারা গঠিত ও পরিপুষ্ট এবং বেদান্ত তাহার উপর engrafted। "বেদান্তের দ্বারাই হিন্দুজাতির সমস্ত জীবন নিয়মিত হইত" আমার কথার ও-অর্থ হয় না এইজন্য যে বাঙ্গালীজীবনের উপর স্মৃতির প্রভাব বিস্মৃত হইবার জিনিষ নয় এবং আমি স্মৃতি হইতে বচন তুলিয়া দেখাইয়াছি—একজন যদি একহস্ত কর্ত্তন করে ও অন্য হস্ত চন্দনচর্চ্চিত করে তবে সন্ন্যাসী তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। কেন না, তিনি কাহারও কল্যাণ অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারেন না। সন্ন্যাসীর সেবাধর্ম্মের ইহাই পরিণতি।

নরেশবাবুর লেখায় এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে যে আমি যাহা বলি নাই তাহা যেন আমি বলিয়াছি এইরূপ ভাবে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিয়াছেন। আবার যাহা বলিয়াছি, তাহা যেন বলি নাই এইরূপ ভাবে তাহারই একটা পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। বিষয়গুলিকে মন্দ বলি না। বরং তাহা অতি সুন্দর, উপাদেয়। কিন্তু আমার নামে জড়িত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। দয়ার উপর সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলে কি দোষ হয় তাহা তিনি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি কিন্তু কোথাও দয়ার উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত

করিতে বলি নাই। আমার ব্যাখ্যায় সহানুভূতি বা মৈত্রী (fellowfeeling) সেবাব্রতের psychological ভিত্তি। তবে ইহার একটা ব্যবহারিক দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম— পরোপকার মানুষকে ভগবানের কৃপাপাত্র করে। ইহা গীতায় "তদর্থং" অর্থাৎ ভগবানের প্রসন্নতালাভ কর্ম্মের উদ্দেশ্য উহারই নামান্তর মাত্র। ইহার কোথাও উপকৃতের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব নাই। আমি যে সেবাধর্ম্মের সামাজিক (Sociologcal) দিক্ দেখাইয়াছি তাহাতে উপকারক ও উপকৃত একই জীবনযন্ত্রের (Organism এর) অঙ্গ —উপকারক উপকার করিয়া উপকৃত ; উপকৃত উপকৃত হইয়া উপকারক—সুতরাং এখানেও একজন অন্য অপেক্ষা বড়, এই আশঙ্কার কারণ নাই। নরেশবাবু যে সেবাধর্ম্মের উচ্চ লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন—"তোমার ব্রহ্মরূপী আত্মা এই সেবার পথ দিয়া মোক্ষের সন্ধান করিতেছে। তাহা ছাড়া জীব ব্রহ্ম এই কথা জানিয়া তুমি কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতে বা তোমা অপেক্ষা হীন ভাবিতে পার না। এইরূপে বেদান্তবাদ নিষ্কাম নিরহঙ্কার ও সশ্রদ্ধ সেবার সহায়তা করে বলিয়া আমি মনে করি।" ইহার সঙ্গে আমার বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহার তুলনা করিয়া পাঠকগণই বলুন, উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়? আমি বলিয়াছিলাম, "সেবা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন ধর্ম্ম। কেন না, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বসাধারণ জনের সেবাই ব্রহ্মসেবা। প্রত্যেক মানুষ ব্রহ্মের মন্দির, আমার ইষ্টদেবতার আসন। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাত, আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় সামাজিক পারিবারিক অত্যাচার অবিচার যা নরনারীর মুখে আমার ইষ্টদেবতার মুখ প্রকাশিত হইতে দেয় না, পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিকে লুক্কায়িত করে—তাহাদের বিপক্ষে যে সংগ্রাম তা আমার ইষ্টদেবতার মন্দির সম্মার্জ্জন, তাঁহার আসন পরিষ্করণ. মন্দির কিঞ্চিন্মাত্রও অপবিত্র থাকিলে দেবতার আবাহন হয় না। নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস। এই উভয়ের ভাষায় যদি কোন বিভিন্নতা থাকে তবে তাহার কারণ নরেশবাবুর মোক্ষতত্ত্বে আমার অনভিজ্ঞতা।

এতক্ষণ গেল বিচার, এখন নজির আসিতেছে। নরেশবাবু বৌদ্ধ যুগের সেবাধর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "শূন্যবাদের উপর যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ধীরেন্দ্রবাবুর তথাকথিত বেদান্তধর্ম্মের উপর সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে কি গুরুতর আপত্তি আছে বুঝিতে পারিলাম না।" কোন কোন বেদান্তবাদ কেন সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী তাহা বুঝাইয়াছি। তবুও এই একটি ছত্রের মধ্যে এক গণ্ডারও অধিক fallacy একসঙ্গে জড় হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম, বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা প্রমাণিতব্য—যাহা প্রমাণিতব্য তাহাকেই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করার অন্য কোন ফল হয় নাই, হইয়াছে কেবল একটি বড় রকমের petitio principii.

দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে শূন্যবাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেবাধর্ম্মকে জন্ম দিবেই— আমি যেমন আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছি, "নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস।" অন্ততঃ দেখাইতে হইবে উভয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে। কিন্তু আমরা কোন কোন বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়াছি যে উহা সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী, শূন্যবাদের সম্বন্ধে তাহা আরও বেশী (a fortiori) খাটে। যদি কেহ এখানে শূন্যবাদী সেবাধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন, তবে কর্ম্মজীবনের বিরোধী স্বীয় মতবাদকে মানুষ কেমন করিয়া অতিক্রম করে তাহার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব।

তৃতীয়তঃ দুইটি জিনিষের একত্র সমাবেশ দেখিলেই একটিকে অন্যটির কারণ বলা যায় না। উভয়ের সমাবেশ আকস্মিক হইতে পারে, বা উভয়ে একই কারণের সহ-কার্য্য (co-effects) ও হতে পারে। আর, উভয়ের মধ্যে যদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে তবুও উভয়ের পৌর্ব্বপর্য্যায় নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হইবে না। ইতিহাস বলিবে বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম আগে, শূন্যবাদ পরে। সুতরাং

শূন্যবাদের উপর সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলে গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইবে। আপত্তিটি কার্য্যকারণ-বিপর্য্যয় হেত্বাভাস (Hysteron proteron)।

চতুর্থতঃ, যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসি-নীগণের সেবাধর্ম্মের সৌরভে বৈদেশিকগণ ভারতের চরণে শত শত নমস্কার করিয়াছেন, তাঁহারা কি শূন্যবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন? ইতিহাস কি বলিবে না, যখন বৌদ্ধগণ শূন্যবাদে মাতিয়াছিলেন তখন সেবাধর্ম্ম ছিল না, ছিল আত্মসেবা। আর ঐ শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য তান্ত্রিক অনাচারে দেশকে ভরিয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মই অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, দুইটি বিভিন্ন কারণ-পরম্পরা হইতে উৎপন্ন কিন্তু একত্র সমাবিষ্ট ফলদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত তৃতীয় কিছুর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন হইলে ঐ দুয়ের মধ্যে যেটির দ্বারা সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় তাহাকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বৌদ্ধের সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোথায়? শূন্যবাদে নয়, মৈত্রী ও করুণায়। শূন্যবাদ তো দুরের কথা বৌদ্ধধর্ম্মের স্বপ্নও যখন কাহারও মনে আসে নাই, তখনই কপিলবাস্তুর রাজগৃহে এই সেবাধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পরে তাহাই ডালপালার বিস্তার লাভ করে। সেবাধর্ম্ম বুদ্ধদেবের হৃদয়জলধির উচ্ছ্বাস, শূন্যবাদের মরুভূমি তাহা কোথার পাইবে। সেইজন্যই বুদ্ধাবতারের গীত নির্ব্বাণতত্ত্ব নয়, শূন্যবাদ নয়, কিন্তু "সদরহৃদয়দর্শিত পশুঘাতং জয় জগদীশ হরে।"

এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিষয়ে নরেশবাবু একটা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু সমাধানের পথে খোলেন নাই। "দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়" যা "প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিতে পাইতেছি"র উপর বিচার চলে না। আমি সময়ে সময়ে রাজাকে ভুল বুঝা হইয়াছে বা রাজার ভুল ব্যাখ্যা হইতেছে ভাবিয়া স্বীয় আলোকে রাজার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু রাজা বলিয়াছেন বলিয়াই যে কথা সত্য মনে করিতে হইবে বা তাঁহার উপর কলম ধরা চলে না, এরূপ কথা যে কখনও-বলি নাই তা হলপ করিয়া বলিতে পারি। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যদি Argumentum ad verecundium হয় তবে বলিবার কিছু নাই। বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা হইল ভাবিয়া নরেশবাবু যে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন ইহা তবে কি? ইহা কি তবে বেদান্তের ভুল হইতে পারে না ইহারই অভিব্যক্তি? যাক্ এখন যেখানে নরেশবাবুর সঙ্গে মিল তাই বলিয়া মধুরেন সমাপয়েৎ করি। রাজা রামমোহন রায় কেবল ভারতের নয়, জগতেরই একজন মহাপুরুষ। কিন্তু এই বেদ বাইবেল কোরান পুরাণ শ্যাম শ্যামা সন্ন্যাসী ও শালগ্রাম (তদভাবে শূন্য) প্লাবিত দেশে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রূপে স্থাপিত করিতে গেলে যে তাঁহারই শিক্ষা অনেকটা হজম করিতে হয় ইহা ভুক্তভোগী হইয়াও তিনি যদি স্বীকার না করেন তবে তাঁহাকে স্বীকার করাইবার শক্তি আমার নাই। সুতরাং "রাজার জীবনের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা স্বাধীনতা এবং সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বাঙ্গালীর (?) ও ভারতবাসীর বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের শৃঙ্খল মোচন" আমার উপর কোনই কার্য্য করে নাই, তাহা আমি স্বীকার করিব না। ইহাতে যদি কিছু আত্মম্ভরিতা থাকে, তবে সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিযা বিদায়—লইতেছি।

এ বিষরে আর কোন বাদানুবাদ ছাপা হইবে না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

১৩২৮ বৈশাখ

টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

মহাত্মা গান্ধি মধ্যে মধ্যে অহিংসাধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও, অকপটভাবে উহার অনুসরণ, সমর্থন ও প্রচার করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি ভারতীয়দের জন্য আফ্রিকায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তিনি তিন বার জেলে গিয়াছেন, একবার প্রহারে তাঁহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল। তিনি ধনীর গৃহে জন্মিয়া ও স্বয়ং প্রভূত ধনোপার্জ্জক হইয়াও, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তপস্বীর মত জীবনযাপন করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ভক্তি করি। তিনি ইংরেজ সরকারের পরোয়া না করিয়া গুজরাতের কায়রা জেলার এবং বিহারের চম্পারন জেলার রাইয়ৎদেব বহু দুঃখ দূর করিয়াছেন। তিনি প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজ প্রভুর দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের আশা ও চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া পৌরুষ দ্বারা উহা লাভ করিবার ইচ্ছা ও সাহস দেশবাসীর প্রাণে সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। অবান্তর বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল না থাকিলেও, তাঁহার এই দেশভক্তি, স্বজাতিপ্রেম ও চূড়ান্ত সাহসের নিকট মাথা নত না করিয়া থাকা যায় না।

কিন্তু ইংরেজের অধীনতার অপমান, এবং ইংরেজ, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপ্রণোদিত কুটিল রাজনীতির গর্হিততা তাঁহাকে এমন অভিভূত করিয়াছে, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়মনকে এমন পাইয়া বসিয়াছে ও গ্রাস করিয়াছে, যে, তিনি অন্য অনেক বিষয়ে সুবিবেচক ও সর্ব্বদিগ্‌দর্শী হইতে পারিতেছেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে হইতেছে।

কটকে একটি সভায় বক্তৃতা করিবার পর গান্ধিমহাশয় শ্রোতৃবর্গকে প্রশ্ন করিতে আহ্বান করেন। একটি এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। "ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ভারতীয় নানা প্রদেশবাসীদের মধ্যে একতা আনয়ন করিয়াছে, এবং ইহা 'অস্পৃশ্য'তা দূর করিতে পারে। অতএব, জিজ্ঞাস্য এই, ইহা কি অবিমিশ্র অশুভ? টিলক, রামমোহন ও আপনি কি ইংরেজী শিক্ষার ফল নহেন?" ইহার উত্তরে গান্ধি-মহাশয় যত কথা বলেন, সবগুলির আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই এবং স্থানও নাই। ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধির সহিত আমাদের মতের মিল নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তা ছাড়া প্রশ্নকর্ত্তা ও মহাত্মা গান্ধি উভয়েই এই ভ্রমে পড়িয়াছেন, যে, রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার ফল। প্রকৃত কথা এই, যে, রামমোহন ইংরেজীশিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক, এবং তিনি ইংরেজী শিখিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে হাত দিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে গান্ধি বলেন, "আমার কথা ছাড়িয়া দিন, আমি তুচ্ছতম বামন (miscrablest pigmy)। টিলক রামমোহন আরও বড় লোক হইতেন, যদি ইংরেজী শিক্ষার ছোঁয়াচ্ (contagion) তাঁহাদিগকে না লাগিত। * * * রামমোহন ও টিলক (আমার কথা

ছাড়িয়া দিন্) বামন ছিলেন ; চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর নানকের সহিত তুলনায় দেশবাসীদের উপর ঐ দুজনের কোন প্রভাব ছিল না। ঐ অতি-মানবদের সঙ্গে তুলনায় টিলক রামমোহন বামন ছিলেন। একমাত্র শঙ্কর যাহা করিতে পারিয়াছেন, ইংরেজী-জানা সমস্ত লোক মিলিয়া তাহা করিতে পারেন না। আমি আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি। গুরুগোবিন্দ কি ইংরেজী শিক্ষার ফল? ইংরেজী-জানা একজন ভারতীয়ও আছেন কি যিনি নানকের সমতুল্য—যে নানক পরাক্রমে ও আত্মোৎসর্গে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের সমকক্ষ সম্প্রদায়ের সংস্থাপক? রামমোহন কি দলীপ সিংহের মত আত্মবলিদাতা একজন বীরও উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন?" আমরা টিলক বা রামমোহনের পক্ষ সমর্থনের জন্য কলম ধরি নাই। তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। শঙ্কর নানক চৈতন্য কবীর গুরুগোবিন্দ যত বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবের হিত করিয়া গিয়াছেন, টিলক ও রামমোহনের তিরোভাবের পর তত বৎসর অতীত হইয়া গেলে, ইতিহাস তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা মহাত্মা গান্ধির কিম্বা আমাদের কথা অপেক্ষা অধিক নিরপেক্ষ হইবার সম্ভাবনা। আমরা এখন কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, টিলক ও রামমোহনকে বামন না বলিলেও এবং অতীত কালের কোন মহাপুরুষের সহিত তাঁহাদের তুলনা না করিলেও চলিত। তুলনা করা ও তাঁহাদিগকে "বামন" বলা অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। যে-সব লোক, হইতে পারে ভ্রম বশতঃ তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, অকারণ তাহাদিগকে আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

রামমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির মনের ঝাল যেন একটু বেশী মনে হইল। কারণ, তিনি জিজ্ঞাসা, করিতেছেন, যে, রামমোহন দলীপ সিংহের মত আত্মবলিদাতা একজন পুরুষও উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন কি? রামমোহন কি করিতে পারিয়াছেন, তাহা লিখিব না। নানকের ধর্ম্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ ফলের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া গান্ধি মহাশয় যে লোকটির নাম করিয়াছেন, তাঁহাকেই আবিষ্কার করিতে হইবে। কারণ, শিখ্ ইতিহাসের শতশত বন্দনীয় ধর্ম্মবীরের মধ্যে দলীপ সিংহ বলিয়া কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র এক দলীপ সিংহ ছিলেন। কিন্তু তিনি শৈশবে ইংলণ্ডে নীত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ; দেশ বা ধর্ম্মের জন্য কখনও কোন বীরত্ব বা ত্যাগের দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। আর এক দলীপ সিংহ, জলন্ধরবাসী, সেদিন ইংরেজজাতি সম্বন্ধে কি বলিয়া আদালতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হন, এবং নিজের কথা প্রত্যাহার করিয়া ও ক্ষমা চাহিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইনিই মহাত্মা গান্ধি কর্ত্তৃক প্রশংসিত আত্মবলিদাতা বীর হইবেন কি? যাহা হউক, তাঁহার উল্লিখিত বীরটির ঠিক্ পরিচয় জানিতে পারিলে গান্ধি-মহাশয়ের মার্টারের আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে।

গান্ধি মহাশয় কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া তুলনা করিয়াছেন, বুঝা গেল না। তিনি শঙ্কর নানক কবীর চৈতন্য গুরুগোবিন্দ প্রতাপ সিংহ ও শিবাজীর উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিকদের মধ্যে টিলক ও রামমোহনের নাম করিয়াছেন। তুলনা করিবার একান্ত প্রয়োজন হইলেও, একরকমের মানুষের মধ্যেই তুলনা চলে,

দার্শনিক বা ভক্তের সঙ্গে যোদ্ধার কিম্বা রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্ম্মোপদেষ্টার তুলনা সঙ্গত হয় না। কালিদাসের সঙ্গে চৈতন্যের, প্রতাপসিংহের সহিত শঙ্করের তুলনা চলে না। টিলক ও রামমোহনের সহিত যাঁহাদের তুলনা করা হইয়াছে, তাঁহারা কি একবিধ লোক ছিলেন? টিলক প্রধানতঃ পণ্ডিত ও রাজনৈতিক সংস্কারক ছিলেন। রামমো ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাপ্রবর্ত্তক, রাজনৈতিক সংস্কারক, গ্রন্থলেখক, দার্শনিক লেখক ও টীকাকার প্রভৃতি নানারূপে পরিচিত। তাঁহার কাজ বামনের মত ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, ঐ প্রকারের বহুকর্ম্মীর সহিত তুলনা করা আবশ্যক।

গান্ধি মহাশয় নানক কবীরের উল্লেখ করিবার সময় ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের সময়ে পারসীক ও আরবীয় ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সেইস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে-স্থান এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য ও পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে, এবং তাৎকালিক ঐ বৈদেশিক সভ্যতা, সাহিত্য ও ধর্ম্মের প্রভাব নানক কবীরের জীবন চরিত্র ও উপদেশে বিশেভাবে লক্ষিত হয়। তাঁহারা যদি তাঁহাদের সময়কার বৈদেশিক প্রভাবকে হজম করিয়া আত্মিক শক্তিতে বড় হইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের সমসাময়িক বৈদেশিক প্রভাবকে হজম করিয়া আত্মাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী কেন করিতে পারিব না? ইংরেজের দাসবৎ অনুকরণ হেয় ও অনিষ্টকর, কিন্তু তা বলিয়া পাশ্চাত্য কিছুই লইব না, ইহা হইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিদেশী অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আরবেরা, ইংরেজরা, চীনেরা, জাপানীরা,—সকল বড় জাতিই—তাঁহাদের ইতিহাসের কোন-না-কোন যুগে অল্পাধিক পরিমাণে বৈদেশিক প্রভাবের অধীন হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বহু অনিষ্ট যেমন হইয়াছে। ইষ্টও তেমনি অনেক হইয়াছে। কোন বড়জাতি বৈদেশিক প্রভাবকে বাদ দিয়া শক্তিশালী হইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধি নিজেই বলিতেছেন—"I don't want to destroy the English language but read English as an Indian Nationalist would do." "আমি ইংরেজী ভাষাকে নাশ করিতে চাহি না, কিন্তু ভারতীয় স্বাজাত্যসাধকের মত ইংরেজী পড়িতে চাই।" কিন্তু রামমোহন ও টিলকও ত তাহাই করিয়াছিলেন ; তাঁহারা ইংরেজী কোন জিনিষেরই দাসবৎ অনুকরণ করেন নাই।

আলোচনা

১৩২৮ আষাঢ়

টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে বিবিধপ্রসঙ্গের মধ্যে উপরিউক্ত শীর্ষক একটি প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গটা সম্বন্ধে "নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন" নীতি অবলম্বন কর্‌লে মহাত্মা গান্ধী ও রামানন্দ-বাবু দুজনের প্রতিই অবিচার করা হবে। কাজেই দুটো-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে কর্‌ছি।

গোড়াতেই ব্যক্তিগত একটা কথা বলে রাখা ভাল। সম্প্রতি মডার্ণ রিভিউ পত্রে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল যা আমি ন্যায়সঙ্গত ও সত্যমূলক মনে করি নি। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য উক্ত কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সেটা ফেরৎ দিয়েছেন। ঘটনা ঘট্‌লেই কারণের দাবী মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় সে দাবী পূরণ করা উচিত মনে করেন নি। তাঁর সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য তিনি আমার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল বুঝেন। সুতরাং বলার কিছু নাই. কিন্তু ফলে একটু অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কল্পনা চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। ঠিক কারণটা না জান্‌তে পার্‌লে নানা কারণের সৃষ্টি করে বসে। হয়তো নিতান্ত অকারণেই। তবে একটু বল্‌তে পারি,—আমার মনের যে চিন্তাটিকে বিন্দুমাত্র অন্যায় মনে করেছি রাজপুতের মেয়ের মতো সূতিকা-ঘরেই তার গলা টিপে দিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যে ভূত হয়ে মনের কোনও কোণ হতে উঁকি-ঝুঁকি মারছে না এটা তো ঠিক বলা যায় না। তা ছাড়া অবিচার-পীড়িত লোক মনে করে বসে তারও অবিচারের স্বত্ব জন্মেছে ; কোন্ আইন অনুসারে বলা যায় না। হয়তো বিচারের আইনের মতো অবিচারেরও একটা গোপন কোড থাক্‌তে পারে। সুতরাং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের কোনও লেখার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলে স্বভাবতই আশঙ্কা জন্মে এর মধ্যে মনের কোণের সেই গোপন ভূতটার দৃষ্টি হয় তো থাক্‌তে পারে। তবে ভরসার কথা এই আমি লেখনী-ব্যবসায়ী নহি। অকারণে বা সামান্য কারণে কলমের খোঁচা দেওয়া বা কালী ছিটানো আমার অভ্যস্ত বিদ্যা বা নেশার মধ্যে নয়, স্বভাব তো নয়ই। আমি যা লিখে থাকি তার প্রায় সবই কবিতা এবং প্রেমের কবিতা। (প্রেম ছাড়া আর-কিছুর কবিতা হতে পারে একটা অবশ্য আমি মনে করি না।) আমার লক্ষ্য ও ব্রত আনন্দদান, আনন্দহরণ নয়। আমি কেবল সেইটুকু আঘাতই দিতে চাই—মনের তারে—যাতে আনন্দ ও প্রেমের সুর বেজে উঠ্‌তে পারে। তার বেশী নয়। একটা ভাল জিনিষে কোনও দোষের স্পর্শ দেখ্‌লে লোকে স্বভাবতই যেমন "আহা হা" বলে উঠে, সেই ভাব হতেই এ লেখাটার উদ্ভব। উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যাতে "ছি ছি ছি" বা "হায় হায়" বল্‌তে না হয়।

এখন আসল বিষয়ে নামা যাক্। প্রথমেই চোখে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের গৌরচন্দ্রিকা। রামানন্দ-বাবু মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরম্ভ করার পূর্ব্বে এরূপ একটা গৌরচন্দ্রিকা প্রায় গেয়ে থাকেন। কখনো ছোট, কখনো বড়। তথ্য হিসাবে এর বিশেষ কোনও মূল্য নেই। মহাত্মা গান্ধী আফ্‌রিকায় বা অন্যত্র কি করেছেন না করেছেন সেটা এখন রাস্তায় লোকও জানে। এজন্য শ্রদ্ধা সকলেই করে থাকে। এমন কি, মহাত্মা যাদের পাকা ধানে মই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তারাও। Saintএর সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে একপাশে সরিয়ে রাখার চেষ্টা লাটাধিলাটেরাও করে ছিলেন—অনেক দিন। সুতরাং রামানন্দ-বাবুর মত লোক যে এজন্য শ্রদ্ধা কর্‌বেন এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সংশয়ও বোধ হয় কেউ কোনও দিন করে নি। সুতরাং এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা

নিতান্তই নিরর্থক। কেবলমাত্র নিরর্থক নয়, এতে দোকানদারীর গন্ধও যেন একটুখানি পাওয়া যায়। বোধ হয় সেটা ব্যবসামাত্রেরই অপরিহার্য্য অনিষ্ট-ফল। কয়লার খাদ ও ছাপাখানা—কালী দু যায়গাতেই লাগ্‌তে পারে এবং লেগে থাকে।

শ্রদ্ধা জিনিষটা অন্তরের। মনেও জিনিষটা থাক্‌লে আপনি বেরিয়ে পড়ে—কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে। সেজন্য নকীব নিয়োগের দর্‌কার হয় না। কিন্তু নকীব সব সময়ে ঠিক ফুক্‌রায় না। বিজ্ঞাপন মোতাবেক মাল বাজারে মেলে দৈবাৎ। শ্রীচরণকমলেষু পাঠে যথেষ্ট পিতৃভক্তি প্রকাশ হয় না বলে শ্রীচরণসরসীরু-হরাজেষু পাঠে যে চিঠি সুরু হয় তাতেও বাপের বাপান্ত আঠারো আনা থাক্‌তে পারে। আর যে বউ ভক্তির বাহুল্য বশতঃ শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে না, সেও কপাটের আড়াল হতে মৃদুগুঞ্জনে শাশুড়ির মর্ম্মচ্ছেদ কর্‌তে পারে, সাবেক তন্ত্রের পরিবারে এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি।

শ্রদ্ধাভাজন লোকের প্রতিবাদ অনেক সময় দর্‌কার হয়ে পড়ে এবং ষোল আনা শ্রদ্ধা বজায় রেখেও তা রীতিমত চল্‌তে পারে। প্রতিবাদের রকমেই শ্রদ্ধার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়। সেইটাই তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। আর মানুষের মন ঐ আভ্যন্তরীণ প্রমাণটাকেই বেশী মানে ; আটা দিয়ে জুড়ে দেওয়া লেবেলটাকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখে থাকে।

কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বল্‌তে হচ্ছে—রামানন্দ-বাবুর প্রতিবাদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলি তাঁর মুখবন্ধের শ্রদ্ধাটাকে ঠিক ষোল আনা সমর্থন করে না। প্রকাশক্ষমতার অসম্পূর্ণতা এর কারণ হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়। কারণ যাই হোক, গর্‌মিলটা বড় বেশী চোখে পড়ে। রামানন্দ-বাবু লিখেছেন—"রামমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর মনের ঝাল যেন একটু বেশী মনে হইল।" মহাত্মাদের মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতা আমার বড় বেশী নাই। 'মনের ঝাল' সম্পূর্ণ মরার পূর্ব্বে কেহ 'মহাত্মা' হতে পারেন কি না পাঠকগণ বিচার কর্‌বেন। কিন্তু ঐ 'মনের ঝাল' কথাটা সম্বন্ধেই আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় কলহ-পরায়ণা স্ত্রীলোক ও সেইরূপ স্ত্রী-প্রকৃতি পুরুষের মুখেই বরাবর ঐ কথাটা শুনে ওটার বিরুদ্ধে আমার একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মে গিয়েছিল। আমার ভাষার সামাজিক সংস্থানে ও-কথাটা অন্ত্যজজাতীয় বা Depresssd class এর সামিল হয়েই এতদিন ছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার পথে ওর চলাফেরা একরূপ নিবিদ্ধই ছিল। কিন্তু রামানন্দ-বাবুর মতো ব্রাহ্মণ যখন মহাত্মা গান্ধীর মতো ঋষির সম্বন্ধে ওটা এমন অনায়াসে ব্যবহার কর্‌লেন তখন ওর অন্ত্যজজাতীয়ত্ব আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার মাত্র মনে করাই উচিত। যা হোক ও কথাটা যে এখন হতে বুক ফুলিয়ে পংক্তি-ভোজনে বস্‌তে পার্‌বে এটা সুখের বিষয়।

তার পর তিনি দলীপ সিংহের বিষয়টা নিয়ে যে ভাবে আলোচনা করেছেন তার নিগূঢ় শ্লেষের ভঙ্গীটা ঠিক কাঁটার মতই বিঁধে। চরমে উঠেছেন যেখানে লিখেছেন—"যাহা হৌক তাঁহার উল্লিখিত বীরটির ঠিক পরিচয় জানিতে পারিলে গান্ধী মহাশয়ের মার্টারের আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে।" আদর্শটা মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুই হয়ে থাকে। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শটা আজকের এই ভারতবর্ষে যে কারো আদর্শের চেয়ে খাটো হবে এমন মনে কর্‌বার তো কোনও কারণ দেখি না। তবে যাঁরা আদর্শকে জীবন হতে সম্পূর্ণ তফাৎ করে রাখার কৌশল অবগত আছেন তাঁদের আদর্শ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের চেয়ে অনেক উঁচু হওয়া সম্বন্ধে অবশ্যই কোনও আটক নাই। কিন্তু একটা সমস্যার আমি কিছুতেই সমাধান করে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। "তিনি ভারতীয়দের জন্য আফ্রিকায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—তিনি তিন-তিনবার জেলে গিয়াছেন, একবার প্রহারে তাঁহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল" যাঁর সম্বন্ধে রামানন্দবাবু এই কথা ও এই ভাবের আরো নানাকথা লিখ্‌লেন, তাঁর মার্টারের আদর্শ সম্বন্ধে হঠাৎ সোপহাস কৌতূহলের ভাব তাঁর মনে কি করে জাগ্‌ল বুঝা বড় কঠিন।

এই তো গেল রামানন্দ-বাবুর মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার আলোচনা। টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে অর্থাৎ রামমোহনের উপর মহাত্মা গান্ধীর অশ্রদ্ধাটা কিরূপ

এখন দেখা যাক্। গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখি। মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিক ডাকাতি করে আমাদের ভক্তি কেড়ে নিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ডাকাতই আমাদের বিচারশক্তি কাড়তে পার্‌বে না। তিনি যদি রামমোহনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন সে অবজ্ঞাকে আমরা অবজ্ঞাভরেই প্রত্যাখ্যান কর্‌বো।

টিলক সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কোনওরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন কি না—সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি টিলকের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য যে ভারতজোড়া ভিক্ষা-ব্রত আরম্ভ করেছেন সেইটাকে তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে গ্রহণ কর্‌লে অন্যায় হবে মনে হয় না। কথা হচ্ছে রামমোহনকে নিয়ে। প্রবাসীতে রামানন্দ-বাবুর সমালোচনা পড়ে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল তিনি একটু ভুল বুঝেছেন। সেইজন্য ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে মহাত্মা গান্ধীর কথোপকথনের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সেটা পড়ে দেখ্‌লাম।

একটা কথা মনে রাখা দর্‌কার যে এটি একটি কথোপকথনের রিপোর্ট। রীতিমত প্রবন্ধের যুক্তিপর্য্যায় এতে আশা করা যায় না। মোটের উপরে জিনিষটা বুঝে নিতে হবে। রামানন্দ-বাবু "টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য" বলে প্রসঙ্গটির যে শিরোনামা দিয়াছেন সেটা একটু ভুল হয়েছে। লোকের ভুল ধারণা হতে পারে। ইয়ং ইণ্ডিয়ার শিরোনামা 'An Unmitigated Evil'। মহাত্মা গান্ধীর "মন্তব্য" বর্ত্তমান প্রণালীর ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে। টিলক প্রভৃতির কথা উঠেছিল প্রসঙ্গক্রমে। যাহা হউক ইয়ং ইণ্ডিয়ার রিপোর্টটি পড়ে আমি যা বুঝেছি জানাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কোনওরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন কি না সেইটাই বিবেচ্য।

আমি যা বুঝেছি তার সার মর্ম্ম এইরূপ ;— "স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিখ্‌তে পার্‌লে তার উপকারটা লাভ কর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে শিখ্‌ছি তাতে অপকারই হচ্ছে। ভালমন্দ-নির্ব্বিচারে ইংরেজী ভাবের নিকট আমাদের মন দাসখৎ লিখে দিচ্ছে। The present system enslaves without allowing a discriminating use of English literature। ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের মনের গঠন বিকৃত ও অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেশের মর্ম্মস্থানে প্রবেশের পথ চিন্‌তে পার্‌ছিনে। এইজন্য ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরাও লোকের মন ও চরিত্রের উপর তেমন স্থায়ী প্রভাব রাখ্‌তে পারছেন না। কিন্তু এই প্রভাবের পরিমাপটাই মহাপুরুষদের মহত্ত্বের আসন মাপ। এই মাপ অনুসারে বিচার কর্‌লে চৈতন্য শঙ্কর কবীর নানকের নিকট টিলক ও রামমোহন বামন মাত্র। আমি টিলক ও রামমোহনকে একান্ত শ্রদ্ধা করি। তারা স্বভাবতঃ বামন নহেন। চৈতন্য প্রভৃতি অতিমানবদেরই জাতীয়। তবে ইংরেজী শিক্ষার দোষে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ কর্‌তে না পারায় চৈতন্য প্রভৃতির নিকট বামনরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করতে পার্‌লে এঁরাও চৈতন্য প্রভৃতিরই সমকক্ষ হতে পার্‌তেন। I highly revere Tilak and Rammohan. It is my conviction that if Tilak and Rammohan had not received this education but had received their natural training, they would have done greater things like Chaitanya। নানকের প্রকৃতি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করায় তাঁর প্রভাব লোকের চরিত্রের উপর অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার দোষে সেরূপ কর্‌তে পারেন নি। ফলে শিখ সম্প্রদায়ের বহুলোক যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন রামমোহন-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে সেরূপ একটিও দেখা যায় না।" এ ছাড়া আর যেসব প্রসঙ্গ আছে সে-সকলের সহিত আমাদের বিশেষ সংশ্রব নাই।

পণ্ডিত লোকে যাই করুন, উল্লিখিত উক্তিগুলিতে রামমোহনের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ হয়েছে। তিনি রামমোহনকে চৈতন্যাদির তুল্য জাতীয়ই মনে করেন, তবে প্রভেদটা দাঁড়িয়েছে শিক্ষার দোষে। আমার তো আশঙ্কা হয় রামানন্দ-বাবুই রামমোহনকে লোকের চোখের সাম্‌নে কতকটা ছোট করে ধরেছেন।

রামমোহন ও শঙ্করাদির মধ্যে কে বড় কে ছোট সে আলোচনা করা নিষ্ফল। কিন্তু দেশ ও বিদেশের প্রায় সব লোকেরই ধারণা শঙ্করাদির স্থান অনেক উচ্চে। মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন লোকে যদি তা স্বীকার করে নেয়, তাহলে এই পার্থক্য সত্ত্বেও রামমোহনকে শঙ্করাদির একজাতীয় মনে কর্‌বে। কিন্তু তারা যদি রামানন্দ-বাবুর কথায় বিশ্বাস করে শিক্ষার কোনও দোষ দেখ্‌তে না পায় তাহলে পার্থক্যটাকে মূলপ্রকৃতিগত বলেই মনে কর্‌তে বাধ্য হবে।

এই তো গেল মূল বিষয়ের বিচার। রামানন্দ-বাবু আনুষঙ্গিক ভাবে কয়েকটি কথা বলেছেন। তারও একটু আলোচনা দর্‌কার।

১। রামানন্দ-বাবু লিখেছেন—"যে-সব লোক, হইতে পারে ভ্রমবশতঃ, তাঁহাদিগকে (টিলক ও রামমোহনকে) ভক্তি করে তাহাদিগকে অকারণ আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

পূর্ব্বেই দেখা গিয়েছে মহাত্মা গান্ধী আঘাত কিছুমাত্র করেন নি। তবে কেহ যদি আহত হয়েছেন মনে করেন তাঁর পক্ষে বিবেচনা করা উচিত এটা 'অকারণ' নয়। ইংরেজী শিক্ষার দোষ দেখানো কেহ যদি অত্যাবশ্যক মনে করেন তাহলে রামাশ্যামার ঐ শিক্ষায় কি অনিষ্ট হয়েছে সেটা না দেখিয়ে মহাপুরুষেরাও ঐজন্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেইটা দেখানই কি ঠিক নয়! তা ছাড়া রামানন্দ-বাবু নিজেই লিখেছেন যে মহাত্মা গান্ধীকে টিলক, রামমোহন (এবং গান্ধী) সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরূপ জিজ্ঞাসার পর মহাত্মার পক্ষে চারিটি পথ খোলা ছিল—(১) চুপ করে থাকা, (২) কিছু বল্‌বো না বলা, (৩) মিথ্যা কথা বলা, (৪) যথাবিশ্বাস সত্য ধারণা জানানো। মহাত্মা চতুর্থ পথটি অবলম্বন করেছিলেন। রামানন্দ-বাবু কি মনে করেন আর-কোনওটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ঠিক সঙ্গত হতো?

২। মহাত্মা গান্ধী রামমোহনকে যে ইংরেজী শিক্ষার ফলস্বরূপ বর্ণন করেছেন রামানন্দ-বাবু সেটাকে ভুল বলেছেন। ওটা নিশ্চয়ই ভুল। রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভুলটি তেমন মারাত্মক হয় নি। আসলে ঠিকই আছে। যে মনোভাব হতে তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিলেন তা যে বিষের সংস্রব হতে একেবারে মুক্ত ছিল এ কথা জোর করে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তার প্রত্যেক ভাবটিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখ্‌তে সকলকেই অনুরোধ করি। উক্ত পত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ বেদান্ত, ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনের তিনি যে ভাবে এক কথায় ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ করেছেন, কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিত সেরূপ কর্‌লে কোনও ভারতবর্ষীয়ই তাঁকে মার্জ্জনা করতেন না। ওর চেয়ে ঢের লঘু অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্র লাসেন ওয়েবার প্রভৃতি জর্ম্মান পণ্ডিতদের প্রতি কিরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করেছিলেন তা সকলেই জানেন।

এইরূপ ডিক্রী ডিস্‌মিসের পর বেকনের পূর্ব্ববর্ত্তী য়ুরোপীয় জ্ঞানরাজ্যের অবস্থা উল্লেখ করে লিখছেন 'In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep the country in darkness, etc., সে সময়কার টোলের শিক্ষা-প্রণালী হয়তো খুবই দোষবহুল ও অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তার সংস্কার করে উপনিষদের যুগের শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন কর্‌লেও কি অন্ধকার দূর হতো না? যে জ্যোতির প্রার্থনা উপনিষদের মর্ম্মগত বাণী, সে জ্যোতিও কি বেকনের প্রণালী-লব্ধ জ্ঞানের নিকট অন্ধকার মাত্র? শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ইত্যাদি অমৃতবাণীও কি মিথ্যা স্তোক বাক্য মাত্র। তমসো মা জ্যোতির্গময় মন্ত্র-নিশ্চয়ই Inductive method সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে তার স্থান হতে পারে না। আসল কথা য়ুরোপের বস্তুবিদ্যার মোহ তাঁর ব্রহ্মবিদ্যাকে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও বিধ্বস্ত করেছিল।

৩। শিখ-সম্প্রদায়ের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের উদাহরণ-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী দলীপ সিংহের নাম উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপার নিয়ে রামানন্দ-বাবু যে বাগ্‌বাহুল্য বিস্তার করেছেন তা নিতান্তই অশোভন। দলীপ সিংহ কে ছিলেন জানি না। হয়তো কোনও অশ্রুতকীর্ত্তি ত্যাগবীর ছিলেন। হয়তো বা গান্ধী মহাশয়

নামোল্লেখে ভুল করেছেন। কিন্তু শিখ-ইতিহাসে যখন আত্মোৎসর্গের উদাহরণের অভাব নাই তখন অন্ততঃ পঁচিশটা নাম দিয়ে এ ভুলটা সংশোধন কর্‌তে পারা যেত। সুতরাং দলীপ সিংহ নামে কোনও ত্যাগবীরের অস্তিত্ব না থাক্‌লেও গান্ধী মহাশয়ের আসল কথাটার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। রামানন্দ-বাবুর একমাত্র উত্তর ছিল রামমোহন-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে এমন কতকগুলি আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাঁদের ত্যাগমাহাত্ম্য শিখবীরদের সমকক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তা না করে কথায় চিঁড়ে ভিজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কাজেই গব্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণই উপস্থিত হয়।

৪। রামানন্দ-বাবু গান্ধী মহাশয়ের তুলনা-প্রণালীর ভুল ধরেছেন। গান্ধী মহাশয়ের উল্লিখিত মহাপুরুষেরা যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত নয় তখন তুলনা চল্‌তেই পারে না এই তাঁর মত। স্থূলতঃ কথাটা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মহাপুরুষদের মধ্যে একটা একজাতীয়ত্ব আছেই—কেহ দানবীর, কেহ জ্ঞানবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ বা রণবীর। তাঁদের অন্তর্প্রকৃতির গঠনে একটা মর্ম্মাগত মিল আছে। কেবল বীর্য্য প্রকাশের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে নানা শ্রেণীর অসাধারণ ব্যক্তিকে এক Hero নামের কোটায় ফেলেছেন। তাছাড়া শঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের তুলনা রামানন্দ-বাবুর মতানুসারেও বেশ ভাল-রকম চল্‌তে পারে। উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র প্রায় ষোল আনা একরূপ। রামানন্দ-বাবুর ভাষায় তাঁরা উভয়েই "ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, গ্রন্থ-লেখক, দার্শনিক লেখক ও টীকাকার"।

৫। রামানন্দ-বাবু লিখেছেন—"গান্ধী মহাশয় নানক-কবীরের উল্লেখ করিবার সময় ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সময় পারসীক ও আরবীয় ভাষা সাহিত্য সভ্যতা ও ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল যে স্থান এখন পাশ্চত্য সভ্যতা, শিক্ষা সাহিত্য ও পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে।" কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত অত্যুক্তি। একটা স্থান অধিকার করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু সেটা সমাজ ও মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে। এখনকার মতো মর্ম্মস্থানটিকে একান্ত গ্রাস করে বসে নি। নবদ্বীপের বিদ্যার গৌরবের সময় মুসলমান আমলেই। সমস্ত ভারতবর্ষের ছাত্র নবদ্বীপে যে বিদ্যালাভ কর্‌তে আস্‌তো তা যবনসংস্পর্শশূন্য। বাংলা দেশের সভ্যতার কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ—মুর্শিদাবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন এদেশে ইংরেজ শিক্ষিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য জাতিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠ্‌ছে সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আসল কথা হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার মূল প্রকৃতি তেমন বিভিন্ন নয় ; পাশ্চাত্য সভ্যতা উভয়ের সঙ্গেই মূলতঃ বিভিন্ন। কাজেই এর

সম্পাদকের মন্তব্য

আলোচনা-বিভাগটির উদ্দেশ্য প্রবাসীতে যাহা লেখা হয়, তাহার ভ্রম প্রদর্শন। ভ্রম প্রদর্শনটাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানাবিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা আমার ভ্রমপ্রদর্শনের জন্য আবশ্যক ছিল না, এবং যাহার জন্য তাঁহার চিঠি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। আমি তাঁহার প্রধান বক্তব্যগুলি সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, নতুবা আমার মন্তব্যও, যত লম্বা হইল, তার চেয়ে আরো খুব বেশী লম্বা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

গোড়াতেই আমি এক বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র-বাবুর নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছি। তিনি আমাকে "দোকান্‌দারী"র সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তজ্জন্য "ধন্যবাদ"। কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর "ধন্যবাদ" দোকানদারকেও কেমন করিয়া ঠকাইতে হয়, সেই বুদ্ধিটি দৃষ্টান্ত সহ শিখাইয়া দেওয়ার জন্য। পাঠকেরা জানেন, আমি বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক টাকা লইয়া থাকি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-বাবু সুকৌশলে

বা কুকৌশলে বিনি পয়সায় নিজের কবিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়া লইয়াছেন ; তাহাতে আমাকে ঠকিতে হইল। যাহা হউক, সান্ত্বনা এই, যে, তাঁহার এই বিজ্ঞাপনের ফলে তাঁহার কাব্যগ্রন্থনিচয়ের বিক্রী বাড়িলে আমার এই অনিচ্ছাকৃত নিঃস্বার্থ পরোপকারের পুণ্যফল আমি কিছু পাইতেও পারি।

মডার্ণ-রিভিউয়ে আমি যে ভুল করিয়াছিলাম, তাহা দ্বিজেন্দ্র-বাবু তাঁহার ইংরেজী চিঠিতে দেখাইয়া দেন। তদনুসারে আমি ঐ কাগজের বিবিধ টিপ্পনীর গোড়াতেই আমার ভ্রম স্বীকার করিয়া আমার প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। তাঁহার দীর্ঘ ইংরেজী চিঠিখানিতে বর্ত্তমান বাংলা চিঠিটির মত নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা ছিল। এই কারণে ঐ চিঠি ছাপি নাই। কিন্তু আসল কাজ যাহা তাহা করিয়াছিলাম। তথাপি সেই চিঠির কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন! কারণ, দ্বিজেন্দ্র-বাবুর মত লেখকদের একটা দুর্ব্বলতা আছে, যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক কালীর আঁচড়টিকে অপরের পয়সায় ছাপাইবার যোগ্য মনে করেন। আমি তাহা করি না।

বাগচী মহাশয়ের প্রথম আলোচনার বিষয় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার "শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের গৌরচন্দ্রিকা"। তিনি বলেন যে আমি "মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরম্ভ করার পূর্ব্বে এরূপ একটা গৌরচন্দ্রিকা প্রায় গেয়ে" থাকি। আমি প্রায়ই এইরূপ করিয়া থাকি কি না, তাহা বলা আমার পক্ষে সুসাধ্য নহে। কারণ আমি ন্যূনকল্পে বার বৎসর ধরিয়া গান্ধী মহাশয়ের ও তাঁহার সহযোগী ও অনুচরবর্গের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় বিষয় বহুচিত্রসহ প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ কাগজ দুখানিতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ; ফলে এই দুখানি কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে যত লেখা ও ছবি প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গের কোন কাগজে ত তাহা হয়ই নাই, ভারতবর্ষের কোন কাগজে হইয়াছে কি না সন্দেহ। এত বৎসর ধরিয়া আমি যাহা লেখাইয়াছি ও লিখিয়াছি, তাহার অধিকাংশই "মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরম্ভ করার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা" কি না, ন্যূনকল্পে বার বৎসরের মডার্ণ-রিভিউ ও প্রবাসী না ঘাঁটিলে তাহা বলিতে পারিতেছি না। "ন্যূনকল্পে বার বৎসর" এইজন্য বলিতেছি, যে, ১৯০৯ সালে আমি, বোম্বাই ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি Chief Judge আমার বন্ধু কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয়ের দ্বারা গান্ধী মহাশয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসের অভিজ্ঞতার কাহিনী সম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইয়া ক্রমে ক্রমে ছাপিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে। সম্ভবতঃ তাহারও অনেক বৎসর পূর্ব্বে মডার্ণ-রিভিউ ও প্রবাসীতে গান্ধীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই সমালোচনার পালা গাইবার গৌরচন্দ্রিকা কি না, এখন হঠাৎ বলিতে পারিতেছি না। কারণ, এত বৎসর ধরিয়া এ পর্য্যন্ত আমি গান্ধী মহাশয় ও তাঁহার সহচরঅনুচরদিগের গুণকীর্ত্তন প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ এর কত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া করিয়াছি ও করাইয়াছি, কত পৃষ্ঠাই বা সমালোচনার জন্য নিয়োগ করিয়াছি, তাহার হিসাব করা সহজ নহে ; এবং সেরূপ হিসাব সম্মুখে না রাখিয়া আমি বাগচী মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে নিজেকে দোষী (guilty) কিম্বা নির্দোষ (not guilty) কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

বাগ্‌চী মহাশয় বলেন, আমার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা "নিতান্তই নিরর্থক" এবং এতে "দোকানদারীর গন্ধও" আছে। আমি দেখিতেছি ১৩ই এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ১২০ পৃষ্ঠার মহাত্মা গান্ধী টিলক ও রামমোহনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন I highly revere Tilak and Raw Mohun। দ্বিজেন্-বাবু নিশ্চয়ই এই সমালোচনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মিশ্রণকে নিরর্থক ও দোকানদারীর গন্ধবিশিষ্ট মনে করেন না, আমিও করি না। আমি মনে করি, এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দ্বারা গান্ধী ইহাই জানাইতেছেন, যে, তিনি অশ্রদ্ধাবশতঃ সমালোচনা করেন নাই, আবশ্যকবোধে করিয়াছেন। আমারও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তাহাই। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"; আমি এ বিষয়ে গান্ধীমহাশয়ের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি বলিয়া লোকের আমার সমালোচনার কারণ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা বেশী বলিয়া, এবং আমি বহু বৎসর ধরিয়া গান্ধী মহাশয়ের সম্বন্ধে কি লিখিয়াছি ছাপিয়াছি তাহা অনেকের জানা না থাকিবার সম্ভাবনা বলিয়া (কেননা, আমি প্রথম যখন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করি তখন যাঁহারা নাবালক কিম্বা সার্ব্বজনিক বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন, এখন তাঁহারা সাবালক ও মনোযোগী হইয়াছেন), "গৌরচন্দ্রিকা" কখন কখন দরকার বোধ করি। লেখক আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা নিরর্থক বলিয়াছেন এইজন্য যে গান্ধী মহাশয় যে শ্রদ্ধাভাজন, এটা ত খুব জানা কথা, এবং আমি যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি 'তাহাতে সংশয়ও বোধ হয় কেউ কোন দিন করেন নি।' কিন্তু লেখক ২।১ ছত্র পরেই সন্দেহ করিয়াছেন! সে কথা যাক্। টিলক ও রামমোহন যে শ্রদ্ধাভাজন, এবং গান্ধী যে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, সে বিষয়েও ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। অথচ গান্ধী তাঁহাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাকে লেখক নিরর্থক বলেন নাই। তবে কি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা আমার বলিয়াই নিন্দনীয়? লেখক বলিতে পারেন, মহাত্মা গান্ধী যাহা করিলে দোকানদারী হয় না, আমি তাহা করিলে দোকানদারী হয়, অতএব দোকানদারীর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝা দর্‌কার। এ স্থলে ইহার অর্থ, লাভের জন্য সত্য গোপন ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া ভণ্ডামি করা। অর্থাৎ গান্ধীর প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু প্রবাসীর কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য বা কাট্‌তির হ্রাস যাহাতে না হয়, তাহার জন্য আমি কপট-শ্রদ্ধা প্রকাশ করি (এবং বোধহয় ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছি) ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লেখক স্বীকার করিবেন, যে, আমার অন্যদিকে বুদ্ধিহীনতা যত বেশীই হউক, দোকানদারী বুদ্ধিটা আছে। অতএব সেই বুদ্ধি অনুসারেই, অর্থাৎ লাভালাভ কিসে বেশী হয় তদনুসারেই আমার কার্য্যের সমীচীনতার বিচার হউক। ইহা বোধ হয় নিরপেক্ষ লোকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, যদি কেহ কপটভাবে দোকানদারী করিয়া, গান্ধীকে শ্রদ্ধা দেখাইতে চায়, তাহা হইবে পুরাপুরি নির্জলা অবিমিশ্র শ্রদ্ধা দেখাইয়া যত আর্থিক লাভ হইবে কপট-শ্রদ্ধার সহিত সমালোচনার ভেজাল দিলে ততটা লাভ হইবে না। কিন্তু লেখক বলিতে চান, যে আমি এত বোকা দোকানদার যে, আমি এই সোজা কথাটাও বুঝি না, এইজন্য সমালোচনার নিরবচ্ছিন্ন কপট-শ্রদ্ধা না দেখাইয়া সমালোচনার ভেজালযুক্ত কপট শ্রদ্ধা দেখাইয়া অধিকতর

লাভবান্ হইতে চাই! কেবলমাত্র শ্রদ্ধা (কপট বা অকপট যাহাই হউক) দেখাইলে, একটুও সমালোচনা না করিলে, কাগজের কাট্‌তি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া যায়। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিব না। কারণ, আমি গান্ধীর প্রতি পূর্ণ বা আংশিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকারী সম্পাদক মাত্রেরই বিচারক সাজিয়া কাহারো আচরণে কোন অভিসন্ধি আরোপ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। আমি নিজে, যে, কর্ত্তব্যবোধে প্রশংসা ও সমালোচনা দুই করি, তাহাতে ত লাভ এই হইয়াছে, যে, কতকগুলি ধমকপূর্ণ, "অহিংসা"-সূচক চিঠি গান্ধী-ভক্তেরা আমাকে লিখিয়াছেন : এবং দ্বিজেন্দ্র-বাবুর চিঠি ও তাহার উত্তর ছাপিতে, ও তাহার উত্তর দিতে আমার প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪।১৫ টাকা খরচ হইতেছে!

অতঃপর লেখক মল্লিখিত "রামমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর মনের ঝাল যেন একটু বেশী মনে হইল" কথাগুলির আলোচনা করিয়া "ঝাল" কথাটার জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। আমার ধারণা এই যে, মানুষ বাস্তবিক মহাত্মা নামের যোগ্য হইলেও (যেমন গান্ধী হইয়াছেন), সর্ব্বকালে সর্ব্ববিধ চিত্তবিকারের অতীত হইয়া যান না। এইজন্য, খবরের কাগজে (ইয়ং ইণ্ডিয়াতে সংশোধিতভাবে প্রকাশের পূর্ব্বে) যখন গান্ধী মহাশয়ের উক্তিগুলি, পড়ি, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে তিনি ঠিক নিরপেক্ষ ও শান্তভাবে রামমোহনের বিচার করিতে পারেন নাই। আমার ভাষার দোষ সম্ভবতঃ হইয়াছে, কিন্তু আমার এখনও ধারণা এই, যে, রামমোহনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি উহাঁর সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য ও নির্ব্বিকারচিত্ত নহেন। রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা ও রামমোহনের অনুবর্ত্তী অনেক লোকের অসহযোগবিরোধিতা ইহার কারণ হইতে পারে, না হইতেও পারে : ঠিক কারণ নির্ণয় করিতে আমি অসমর্থ। যাহা হউক, আমি কেন উল্লিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার কারণ কিছু বলিতেছি। কাহাকেও "বামন" বলিবার প্রধান কারণগুলির মধ্যে দুটি দেখিতেছি এই যে "বামন" নামে অভিহিত এক ব্যক্তির অনুবর্ত্তীদের মধ্যে শিখদের মত মার্টার (martyr) হন নাই, এবং "বামন"টির প্রভাব জনসাধারণের মনের উপর কম। ইতিহাস বলে, যে, শিখদের মত এত এবং এ-প্রকার মার্টার গান্ধী মহাশয়ের উল্লিখিত শঙ্কর, চৈতন্য ও কবীরের অনুবর্ত্তীদের মধ্যেও দেখা যায় নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের "জায়েণ্ট" (giant) আখ্যা বজায় আছে ; তাঁহারা নানক অপেক্ষা নিকৃষ্ট এরূপ কথা বলা হয় নাই, তাঁহারা কেহ মার্টার উৎপন্ন করিয়াছেন কি না, এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হয় নাই। গান্ধী বলিয়াছেন, টিলক ও রামমোহনের সর্ব্বসাধারণের মনের উপর দখল চৈতন্যাদির তুলনায় নাই বলিলেই হয় ("Ram Mohan and Tilak had no hold upon the people compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak")। কিন্তু টিলকের বেলাতে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় নাই, যে তিনি কোন মার্টার উৎপন্ন করিয়াছেন কি না। বস্তুতঃ টিলকের প্রভাব মহারাষ্ট্রে এবং অন্য কোথাও কোথাও খুব বেশী। তজ্জন্য স্বরাজ্য ফণ্ডের নাম টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড্ রাখা হইয়াছে। রামমোহনকে কার্য্যতঃ এরূপ কোন সম্মান দেখাইবার সাংসারিক প্রয়োজন নাই ; কারণ, সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

দ্বিজেন্-বাবু যাহাই মনে করুন, আমি

গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ; সেইজন্য এই ক্ষুদ্র বিষয়টির অধিক সমালোচনা করিয়া ইহা অধিকতর তিক্ত করিতে চাই না। আমার ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহা আমি অবিলম্বে স্বীকার করিব ; কিন্তু এখনও ভ্রম বুঝিতে পারি নাই।

লেখক আমার "নিগূঢ় শ্লেষের ভঙ্গীটার" নিন্দা করিয়াছেন। আশা করি তিনি তাঁহার চিঠির নানা স্থলে শ্লেষের ভঙ্গীটার দ্বারা আমাকে। পরম আপ্যায়িত ও সুখী করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি দলীপসিংহ-প্রসঙ্গে গান্ধীর মার্টারের আদর্শ জানিতে চাওয়ায় লেখক চটিয়া-মটিয়া বহুৎ কথা লিখিয়াছেন। এবং ভুলটি গান্ধী করায় সুবিধাজনক অনুমান দ্বারা তাহা লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি একটা সোজা কথা বলি। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, মাড়োয়ারীরা বাঙ্গালীদের মত কবি উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রন।থ ঠাকুরের মত কবি তাঁহাদের আছে কি না। "অশ্রুতকীর্ত্তি" কোন কবির নাম করা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং দলীপসিংহ "কোনও অশ্রুতকীর্ত্তি ত্যাগবীর" ছিলেন বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলে চলিবে না। মার্টারের মানেটার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, যে-অর্থে উহা প্রযুক্ত হইবে, তদনুসারে প্রযোক্তার প্রয়োগকালীন আদর্শ বুঝা যাইবে। "আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি" মাত্রেই মার্টার্ নহেন, "ত্যাগবীর" মাত্রেই মার্টার নহেন। "স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত" দেখাইলেই মার্টার হওয়া যায় না। শিখ মার্টাররা মার্টার কথাটির প্রাথমিক অর্থে মার্টার ছিলেন, এবং গান্ধী মহাশয় শিখদেরই মার্টারত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সে অর্থ, one who testifies by his death to his faith of principles, one who is put to tortured for adherence to some belief, ইত্যাদি। শিখদের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিহত বা নিষ্ঠুররূপে নির্য্যাতিত প্রসিদ্ধ কোন মার্টারের নাম দলীপসিংহ বলিয়া আমার জানা না থাকায়, এবং ঐ নামের একজন জীবিতব্যক্তি গান্ধী মহাশয়ের কটকের প্রশ্নোত্তরের কিছু পূর্ব্বে রাজনৈতিক কারণে ধৃত (ও পরে ক্ষমা প্রার্থনার পর মুক্ত) হওয়ায়, আমি মনে করিয়াছিলাম যে তিনি রাজনৈতিক মার্টারের উল্লেখই করিয়া থাকিবেন, এবং তজ্জন্য আদর্শের কথাটা তুলিয়াছিলাম। কারণ, মার্টারের প্রাথমিক অর্থের পর অন্য অর্থও প্রচলিত হয়, রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকেও কখন কখন মার্টার বলা হয় ; যেমন মিসেস বেসান্টকে ডিপোর্ট করা হইলে সেই সামান্য কারণেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মার্টারত্ব হইয়াছে বলিয়াছিলেন। জীবিত দলীপসিংহ মিসেস্ বেসাণ্ট অপেক্ষাও সামান্য কষ্ট সহ্য করিয়া (এবং পরে ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি পাইয়া) যদি মার্টার নাম পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তার চেয়ে বড় মার্টার্ অবজ্ঞাত রামমোহনশিষ্যদের মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে, এই অনুমানে আমি আদর্শের কথাটা তুলিয়াছিলাম ; মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমার মত লোকের আদর্শের চেয়ে ছোট, এরকম মনে করিবার ধৃষ্টতা আমার কোন কালে হয় নাই। গান্ধীর "আদর্শ" কথাটা তাঁহার উচ্চতম চিরন্তন আদর্শ অর্থে আমি ব্যবহার করি নাই ; তিনি যখন ঐ প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, তখন কি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া করিয়াছিলেন, এবং তাহা

ধর্ম্মবিষয়ক বা রাজনৈতিক মার্টারত্ব তাহাই জানা আমার অভিপ্রায় ছিল। গান্ধী মহাশয়কে লইয়া একটু পরিহাস করা এত বড় মহাপাতক তাহা জানিতাম না। লোকে, এবং দ্বিজেন্দ্র-বাবুর "স্বজাতি" কবিরাও, ঠাকুরদেবতাকে লইয়াও রঙ্গ করিয়া গিয়াছে।

রামমোহনশিষ্যদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য মার্টার্ কেহ হন নাই, ইহা অতি সত্য কথা ; কিন্তু "আত্মোৎসর্গকারী" বা "ত্যাগবীর" কেহ নাই বা ছিলেন না, কেহই "স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত" দেখান নাই, ইহা সত্য নয়। তাঁহাদের ফর্দ্দ দিবার আবশ্যক নাই ; লেখকের challenge সত্ত্বেও দিব না। শিখ মার্টার্রা যে অর্থে মার্টার তাহাই বিবেচ্য। শিখদের মত বহুসংখ্যক জ্বলন্ত মার্টার শঙ্কর, কবীর, চৈতন্যের অনুবর্ত্তীদের মধ্যেও নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা জায়েন্ট (giant)। কিন্তু রামমোহনের সম্প্রদায়ে মার্টার্ না থাকাটা তাঁহার বামনত্বের অন্যতম প্রমাণ! একটা অতি সোজা কথা গান্ধী মহাশয় ও বাগ্চী মহাশয় কেহই বিবেচনা করেন নাই। ধর্ম্মের জন্য অত্যাচারী ও ধর্ম্মের জন্য অত্যাচরিত দুই পক্ষ থাকিলে তবে মার্টার্ জন্মে। মাথা চাহিবার ও লইবার এবং মাথা দিবার এই উভয়বিধ লোক থাকিলে তবে মার্টারের উদ্ভব হয়। মোগলযুগে ধর্ম্ম-ও-রাজনীতি উভয় সম্পৃক্ত কারণে অনেক শিখ্কে বলা হইয়াছিল, "হয় ধর্ম্ম ছাড়, নয় মাথা দাও"। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ শিখ্ মাথা দিয়াছিলেন ধর্ম্ম ছাড়েন নাই ; ইহাঁরাই বন্দনীয় মার্টার্। ইংরেজের আমলে, "হয় ধর্ম্ম ছাড়, নয় মাথা দাও," এরূপ দাবী হয় নাই ; সুতরাং ইংরেজ আমলে, মুসলমান আমলের মত ধর্ম্মের জন্য মার্টার্ শিখ্রাও হন নাই, অন্য কোন ধর্ম্মের লোকেরাও হন নাই। মাথা চাহিলে কোন রামমোহনশিষ্য মাথা দিতেন কি না, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমার ধারণা তাঁহাদের মধ্যে মাথা দিবার লোকের অভাব হইত না, এখনও হইবে না। ইংরেজ আমলে ধর্ম্মের জন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকই মার্টার হন নাই। রামমোহন ইংরেজ আমলের লোক ; সুতরাং মার্টার উৎপন্ন না-করাটা কেবলমাত্র তাঁহারই একচেটিয়া ত্রুটি বা অক্ষমতা বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যন্ত অবিচার হয়। মহাত্মা গান্ধী, অবশ্য অনবধানতা-বশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, এই অবিচার করিয়াছেন।

তাহার পর, রাজনৈতিক মার্টারের কথা। জীবিত দলীপসিংহকে মাপকাঠি ধরিলে রামমোহনের শিষ্যদের মধ্যে উচ্চতর এবং খাঁটি মার্টারের অসদ্ভাব নাই। দ্বিজেন-বাবু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরবর্ত্তী সময়ে রাজনৈতিক কারণে, নজরবন্দী অবস্থায় রক্ষণ বা ডিপোর্টেশ্যন হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দণ্ডে দণ্ডিত লোকদের মধ্যে রামমোহনের সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহাদের বংশজাত ও পরিবার-ভুক্ত লোক, দেখিতে পাইবেন। রামমোহনের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত লোকেরা সংখ্যায় দেশে বিশহাজারেও একজন নহে। সে অনুপাতে, দণ্ডিত লোকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অবজ্ঞার উদ্রেক করিবে না। দণ্ডিত ব্যক্তিদের আচরণ কি পরিমাণে ভাল বা মন্দ ছিল, তাহার বিচার হইতেছে না, রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু-একটা আদর্শের জন্য, কোনও বিশ্বাসের জন্য, কষ্ট সহিবার, সর্ব্বস্বপণ করিবার, প্রাণপণ করিবার, ক্ষমতা ও সাহসের পরিচয়, রামমোহনশিষ্যেরা ন্যূনকল্পে জীবিত দলীপসিংহের সমান পরিমাণে দিতে পারিয়াছে

কি না, তাহাই বিচার্য্য। আমি দেখাইলাম, পারিয়াছে।

লেখক লিখিতেছেন, "রামমোহনের উপর মহাত্মা গান্ধীর অশ্রদ্ধাটা কিরূপ এখন দেখা যাক্।" অনেক তার্কিক প্রতিপক্ষের মুখ দিয়া কাল্পনিক স্বরচিত যুক্তি উচ্চারণ করাইয়া তৎপরে তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক বাহাদুরী লইয়া থাকেন। আমি কোথাও লিখি নাই, যে রামমোহনের প্রতি গান্ধী অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। আমি "বামন" কথাটি প্রয়োগ প্রভৃতিতে আপত্তি জানাইয়াছি। সুতরাং গান্ধী যে অশ্রদ্ধা জানান নাই, শ্রদ্ধাই জানাইয়াছেন, ইত্যাকার দীর্ঘ তর্ক নিরর্থক।

অতঃপর লেখক অনুমান করিয়াছেন যে আমি একটু ভুল বুঝিয়াছি, এবং তজ্জন্য বিস্তারিতভাবে আমার ভুল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাও লিখিয়াছেন। তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়ার উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরের সার মর্ম্ম দিয়াছেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ সংশোধিত। উহার আগে অন্য কাগজে যাহা ছাপা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া আমি লিখিয়াছিলাম। তাহা আমি কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে পাইতেছি না। তাহার সহিত ইয়ং ইণ্ডিয়ার, অল্প হইলেও কিছু প্রভেদ ছিল। যাহা হউক, আমি ইয়ং ইণ্ডিয়ার রিপোর্টটি হইতেই টিলক রামমোহন সম্বন্ধীয় মন্তব্য অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকেরা তাহা হইতে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন।

In reply to a question put to him in a public meeting at Orissa, whether English education was not a mixed evil, in as much as Lok, Tilak, Babu Rammohan Rai, and Mr. Gandhi were products of English education, Mr. Gandhi replied as follows:–

This is a representative view being expressed by several people. We must conquer the battle of Swaraj by conquering this sort of wilful ignorance and prejudice of our countrymen and of Englishmen. The system of education is an unmitigated evil. I put my best energy to destroy that system. I don't say that we have got as yet any advantage from the system. The advantages we have so far got, are in spite of the system, not because of the system. Supposing the English were not here, India would have marched with other parts of the world and even if it continued to be under Moghul rule, many people would learn English as a language and a literature. The present system enslaves us, without allowing a discriminating use of English literature. My friend had cited the case of Tilak, Ram Mohan, and myself. Leave aside my case, I am a miserable pigmy.

Tilak and Ram Mohan would have been far greater men if they had not had the contagion of English learning (clapping). I don't want your verbal approval by clapping but I want the approval of your intellect and reasoning. I am opposed to make a fetish of English education, I don't hate English education. When I want to destroy the Government, I don't want to destroy the English language but read English as an Indian nationalist would do. Ram Mohan and Tilak (leave aside

my case) were so many pigmies who had no hold upon the peple compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak. Ram Mohan, Tilak, were pigmies before these giants. What Sankar alone was able to do. the whole army of English-knowing men can't do. I can multiply instances. Was Guru Govind a product of English education?

Is there a single English-knowing Indian who is a match for Nanak, the founder of a sect second to none in point of valour and sacrifice? Has Rammohan produced a single martyr of the type of Dulip Singh? I highly revere Tilak and Ram Mohan. It is my conviction that if Ram Mohan and Tilak had not received this education but had their natural training they would have done greater things like Chaitanya.

লেখক বলিতেছেন, "রামানন্দ-বাবু 'টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য' ব'লে প্রসঙ্গটির যে শিরোনামা দিয়েছেন সেটা একটু ভুল হয়েছে"। বিন্দুমাত্রও ভুল হয় নাই। গান্ধীর কথার যে-অংশটুকু আমার আলোচ্য, আমি তদনুরূপ নাম দিয়াছি। গান্ধী আরো নানা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার আলোচনা আমি করি নাই, সুতরাং নামও সেরূপ দি নাই। "বিশ্বকোষে" অন্য সব বিষয়ের মধ্যে বেগুনেব বিষয়েও কিছু লেখা আছে। কিন্তু তা বলিয়া বেগুনের বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া তাহার নাম "বিশ্বকোষ" দিলে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী মহাশয়ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না।

বাগচী মহাশয় নিজের ধারণা অনুযায়ী "সারমর্ম্ম" দিয়া লিখিতেছেন, "পণ্ডিত লোকে যাই মনে করুন, উল্লিখিত উক্তিগুলিতে রামমোহনের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ হয়েছে।" যেন আমি (আমি পণ্ডিত নহি) বলিয়াছি, যে, তাঁহার সব উক্তিগুলিতেই বা মোটের উপর উক্তিসমষ্টিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে! আমি আবার বলিতেছি, আমার আপত্তি "বামন" কথাটির প্রয়োগে, এবং তুলনা ও তুলনার রীতিতে।

লেখক যাহা লিখিয়াছেন, সেগুলি সমস্ত গান্ধীর "উক্তি" নহে ; গান্ধীর কথা লেখক যেরূপ বুঝিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই। উভয়ে প্রভেদ আছে। উপরে উদ্ধৃত মূল ইংরেজী দেখিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। একটিকে আর-একটি বলিয়া চালান উচিত নয়।

লেখক বলেন, "আমার তো আশঙ্কা হয় রামানন্দ-বাবুই রামমোহনকে লোকের চোখের সাম্‌নে কতকটা ছোট ক'রে ধরেছেন।" তাঁহার আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু তাহা অমূলক। আমি রামমোহনকে যাহা মনে করি, তাহার কিছু আভাস জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিয়াছি ; পুনরুক্তি করিব না।

একজন মানুষের অন্য বহু মানবের হৃদয়মনচরিত্রের উপর প্রভাব দুদিক্ দিয়া বিচারিত হইতে পারে, (১) কত জনের উপর প্রভাব পড়িয়াছে, এবং (২) কি রকম মানুষের উপর কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে। তর্কবিতর্কের সময় উভয় পক্ষের, অজ্ঞাতসারে, সত্য হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এইজন্য আমি আমার মত এখন বলিতে চাই না। রামমোহন রায়ের প্রভাব যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে আবদ্ধ নহে, তাহার বাহিরেও বহুবিস্তৃত, কেবল ইহাই

বিবেচনা করিতে বলি। তাহার পর, কি দরের লোকে তাঁহার প্রভাবাধীন তাহাও বিচার্য্য। রামমোহনের প্রভাবাধীন মহাপতি রাণাড়ে প্রভৃতির বিষয় জানা থাকিলেও, অন্য সব প্রদেশের কথা ভাল করিয়া হয় ত বলিতে পারিব না, সেইজন্য বঙ্গের কথাই বলি, ইহাতে দোষ হইবে না ; কারণ নানকেরও প্রভাব প্রধানতঃ পঞ্জাবে, এবং কবীরের প্রভাব প্রধানতঃ আগ্রাঅযোধ্যায় লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্র-বাবু বঙ্গের জাতীয় জীবনে নানা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ও কর্ম্মীদের তালিকা করিয়া দেখুন তাঁহাদের মধ্যে কত লোক সাক্ষাৎ ভাবে রামমোহনের অনুবর্ত্তী। তাহার পর, বিবেচনা করিবেন, যে, ব্রাহ্ম না হইলেও, বিবেকানন্দস্বামী স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, যে, তিনি রামমোহনের পন্থাবলম্বী ; অরবিন্দ ঘোষের মাতা, মাতামহ, প্রভৃতি ব্রাহ্ম এবং তাঁহার উপর রামমোহনের প্রভাব যথেষ্ট আছে। অসহযোগ আন্দোলনে এখন খ্যাত্যাপন্ন কোন কোন লোকেরও বংশাদির পরিচয় লইবেন। রবীন্দ্রনাথ ত লিখিয়াছেনই, যে, রামমোহন যেমন তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথকে ইস্কুলে পৌঁছাইয়া দিতেন, তেমনি ঠিক যেন সমস্ত জাতিকে ইস্কুলে লইয়া যাইতেছেন। (বহি নিকটে না থাকায় ঠিক্ কথাগুলি তুলিয়া দিতে পারিলাম না)।

প্রভাব বিস্তৃত হইতে সময়ও ত লাগে। আমরা এখন শঙ্কর-নানকাদির প্রভাব যেরূপ দেখিতেছি, তাহা কত শতাব্দীর পর? রামমোহন ত গত শতাব্দীর লোক।

জনসাধারণের উপর প্রভাবের কথা গান্ধী কটকের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এবং ২৭শে এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়ার ১৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "The effect of Rammohan and Tilak on the masses is not so permanent and far-reaching as that of the others more fortunately born." এই প্রভাবও কালসাপেক্ষ। তা ছাড়া আরো কিছু বলিবার এবং ভাবিবার আছে। গুস্তাভ্ ল্য বঁ (Gustave Le Bon) প্রণীত "The Crowd : A Study of the Popular Mind" জনসমষ্টির মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রামাণিক বহি। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ভাব-চিন্তা-আদির বিস্তারে দীর্ঘকালের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"A long time is necessary for ideas to establish themselves the minds of crowds....For this reason crowds, as far as ideas are concerned, are always several generations behind learned men and philosophers"–Pp.72-73.

"Even when an idea has undergone the transformations which render it accessible to crowds, it only exerts influence when by various processes which we shall examine elsewhere, it has entered the domain of the unconscious when indeed it has become a sentiment, for which much time is required."–P. 71.

ভাব ও চিন্তা আদির উপরি-উক্ত কিরূপ রূপান্তর ঘটিলে তাহা জনসমষ্টি সহজে গ্রহণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"Ideas being only accessible to crowds after having assumed a very simple shape must often undergo the most thoroughgoing transformations to become popular. It is especially when we are dealing with somewhat lofty philosophic or scientific ideas that we see how far-reaching are the modifi-

cations they require in order to lower them to the level of the intelligence of crowds. These modifications are dependent on the nature of the crowds, or of the race to which the crowds belong. But their tendency is always belittling and in the direction of simplification...... However Great or true an idea may have been to begin with, it is deprived of almost all that which constituted its elevation and greatness by the mere fact that it has come within the intellectual range of crowds and exerts an influence upon them."– Pp. 70-71.

যেরূপ ভাব চিন্তা ও আদর্শের প্রভাবে আসিতে হইলে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন, জনসমষ্টি তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রন্থকারের মত এইরূপ। যথা ঃ—

The case with which certain opinions obtain general acceptance results more especially from the impossibility experienced by the majority of men of forming an opinion peculiar to themselves and based on reasoning of their own." P. 75.

খুব মহৎ লোকেরও যে নিজের যুগের লোকদের উপর প্রভাব না থাকিতে পারে, তাহার কারণ গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"At every period there exists a small number of individualities which react upon the remainder and are imitated by the unconscious mass. It is needful, however, that these individualities should not be in too pronounced disagreement with received ideas. Were they so to imitate them would be too difficult and their influence would be nil. For this very reason men who are to superior to their epoch are generally without influence upon it." Pp. 144-5.

এই গ্রন্থকারের সব কথাই সত্য না হইতে পারে ; কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, কেবল "বামন" হওয়ার দরুনই যে রামমোহনের প্রভাব এখনও বহুবিস্তৃত হয় নাই, তাহা নহে।

টিলক ও রামমোহনের শিক্ষার কথা উঠিয়াছে। এই দুজনের শিক্ষাকে এক শ্রেণীতে ফেলাই একটা মস্ত ভুল। গান্ধী এই ভুল করিয়াছেন। টিলক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা পান। রামমোহনের সময় সেরূপ কোন গবর্ণমেণ্ট-শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। তিনি তৎকাল-প্রচলিত দেশী রীতিতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে বাংলা সংস্কৃত আরবী ফারসী শিক্ষা করেন। তাহার পর প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ হইয়া স্ব-ইচ্ছায় নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা করেন, যেমন পরে হীব্রু লাটীন গ্রীক আদি শিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইংরেজী-শিক্ষা-প্রণালী তখন ছিল না ; এখনকার মত উহার অনুযায়ী ইস্কুলও ছিল না ; উহা এবং উহার অনুযায়ী ইস্কুলের দোষও সেইজন্য রামমোহনের দেহমনকে স্পর্শ করে নাই। রামমোহন কোন ইংরেজী স্কুলে যান নাই। গান্ধী স্বয়ং ইংরেজী শিখিবার বিরোধী নহেন ; জাতীয়তার জন্য কেহ উহা স্বেচ্ছায় শিখিলে উনি তাহাতে আপত্তি করেন না। ("read English as an Indian nationalist would do")। রামমোহনও সেইরূপেই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন—স্বেচ্ছায় শিখিয়াছিলেন ; কেহ তাঁহাকে বাধ্য করে নাই।

রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক হইয়া একটুও অন্যায় করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী ইংরেজীশিক্ষার দোষ ততটা দেন না, বর্ত্তমান system অর্থাৎ প্রণালী পদ্ধতি রীতি বা প্রথার যতটা দোষ দেন। এই সীস্‌টেম্‌ রামমোহন প্রবর্ত্তিত করেন নাই। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না।

কোন বিষয়েই রামমোহন রায়ের, বিরাট ব্যক্তিত্ব এক কথায় বুঝান যায় না। তিনি যেমন তাৎকালিক সংস্কৃত শিক্ষার দোষ দেখাইয়াছিলেন, তেমনি গুণও খুব জানিতেন। দ্বিজেন্দ্র-বাবু জানেন না বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, তিনি যেমন পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি বৈদিক কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং উপনিষদাদি অনুবাদ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচার প্রথমে তিনিই করেন। এসব বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র-বাবুর উপদেশের অপেক্ষা তিনি করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র-বাবু যে এখন উপনিষদ কপ্‌চাইতেছেন, তাহাও রামমোহনের কার্য্যের পরোক্ষ ফল। য়ুরোপের বস্তুবিদ্যার মোহ তাঁহাকে একটুও আচ্ছন্ন করে নাই ; কিন্তু তিনি সেই জাতীয় আত্মপ্রতারিত বা ভ্রান্ত বা কপট লোক ছিলেন না, যাঁহারা ইউরোপীয় বস্তুবিদ্যার সমুদয় সুবিধা ও কার্য্যসৌকর্য্য ভোগ করিতে ছাড়েন না অথচ উহার নিন্দাও পঞ্চমুখে করেন। তাঁহার দৈহিক আত্মিক লৌকিক পারত্রিক সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বদেশিক কল্যাণের আদর্শ এরূপ উচ্চ বিশাল ও অখণ্ড ছিল, এবং উহা পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ অ-পূর্ব্ব ছিল, যে, এখনও অনেকে উহা বুঝিতে পারেন না।

লেখক বলেন, মহাত্মা গান্ধী রামমোহনের ভক্তদিগকে আঘাত করেন নাই। ইহা নিশ্চিত

রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধী মহাশয়ের দ্বিতীয় ভুল এই যে, তিনি ২৭শে এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন—"Rammohan Rai would have been a greater reformer......if [he] had not to start with the handicap of having to think in English and transmit thoughts chiefly in English." "তিনি চিন্তা করিতে ও চিন্তা অন্যের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন প্রধানতঃ ইংরেজীতে' ইহাও একটি মস্ত ভুল। তিনি ইংরেজী শিখিবার আগেই চিন্তাকারী (thinker) এবং সংস্কারক হইয়াছিলেন, এবং বহিও লিখিয়াছিলেন। পাদ্রীদের সহিত বিচার এবং সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের জন্য অভিপ্রেত জিনিষ ছাড়া তাঁর সব প্রধান লেখা প্রথমতঃ প্রাচ্য ভাষায় (বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়) লিখিত হয় ; তন্মধ্যে কিছু কিছু পরে ইংরেজীতে অনুবাদও করেন। ইংরেজীতেই প্রথমে তিনি চিন্তা করিতে শিখেন নাই, লেখেন নাই, মাতৃভাষায় এবং অন্য প্রাচ্য ভাষায় করিয়াছিলেন। অতঃপর উভয়ের সম্বন্ধে গান্ধী বলিতেছেন—"No doubt they both gained from their knowledge of the rich treasures of English literature. But these should have been accessible to them through their own vernaculare." এখানেও গান্ধী রামমোহন ও টিলককে একসঙ্গে জড়াইয়া ভুল করিয়াছেন। দেশভাষায় সকল জ্ঞানপূর্ণ বহি বিদ্যার্থী বালকের সহজলভ্য হওয়া যে উচিত, ইহা রামমোহনই আমাদের দেশে দেশীলোকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়া স্বয়ং সেইরূপ বহি লিখিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার ত্রুটিটা কোথায় হইল, তাঁহার শিক্ষায় নিবার্য্য দোষ কি হইল, বুঝিতে পারি না।

যে তিনি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু আমার ভক্তির পাত্রকে কেহ বামন বলিলে আমি মর্ম্মান্তিক আহত হই। আমি জানি অন্য অনেকেও ইহাতে খুব ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন। যেটা আমার অনুভবের বিষয় তাহাকে তর্ক করিয়া কেহ উড়াইতে পারে না।

লেখক বলেন, গান্ধী, যাহা বলিয়াছেন তাহা "অকারণ" নহে। আমি মনে করি, নিশ্চয়ই অকারণ ; কেননা, কোনও লোককে "বামন" না বলিয়াও ইংরেজী শিক্ষার দোষ অনায়সেই দেখান যায়। এই দোষকীর্ত্তন অনেক বৎসর হইতে চলিতেছে ; গান্ধী যে-যে দোষ দেখাইয়াছেন, অন্যে তাহাও দেখাইয়াছেন. কিন্তু কেহই রামমোহনকে বামন বলেন নাই। সত্য, কটকে প্রশ্নকর্ত্তা রামমোহনের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে বামন বলিবার আবশ্যকতা বুঝিলাম না।

গান্ধীর তুলনাপ্রণালীর ভুল স্বীকার করিয়াও লেখক স্বীকার করিবেন না। মহাপুরুষদের মধ্যে একজাতীয়ত্ব যেমন আছে, সব মানুষের মধ্যেও তেমনি একজাতীয়ত্ব আছে। তা বলিয়া ছোট বড় নির্ণয়ের জন্য সকলের তুলনা সকলস্থলে সমীচীন হয় না। কার্লাইল্ নানাপ্রকারের লোককে হীরো বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হীরোদের সকলের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহার তুলনা করেন নাই! শঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের কার্য্যক্ষেত্রের আংশিক মিল আছে বটে, প্রায় ষোল আনা নহে। রামমোহনের অখণ্ড মঙ্গলের আদর্শ তাঁহার অন্যতম বিশিষ্টতা। অন্যদের তাহা বিশিষ্টতা নহে।

আমি নানক কবীরের সময়ে পারসীক ও আরবী সাহিত্য সভ্যতাদিকে যে স্থান দিয়াছি, লেখক তাহাকে অসঙ্গত অত্যুক্তি বলিতেছেন। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা খুব সঙ্গত ; তাহা অত্যুক্তি নয়, বরং কম করিয়া বলিয়াছি। আমি এ বিষয়ে তথ্যকে সাক্ষী মানিব। ইস্লামিক ও হিন্দুসভ্যতা মূলতঃ এক কি না, সেটা বিচার্য্য বিষয় নহে। বিচার্য্য এই, যে, বিদেশী ইস্লামিক সাহিত্য ও সভ্যতা ভারতবর্ষে অন্ততঃ ততটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না, এখন বিলাতী সাহিত্য ও সভ্যতা যতটা করিয়াছে। আমি কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি।

(১) ধর্ম্ম।—সত্যপীরের কথার মত "ট্রু-খৃষ্টিয়ান-সেণ্ট" বলিয়া কোন কাহিনীর সৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজের আমলে হইয়াছে কি! কবীর, নানক প্রভৃতির বাণীতে যত আর্বী ফার্সী কথা আছে, আধুনিক কোন দেশী ধর্ম্মোপদেষ্টার বাণীতে তত ইংরেজী কথা আছে কি? পীরের সিন্নি পাড়াগাঁয়ের হিন্দুনারীরাও দেন। খ্রীষ্টকে সিন্নি বাঙালী হিন্দুর মেয়ে কেহ দেন? ধর্ম্মস্থলে প্রবেশ কাহাকে বলে? মুসলমান রাজত্বকালে একশ্রেণীর হিন্দু ছিল, তাহাদের নাম দর্শনিয়া" ; তাহারা প্রাতে আগ্রা-দিল্লীতে মুসলমান বাদ্শাহকে না দেখিয়া জলগ্রহণ বা কাজকর্ম্ম করিত না ; বাদ্শাহ তাহাদিগকে ঝরোকা-ই-দর্শন্ হইতে দেখা দিতেন। ইংরেজ রাজত্বে কোন হিন্দু কি রাজা পঞ্চম জর্জকে বা তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে না দেখিয়া জলগ্রহণ করে না? ১৩২৮ সালের নিদাঘসংখ্যা "প্রভাতী"তে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা সম্রাট আকবরকে জগৎ-গুরু উপাধি দিয়াছিল! আবুলফজলের মতে সব জাতির লোক জানে যে "বাদশাহের

নামে মানত করাই তাহাদের সমস্ত বিপদ বাধা ভঞ্জনের উপায়। যখন তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তখন তাহারা উহাঁকে পূজা করিতে মাথা নত করে।" দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর রাজ্যের সুলতানদের একজন "জগৎ-গুরু" উপাধি লইয়াছিলেন। "যাহা হউক, সম্রাট ত জগৎগুরু হইলেন, এখন সম্রাজ্ঞীকে ঐ-মত একটা উপাধি না দিলে বড়ই অসামঞ্জস্য থাকে। সে কালের কর্ত্তাভজাগণ এটিও ছাড়ে নাই। তাহারা জহাঙ্গীরের প্রধান পত্নী-(যোধপুর-দুহিতা ও শাহজহানের মাতা)-কে 'জগৎগোস্বামিনী' বলিয়া ডাকিত।" সম্রাজ্ঞী মেরীকে কেহ জগৎ-গোস্বামিনী বলে না। "লণ্ডনেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রবও উঠে নাই।

(২) সমাজ।—মোগল বাদশাহ ও কোন কোন ওমরাকে হিন্দু রাজাদের কন্যাদানের মত কিছু ইংরেজ আমলে আছে কি? মুসলমান সমাজে নারীর অবরোধ এবং ইংরেজ সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন বেশী। কিন্তু মুসলমান-প্রভাবে পর্দ্দার প্রসার ও প্রকোপ যত হইয়াছিল, ইংরেজ প্রভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা এখনও তত হয় নাই। বেশভূষা সম্বন্ধে এখনও পশ্চিমে সেকেলে লালাদিগকে মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বেশী লিখিবার স্থান ও সময় নাই।

(৩) নাম।—স্বাধীন নেপালে পর্য্যন্ত বিদেশী ভাষার নাম জং-বাহাদুর চলিয়াছে ; পঞ্জাব আগ্রা-অযোধ্যার শম্‌শের জঙ্গ বাহাদুর, আমীর বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, সর্‌কার বাহাদুর, ইক্‌বাল্‌ নারায়ণ, তেজ বাহাদুর, ইত্যাদি হিন্দু নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের ফকীরচাঁদ, গোলাপ, বাবুলাল, প্রভৃতি আরো অনেক নাম এই প্রকারের। ইংরেজী ভাষার কতগুলি নাম এই প্রকারে আমাদের গৃহে স্থান পাইয়াছে, লেখক বলিতে পারেন কি?

(৪) ভাষা।—ফার্সী-আরবী-শব্দবহুল উর্দ্দুভাষার কথা না-হয় ছাড়িয়া দিলাম—যদিও ওরূপ কোন ইংরেজী-শব্দবহুল ভাষা ভারতে ইংরেজ আমলে জন্মে নাই। কথিত ও লিখিত বাংলা ভাষার মধ্যে যত ফার্‌সী আর্‌বী কথা ঢুকিয়াছে, ইংরেজী তত ঢুকে নাই। কিন্তু ভাষার মর্ম্মস্থানে পর্য্যন্ত মুসলমান-প্রভাব লক্ষিত হয়। "এবং"-বাচক, "আর"-বাচক "ও" কথাটি সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে ; উহা ফার্‌সী, কিন্তু বাংলার অস্থিমজ্জার ভিতর ঢুকিয়াছে, বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। "দিগ" বিভক্তিটিও এইজাতীয়। ইংরেজীর এরূপ প্রভাব কোথায়?

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিব না। কেবল যে slave mentality বা দাসমনোভাবের উল্লেখ বাগ্‌চী মহাশয়ও, গান্ধীর মত, ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম কুফলের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের মত "প্রভাতী" হইতে দিতেছি ঃ—

"এই যে রাজার প্রতি দাস্যভাব (slave mentality) বলিয়া একটা কথা আজকাল বড়ই চলিতেছে, এটা ভারতের অতি পুরাতন সুদীর্ঘ পরিচিত বন্ধু বলিয়া ঐতিহাসিক চেনেন, গোলদিঘীর বক্তারা যদিও তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।" এ প্রবন্ধে তাহারই প্রমাণ দেওয়া গেল।"

আশা করি বাগ্‌চী মহাশয় এই দাবী করিবেন না, যে তিনি কিম্বা মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসেও যদুবাবু অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ।

দ্বিজেন্দ্র-বাবু মুসলমান আমলে নবদ্বীপে স্বাধীন সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ শিক্ষা ভারতের নানাপ্রদেশে এখনও আছে।

শেষে লেখক আমাকর্ত্তৃক গান্ধীর নামের পূর্ব্বে "মহত্মা" ব্যবহার অব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি হিসাব করিয়া চলি না। "মহাত্মা" লেখা না-লেখা আগেও ছিল, এখনও আছে। গান্ধী-ভক্ত অন্ধ্রদেশীয় ইংরেজী "জন্মভূমি"র ১৯শে মে তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ৫০ লাইনের মধ্যে এগার বার তাঁহার নাম শুধু গান্ধী লেখা আছে, এই মাসের প্রবাসীতেই তাঁহার পরমভক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে শুধু গান্ধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধী নিজে নানক, চৈতন্য শিবাজী, টিলক ও রামমোহনকে কটকের প্রশ্নোত্তরে, একবারও, যথাক্রমে, বাবা নানক বা গুরু নানক, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য, ছত্রপতি শিবাজী, লোকমান্য টিলক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলেন নাই ; অথচ ইহাঁদের ভক্তেরা এইসব বিশেষণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহাত্মা গান্ধী এইসব বিশেষণ লোপ করিলে কোন দোষ হয় না, যত দোষ হয় আমি কখন কখন "মহাত্মা" বিশেষণটি লোপ করিলে। আরো চমৎকার ব্যাপার এই, যে, লেখক নিজেই স্বীকার করিতেছেন, যে, "আমি নিজে মানুষের সোজাসুজি নামের পূর্ব্বে অভিধানের বহর বাড়াবার পক্ষপাতী নই"! সুতরাং আমার উপর আক্রমণ গান্ধীভক্ত বাগ্‌চী মহাশয়ের অহিংসার পরিচায়ক বটে। তাহার পর রাজা, স্যার প্রভৃতি উপাধি ব্যবহারের কথা। লেখক দেখিবেন, আমি তাঁহার সমালোচিত বৈশাখের টিপ্পনীটিতে কোথাও রামমোহনকে রাজা বলি নাই। জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দিগকে অনেকবার শুধু অধ্যাপক, আচার্য্য, ডাক্তার বলিয়া ও লিখিয়া থাকি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শুধু দেবেন্দ্রনাথও অনেকবার বলি। লেখক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যটা প্রার্থনীয় মনে করেন। কিন্তু গান্ধী মহাশয়ও তাহা রক্ষা করেন নাই ; কারণ ২৭শে এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তিনি টিলক ও রামমোহনকে কখন লোকমান্য ও রাজা বলিয়াছেন, কখন বলেন নাই। এই অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের জন্য তাঁহার প্রতি কি শাস্তির হুকুম হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

আসল কথ হচ্ছে এই, যে, মুখে মহাত্মা বলায় ভক্তি প্রকাশ পায় না ততটা, যতটা মহাত্মার ঈপ্সিতার্থ লাভের জন্য চেষ্টায় প্রকাশ পায়। গান্ধী চান, ব্যক্তির জন্য আত্মশুদ্ধি, সমাজের জন্য অস্পৃশ্যদের পর্য্যন্ত উহাতে সম্মানের স্থান, এবং জাতির জন্য জাতীয় স্বাধীনতা। এই এই দিকে চেষ্টা প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ করে কি না ও তদ্দ্বারা কার্য্যতঃ মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কি না, তাহাই বিচার্য্য। ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধে ঈশা বলিয়াছিলেন, "যে-কেহ আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এমন নয় ; কিন্তু যে-কেহ আমার পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।" পার্থিব বিষয়েও, স্বরাজ্যপ্রচেষ্টার প্রধান নেতাকে মহাত্মা মহাত্মা বলিয়া হায়রান করিলেই স্বরাজ্যলাভ হইবে না, তাহা পাইবার জন্য বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সে-বিষয়ে, বাগ্‌চী মহাশয়ের মত,

আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করি ; সে-বিষয়ে আমাদের ভ্রম ত্রুটি ও অবহেলা বিস্তর আছে। তাহা প্রদর্শনের যোগ্য। কিন্তু ক'বার মহাত্মা বলিলাম, বা না-বলিলাম, তাহা অতি তুচ্ছ বিষয়। তাহা গণনা করা সময়ের নিতান্তই অপব্যয়।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
কার্সিয়ং। প্রবাসীর সম্পাদক।

১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ
রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব

রামমোহন রায় কাহা অপেক্ষা বড় বা কাহা অপেক্ষা ছোট ছিলেন, কত বড় বা কত ছোট ছিলেন, তাহার আলোচনা বা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি নিজের প্রদেশকে ভুলেন নাই, অথচ সমগ্র ভারতবর্ষের হিতৈষী ও হিতসাধক ছিলেন। তিনি নিজের জন্মগত হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে এবং তাহার শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, এবং বাল্যকালেই তাহার মূল ও প্রধান সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণচেতা ছিলেন না, (কোন রাজনৈতিক কারণ, প্রয়োজন, বা উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে) মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এবং তাহার শাস্ত্রসকলকেও তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, এবং মূল আরবী, গ্রীক ও হীব্রুভাষায় তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত তর্কে তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের আন্তরিক সমর্থন করিতেন। তিনি কেবল পণ্ডিতের মত পড়েন নাই, মহামনস্বী ছিলেন বলিয়া মনন ও ধ্যান দ্বারা সকল ধর্ম্মের সার সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে বলহীন করে নাই ; তিনি সকল সম্প্রদায়গত ভ্রমের উল্লেখ ও নিরসন "তুফাতুল্ মুওাহিদীন্" নামক আরবী-ফার্সী পুস্তিকায় এবং নানা বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী গ্রন্থে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকারে অন্য যে-কোন দেশের সমকক্ষ হয়, ইহা তাঁহার হৃদগত ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষ যে কালে স্বরাজ্য লাভ করিবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদিও স্বরাজ্য কথাটি ব্যবহার করেন নাই। ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতি-চেষ্টায় তিনিই আধুনিক প্রবর্ত্তক। যুদ্ধ দ্বারা ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের সম্ভাবনা না থাকায় এবং যুদ্ধ তাঁহার মনঃপূত ছিল না বলিয়া, তিনি নিরস্ত্র চেষ্টার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ভারতীয়দের, সমুদয় এশিয়াবাসীর, আত্মমর্য্যাদার লাঘব কখনও সহ্য করিতেন না। ভারতীয়েরা বিদ্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে

সুযোগ পাইলে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে পারে, তাঁহার এই মত তাঁহার গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় ; তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় লোকেরা যে উচ্চ সর্‌কারী কাজের উপযুক্ত তাহা তিনি তখনই বলিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর ভারতীয় জ্ঞানসমষ্টি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসমষ্টি অপেক্ষা কম বা অল্পমূল্য নহে, এই মতও তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়াবাসীদের সম্মান রক্ষা জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার একজন ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান্ তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে করিতে "Asiatic effeminacy" কথাটা ব্যবহার করায়, তিনি জবাব দেন, যে, এশিয়াবাসীরা জন্মতঃ বংশতঃ ইউরোপীয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন, এবং এশিয়াবাসীদের পৌরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, যীশু খৃষ্ট সাধু পৌল (St. Paul), প্রভৃতি এশিয়ার লোক ছিলেন। শুধু ইহাঁদের নাম করিবার কারণ এই, যে, তিনি খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন।

তাঁহার এইপ্রকার সদাজাগ্রত স্বাজাত্য, স্বাদেশিকতা, ও স্বমহাদেশিকতা ("Continental Patriotism") সত্ত্বেও তাঁহার অতি উদার বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন—একবার এইরূপ কারণে টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন ; স্বাধীনতালাভচেষ্টায় বিদেশী কোন জাতি বিফলপ্রযত্ন হইলে তিনি ম্রিয়মাণ হইতেন ; আইরিশদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদনা ছিল, ও তাহাদের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন ; ফ্রান্সকে স্বাধীনতার পীঠস্থান জ্ঞানে তিনি ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, বিলাতযাত্রার পথে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এক ফরাসী জাহাজের ফরাসী জাতীয় পতাকাকে সেলাম করিতে গিয়া পা পিছ্‌লাইয়া পড়ায় তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায় ; ইংরেজের অত্যাচার নিবারণ ও প্রভুত্ব নাশের জন্য তিনি চেষ্টিত থাকিলেও, উদার-মানবপ্রেম-বশতঃ ইংলণ্ডের সংস্কার-আইন পাস্ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—জাতি-দেশ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা এমনি প্রবল ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই মানবের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ বা চরম আদর্শ ছিল না। সামাজিক বিষয়েও মানুষের হিত ও স্বাধীনতা তিনি চাহিতেন ; ধর্ম্মবিষয়ে, আত্মিক বিষয়ে, মানুষের স্বাধীনতা ও কল্যাণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই উভয় লক্ষ্য সাধনে তিনি সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে সংকল্প করাতেও তিনি নিবৃত্ত হন নাই। দেশে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা লোকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে তিনি যত্নবান ছিলেন, এবং তজ্জন্য একদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও অন্যদিকে বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানাদির জ্ঞানলাভ আবশ্যক, এবং সে সময়ে (এবং এখনও) ইংরেজী (বা অন্য কোন উন্নত পাশ্চাত্য ভাষা) না শিখিলে উহা অধিগম্য ছিল না, ইহা জানিয়া তিনি যেমন স্বেচ্ছায় একদিকে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, ও ইংরেজী শিক্ষার

প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (অন্য পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষা সহজতর ছিল), তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় অতুলনীয় পরাবিদ্যা যাহাতে লুপ্ত ও বিস্মৃত না হয়, পরন্তু উহার চর্চ্চা হয়, তজ্জন্য বৈদিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশের অর্থাৎ প্রধানতঃ সাধারণ লোকদের আর্থিক উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন।

তাঁহার মহত্ত্ব কেবল ভারতবর্ষসম্বন্ধীয়ই নহে ; উহা সমুদয়পৃথিবীসংসৃষ্ট। কেন না, তিনি সমুদয় মানুষের রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক স্বাধীনতার সমর্থক ও সাধক ছিলেন ; কিন্তু মানবের কল্যাণের, ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণে আদর্শ তাঁহার প্রাণে আধুনিক কালে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হয় (পুরাকালেও আর কাহারও প্রাণে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছিল কি না, জানি না) এবং সেই আদর্শ তিনি বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা দ্বারা, মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে, মহাদেশে মহাদেশে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ; তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ বা ভিক্ষুক-দাতার মধ্যে আদান-প্রদানের মধ্যস্থতা না হইয়া, সমান-সমানের মধ্যে হইতে পারে ; তিনি অতীতে আত্যন্তিক পারত্রিকতা (other-worldliness) ও বর্তমানের ঐকান্তিক ঐহিকতার (secularism এর) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সেতু রচনা করিয়াছিলেন ; এবং তিনি স্বদেশবাসীর ও স্বজাতির (হয় ত বা সকল মানবের) আত্মা (soul) এবং ধর্ম্মবুদ্ধিকে (conscienceকে) সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম ও সংস্কারগত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি কেবল পুরুষের হীনদশায় বেদনা বোধ করিয়াছিলেন না, নারীর দুর্গতিতেও তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। নারীর দায়াধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে আর কেহ তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করেন নাই। নারীর চরিত্র ও নারীর স্বভাবকে মিথ্যা কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় বা অন্যদেশীয় কোন লেখকের লেখায় সেরূপ কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

হিমাচলের পাদদেশে দাঁড়াইয়া হিমাচলকে চেনা যায় না ; কিছুদূর হইতে, উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া, হিমালয়কে দেখিলে উহার বিরাটমূর্ত্তি উপলব্ধি হয়। বড় একখানা ছবি দেখিতে হইলেও উহা হইতে কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। বুদ্ধদেবের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহাকে পুনরাবিষ্কার করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্মান করিতে পারিয়াছে। রামমোহনকে কোনও মহাপুরুষের সহিত তুলনা না করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, তাঁহাকে চিনিতে যদি লোকের এক শত বৎসর অপেক্ষা বেশী সময় লাগে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাকে বুঝিতে সময় লাগিবে।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

রামমোহন রায় ও রাজারাম

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

১৮৩০, ১৫ই* নভেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের নিকট বিদায় লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল—পালিতপুত্র বালক রাজারাম, পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, এবং ভৃত্য রামহরি দাস, —রামমোহনের সকল জীবন-চরিতেই এ কথা আছে।

রাজারামের জন্মকথা কিছু রহস্যাবৃত। নানা জনের নানা অভিমত। কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা বলা কঠিন। সরকারী কাগজপত্র হইতে তাহার জীবন-কথা কতটুকু সংগ্রহ করিতে পারা যায়, দেখা যাক।

১৯২৬ সালে রামমোহন-সংক্রান্ত একখানি একখানি পুস্তক লিখিবার সময় আমাকে ভারত-সরকারের দপ্তরখানা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। দপ্তরখানার কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহন রায়ের ও তাঁহার সঙ্গীদের জাহাজে যাত্রী হইবার দুইখানি অনুমতি-পত্র ছিল। রামমোহনের অনুমতি-পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

"রামমোহন রায় নামক জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে ইংলণ্ড যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন করায় তাঁহাকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র এই মাসের [অক্টোবর ১৮৩০] ৭ই তারিখে মঞ্জুর করা হইয়াছে।"**

রামমোহনের সঙ্গীদের অনুমতি-পত্রের তারিখ ১৫ই নভেম্বর ১৮৩০, অর্থাৎ জাহাজ ছাড়িবার দিন। পত্রখানি এইরূপ :—

"১৫ই নভেম্বর তারিখে রামরতন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হইল। ইঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গীরূপে 'অ্যালবিয়ন' পোতে ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন।"†

শেষের অনুমতি-পত্রখানি হইতে আমরা রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রার সঙ্গী—রামরতন, মুখোপাধ্যায়, **হরিচরণ দাস** ও **শেখ বক্‌সুর** নাম পাইতেছি। কিন্তু রামমোহনের সমস্ত জীবন-চরিতেই তাঁহার সঙ্গীদের নাম দেওয়া আছে—রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, **রামহরি দাস** ও **রাজারাম**। এমন কি বিলাতে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও শেষোক্ত তিনটি নামই পাওয়া যায়।* তাহা হইলে রামহরি দাস ও রাজারাম নামের পরিবর্ত্তে আমরা সরকারী অনুমতি-পত্রে পাইতেছি হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুর নাম। এই গরমিলের কারণ কি?

বিনা অনুমতি-পত্রে জাহাজে বিদেশ যাইবার উপায় নাই। সরকারী অনুমতি-পত্রে উপর্য্যুপরি দুই-দুইটি নামের ভুল থাকা সম্ভব নয়। তবে রামমোহন কি হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুর নামে অনুমতি-পত্র লইয়া রামহরি দাস ও রাজারামকে বিলাত লইয়া গিয়াছিলেন? এরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইবার কারণ অথবা সম্ভাবনাই বা কি? বিলাত যাইবার সময়, দিল্লীশ্বরের ব্যাপার লইয়া

* *India Gazette* : 15 Nov. 1830 : Shipping Intelligences : Departure of Passengers : Per Ship *Albion* :—Baboo Rammohun Roy and servants. 19th November 1830 : Station of Vessels in the river. Diamond Harbour : *Albion* passed down.

** *Public Body Sheet,* 12th October 1830, No. 95.

† "Orders for reception granted to Ramrutton Mookherjee. Hurichurn Doss and Sheik Buxoo—15th November proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the *Albion*."—*Public Body Sheet,* 16 November, 1830.

* Mary Carpenter's *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy,* (2nd ed.), p. 131.

রামমোহনের সহিত বাংলা-সরকারের পত্রের যে আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা পাঠে ধারণা হয়, সরকারের নিকট হইতে বিলাত যাইবার অনুমতি-পত্র মিলিবে কি না, এ বিষয়ে রামমোহনের মনে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।† এ অবস্থায় তিনি সরকারের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য অপরের নামে অনুমতি-পত্র লইয়া নিজে বিলাত সঙ্গী-তিনজনের মধ্যে দুইজনকে মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া, বিলাত লইয়া যাইবেন কেন? ধরা পড়িলে সাজা যাহাই হউক, তাঁহার বহুদিনপুষ্ট বিলাত-যাত্রার অভিলাষ যে ব্যর্থ হইত, তাহা ঠিক। এরূপ প্রতারণা ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিবার পাত্র রামমোহন ছিলেন না।

তবে হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুই কি রামহরি দাস ও রাজারামের নামান্তর? কিন্তু তাঁহাদের নামের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া?

যদি কেহ বলেন,—শেখ বক্‌সু ও রাজারাম একই লোক নয় ; এদেশ হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন কারণে শেখ বক্‌সুর যাওয়া হয় নাই, তাহার জায়গায় রামমোহন রাজারামকে লইয়া গিয়াছিলেন,—তাহা হইলে এরূপ যুক্তি বা অনুমান মানিয়া লইবার পক্ষে বাধা আছে। যেদিন জাহাজ ছাড়ে ঠিক সেইদিনই রামমোহনের সঙ্গীদের —রামরতন, হরিচরণ ও শেখ বক্‌সুকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় ; পুনরায় সেইদিনই আবার শেখ বক্‌সুর নাম বাতিল করিয়া রাজারামের যাত্রী হইবার কথা মানিয়া লওয়া কতটা সঙ্গত হইবে জানি না। এমন কি মানিয়া লইলেও আর-একটি গোল উঠিতেছে। বিলাত-যাত্রার জন্য শেখ বক্‌সুর নামে অনুমতি-পত্র লওয়া হইয়াছিল ; তাহার বদলে রাজারাম গিয়া থাকিলে, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, সরকারী দপ্তরখানায় তাহারও কোন-না-কোন প্রমাণ থাকিত। কিন্তু সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বালক রাজারাম যে অপর কাহারও সহিত রামমোহনের পূর্ব্বে বিলাত গিয়া থাকিবে—একথাও মানা চলে না। রামমোহনের কোন জীবন-চরিতে বা সরকারী কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ নাই।

† লেখকের রচিত *'Rammohun Roy's Mission to England,* (1926), pp. 20-21.

সুখের বিষয়, আমাদের সন্দেহ নিরাকরণের কিছু সূত্র আছে। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকায় আছে ঃ—

"রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন।"

সরকারী অনুমতি-পত্রের "হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুর"—"রামহরি দাস ও রাজারাম" নামে পরিণত হইবার ইহা একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে। রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে 'রাম' থাকায় কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। নিজ নাম 'রাম'-এর উপর রামমোহনের —হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে—বিলক্ষণ মোহ ছিল। অনেক সময় বাদ-প্রতিবাদেও (যেমন ডাঃ টাইটলারের সহিত) তিনি 'রামদাস' নাম ব্যবহার করিতেন। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর বহুস্থলে তিনি 'রাম' নাম ব্যবহার করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন।* রামমোহনের সহিত তিনজন 'রাম'-নামযুক্ত লোকের যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং নিজ নামের যোগে তিনি যে তাঁহার সহযাত্রীদের নামকরণ করেন, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব শেখ বক্‌সু ও রাজারাম একই লোক ; রাজারাম শেখ বক্‌সুর নামান্তর মাত্র। এমনও হইতে পারে যে, বিলাত যাইবার পূর্ব্বে শেখ বক্‌সুর ডাকনাম ছিল রাজারাম, বাংলা-সরকরের নিকট তাহার প্রকৃত নামেই অনুমতি-পত্র চাওয়া হইয়াছিল।

১৮৩১, ৮ই এপ্রিল সহযাত্রীদের সহিত রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছেন। তখন বাষ্পীয় পোত সৃষ্টি হয় নাই জাহাজ পালের জোরে চলিত—কাজেই এখনকার মত ১৫-২০ দিনে বিলাত-পৌঁছান সম্ভব ছিল না। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে রাজারামকে যথারীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন,—

* ১ম প্রকরণ।..."ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন।" ২য় অধ্যায়, ১ প্রকরণ।... "রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি।"—পৃঃ ৭১৩, ৭১৯।

একথা মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকে আছে। তিনি রাজারামকে পুত্রবৎ দেখিতেন। অনেক গ্রন্থে তাহাকে রামমোহনের পালিতপুত্র বলা হইয়াছে।

রামমোহন আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। ১৮৩৩, ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলের নিকট 'ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভে' তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রভুর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রামরত্ন ও রামহরি দেশে ফিরিয়াছিলেন।† রাজারাম তাঁহাদের সঙ্গে ফেরেন নাই। তিনি লণ্ডনে আসিয়া বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতাদের আশ্রয় লইলেন। রামমোহনেরও প্রবাস-জীবনের অনেক দিন এই হেয়ার পরিবারের প্রাসাদতুল্য ভবনে কাটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে, খুব সম্ভব সদাশয় হেয়ার-পরিবারের চেষ্টা-যত্নে, রাজারাম বোর্ড-অফ কণ্ট্রোলের আপিসে একটা চাকরি পান। বোর্ডের সভাপতি—স্যর জন্ হব হাউসের ১৮৩৫, ৪ আগষ্ট তারিখের মিনিটে প্রকাশ,—"বোর্ডের সভাপতি পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের হইয়া একখানি আবেদন-পত্র পাইয়াছেন।" স্বদেশে ফিরিবার পূর্ব্বে বিলাতে সরকারী কার্য্য পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে রাজারামকে জ্ঞানলাভের সুযোগ দিবার জন্য আবেদন-পত্রে অনুরোধ ছিল। ১৮৩৫ আগষ্ট মাসে, বাৎসরিক এক শত পাউণ্ড বেতনে, প্রথমে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত কেরানী হিসাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বাংলা দেশের জন্য কোন 'রাইটার'-এর (Writer অর্থাৎ সিভিলিয়ানের) পদ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। বোর্ডের আপিসে প্রায় তিন বৎসর কাজ করিবার পর রাজারাম ভারতবর্ষে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে তৃতীয় বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা হইল ; ইহা ছাড়া যেরূপ পরিশ্রম-সহকারে তিনি কাজ করিয়াছেন এবং যে অবস্থায় বিলাতে আসেন, —তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এক শত পাউণ্ড দান করা হইল। * ১৮৩৮ এপ্রিলের শেষভাগে রাজারাম বিলাত ত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি স্বদেশে আসিয়া পৌঁছেন। † রাজারাম সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। শোনা যায়, এদেশে ফিরিয়া তিনি না-কি কাষ্টম্‌স্ কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত, রামমোহন সম্বন্ধীয় পুস্তকের পরিশিষ্টে মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন,—"রাজারাম ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছেন।"

২

এইবার রাজারাম সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি আলোচনা করা যাক।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ কার্পেণ্টার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।†† এই পুস্তিকায় রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলিয়া উল্লেখ করায় ১৮৩৫ সালে এদেশ হইতে রামমোহনের কোন [সাহেব ?] বন্ধু ডাঃ

† রামহরি দাস সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"রাজার এই বাগান, তাঁহার মালী রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল। রামদাস রাজাকে বড় ভালবাসিত। রামদাস রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও কিছুদিন চাকুরি করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রামদাস বর্দ্ধমানের মহারাজার গোলাপবাগের প্রধান মালী (Head Gardener) ছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতনের আমার বাগান রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল।" (*The Queen. 28 Sep. 1896* হইতে অনূদিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামমোহন্ রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৭৩৪।

* রাজারামের বিলাত-প্রবাসের ইতিহাস আমি গত অক্টোবর মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি।

† *India Gazette,* dated 13 August 1838—Supplement. Shipping Intelligence. Arrivals at Kedgeree. 11 August—English ship *Java* [Captain R. Jubling, from London, 27 April. Arrivals of Passengers—Per *Java* :—Rajah Ram Roy, son of the late Rajah Rammohun Roy.

†† Lant Carpenter's *A Review of the Labours, Opinions and Character of Rajah Rammohun Roy,* (London & Bristol 1833).

কার্পেণ্টারকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে রাজারামের ইতিহাস এইরূপ দেওয়া আছে :—

"আপনার পুস্তকে কোনো ভুল থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। একটি ভুলের প্রতি রামমোহনের ভারতীয় বন্ধুরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—রামমোহনের চরিত্রের সুনামের দিক্ দিয়া তাহার সংশোধন আবশ্যক। রামমোহনের সহিত যে বালক 'রাজা' বিলাত গমন করে, সে তাঁহার পুত্র নহে,—এমন কি হিন্দুবিধি-মতে পোষ্যপুত্রও নয়। সে এক অনাথ বালক—অবস্থাচক্রে পড়িয়া রামমোহন তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে বিশেষ ঘটনায় পড়িয়া রাজারাম তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছিল, সে কথা রামমোহন আমাকে বলিয়াছিলেন—তাহা এখনও আমার বেশ স্মরণ আছে। এ বিষয়ে অন্যান্য লোকের মুখেও যাহা শুনিয়াছি, তাহার সহিত আমার স্মৃতিগত মিল আছে। হরিদ্বারের এক বার্ষিক মেলায় যখন দুই-তিন লক্ষ লোক সমাগম হয়, সেই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান ডিক (Dick) সাহেব এই শিশুটিকে অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়াইয়া পান। ইহার মাতাপিতা হিন্দু কি মুসলমান,—তাহারা শিশুকে হারাইয়া ফেলে, কি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া যায়,—এসব কথা কিছুই জানা যায় নাই। ডিক সাহেবই বালকটির প্রতিপালনের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাহার কি ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়ে রামমোহনের সহিত পরামর্শ করেন। বেশ স্মরণ আছে, আমার পরলোকগত বন্ধু রামমোহন বলিয়াছিলেন, "যখন দেখিলাম একজন ইংরেজ—একজন খৃষ্টিয়ান—এক দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তখন এদেশের লোক হইয়া কেমন করিয়া আমি বালককে আশ্রয় দিতে—তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে ইতস্ততঃ করি?" ডিক সাহেব আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই—বিলাতের পথেই বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হয়। বালকটি রামমোহনের কাছেই রহিয়া গেল। সে তাঁহার এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে—সময়ে সময়ে তাঁহাকে এ কথাও বলিয়াছি—অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাহার অনিষ্ট করিয়াছেন।"*

রামমোহনের জীবনচরিত-লেখকদের অনেকেই এই কাহিনীটিকে রাজারামের প্রকৃত পরিচয়-বোধে গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

রামমোহনের প্রধান শিষ্য, চন্দ্রশেখর দেব কিন্তু রাজারামের অন্যরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার বন্ধু রাখালদাস হালদারকে বলেন (১৮৬৩),—"জনরব, এক সময় রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িনী ছিল; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাঁহারই গর্ভজাত। আমি কিন্তু রামমোহনের মুখে শুনিয়াছি—অনাথ বালক রাজারাম এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র—রামমোহন তাহাকে প্রতিপালন করেন।"**

রাজারাম সম্বন্ধে উপরের গল্প-দুইটির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নাই—অথচ বলা হইতেছে, দুইটিই রামমোহন রায়ের মুখে শোনা! তবে এ পার্থক্য কেন? ডাঃ কার্পেণ্টার তাঁহার রচনায় রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলায়, † "পাছে রামমোহনের নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয়" এইজন্য এদেশ হইতে

* Mary Carpenter's *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy,* (2nd ed.), p. 173.

** 'Chunder Sekhar Deb—the disciple who, it will be rememberd, suggested the formation of the Brahmo Samaj–stated in conversation with a friend, R. D. H., at Burdwan, so late as January, 1863, that 'rumour had it that at one time he [Rammohun] had a mistress ; and people believed that Rajaram was his natural son, though he himself said Rajaram was the orphan of a Durwan of some. Saheb, and Rammohun Roy brought him up.'—Miss Collet's *Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* (2nd ed.), p. 169.

† "On the 8th of April, 1831, the Raja arrived at Liverpool, accompanied by his *youngest son, Raja Ram Roy,* and two native servants, one of them a Brahmin."—Mary Carpenter's *The Last Days of the Rajah Rammohun Roy,* (2nd ed.), p. 68.

রামমোহনের কোন অজ্ঞাতনামা বন্ধু রাজারামের প্রকৃত পরিচয়রূপে প্রথম গল্পটির উল্লেখ করেন। এই বন্ধুটি কে, তিনি দেশী কি বিদেশী, এবং তাঁহার কথার মূল্যই বা কতটা, আজ তাহা জানিবার বা যাচাই করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার লেখায় এমন-সব কথা আছে যাহা গল্পটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিতে পারে। তিনি ত রামমোহনের দোহাই দিয়া স্পষ্ট বলিতেছেন, এই অনাথ বালকের "মাতাপিতা জাতিতে হিন্দু কি মুসলমান তাহা অজ্ঞাত।" কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, যদি বালক রাজারামের জাতিই অজ্ঞাত ছিল, তবে কেমন করিয়া রামমোহন তাহার নাম দিলেন—শেখ বক্সু? শেখ বক্সু ত আর হিন্দু নাম হইতে পারে না! সুতরাং এই গল্পটির মূলে কতটা সত্য আছে, তাহা ভাবিবার কথা।

গল্পটি যে অসার তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। সত্যসত্যই ডিক বলিয়া কোন সিভিলিয়ান রাজারামকে হরিদ্বারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন কি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজারাম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"রাজার পালিতপুত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক প্রকার দুষ্টমি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাস্তবিক আমি এ পর্য্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। এক দিবস মধ্যাহ্নে আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম। রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'একটা তামাসা দেখিবে তো এস।' আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। রাজা জাগ্রৎ হইলেন, এবং 'রাজারাম' 'রাজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।"*

* মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৭৩০-৩১।

ইহা পাঠ করিলেই মনে হয়, মহর্ষি ও রাজারাম প্রায় সমবয়স্ক—বড়জোর দুই-চার বৎসরের ছোট-বড় হইতে পারেন। মহর্ষি যে-সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তখন (তিনি নিজেই বলিয়াছেন) তাঁহার বয়স ৮ কি ৯। মহর্ষির জন্ম ১৮১৭ সালে, তাহা হইলে আনুমানিক ১৮২৫-২৬ সালের কথা হইতেছে। এ সময় রাজারামেরও বয়স যে ৮-৯ বৎসরের বেশী ছিল না, মনে করিবার একটি কারণ আছে। ১৮৩১, ১৩ই জুন তারিখে, *Monthly Repository*র সম্পাদক রেভারেণ্ড ফক্সকে লিখিত একখানি পত্রে রামমোহন রাজারামকে, 'my little youngster' বলিতেছেন।† ১৮৩৩ সালে মিস ক্যাসেলকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি রাজারামকে 'my youngster' বলিয়াছেন, এবং 'দুষ্টামি করিলে তাহাকে সংশোধন করিয়া দিবার' অনুরোধও পত্রে আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, ১৮৩৩ সালে রাজারামের বয়স ১৬-১৭ বৎসরের বেশী ছিল না। বোধ হয়, এই-সব কারণেই মিস কোলেট প্রভৃতি রামমোহনের জীবনচরিতে, ১৮৩০ নভেম্বর মাসে বিলাতযাত্রাকালে রাজারামের বয়স "আন্দাজ ১২ বৎসর" বলিয়াছেন।*

হরিদ্বারের গল্পে পাই, ডিক নামে কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান হরিদ্বারের এক বার্ষিক মেলায় বালকটিকে [রাজারামকে] অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়াইয়া পান। তিনিই বালকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে...তিনি রামমোহন রায়ের উপর বালকের ভরণপোষণের ভার দেন। ডিক সাহেব আর

† "I shall endeavour to bring my little youngster with me, agreeably to your kind request."—Rammohun Roy to Rev. W. J. Fox dated 13 June 1831 (Miss Collet, 2nd ed, p. 187).

* Miss Collet (2nd. ed.), p. 169; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত," (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪৩৭।

ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই ; ইংলণ্ডের পথেই জাহাজে বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হয়।"†

রাজারামের বয়স যাহাই হউক, ধরা যাক, তাহাকে ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ সালের মধ্যে কোন সময়ে রামমোহনের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা দরকার, এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে 'ডিক' নামধারী কোম্পানীর কোন সিভিলিয়ান এদেশ হইতে বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন কি না।

১৮৩৯ সালে বিলাত হইতে প্রকাশিত *Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, from 1780 to 1838* একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই প্রামাণিক গ্রন্থে সেই সময়ের সকল সিভিলিয়ানের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে 'ডিক' নামধারী নয়জন সিভিলিয়ানের কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে সাতজন ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পরেও এদেশে চাকরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের কেহই গল্পোল্লিখিত ডিক হইতে পারেন না। অষ্টম ডিক—সার রবার্ট কীথ ডিক্, ব্যারনেট—১৮১৩, ১৬ই ডিসেম্বর "এদেশে কোম্পানীর কর্ম্মে ইস্তফা দেন।" অতএব ইনিও হরিদ্বারের গল্পের ডিক হইতে পারেন না। তাহা হইলে বাকী রহিলেন, নবম ডিক—John Dick. তাঁহার কর্ম্মজীবনের তালিকা এইরূপ—

নিয়োগ ঃ—

১৮১৮, ১১ই আগষ্ট...ত্রিহুতের ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারী ১৮২১, ৬ই জুলাই...বীরভূমের " " ১৮২২, ১০ই এপ্রিল...শান্তিপুরের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ১৮২৩—হরিপালের অস্থায়ী " " মৃত্যু—কলিকাতায় ১৮২৫, ২০ এ জুলাই।"

† "Mr. Dick, a civil servant of the Company...had him clothed and fed and when he was under the necessity of leaving the country for the recovery of his health, he consulted with Rammohun Roy how the child should be disposed of...Mr. Dick never returned to India, having died I believe, on the passage to England, and the child remained with Rammohun Roy."—Mary Carpenter, 2nd. ed., p. 173.

কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই জন্ ডিকের কর্ম্মস্থল কোনদিনই হরিদ্বার বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থলে ছিল না। যদিই ধরিয়া লওয়া যায়, কোনো সময়ে তিনি ছুটিতে হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, তাহা হইলেও প্রমাণ হয় না যে, তিনিই সেই ডিক যিনি "রামমোহনের হাতে রাজারামকে সঁপিয়া দিয়া বিলাতযাত্রা করেন।" কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উপরের জন্ ডিক ১৮২৫, ২০এ জুলাই কলিকাতায় মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইঁহার কর্ম্মস্থল ছিল—কলিকাতাব সন্নিকটস্থ হরিপালে। সরকারী দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্যহানি হেতু সরকারের নিকট বিলাতযাত্রার ছুটি বা জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্রের জন্য আবেদন করেন নাই। এই-সমস্ত কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক, রামমোহনের অজ্ঞাতনামা বন্ধু ডাঃ কার্পেণ্টারকে লিখিত পত্রে রাজারামের পরিচয়-প্রসঙ্গে যে ডিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেরূপ কোন ডিকের অস্তিত্ব তখন ভারতে ছিল না। তবে কি সেই সময় ভারতে 'ডিক' নামধারী অনেকগুলি সিভিলিয়ান থাকায়, হরিদ্বারের গল্পটিতে 'ডিক' নাম যোগ করিয়া, পাঠকের মনে প্রথম দৃষ্টিতেই ইহার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল? জনপ্রবাদ, রাজারাম (শেখ বক্সু) বিলাত হইতে ফিরিয়া রামমোহনের বিষয়ের উপর দাবি করেন। শেষে কিছু টাকা দিয়া না-কি তাঁহাকে বিদায় করা হয়। ইহার মূলে কিছু সত্য থাকা সম্ভব, কারণ হরিদ্বারের গল্পটি পড়িলেই মনে হয়, রাজারাম রামমোহনের নিজ পুত্র নামে প্রচারিত হইলে পাছে কোনদিন সে বিলাত হইতে ফিরিয়া বিষয়-সম্পত্তি দাবি-দাওয়া করে, এরূপ একটা আশঙ্কাবশেই যেন তাহাকে রামমোহনের 'পালিত-পুত্র' বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা এই গল্পটির মধ্যে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্পটিতে রাজারামকে এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র বলা হইতেছে। দরওয়ান বলিতে সচরাচর হিন্দুই বোঝায়। দেখা যাইতেছে, দুইটি গল্প পরস্পর-বিরোধী। কোনটিকেই আমরা তথ্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দুইটি গল্পই যদি রামমোহনের মুখে শোনা হয়, তবে কি রামমোহন ইচ্ছা করিয়া

রাজারামের পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য, তাহাকে পালিতপুত্ররূপে প্রচার করিয়া, নানা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? একথা অবশ্য বলা যায় না ; স্মরণ রাখিতে হইবে, উপরের দুইটি গল্পই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রচারিত।

৩

রাজারামের পরিচয়ে যে একটা রহস্য রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই মনে হইতেছে।

রাজারাম, ওরফে শেখ বক্‌সু, যে রামমোহনের পুত্র ছিলেন—পালিতপুত্র নহে —নানা কারণে তাহাই আমার মনে হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রাজারামকে 'পুত্র' বলিয়াই পরিচয় দিতেন,—অবশ্য পালিতপুত্রকে 'পুত্র' বলিলেও কোন ভুল হয় না। মিস্ কিডেল, ডাঃ কার্পেণ্টারের কন্যা মেরী কার্পেণ্টার, রেভারেণ্ড ফক্স্ প্রভৃতিকে লিখিত পত্রে রামমোহন 'my son' 'my little youngster' বলিয়াই রাজারামের উল্লেখ করিয়াছেন।* ডাঃ কার্পেণ্টার রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যেই রামমোহন প্রবাসের অনেকদিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কোনদিনই রামমোহন তাঁহার নিকট 'পালিতপুত্র' বলিয়া রাজারামের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া কোন মুদ্রিত প্রমাণ নাই। ডাঃ কার্পেণ্টার রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলিয়াই জানিতেন, মুদ্রিত সমুদয় প্রমাণ হইতে এইরূপ মনে হয়। তবে ভারতবর্ষে রামমোহনের অনেক সাহেব বন্ধু রাজারামকে রাজার পালিতপুত্ররূপে জানিতেন। রাজারামের চাকরির জন্য বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোলে যে দরখাস্ত গিয়াছিল, তাহাকেও "রামমোহনের পুত্র" বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।* রাজারামের প্রতি রামমোহনের স্নেহের আতিশয্য, সযত্নে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান, এবং স্বদেশে হিন্দু আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী পরিজনবর্গের মধ্যে না রাখিয়া, কিশোর বালককে সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া যাওয়া—এ সমস্তই ইঙ্গিত করে যে, মুসলমান শেখ বক্‌সু (রাজারাম) রামমোহন রায়ের পুত্র। রামমোহন পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ; কাজেই আত্মীয়স্বজনরা তাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন। শোনা যায়, দুই স্ত্রীর সহিতও তাঁহার বনিবনাও ছিল না।** এই কারণেই বোধ হয় তিনি শেখ বক্‌সুকে এদেশে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই।

* "I had yesterday the pleasure of receiving your letter of the 6th, and rejoice to learn that you find my son peaceable and well behaved. I however entreat you will not stand on ceremony with him. Be pleased to correct him whenever he deserves correction. My observation on, and confidence in, your excellent mode of educating young persons, have fully encouraged me to leave my youngster under your sole guidance. I at the same time cannot help feeling uneasy now and then, at the chance of his proving disrespectful or troublesome to you or to Miss Castle. Dr. Carpenter (I think) left London on Saturday last. I doubt not you will take my youngster every Sunday, to hear that pious and true minister of the Gospel."—Rammohun to Miss Kiddell, dated 9 July 1833. (Mary Carpenter, 1st. ed., pp. 118-19, facsimile of autograph letter to Miss Carpenter to face p. 114 ; 2nd. ed., pp. 107, also 109, etc.

* "The President of the Board of Commissioners for the Affairs of India has received an application on behalf of the son of the late Rajah Rammohun Roy, who died in this country."—*Minutes of the Board of Control Vol. 6*, p. 460. (India Office Records).

** "Rammohun lived apart from his wives simply because they were Hindus, and he was considered an outcast by them. His wives did not like to live with him."—Nagendranath Chatterji to Miss Collet, dated 2 January, 1883.

"Rammohun has left in India a wife, from whom he has been separated (on what account we know not) for some years.'—"Rammohun Roy"—*Asiatic Journal*, Nov. 1833, p. 208.

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত কিংবদন্তীরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সত্য বটে, জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী স্বয়ং প্রমাণ নহে ; কিন্তু অন্য প্রমাণ বা অনুমানের সমর্থকরূপে তাহা গ্রহণ করা চলে।

রামমোহনের প্রিয় শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবই রাখালদাস হালদারের নিকট প্রকাশ করেন,—"জনরব, একসময়ে রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িনী ছিল ; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাঁহার গর্ভজাত।" সাধারণে যখন এই জনরব সত্য বলিয়া মনে করিত, তখন এক কথায় ইহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না ; বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের চরিতকার ও বিশেষ ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও লিখিতেছেন,—"রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি দুর্নাম আছে।† রাজারাম সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সন্দেহ ছিল। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—"বালক রাজারামের সঙ্গে রামমোহনের কি সম্বন্ধ ছিল? পোষ্যপুত্র? তবে কি মিশনরিসুলভ বিদ্বেষবশতঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেন?"‡

চন্দ্রশেখর দেবের উল্লিখিত জনরবে প্রকাশ, "রাজারাম—রামোহনের এক প্রণয়িনীর গর্ভজাত।" রামমোহনের এই প্রণয়িণী মুসলমান ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। আগেই প্রমাণিত হইয়াছে, রাজারামের আসল নাম—শেখ বক্‌সু ; এই নামই জাহাজে যাত্রী হইবার সরকারী অনুমতি-পত্রে পাওয়া গিয়াছে। শেখ বক্‌সু—মুসলমানের নাম, তাহার মাতাও যে মুসলমান ছিলেন, এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"অনেক লোকের সংস্কার ছিল রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"* এখানেও রাজারামকে মুসলমান বলিয়া অনেকের বিশ্বাসের উল্লেখ করা হইতেছে, এবং 'মুসলমানের সন্তান' বলিতে 'মুসলমান-নারীর গর্ভজাত'—এরূপ বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চন্দ্রশেখর দেব ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে-দুইটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে সত্য একথা তাঁহারা স্পষ্ট না বলিলেও, তাহার মধ্যে মিল রহিয়াছে, এবং ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে— রাজারাম মুসলমান এবং তাহার মাতাই রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী। কিংবদন্তী—আজ পর্য্যন্ত রংপুরে রামমোহনের এই মুসলমান-প্রণয়িনীর বংশ রহিয়াছে ; রামমোহন ইঁহার গর্ভজাত এক কন্যারও না কি তথায় বিবাহ দিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরা অনেকে—এমন কি চাষাভূষারাও একথা বলিয়া থাকে। আরও শোনা যায়, রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গী রামহরি দাস বলিতেন, রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলে তাঁহার প্রণয়িনীও এখানে আসেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রে গোপনে আসিয়া রামমোহনের সংবাদ লইয়া যাইতেন। জনপ্রবাদ, রাজারাম এদেশে আসিয়া মুসলমানদের দলে মিশিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের দুইটি নাম ছিল—গোলাম নবী ও নন্দকুমার ; যেমন শেখ বক্‌সুর হিন্দু নাম ছিল—রাজারাম। রাজারাম যে মুসলমান ছিলেন—এ প্রবাদ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জানা ছিল। তাঁহার এক চরিত-কথায় প্রকাশ ঃ—"রাজা রামমোহনের প্রসঙ্গে রাজারামের কথা উঠিল। তিনি [স্যর গুরুদাস] বলিলেন, রাজারামের বাড়ী তাঁহার বাড়ীর কাছেই ছিল। রাজারাম মোসলমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নাই। রমাপ্রসাদ রায়কে 'ঠাকুর-পো' বলিতেন, এইরূপ তিনি বাল্যে শুনিয়াছিলেন।"*

† "মাহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪৩৫

‡ "মানসী ও মর্ম্মবাণী", আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃঃ ৬; ৫১০-১১

* "মাহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪৩৬

* স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। পৃঃ ৩৬

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, গোঁড়া হিন্দু-সমাজ ত রামমোহনের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন — রামমোহনের কোনো মুসলমান প্রণয়িনী থাকিলে সেকথা কি তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিত? আর জানা থাকিলে কি তাঁহারা নীরব থাকিতেন?

কলিকাতার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন † 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম লইয়া রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন। তৃতীয় প্রশ্নে ছিল,—"ব্রাহ্মণসজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আত্মোদরভরণ অনুচিত কি না?" চতুর্থ প্রশ্নে ছিল,—"লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কি না?" ১৮২২ সালে রামমোহন প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। "তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত, এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসক" হরিহরানন্দ স্বামীর শিষ্য রামমোহন তন্ত্র-শাস্ত্রের সাহায্যে ছাগবধ, সুরাপান ও যবনী-গমন সমর্থন করিয়াছেন। তর্কপঞ্চাননের আক্রমণ রামমোহনকেই উপলক্ষ্য করিয়া। যাঁহারা রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীতে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে একমত হইবেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একথা স্বীকার করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল।" রামমোহনের জীবনচরিতেও প্রকাশ, ছাগমাংস-ভক্ষণ ও সুরাপান রামমোহনের অভ্যস্ত ছিল। যবনী-গমনের অপবাদও যে তাঁহার ছিল, তাহাও তাঁহার প্রত্যুত্তর হইতে পরিস্ফুট হইবে।

রামমোহনের মতে, "ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তান্ত্রিকদিগের পক্ষে শৈব-বিবাহে দোষ নাই। শৈব-বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সপিণ্ডা না হয়, আর সভর্ত্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র-প্রমাণে হয়।" কেবল তান্ত্রিক সাধকদিগের জন্য মাংস, মদ্য ও শৈববিবাহ বিহিত, কিন্তু স্মার্ত্ত মতে, এ সকল একেবারে নিষিদ্ধ।*

রামমোহনের রচনার এই অংশটি হইতে কথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে ঃ—

"যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক, এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম ; কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী, জন্ম হইবামাত্রই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয়... শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক।"†

"চারি প্রশ্নের উত্তর" প্রকাশিত হইলে, রামমোহনের ঘোর বিপক্ষ—নন্দলাল ঠাকুর-এর ইচ্ছায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামে ২৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে রামমোহনের উপর অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হয়।

† ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন।

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত", ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২৫-২৬

† "চারি প্রশ্নের উত্তর", পৃঃ ২৪০

'নগরান্তবাসী' কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ—নগরের অন্তে যিনি বাস করেন, অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন ; অপর অর্থ—চণ্ডাল।

'পাষণ্ডপীড়ন'-এর প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' পুস্তক লিখিলেন (১৮২৩)। ইহাতে তিনি লিখিতেছেন,—

"১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে, 'সুশীল সুজনদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই সম্ভব।' উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে দুর্জ্জন পদপ্রয়োগ তাঁহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা, অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।"*

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, সুরাপান ও ছাগমাংস-ভোজনের ন্যায়, যবনী-গমনের দুর্নামও তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু-সমাজ রামমোহনের উপর আরোপ করিতেন। কাজ তিনটি যে দোষাবহ নহে, তাহা তন্ত্র-সাধক রামমোহন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্ত্র-সাধকের পক্ষে যবনী-গমন তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না, এবং তাঁহার মুসলমান প্রণয়িনী থাকা সত্য হইলে তিনি তাঁহাকে সম্ভবতঃ শৈব-মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মুসলমান-নারীই যে রাজারামের—ওরফে শেখ বক্‌সুর—মাতা, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ-বলে তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক.

রাজারাম-সম্পর্কে যাহা লেখা হইল, তাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় না। রামমোহন মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর** স্বামী হইয়া যদি তিনি শৈব-মতে এক মুসলমানীকে গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই ; বিশেষতঃ সে-যুগে কোন প্রকার ধর্ম্মমত অনুসারে বিবাহ না করিয়াও মুসলমান বা অন্য নারীর সংসর্গ করায় কিছু নূতনত্ব ছিল না। সুতরাং এ-যুগের আদর্শের মানদণ্ডে সে-যুগের রীতিনীতি ও আদর্শের বিচার সমীচীন নহে।

* "পথ্যপ্রদান"—চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৩৩১

** রামমোহনের তিন বিবাহ সম্বন্ধে মিস্ কোলেটের গ্রন্থে আছে,—

"While yet a mere child, his father married him three times. The first bride died 'at a very early age' (not specified) and after her death, as we learn from William Adams's letters, 'his father, when he was only about nine years of age, married him within an interval of less than a twelve month to two different wives." His Second wife, who died in 1824, was the mother of all of Rammohun's children. The third wife survived him. (Miss Collet, 2nd ed., p. 6)

আলোচনা *

১৩৩৬ চৈত্র

"রামমোহন রায় ও রাজারাম"

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' আমার "রামমোহন রায় ও রাজারাম" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পর এ বিষয়ে অনেকগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে। আলোচনা, আন্দোলন সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। সকলেরই সত্যানুসন্ধিৎসু হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও লেখায় বিশেষ কোনো নূতন তথ্য বা নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল না। পূর্ব্বে যে-সকল যুক্তি ও প্রমাণ দিয়াছি তাহার আর পুনরুল্লেখ না করিয়া আলোচনাগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিবেদন করিব। পাঠকগণ এইগুলি পড়িবার সময় আমার মূল প্রবন্ধটির যুক্তিতর্ক স্মরণ রাখিলে অনুগৃহীত হইব।

ডিক, না ডিগবী?

পৌষের "প্রবাসীতে" ৩৬ বৎসরের পুরাতন 'ভারতী' হইতে শ্রীযুত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের "বিদেশে রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক" নামে একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে রাজারাম সম্বন্ধে মাত্র এই কয়েকটি কথা আছে,—

"মিসেস এডামের মুখে শুনিলাম কি অবস্থায় রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার 'রাজারাম রায়' নামকরণ করেন। মিষ্টার ডিগবী নামক একজন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন। একদিন রাজা ডিগবীর সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া আকুল। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া দুই-একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া সস্নেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।"

(প্রবাসী, পৌষ, পৃ. ৪১৩)

রামমোহনের প্রচলিত সমস্ত জীবন-চরিতে রাজারাম সম্বন্ধে এই ধরণের যে-দুইটি গল্প আছে, তাহা কতদূর অবিশ্বাস্য আমি আমার মূল প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। মোহিনীবাবুর প্রবন্ধে মিসেস এডামের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাকে সেই গল্প দুইটি হইতে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবার কোন হেতু আছে কি? আমাদের মনে হয়, নাই। রামমোহনের মৃত্যুর ৫৪ বৎসর পরে, উইলিয়াম এডামের বিধবার মুখে মোহিনীবাবু রাজারামের এই ইতিহাস শোনেন ; তখন এডাম-পত্নীর বয়স ৮৮ বৎসরেরও অধিক, এবং দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; এডাম-পত্নী এ-সকল কথা কবে কাহার কাছে শোনেন, রাজারাম কেমন করিয়া ডিগবীর আশ্রয়ে আসেন, ডিগবী তাহাকে কোথায় কুড়াইয়া পান, কুড়াইয়াই পান কিনা, — ইহাতে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তা ছাড়া গল্পটির ভঙ্গীও অনেকটা রূপকথার মত। ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে ইহার তুলনায় আমি প্রচলিত যে-দুইটি গল্পের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিয়াছি তাহা অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য ছিল। উহাদের একটি রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৫ সনে ডাঃ কার্পেণ্টারকে লিখিত একটি চিঠিতে লিপিবদ্ধ আছে। মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার প্রণীত রাজার জীবনীতে এই পত্রলেখক কে, তাহা প্রকাশ না করিলেও ঐ চিঠিতেই উল্লেখ আছে যে তিনি রামমোহনের একজন অন্তরঙ্গ ইংরেজ বন্ধু, রামমোহনের মুখেই তিনি গল্পটি শুনিয়াছেন, এবং রাজারাম-সম্বন্ধে রামমোহনের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত ; শুধু ইহাই নহে, চিঠিখানিতে আরও বলা হইয়াছে যে, "রামমোহনের অন্যান্য বন্ধুদের মুখেও রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহার সহিত তাঁহার স্মৃতিগত মিল আছে।" দ্বিতীয় গল্পটি ১৮৬৩ সনে বর্দ্ধমানে

রাখালদাস হালদারের নিকট রামমোহনের প্রধান শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি বলিয়া মিস্ কোলেট তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটি সাক্ষ্যই এডাম-পত্নীর উক্তি অপেক্ষা পুরাতন এবং প্রামাণিক, এবং দুইটি গল্পই যাঁহারা রামমোহনের সহিত মিসেস এডাম অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতরভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদেরই উক্তি, ও রামমোহনের নিজের মুখে শ্রুত বলিয়া উল্লিখিত। এই অবস্থায়, পূর্ব্বোক্ত গল্প দুইটি অবিশ্বাস্য প্রমাণিত হইবার পরেও এডাম পত্নীর গল্পকে নূতন ও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিবার কোনই কারণ নাই। পক্ষান্তরে, ডাঃ কার্পেন্টারের নিকট লিখিত পত্রে রাজারামের যে পরিচয় আছে তাহার সহিত মিসেস এডামের গল্পের তুলনা করিলে স্পষ্ট মনে হয় যে, মিসেস এডামের গল্পটি তাহারই "অপভ্রংশ" ও প্রতিধ্বনি মাত্র। কেবল একটিমাত্র বিষয়ে আমরা এডাম-পত্নীর গল্পের সহিত ডাঃ কার্পেন্টারকে লিখিত গল্পের অনৈক্য দেখিতে পাই,—সে 'ডিক' স্থলে 'ডিগবী' নামের উল্লেখে। কিন্তু এখানেও এডাম-পত্নীরই স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়াছে মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

ডিগবীর সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দশ বৎসরের অধিক কাল রামমোহন ডিগবীর অধীনে কর্ম্ম করেন। ১৮১৪ সং. ছুটি লইয়া ডিগবী যখন বিলাতে অবস্থান করেন, তখন উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার ছিল ; এমন কি রামমোহনের বেদান্ত-চূর্ণকের ইংরেজী অনুবাদের একটি সংস্করণ, ডিগবী নিজ ভূমিকাসহ বিলাতে প্রকাশ করেন। তাহার পর দ্বিতীয়বার ভারতে আসিয়া যখন তিনি কালেক্টররূপে কয়েক বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থান করেন, তখনও মধ্যে মধ্যে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইত। ডিগবী রামমোহনের উপর এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, বর্দ্ধমান কালেক্টরীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদই রামমোহনের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন—যেমন, রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ছিলেন দ্বিতীয় সেরিস্তাদার, ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় ছিলেন বর্দ্ধমানের আবকারি তহসিলদার। তাহার পর বর্দ্ধমান কালেক্টরী-সংক্রান্ত একটি গুরুতর ব্যাপারে রাধাপ্রসাদ রায়কে জড়িত করিয়া সরকার যখন দীর্ঘকাল মামলা চালান, তখন রাধাপ্রসাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য ডিগবী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সরকারের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। সেই বন্ধুবৎসল সদাশয় ডিগবীর কাছেই যদি রামমোহন রাজারামকে পাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই কথা রামমোহনের সমস্ত বন্ধুদের কাছে অজ্ঞাত থাকিয়া একমাত্র এডাম-পত্নীরই জানা থাকিবার কথা নয়, এবং রামমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুরা এই সুপরিচিত নামটি ভুলিয়া গিয়া 'ডিগবী' স্থলে সম্পূর্ণ অজানা এক ডিক সাহেবের নাম করিবেন তাহা কি সম্ভব?

পক্ষান্তরে, অতিবৃদ্ধা (তখন তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসরেরও অধিক—একথা মোহিনীবাবুই বলিয়াছেন। এডাম-পত্নীর পক্ষে রামমোহনের মৃত্যুর ৫৪ বৎসর পরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত 'ডিক' সাহেবের সহিত রাম-মোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডিগবীর নামের গণ্ডগোল করিয়া ফেলা খুবই স্বাভাবিক। অতিবৃদ্ধার এই স্মৃতিকথা যে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়, তাহার আরও প্রমাণ দিতেছি। এডাম-পত্নী বলিয়াছেন,—

"একদিন রাজা ডিগবীর সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শোনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন।"

আমি বাংলা গভর্মেন্টের দপ্তরখানায় ডিগবীর কর্ম্মজীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তিনি পদত্যাগও করেন নাই,—স্বদেশ-যাত্রাও করেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মাস-কয়েকের ছুটি লইয়া কেপটাউনে ছিলেন। রাধাপ্রসাদের মকদ্দমা তখনও চলিতেছিল ; ডিগবীর প্রাণপণ চেষ্টা না থাকিলে রাধাপ্রসাদের বিচারের ফল কিরূপ দাঁড়াইত বলা যায় না। অন্য কারণে না হউক, একমাত্র রাধাপ্রসাদের মকদ্দমার জন্য ডিগবীর গতিবিধির কথা রামমোহনের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং ডিগবীর 'পদত্যাগ ও স্বদেশযাত্রার' মত অমূলক কথা এডাম-পত্নী কখনও রামমোহনের মুখে শুনিতে পারেন না।

রাজারাম-সম্পর্কীয় কাহিনীগুলি রামমোহনের

মৃত্যুর পর রচিত হইয়াছে। এগুলিকে অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ বাধা আছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত স্যর উইলিয়াম ফষ্টারের নব-প্রকাশিত *John Company* পুস্তক হইতে রামমোহনের সহিত রাজারামের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রবাসী, মাঘ, পৃ. ৫৫১-২), তাহার সম্বন্ধেও একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই কাহিনীটি মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত, ডাঃ কার্পেণ্টারকে লিখিত রাজারামের বিবরণের ভাষান্তর মাত্র,—নূতন কোন প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তফাৎ-এর মধ্যে দেখিতেছি, 'কোম্পানীর সিভিলিয়ান ডিক সাহেব'-এর স্থলে ফষ্টার 'কোম্পানীর এক ইংরেজ কর্ম্মচারী' লিখিয়াছেন। এ সমস্ত কথাই আমার মূল প্রবন্ধে আছে, এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া গল্পটি যে ভিত্তিহীন তাহা প্রমাণ করিয়াছি।

রামমোহন ও তাঁহার সহিত সম্পৃক্তা মুসলমান নারী

রামমোহনের মুসলমান প্রণয়িনী থাকা যে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, একথা আমার প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন,—"রামমোহন রায়ের শৈবমতে বিবাহিত একটি মুসলমানী স্ত্রী ছিলেন, এ কথাটাও অনুমান হইলেও এই অনুমানের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ঘটিত প্রবল সাক্ষ্য বর্ত্তমান। প্রতিপক্ষের কটাক্ষের যে উত্তর তিনি দিয়াছেন, তাহাতে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। তবে তাহা অনুমানই।" (প্রবাসী, পৌষ, পৃ. ৪১৫)। শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র সোমও—"রামমোহন রায়ের শৈববিবাহিতা যবনী-পত্নী থাকিলেও থাকিতে পারেন, তিনি সম্ভবতঃ রামমোহনের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে পারেন"—এই কথা মানিয়া লইয়া শৈববিবাহ যে বিবাহেরই শাস্ত্রসঙ্গত আর একটা রূপ, একথা প্রমাণ করিতে প্রয়াস [illegible] ছেন (প্রবাসী, মাঘ, পৃ. ৫৭৫-৭৬)। ইহা নিতান্তই কুতর্ক মনে হইলেও অবান্তর বলিয়া এখানে কোনও প্রশ্ন তুলিব না। আমাদের উদ্দেশ্য, রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী বা শৈব-পত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এ বিষয়ে মূল প্রবন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে প্রতিবাদকারীরা সন্তুষ্ট হন নাই দেখিয়া আমার অনুমানের সপক্ষে ও সমর্থক-হিসাবে আরও কয়েকটি নূতন তথ্যের অবতারণা করিতে হইতেছে।

আমার প্রথম কথা এই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক হইতে দেখিলে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। যাঁহারা সেকালের কলিকাতার ইতিহাস একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কলিকাতা-বাসকালে রামমোহন রায়ের মুসলমান-সংসর্গ কিছু অতিমাত্রায় ছিল। ইহা এতই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল যে, হিন্দুরা বলিত রামমোহন মুসলমান বনিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।*

রামমোহনের মুসলমান-সংসর্গের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ১২২৮ সালের ২৫এ চৈত্র (১৮২২, ৬ই এপ্রিল) তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" রামমোহনকে চারিটি প্রশ্ন করেন। † কলিকাতার অনেক গণমান্য লোকের অনুরোধে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক প্রশ্ন চারিটি পত্রস্থ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরস্বরূপ রামমোহন 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন (বৈশাখ ৩০, শক ১৭৪৪)। ইহার প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষ আবার ১৮২৩ সালে (১২২৯, ২০ মাঘ) 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে ২২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এক গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে রামমোহন ও তাঁহার শিষ্যবর্গের উপর তীব্র কটাক্ষ ও পূর্ব্ব অভিযোগগুলির স্পষ্ট পুনরাবৃত্তি ছিল। এই 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থখানি অতি দুষ্প্রাপ্য। উহা দেখিবার সুযোগ এতদিন আমার হয় নাই ; সম্প্রতি এই গ্রন্থের একখণ্ড স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করিয়াছি।

* এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তাহা আমি অবগত আছি।—প্রবাসী-সম্পাদক

† শোভাবাজার রাজাবাড়ীতে ১৮২১ এপ্রিল হইতে ১৮২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত চারি বৎসরের 'সমাচার দর্পণ'-এর ফাইল আছে।

"পাষণ্ডপীড়ন"-এর ১৬৩ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি পাইলাম,—

"কিন্তু, নগরান্তবাসির ‡ অদ্যাপি জবনীগমনের চিহ্ন, প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজবাসস্থানের প্রান্তেই জবনীগমনের ধ্বজপতাকারোপণ করিয়াছেন।"

এই কথাগুলিতে মুসমলান নারীটির রামমোহনের নিজ বাটির খুব নিকটে সসন্তান বাসের ইঙ্গিত রহিয়াছে। শেষ ইঙ্গিতটি যে রাজারামের ক্ষেত্রে খাটে, তাহা পরে দেখাইব। এখানে 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর অভিযোগ সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু'একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

শত্রুদের পক্ষে রামমোহনের নামে কলঙ্ক আরোপ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে রামমোহনের মুসলমান নারীর সাহচর্য্যের কথা যে একেবারে অমূলক অপবাদ নয় তাহা মনে করিবার প্রধান কারণ,—এ সম্বন্ধে রামমোহনের নিজমুখে সুস্পষ্ট প্রতিবাদের অভাব।

'পাষণ্ডপীড়ন'-এর উত্তরে রামমোহন ১২৩০ সালের ১৫ই পৌষ 'পথ্যপ্রদান' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহাতে তিনি মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগ খণ্ডন করা দূরে থাকুক, তাহা এক-রকম মানিয়া লইয়া শৈব-বিবাহের সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

"শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন।" (গ্রন্থাবলী, পৃ. ৩৩১)

রামমোহন আরও বলিয়াছেন,—

"শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে গ্রহণ করিবেক।" ('চারিপ্রশ্নের উত্তর', গ্রন্থাবলী—পৃ. ২৪০)

কেবল তর্কপ্রিয়তার জন্যই রামমোহন শৈববিবাহের এই অনর্থক উল্লেখ করিয়াছেন —এমন মনে করিবার কোনো কারণ আছে কি? অন্য অন্য বিষয়ে যখনই যে-কেহ রামমোহনের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে রামমোহন কিন্তু মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে একেবারে নীরব এবং বৈদিক বিবাহ ও শৈববিবাহ সমতুল্য উহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর লেখক এই অবান্তর তর্কে ভুলিবার লোক নহেন। তিনি রামমোহনের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ না পাইয়া ধরিয়াই লইতেছেন যে রামমোহন এই অভিযোগ নিজমুখে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। আমরা 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর অন্যত্র নিম্নলিখিত কথা কয়টিও পাই,—

"কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভক্তবামাচারী মহাশয়, আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, জবনী গমন, সম্প্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনাদিগের জবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব, ও জবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইয়দ্দিনে এক্ষণে ধর্ম্মের গুণে বাক্যমনের অনৈক্য দূর হইয়া তাহার ঐক্য হইতেছে, আরও হইবেক, কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্র ভাবের অভাব কত কাল হয়।" (পৃ. ১৫৮-৫৯)

রাজারাম কি রামমোহনের পালিত পুত্র?

রাজারাম ও রামমোহনের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে গিয়া আমি আমার মূল প্রবন্ধে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম,—(১) রাজারাম মুসলমান, ও (২) রাজারাম রামমোহনের পুত্র—পালিত পুত্র নহেন,

‡ "উহাতে ['পাষণ্ডপীড়নে] রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন ; অর্থাৎ রামমোহন রায় মানিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ চণ্ডাল।" (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৪৩)

দত্তকপুত্র ত হইতেই পারেন না। যে প্রমাণের উপর আমার প্রথম সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গীগণের পাসপোর্ট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়—রাজারামের প্রকৃত নাম শেখ বক্‌সু এবং এই নাম হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে সে মুসলমান। প্রতুলবাবু এই যুক্তি মানিতে প্রস্তুত ন'ন। তিনি বলেন, "ব্রজেন্দ্রবাবু যে পাসপোর্টের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা অন্যস্থলে [অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তির স্থলে] প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু এস্থলে [রামমোহনের ক্ষেত্রে] নয়। কেননা বেনাম ব্যবহার রামমোহনের অস্থিমজ্জাগত ছিল।" সেইজন্য ধরিয়া লইতে হইবে যে "পাসপোর্টে নাম বদলাইলেই প্রমাণ হয় না যে রাজারাম মুসলমান।" প্রতুলবাবুর এই যুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি।

প্রথমতঃ, রামমোহন অনেক সময়ে বেনামী রচনা লিখিতেন বটে কিন্তু তাহার একটা বিশিষ্ট হেতু ছিল। এক্ষেত্রে তাঁহার কোন হেতুও নাই। বরং পাসপোর্টে যথার্থ পরিচয় গোপন করিলে রামমোহনের ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। এ প্রসঙ্গে প্রতুলবাবু রামমোহনের প্রদৌহিত্র নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের "রামমোহন সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকা হইতে এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"রাজা রামমোহনের সঙ্গে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপনার নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের পূর্ব্ব নাম শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম হরিদাস।" ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে পাসপোর্ট লইবাব পূর্ব্বে, কিংবা বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে, রামমোহন তাঁহার সঙ্গীদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, —এই নাম-পরিবর্ত্তন বিলাতযাত্রার পরে ঘটিয়াছিল। পাসপোর্ট লইবার সময় রামমোহন কাহারও নাম গোপন করেন নাই ; সকলেরই, অন্ততঃ তিনজন সঙ্গীর মধ্যে দুইজনের—রামরতন মুখোপাধ্যায়ের ও হরিচরণ দাসের, প্রকৃত নামই দিয়াছিলেন। রামরতন সম্বন্ধে প্রতুলবাবু বলিতেছেন, "পাসপোর্টে দেখিতেছি শম্ভু রামরতন হইয়াছেন।" প্রকৃত পক্ষে রামরতনই রামরতনের আসল নাম ;— শম্ভু তাঁহার ডাকনাম মাত্র। সরকারী দপ্তরে ইহার প্রমাণ আছে। রামরতন মুখোপাধ্যায় বিলাত হইতে ফিরিয়া 'রায় বাহাদুর' হন ; তিনি ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বব মুর্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছিলেন। রামমোহন যে তাঁহার কোনো কোনো সঙ্গীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—এ রকম একটা গুজব বাংলা সরকারের কানে আসিয়াছিল। এই কারণে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে রামরতন অন্য কোন নামে পরিচিত ছিলেন কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে রামরতন লিখিয়াছিলেন,—

"With regard to the second query on the subject of my name, I beg to submit that the name which I hold now is what I received since the day of my *Unnoprashana,* or first sacrament of the Hindus, a name by which I have been always known and by which our countrymen perform their Brahmanical ceremonies. It should, however, be stated here for your information and that of the Sadar Board of Revenue that I was also called in my boyhood by Shambhu Chunder by my very near relations and particularly by my father as a mark of his tender regard for me. But as this latter name is only given to me in token of affection, I held every situation as well as received introductions and recommmendations private and public from the late much lamented Raja, as well as from my friends, both European and Native, in my real name Ram Rutton by which I am commonly known and

in which I hold my present situation. For the conviction of which I doubt not the several documents which I submitted for your perusal and inspection the other day might have served."*

ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, বিলাতযাত্রার সময়ে রাজা তাঁহার সঙ্গীদের নাম পরিবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, তাহাদের ডাকনাম পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া তাহাদের প্রকৃত পরিচয়ই দিয়াছেন। শুধু রাজারামের ক্ষেত্রে যে রামমোহন একটা কাল্পনিক ছদ্মনাম ব্যবহার করিবেন ইহার কি কারণ আছে? এবং শেখ বক্‌সু যদি রাজারামের প্রকৃত নাম হয় তবে সে মুসলমান, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বোধ করি কেহ আপত্তি তুলিবেন না।

কিন্তু প্রতুলবাবু আর একটা কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, "রাজারাম বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলমান-সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন ইহা সত্য হইলেও প্রমাণ হয় না যে, তিনি মুসলমান ছিলেন। জাত হারাইলে মানুষ শুধু বৈষ্ণব হয় যে তা নয়, মুসলমানও হয়।" এ সমস্ত কথার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। রামমোহনের বিলাতযাত্রার অপর দুই সঙ্গী রামরতন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস—বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈষ্ণবও হন নাই, মুসলমান ত হনই নাই। উভয়েরই বংশধরেরা এখনও জীবিত, এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া কঠিন নয়।

আমার দ্বিতীয় কথা, রাজারাম রামমোহনের পুত্র। এ বিষয়েও পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি যে-সকল প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। মূলপ্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ কার্পেন্টার তাঁহার পুস্তকে রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ("youngest son") বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন যে, ডাঃ কার্পেন্টারের মৃত্যুর পর, মেরী কার্পেন্টার রামমোহন সম্বন্ধীয় তাঁহার পুস্তকে পিতার রচনার অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন ; তাহাতেও রাজারামের ঐ পরিচয়ই দেওয়া আছে। মিস কার্পেন্টার তাঁহার পুস্তকের একাধিক সংস্করণেও পিতার লেখা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। রাজারাম যে রামমোহনের পালিতপুত্র—এ গল্প তাঁহার পুস্তকের পরিশিষ্টে মাত্র স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে শুধু 'নেতি নেতি' (negative) সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। রাজারাম ওরফে শেখ বক্‌সু যে রামমোহনের পুত্র তাহার সপক্ষে প্রমাণ আমি গভর্ণমেণ্ট গেজেটে পাইয়াছি।

জাহাজ ছাড়িবার দিন ১৮৩০, ১৫ই নভেম্বর, তারিখের গেজেটে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে বিদেশযাত্রীর তালিকায় "রামমোহন, তাঁহার পুত্র ও ভৃত্য-সমভিব্যাহারে বিলাতযাত্রা করিতেছেন" বলা হইয়াছে।† রামমোহনের সঙ্গে রামরতন ও হরিচরণ ভৃত্যরূপে গিয়াছিলেন,—বাকি রহিল শেখ বক্‌সু (এই নাম পাসপোর্টে আছে)। সুতরাং উনি ছাড়া আর কেহই রামমোহনের পুত্র হইতে পারেন না।

রাজারামও নিজেকে রামমোহনের 'পুত্র' বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিবার সময় জাহাজ-যাত্রীদের তালিকায় "Rajaram Roy, son of the late Raja Rammohun Roy" বলিয়াই নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন।*

তখনকার দিনের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—

* Ram Rutton Mookherjea, Deputy Collector under Regulation IX of 1833. to the Hon'ble R. Forbes. Collector of Murshidabad. dated Daulatabad (Murshidabad) 8th January, 1838.—*Board of Revenue Procdgs.* 20 February 1838, No. 160.

† "Departure of Passengers : *Albion* : Baboo Rammohun Roy, *Son* and Servants."—*The Government Gazette.* 15 Nov. 1830

* *India Gazette*, dated 13 August 1838 —Supplement, Shipping Intelligence.

যেমন, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামগোপাল সান্ন্যাল প্রভৃতি—রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই জানিতেন। একটা নজির দিতেছি। রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় লিখিতেছেন,—"Was Rajaram a foster-son of the Raja? We have doubts on that point. The late Dr. Sumbhu Chunder Mukerji, Editor of the *Reis and Rayyet*, held a contrary opinion."†

পরিশেষে আর একটিমাত্র কথার উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। রাজারাম—ওরফে শেখ বক্‌সুকে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর সন্তান বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু আছে কি? আমাদের মনে হয় আছে।

'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক হইতে পূর্ব্বে যে-অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ১৮২৩ সালের কাছাকাছি 'রামমোহনের গৃহের প্রান্তভাগেই' তাঁহার মুসলমান-প্রণয়িনী সন্তানসহ বাস করিতেন—এরূপ ইঙ্গিত আছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, রামমোহনের কোন্ গৃহের প্রান্তভাগে? কলিকাতায় তাঁহার তিনখানি বাড়ীর কথা আমাদের জানা আছে,—মানিকতলার উদ্যানবাটী, শিমুলিয়াস্থ বাটী, আর ষষ্ঠীতলার বাটী। যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর লেখক ষষ্ঠীতলার বাড়ীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা হইলে ব্যাপারটা, ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত আর কয়েকটি ঘটনা ও তথ্যের সহিতও বেশ খাপ খাইয়া যায়। পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৮১৫ সনের কিছুদিন পর হইতে রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' ষষ্ঠীতলার বাটীতে বসিতে আরম্ভ করে।‡ সুতরাং রামমোহন যে তখন ষষ্ঠীতলার বাড়ীতে বাস করিতেন তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। রাজারামও পরে ষষ্ঠীতলাতেই বাস করিতেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী ষষ্ঠীতলায় ; তাঁহার কথায় প্রকাশ,—"রাজারামের বাড়ী তাঁহার বাড়ীর কাছেই ছিল। রাজারাম মোসলমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নাই।"§ এখন জিজ্ঞাস্য, রাজারাম কি বিলাত হইতে ফিরিয়া বিনাকারণে কলিকাতার অন্য কোন পল্লীতে না থাকিয়া ষষ্ঠীতলায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন? ব্যাপারটা অসম্ভব না হইলেও আমাদের মনে হয়, তিনি নিতান্তই খেয়াল-খুশীর বশে সেখানে যান নাই। ষষ্ঠীতলায় তাঁহার মুসলমান মাতা অথবা আত্মীয়-বন্ধুদের বাস বলিয়াই তিনি সেই জায়গায় গিয়া বাসস্থান ঠিক করেন। আমাদের হিসাব-মত রাজারামের জন্মের তারিখও রামমোহনের ষষ্ঠীতলায় বাস আরম্ভ করিবার কাছাকাছিই (১৮১৬-১৭) পড়ে।

এ সকল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মাত্র, কিন্তু ইহার বলে 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে গৃহপ্রান্তবাসিনী মুসলমান নারীটির উল্লেখের সহিত রাজারামের ইতিহাসের একটা সূত্র ও মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগ সম্বন্ধে রামমোহনের নিরুত্তর থাকিবারও একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হইলেও— এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিবার কথা নয়—ঐতিহাসিকের নিকট এ সকল তথ্যের কোনো মূল্য নাই, : একথা বলা নিতান্তই অযৌক্তিক হইবে না কি?

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

† R. G. Sannyal's *Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India*, pt. i. p. 18.

‡ ১৭৩৭ শকে রাজা মানিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সেস্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতকদিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনরায় মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

§ *স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ*—*শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য* প্রণীত। পৃঃ ৩৬

সম্পাদকের মন্তব্য

কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে ব্যক্তিগত আলোচনা করা আমার অভিপ্রেত নহে, আমার অনুসৃত রীতিও নহে। অন্যের লিখিত পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষ্যে তাহা কখন কখন বাধ্য হইয়া করিতে হইতে পারে ; কিন্তু তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ আমি 'প্রবাসী'তে এরূপ আলোচনা করি না, অন্যকৃত এরূপ আলোচনাও মুদ্রিত করি না। রামমোহন সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম কেন করিয়াছি, তাহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু তাহা সত্যনির্ণয়ের জন্যই করিয়াছি ; সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই এই বিশ্বাসে করিয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের উত্তর অন্য কেহ কেহ দিয়াছেন। এখন তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন। অতএব এখন আমি আমার মন্তব্যসহ আলোচনাটি শেষ করিতেছি।

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, যে, রাজারাম সম্বন্ধে প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ সমস্ত গল্পই এডাম-পত্নীর কথিত গল্প অপেক্ষা পুরাতন। মুদ্রণ ও প্রকাশ হিসাবে সেগুলি পুরাতন হইতে পারে। কিন্তু এডাম-পত্নী ভারতবর্ষে থাকিতে কখন গল্পটি শুনেন, এবং অন্য গল্পগুলিই বা কে কবে শুনেন, তাহা জ্ঞাত না থাকায় শ্রবণের পূর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে সব গল্পগুলির বিশ্বাস্যতা বা অবিশ্বাস্যতা সমান।

কিন্তু রাজারাম সম্বন্ধে অন্যান্য গল্পের সহিত মোহিনীবাবুর বর্ণিত আখ্যানটির একটি প্রভেদ আছে, যাহার নিমিত্ত সেটিতে কিছু বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। অন্য গল্পগুলি রামমোহনের কোন্ বন্ধু কবে কাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। মোহিনীবাবুর আখ্যানটিতে বক্ত্রীর ও শ্রোতার নাম এবং মোহিনীবাবুর শুনিবার স্থানকাল উল্লিখিত আছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, তাঁহার, বর্ণিত আখ্যানটি কোনও বাদপ্রতিবাদ উপলক্ষ্যে লিখিত হয় নাই ; সম্ভবতঃ প্রকাশের জন্যও লেখা হয় নাই। কোনও আত্মীয়কে চিঠিতে উহা তিনি লিখিয়াছিলেন। লিখিবার ছয় বৎসর পরে উহা 'ভারতী'তে ছাপা হয়।

গল্পটি বলিবার সময় এডাম-পত্নীর বয়স ৮৮ পার হইয়াছিল, ইহা ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে তাহার অবিশ্বাস্যতার অন্যতম কারণ। কিন্তু বয়স বেশী হইলেই ৫৪ বৎসর আগে শোনা কথা মাত্রই মানুষ ভুলিয়া যায় না—বিশেষতঃ যাহা মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া শুনিয়াছে। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে শোনা বা দেখা ঘটনা মনে থাকিবার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে। ৮৮ বা ততোধিক বৎসর বয়সে প্রামাণিক গ্রন্থ পর্য্যন্ত রচিত হইবার দৃষ্টান্ত আছে।

এডাম-পত্নীর বর্ণিত আখ্যানের কোন কোন ভুল দেখাইয়া এবং তাহাতে কোন কোন জ্ঞাতব্য কথা নাই বলিয়াও ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা অবিশ্বাস্য মনে করেন। কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনচরিতে বর্ণিত কোন ঘটনা বা আখ্যানের একটি অংশে ভুল থাকিলে কিম্বা তাহাতে সমুদয় জ্ঞাতব্য কথা না থাকিলে অন্য সব অংশও অবিশ্বাস্য হইয়া যায় না। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এডাম-পত্নীর কথাতে কিছু ভুল থাকিলেও অনেকটা বা কিছু সত্যও থাকিতে পারে। কিন্তু উহা যে নিশ্চয়ই সত্য, এরূপ বলা যায় না।

রামমোহন যে রাজারামকে ডিগবীর নিকট পাইয়াছেন, এডাম-পত্নী ভিন্ন তাঁহার আর কোন

বন্ধু তাহা জানিতেন না, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান নাই। অনুল্লেখ অজ্ঞতার প্রমাণ নহে। রামমোহনের সব বন্ধুর সব কথোপকথন ও চিঠিপত্র ত পাওয়া যায় নাই।

ফষ্টার নাম না করিয়া "কোম্পানীর এক ইংরেজ কর্ম্মচারী" বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, রামমোহন তাঁহার নিকট হইতে রাজারামকে পাইয়া থাকিতে পারেন। তিনি ডিগবী হইতে পারেনই না, এরূপ বলিবার মত তাৎকালিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান নাই। ডিগবীর মৃত্যু কবে কোথায় হইয়াছিল, জানিতে পারিলে তথ্যনির্ণয়ে হয় ত কিছু সুবিধা হইতে পারিত।

প্রতুলবাবু যে শৈববিবাহকে শাস্ত্রসঙ্গত একপ্রকার বৈধ বিবাহ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি একটুও কুতর্ক মনে করি না। যাহার অনুষ্ঠান কেহ কোনকালে করে নাই বা করিবে না, কোন শাস্ত্রে তাহার বিধান শুধু শুধু থাকিবার কথা নয়। তন্ত্রে যে শৈববিবাহের বিধান ও পদ্ধতি দেওয়া আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, ওরূপ বিবাহ কেহ কেহ করিতেন। তন্ত্রও প্রামাণিক-হিন্দুশাস্ত্র। প্রয়াগস্থ পাণিনি কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার একটি গ্রন্থে মনুস্মৃতির কুল্লুকভট্ট কর্ত্তৃক ব্যাখ্যা হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

"শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক।" এখন তন্ত্রের প্রভাব ও অনুবর্ত্তন কম ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, অতীতকালে বিস্তর লোক তন্ত্রকেও বেদের মত শাস্ত্র বলিয়া মানিত এবং তাহাতে নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত। অতীতে ও বর্ত্তমানে, হিন্দুর মুসলমানী বিবাহের দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের একাধিক সহরে এইরূপ বিবাহের কথা আমি জানি। নানা কারণে এরূপ বিবাহ অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা দুর্নীতি নহে। হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাও জয়াকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ চালাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক-সভায় একটি বিল পেশ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রথম প্রবন্ধে রামমোহনের সহিত মুসলমানীটির সম্বন্ধ সম্ভবতঃ শৈবমতে বিবাহ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

সরকারী কোন কোন কাগজপত্রে বা অন্যত্র রামমোহনের পুত্র বলিয়া রাজারামের পরিচয় আছে বটে। কিন্তু দত্তকপুত্রও ত পুত্র। আদালতের দলিলাদি আইন-নির্দ্দিষ্ট কোন কোন কাগজপত্রে দত্তক পুত্রের দত্তকপুত্র বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ আবশ্যক হইতে পারে। অন্যত্র পুত্র বলিয়া উল্লেখই যথেষ্ট।

শেখ বক্‌সুই যে রাজারাম, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিলেও, ব্রজেন্দ্রবাবু এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তদ্দারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পারিপার্শ্বিক তথ্য দ্বারা উহা যতটা প্রমাণ হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে মনে করি। কিন্তু রামমোহনের যে মুসলমানী পত্নী ছিলেন, এবং রাজারাম যে ঐ নারীরই পুত্র, তাহা এতটা প্রমাণিত হয় নাই, যদিও তদ্রূপ অনুমান করিবার পক্ষে অনেক

পারিপার্শ্বিক তথ্যের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য।

রাজারামের ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ষষ্ঠীতলায় বাস করিবার এই কারণ যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে, যে, তিনি সম্ভবতঃ রামমোহনের পালিত পুত্ররূপে তাঁহার তত্রত্য বাটিতে কখন কখন থাকিতেন ও ঐ অঞ্চলের সহিত পরিচিত ছিলেন, এরূপ অনুমান অত্যাবশ্যক নহে, যে, তাঁহার মুসমলান ধর্ম্মাবলম্বী মাতা জীবিত ছিলেন ও আত্মীয়গণসহ সেখানে বাস করিতেন।

রামমোহনের শৈশবে ও বাল্যে তিনটি হিন্দু বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শৈশবেই একটির মৃত্যু হয়। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের কোন সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার অন্য দুই পত্নী তাঁহার সহিত বাস করিতেন না বলিয়া যে তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে, তজ্জন্য বা তদ্বিধ অন্য কারণে যদি তিনি আরও একটি হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমসাময়িক প্রতিপক্ষেরা সম্ভবতঃ তাঁহার নিন্দা করিতেন না। কারণ, বহুবিবাহ তখন প্রচলিত ছিল, এবং পুরাকালে ও মধ্যযুগেও তাহা প্রচলিত ছিল। রাজা মহারাজাদের মধ্যে ত তাহা খুবই প্রচলিত ছিল। মহারাণা প্রতাপ সিংহের ও ছত্রপতি শিবাজীর মত সকল হিন্দুর পূজিত নৃপতিরাও একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মত ভক্তিভাজন কোন কোন ঋষিরও একাধিক পত্নী ছিলেন। সুতরাং বহুবিবাহ রামমোহনের প্রতিপক্ষদিগের চক্ষে নিন্দার্হ হইবার কথা নয়। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, রামমোহনের মুসলমানী সংসর্গ ছিল। তাহা যে বৈধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না বা মানিতেন না। এই কারণে তাঁহারা রামমোহনের নিন্দা করিতেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ যবনী কথাটির প্রকৃত অর্থ জানিতেন না। উহার প্রকৃত অর্থে চন্দ্রগুপ্ত যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাকালে অন্য অনেক হিন্দুও যবনী বা অন্য অহিন্দু নারী বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারতের মধ্যযুগেও এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে। বর্ত্তমানকালেও হিন্দুর মুসলমানী বিবাহের এবং ইহুদী বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী নারীর সহিত (হিন্দুমতে, আর্য্যসমাজী মতে, শিখ "আনন্দ" পদ্ধতি অনুসারে, বা অন্য প্রকারে) বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দু পুরুষের সহিত অহিন্দু নারীর বিবাহ যে বৈধ হইতে পারে, তাহা রামমোহন মানিতেন। এখন অন্যেরাও মানিতেছেন। তিনি তাঁহার সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, ইহা তাঁহার অপরাধ হইতে পারে।

যদি ইহা সত্য হয়, যে রামমোহনের এক মুসলমান নারীর সহিত সম্বন্ধ ছিল, তাহা হইলে তাহাকে বৈধ সম্বন্ধই মনে করা সঙ্গত। কারণ রামমোহনের সহিত একটি মুসলমান নারীর সম্বন্ধ থাকার যে প্রধান (পরোক্ষ) প্রমাণটি ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহনের একটি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তৎকর্ত্তৃক শৈববিবাহের সমর্থন। ঐটিকে রামমোহনের মুসলমান পত্নী থাকার প্রধান, অন্ততঃ অন্যতম, প্রমাণ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু রামমোহন যে শৈববিবাহকে শাস্ত্রীয় বিবাহ ও নির্দ্দোষ সম্বন্ধ মনে করিয়া ঐরূপ বিবাহ করিয়া থাকিবেন তাহা আমরা স্বীকার করিব না, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না।

শৈববিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে হইতেছে না। আমার বক্তব্য কেবল এই, যে, রামমোহন উহাকে শাস্ত্রীয় মনে করিতেন,

এবং যদি তিনি মুসলমানীর সংসর্গ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহাকে শৈবমতে বিবাহই করিয়া থাকিবেন। রামমোহনের মুসলমানী পত্নী থাকা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া যদি মানিয়া লওয়া যায়, এবং রাজারাম যদি উভয়ের পুত্র ছিলেন, ইহা ঠিক হয়, তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তাঁহার এক বিবাহিতা হিন্দুপত্নীর পুত্রদের মত রামমোহন রাজারামের প্রতিও বৈধপুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য সকল দিক্ দিয়াই পালন করিয়াছিলেন। আমরা বহুবিবাহের বিরোধী। কিন্তু আমাদের এই মত অনুসারে অতীত ও বর্ত্তমানকালের বহুবিবাহিত মানুষদের বিচার হইতে পারে না।

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া আমার মন্তব্য শেষ করি।

রাজারাম যে মুসলমান ছিলেন এবং তিনি যে রামমোহনের মুসলমান পত্নীর পুত্র ছিলেন, তাহার অন্যতম পরোক্ষ প্রমাণস্বরূপ ব্রজেন্দ্রবাবু স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি কথা শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সৎ, শ্রদ্ধেয় ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি বক্তৃতাদিতেও ওজন করিয়া, বিবেচনা করিয়া, কথা বলিতেন। তিনি রাজারামকে রামমোহনের ও তাঁহার মুসলমানী পত্নীর পুত্র মনে করিতেন কি না, জানি না। সম্ভবতঃ তিনি মনে করিতেন, রাজারামের সহিত রামমোহনের রক্তসম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এতদ্বিষয়ক গল্প দ্বারা রামমোহনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার কিছুই হ্রাস হয় নাই। কিন্তু যদি তিনি রামমোহন ও রাজারামের ঐরূপ সম্পর্কে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে রামমোহনের বৈধপুত্র মনে করিতেন এই অনুমানে ভিন্ন রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা অসঙ্গত মনে হয়। রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার মত কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার একটি বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে। উহার শেষ বাক্যটিতে তিনি রামমোহনের স্মৃতিকে পবিত্র স্মৃতি বলিয়াছেন। কাহারও চারিত্রিক গুরুতর দোষে কেহ বিশ্বাস করিলে তাঁহার স্মৃতিকে, আর যাহাই বলুন, পবিত্র বলিতে পারেন না।—

"In matters of religion, no doubt, every allowance must be made for diversity of opinion. But one thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects, whether orthodox Hindus or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians—that to Rammohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a *jogi*, a *suttee*, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship. The truth is that Ram Mohun Roy was one of those great missionaries whom Providence in its benign dispensation sends to us from time to time to dispel the darkness of ignorance and superstition and prejudice, when these become intolerable ; one of those luminaries that shine long and steadily, and never lose their primal glow, though we may be looking at them through long vistas of bygone years. And may we be guided by that sentiment and guided by that light, as time rolls on year after

year, be enabled to offer to his sacred memory the only acceptable offering of some satisfactory account of our national progress, material and moral."—*Speeches and Writings of Sir Gooroodass Banerjee* compiled by Upendra Chandra Banerjee, pp. 361—3.

১৩৪০ কার্ত্তিক
রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্তের পর শত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের অন্য কোন কোন স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সভা ও বক্তৃতাদি হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও হইবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও এইরূপ সভা বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে। যাঁহারা বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র সভা করিবেন, তাঁহারা সকলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য কথা জানিতে চাহিবেন। কলিকাতার রামমোহন শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম যে ইংরেজী পুস্তক বাহির করিয়াছেন, তাহা সময়োপযোগী ও এ-বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বহিখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭০। তা ছাড়া ৭খানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। অথচ মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, অমলচন্দ্র হোম প্রভৃতির লেখা আছে। বহিখানি ২১০-৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে রামমোহন শতবার্ষিকী আফিসে পাওয়া যায়।

রামমোহন সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী লোকদের মত

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি যদি আর কিছুই না করিতেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য ভারতহিতকর এবং জগদ্ধিতকর, কাজও করিয়াছিলেন। এই জন্য, যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এমন বহুসংখ্যক লোকও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্যও, যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, এমন অনেক লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার লোক হয়ত আরও কিছু বেশী হইত। যাহাই হউক, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের এমন অনেক প্রসিদ্ধ

লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিতে সমর্থ। এই সব গুণগ্রাহী লোকদের মধ্যে দেশী বিদেশী উভয় রকমের মানুষই আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। যেমন ফরাসী পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক ভীক্তোর ঝাক্‌মোঁ (Victor Jacquemont)। তিনি তাঁহার Voyage dans l'Inde গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন ঃ—

"Before coming out to India I knew that he was an able orientalist, a subtle logician and an irresistible dialectician ; but I had no idea that he was the best of men." (English translation from the original French.)

তাৎপর্য্য।

"ভারতবর্ষে আসিবার আগে আমি জানিতাম তিনি একজন যোগ্য প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ, সূক্ষ্মবিশ্লেষণকারী নৈয়ায়িক এবং অজেয় তার্কিক ; কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না, যে, তিনি নরোত্তম।"

ইহার পর রামমোহনের চেহারা বর্ণনা করিয়া ঝাক্‌মোঁ বলিতেছেন—

"He never expresses an opinion without taking precautions on all sides, ...

"...He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his countrymen live ; he lives alone ; and though, perhaps, the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and melancholy mark his grave countenance."

তাৎপর্য্য।

"সব দিকে সাবধানতা অবলম্বন না-করিয়া (অর্থাৎ আটঘাট না-বাঁধিয়া) তিনি কখনও কোন মত প্রকাশ করেন না।

"যে সব চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বাস করেন, তদপেক্ষা উচ্চতর মনোলোকে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে ; তিনি একাকী থাকেন ; এবং যদিও, হয়ত, তিনি যে হিতসাধন করিতেছেন, তাহার অনুভূতি তাঁহাকে সর্ব্বদাই আত্মপ্রসাদ দেয়, তথাপি তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হয়।"

বিস্তর সমসাময়িক ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহাদের উচ্চ ধারণা লিপিবদ্ধকরিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব ছাপিবার স্থান হইবে না। অন্য পাশ্চাত্য কয়েক জন বিদেশীর এবং এক জন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিব। রামমোহনের সমসাময়িক আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ বুট লিখিয়াছেন ঃ—

"To me he stood alone in the single majesty of, I had almost said, perfect humanity. No one in past history, or in present time, ever came before my judgement clothed in such wisdom, grace and humility. I knew of no tendency even to error."

তাৎপর্য্য।

"তিনি আমার চক্ষে, প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় একাকী দণ্ডায়মান। অতীত ইতিহাসে বা বর্ত্তমান সময়ে আর কেহ আমার বিচারের সম্মুখে এরূপ প্রজ্ঞা, সৌম্যতা ও নম্রতার মণ্ডিত হইয়া উপস্থিত হন নাই। আমি তাঁহাতে কোন ভ্রান্তি-প্রবণতাও জানিতাম না।"

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িত্রী

ম্যাড্যাম ব্ল্যাভ্যাট্স্কী লিখিয়াছেন, যে, রামমোহন ছিলেন "one of the purest, most philanthropic, and enlightened men India ever produced." "ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধচেতা, মানবপ্রেমিক ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল যে-সব মানুষকে জন্ম দিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।" তাহার পর ম্যাড্যাম ব্লাভ্যাট্স্কী তাঁহার সুমহৎ বুদ্ধিশক্তি, সুমার্জ্জিত শিষ্ট ব্যবহার, ভয়হীন নৈতিক সাহস, পূর্ণ নম্রতা, মানবপ্রেম-প্রবণতা, স্বদেশভক্তি, এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,

"...we have before us the picture of a man of the noblest type. Such a person was the ideal of a religious reformer...one searches the record of his life and work in vain for any evidence of personal conceit, or a disposition to make himself figure as a heaven-sent messenger."

তাৎপর্য্য।

"(এই সব গুণ-লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি, যে,) আমাদের সম্মুখে মহত্তম আদর্শের একটি মানুষের ছবি রহিয়াছে। এই রকম এই মানুষটি আদর্শ ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিয়া কোথাও ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কোন প্রমাণ কিম্বা নিজেকে স্বর্গ হইতে প্রেরিত দূত বলিয়া খাড়া করিবার কোন প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

এইরূপ আরও অনেক প্রশংসাসূচক কথা ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাট্স্কী বলিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি বলিয়াছেন ঃ—

"Raja Rammohun Roy, father of modern India, was one of the most remarkable personalities of his age. While representing all that was best in the Indian tradition, he showed his special genius in a line where the Indians of today are the weakest--in translating into practice by the force of will the dictates of idealism...He fought with phenomenal heroism, against desparate odds, to realize his ideal. If India today wanted any model to shape her present destiny and future history, Rammohun should be the model. He was really the first to bring India abreast of universal history."

তাৎপর্য্য

"আধুনিক ভারতবর্ষের জনক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার যুগের বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত অন্যতম পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত-কালাগত শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা তাঁহাতে ছিল, আবার অন্য এমন একদিকে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়াছেন, যে-দিকে তাঁহার দেশের আজকালকার লোকেরা দুর্ব্বলতম—তিনি যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহাকে নিজের আচরণে পরিণত করিতেন। যদি আজ ভারতবর্ষ নিজের বর্ত্তমান ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনের জন্য কোন আদর্শ চান, তবে রামমোহন এই আদর্শ। তিনিই বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে প্রথম বিশ্বেতিহাসে (অন্য সব জাতির সহিত) প্রগতিশীলদের দলে আনিয়াছেন।"

সিল্ভাঁ লেভি এইরূপ আরও অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারও সব কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। আর দু-জন বিদেশীর কথা উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের দেশের তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। একজন

রামমোহনের সমসাময়িক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সম্পাদক মিঃ বাকিংহাম। তিনি ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে ভাল করিয়া জানিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"Rammohun Roy might have had abundant opportunities of receiving rewards from the Indian Government in the shape of offices and appointments, for his mere neutrality ; but being as remarkable for his integrity as he is for his attainments, he has pursued his arduous task of endeavouring to improve his countrymen, to beat down superstition, and to hasten as much as possible those reforms in the religion and Government of his native land of which both stand in equal need. He was done all this to the great detriment of his private fortune, being rewarded by the coldness and jealousy of all the great functionaries of Church and State in India, and supporting the Unitarian Chapel, the Unitarian Press and the expense of his own publications, besides other charitable acts, out of a private fortune, of which he devotes more than one-third to acts of the purest philanthropy and benevolence."

তাৎপর্য্য।

'রামমোহন যদি (গবর্ন্মেণ্টের সমালোচনা না করিয়া) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে পদ ও চাকরির আকারে ভারতীয় গবর্ন্মেন্টের নিকট হইত পুরস্কার পাইবার প্রচুর সুযোগ তাঁহার হইতে কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য যেমন, সততার জন্যও তেমনি তিনি লক্ষ্যীভূত ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতিসাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালীতে সমভাবে আবশ্যক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি করিয়া এই সব করিয়াছেন। তাহাতে এই পুবস্কার পাইয়াছেন, যে, সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এং খৃষ্টীয় ইংলণ্ডীয় গির্জ্জার বড় বড় পাদ্রীদের অমৈত্রী ও ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান, নিজের কেতাবপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্ম্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।"

রামমোহন সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলরের দীর্ঘ অভিভাষণের এক জায়গায় আছে ঃ—

"The German name for prince is *furst,* in English first, he who is always to the fore, he who courts the place in fight of danger the first place and the last in flight. Such a *furst* was Rammohun Roy, a true prince, a real Rajah, if Rajah also, like Rex meant originally the steersman, the man at the helm."

তাৎপর্য্য ;

"প্রিন্সের জার্ম্মান প্রতিশব্দ ভুর্ষ্ট, ইংরেজী ফার্ষ্ট, তিনি যিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লয়েন, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা। রামমোহন রায় এইরূপ ভুর্ষ্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা—যদি লাটিন রেক্স্ শব্দটির মত রাজার মানে আদিতে ছিল কর্ণধার।"

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন ঃ—

"Sitting it the feet of Rammohun Roy, let us be imbued with his lofty spirit–his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress–let us be regenerated by the touch of his example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to and will help us to secure for oureslves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I believe, are reserved for us in the decrees of providence."

তাৎপর্য্য।

"রামমোহন রায়ের পাদপ্রান্তে শিক্ষার্থীরূপে উপবিষ্ট হইয়া আসুন আমরা তাঁহার উচ্চাশয়তাতে অনুপ্রাণিত হই—তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে, তাঁহার সত্যপরায়ণতাতে ও প্রগতির জন্য তাঁহার সোৎসাহ উদ্যমে ; আসুন আমরা তাঁহার দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে পুনর্জন্ম লাভ করি। তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিব, এবং বিধাতা তাঁহার বিধানে আমাদের জন্য যে-সব উচ্চ সৌভাগ্য রাখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইব।"

পরলোকগত বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন ঃ—

"One thing I believe we all will be agreed upon–all sects, whether orthodox Hindus of progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians–that to Rammohun Roy is due the credit of forcidly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a *yogi*, a *suttee*, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship."

"আমরা গোঁড়া হিন্দু বা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, যাহাই হই, এই একটি বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে একমত হইব, যে বিদ্বান্ হিন্দুদিগকে ইহা প্রত্যয়জনক ভাবে জানাইয়া দিবার প্রশংসা রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য, যে, ধর্ম্মলাভের জন্য কাহারও "যোগী" বা "সহমৃতা" বা অরণ্যবাসী হইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু গৃহপরিবার ও জনসমাজই যথাযোগ্য ভগবদারাধনার ও পরিবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।"

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হিমালয়ের পার্ব্বত্য লোকালয়সমূহে ভ্রমণ কালে তাঁহার কথাবার্ত্তার অনুলিপি রাখিয়াছিলেন। তাহা Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda নাম দিয়া স্বামী সারদানন্দ পুস্তকাকারে বাহির করেন। তাহার ১৯ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

"It was here too that we heard a long talk on Rammohun Roy, in which he [Swami Vivekananda] pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohun Roy had mapped out."

তাৎপর্য্য।

"এখানেই রামমোহন রায় সম্বন্ধে স্বামীজীর দীর্ঘ ভাষণ শুনিতে পাই। তাহাতে স্বামীজী বলেন,

শিক্ষাদাতা রামমোহনের বাণীর তিনটি প্রধান সুর, বেদান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, স্বদেশপ্রীতি প্রচার, এবং সেই মৈত্রী যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করেন, যে, রামমোহনের ঔদার্য্য ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কাজের তালিকা ও পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, তিনি [স্বামী বিবেকানন্দ] সেই কাজ করিতেছেন।"

ভারতবর্ষে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া লাভবান্ হইয়াছেন—যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, দেশভক্ত হইয়াছেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছেন ; সংস্কার উন্নতি ও প্রগতি চাহিতেছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও পৃথিবীর নানা দেশের সহিত মানসিক আদানপ্রদান করিতে পারিতেছেন, পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসে শ্রোতা দর্শক ও কর্ম্মী হইতে পারিতেছেন—তাঁহাদের একটি কথা স্মরণ করা ও মনে রাখা আবশ্যক। যখন ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই প্রশ্ন উঠে, তখন একদল লোক (ক্ষমতাশালী ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রায় সবাই এই দলে ছিলেন) কেবল সংস্কৃত আরবী পারসী ও কিছু দেশভাষা শিখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু রামমোহন স্বয়ং প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও ইংরেজী ভাষার সাহায্য আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একটি আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। তখন তখন সেই চিঠি ফলদায়ক হয় নাই। কিন্তু পরে যে ইংরেজী শিখাইবার পক্ষপাতী "ইংলিশ পার্টি" নামক দলের উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য পড়িয়া বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন। এই "ইংলিশ পার্টির" উদ্ভব সম্বন্ধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠার আছে ঃ—

It is important to notice that the strongest influence in bringing this "English Party" into exsistence were the petition of Rammohun Roy and the practical experience of the Committee.

তাৎপর্য্য।

ইহা লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক, যে ইংলিশ পার্টির উৎপত্তি যে-প্রবলতম প্রভাবের ফলে হয়, তাহা রামমোহন রায়ের আবেদনপত্র এবং কমিটির স্বীয় কার্য্যলব্ধ অভিজ্ঞতা।

মেকলের মন্তব্যেও রামমোহন রায়ের চিঠির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

১৩৪০ পৌষ
রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

কাহারও শতবার্ষিকী দুইবার আসে না—রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী আর আসিবে না এবং তাঁহার দ্বিশতবার্ষিকীর জন্য আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এই বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে করিতে হইবে। আমরা তাহা করি, বা না-করি, তাহতে তাঁহার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—তিনি নিজের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও থাকিবেন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করিলে মনুষ্যোচিত কাজ করা হইবে ; অধিকন্তু মানবজীবনের সকল বিভাগের সমঞ্জসীভূত উন্নতির তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদের জীবনও কতকটা সেই আদর্শের অনুযায়ী হইবে।

২৯ শে, ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় শতবার্ষিকীর শেষ উৎসব হইবে। ইহার সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণ পাঠ করিবেন এবং ভারতবর্ষের নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বহু মনীষী প্রবন্ধ পাঠ করিবে। মহিলা-সম্মেলনেও অনেক মনস্বিনী মহিলা প্রবন্ধ পড়িবেন। সাধারণ সম্মেলনে রাইট্ অনারেব্ল্ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, শ্রীযুক্ত কে নটরাজন, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হইবে। চতুর্থ অধিবেশনে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুচিরাম সাহনী প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হইবে। তদ্ভিন্ন রামমোহন রায়ের হস্তলিপি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

১৩৪০ মাঘ
রামমোহন রায়

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালীদের, ভারতীয়গণের এবং সমগ্র মানবজাতির যে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাস্তবে করিবার নিমিত্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, অর্থব্যয়, এবং স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ তাঁহার নিজের প্রতিভা ও চিন্তা হইতে প্রসূত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবিত ছিলেন, তখন সেই আদর্শ অনন্যসাধারণ ছিল, এবং তখনকার পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। এখনও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গীন

আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার লোক বিরল ; তাঁহার মত ভগবদ্ভক্তি, মানবপ্রীতি, সত্যপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সেই আদর্শের অনুসরণে সমর্থ একজন মানুষও এখন ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন ভারতীয় মহাপুরুষ তাঁহার মত আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করেন নাই বা তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কল্যাণের আদর্শের কোন কোন অংশের সাধনায় তাঁহার অপেক্ষা শক্তিমান্ ও কৃতী ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কল্যাণের আদর্শ অখণ্ড। দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল কোন একদিকে করিতে চাহিলে অন্য সকল দিকেও করা আবশ্যক। ধর্ম্মে, সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও আচারব্যবহারে, শিক্ষায় ও জ্ঞানে, সাহিত্যের সকল বিভাগে, ললিতকলায় ও পণ্যশিল্পে, কৃষিবাণিজ্যে ও আর্থিক সকল বিষয়ে এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ভারতবর্ষের উন্নতি আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের কোন দিকে উন্নতি, অন্য কোন-না-কোন এক বা একাধিক বিষয়ে উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই যে মানবজীবনের নানা বিভাগের উন্নতি ও প্রগতির পরস্পর-সাপেক্ষতা, তাহার অনুভূতি ও উপলব্ধি রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও কৃতিত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার সকল চেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস, যে, মানবে প্রীতি ও মানবের মঙ্গলসাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও তাঁহার সেবার শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি যে সাতিশয় প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া, নানা দুঃখ বরণ করিয়া, প্রাণহানিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাও এই বিশ্বাসে যে, তাঁহার জীবিতকালে হউক বা না-হউক ন্যায় ও সত্যের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গলসাধন চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে। এই জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গলবিধাতা এক পরব্রহ্মে তাঁহার বিশ্বাসকে বাদ দিয়া তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাহিত্যিক এবং অন্যবিধ কার্য্যাবলীর আলোচনা ও প্রশংসা করিলে বৃক্ষের মূলটি বিস্মৃত হইয়া পত্রপুষ্পফলের বর্ণনা ও প্রশংসার মত শুনায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি ভারতীয় মহাজাতিকে, মানবজাতিকে, যে-অবস্থায় আরূঢ় দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এখনও সে অবস্থায় আমরা উপনীত হই নাই। ইহা যদি সত্য হইত যে আমরা সকল বিষয়ে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে দুঃখের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। সমগ্র ভারতে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা, একমেবা-দ্বিতীয়মের আধ্যাত্মিক উপাসনা এবং তজ্জনিত চারিত্রিক উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা ও জাতীয় ঐক্য ও একাগ্রতা তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা তাঁহার সময় অপেক্ষা এখন কিছু অধিকসংখ্যক লোক করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই সামান্য উন্নতি ও প্রগতিকে সন্তোষজনক বলা যায় না। তদ্ভিন্ন যাঁহারা এরূপ উপাসনার সমর্থক, তাঁহাদের উপাসনা কি পরিমাণে মৌখিক ও মতগত এবং কি পরিমাণেই বা জীবনগত, তাহার বিচার করিতে গেলে অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না। তাহার উপর আবার ধর্ম্ম মাত্রেরই, ধর্ম্ম

জিনিষটিরই প্রতি অনাস্থা ও ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা ও নাস্তিক্য ঘোষিত হওয়ায় ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ ইহা ধ্রুব সত্য, যে, ধর্ম্ম অত্যাবশ্যক ও একান্ত আবশ্যক।

সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই তাহা আইনের দ্বারা রহিত হয়। কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে সহমরণ বা তাহার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে কাগজে পত্রে এবং মুখে মুখে যে-সব আলোচনা হয়, তাহাতে এই ধারণাই জন্মে, যে, সতীদাহনিবারক আইন না থাকিলে এখনও হয়ত সমাজের বৃহৎ এক অংশ স্বেচ্ছায়-সহমরণকে উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিত ও তাহার সমর্থন করিত, যদিও বলপূর্ব্বক বা কৌশলপূর্ব্বক বিধবাদাহের অনুষ্ঠান করিত কি-না বলা যায় না। বস্তুতঃ উহা যে উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে, শাস্ত্রীয় আদর্শও নহে, সতীত্বের উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে, এই বিশ্বাস এখনও আমাদের অস্থি-মজ্জাগত হয় নাই। উহা আদর্শ হইলেও পুরুষেরা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ আদর্শের অনুসরণ না-করায় এবং অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না, যে, পুরুষজাতি কর্ত্তৃক ঐ প্রথার প্রশংসা পুরুষস্বভাবের একটা মন্দ অংশ হইতে এবং নিষ্কারুণ্য হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমানে হিন্দু আইন বলিয়া গণিত বিধি অপেক্ষা অধিক ন্যায্য হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার-বিষয়ক বিধান প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। রামমোহন তাহা প্রদর্শন করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সময়ের অনুদার ও অন্যায্য বিধিই বলবৎ আছে।

সতীদাহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান অনুমিত ঐ জনমত হইতে এবং দেশে নারীদের নানা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হইতে মনে হয়, যে, রামমোহন সতীদাহ নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যিনি যে-কোন জাতির বয়সের ও অবস্থার দণ্ডায়মানা নারীর সমক্ষে আসন গ্রহণ করিতেন না, নারীজাতির প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ ও সানুকম্প ভাবের দিকে অগ্রসর হইবার এখনও অবসর আছে। সহমরণ-বিষয়ক তাঁহার একটি পুস্তিকায় তিনি নারীদের উচ্চতম জ্ঞানলাভের অধিকার ও যোগ্যতা, তাঁহাদের সাহস, ধৈর্য্য, সংযম, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রমাণিত করিয়াছেন। এরূপ মত কি এখনও দেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে?

জ্ঞানের সভ্যতার ও স্বাধীনতার যে উচ্চ শিখরে তিনি ভারতবর্ষকে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, দেশ এখনও সেখানে পৌঁছে নাই। অতএব সেই সব দিকেও অগ্রসর হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষ এশিয়াকে জ্ঞানোজ্জ্বল করিবে, তিনি এই আশা পোষণ করিতেন। সেই আশা পূর্ণ হইতেছে কি? এখনও ভারতে শতকরা ৯২ জন নিরক্ষর, এবং জাপানে শিশুরা ছাড়া সবাই লিখন-পঠনক্ষম।

শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তার বিশেষ কি হইয়াছে? পুরাণ-উপপুরাণের প্রচার অনেক হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপনিষদ প্রচার তিনি আধুনিক যুগে আরম্ভ করেন, তাহার চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে কি?

রামমোহন সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এখন সাতিশয় সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে উচ্চ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন। কিন্তু বাদশাহী ও নবাবী আমলেও দেশের লোকেরা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যে-সব উচ্চ কাজ করিতে পাইত ও পারিত, তাহারা এখনও তাহার অনেকগুলি হইতে বঞ্চিত।

রামমোহন জমীদার ও রায়ত উভয়েরই দেয় খাজনা স্থায়ী ভাবে নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্স দ্বারা নিজের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহা অনুসৃত হয় নাই। কৃষকদিগকে অস্ত্র দিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া "মিলিশিয়া" ভুক্ত করিয়া তিনি দেশরক্ষায় সমর্থ করিতে এবং সেই উপায়ে পরোক্ষ ভাবে পেশাদার স্থায়ী সৈনিকদের সংখ্যাহ্রাস ও সাময়িক ব্যয় হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অনুসৃত ব্রিটিশ রাজনীতি এখনও এই অতি-সমীচীন প্রস্তাবের অনুকূল নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। কৌশলী ইংলণ্ড অধীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে কর বলিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করে না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ভারতবর্ষের রাজস্বের অনেক কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে নীত হয়। এই তথ্যটি রামমোহন প্রথম হিসাব করিয়া দেখান ভারতবর্ষের রাজস্বের বহুকোটি টাকা এখনও প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়।

রামমোহন যে-সব কারণে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নীবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, যন্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা ভারতীয়গণকে শিখান তন্মধ্যে প্রধান একটি কারণ। এই সব বিদ্যার জ্ঞান এখনও এ-দেশে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ আছে।

পাশ্চাত্য নানা বিদ্যা শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীগণকে এরূপ ভাবে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত-কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা ঐহিক বিষয়ে ঔদাসীন্য না জন্মাইয়া পারত্রিক কল্যাণের মত ঐহিক কল্যাণেরও সহায় হয়। বেদান্তের চর্চ্চা এখনও এরূপ ভাবে ভারতবর্ষে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তমত গ্রহণ সম্বন্ধে আপনাকে রামমোহনের পথের পথিক বলিয়াছেন এবং বেদান্তকে ঐহিক উদ্যম-শীলতার পরিপোষক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাই বা কার্য্যতঃ কত লোক গ্রহণ করিয়াছে?

রামমোহন যে ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বা পুনঃপ্রবর্ত্তক, যে ধর্ম্মসমাজ তিনি স্থাপন করেন, সংস্কৃত "ব্রহ্মন্" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন তাহার "ব্রাহ্ম" নাম হইতে, তাঁহার রচিত সঙ্গীতনিচয় হইতে, তাঁহার ইংরেজী বাংলা হিন্দী অনুবাদ সহ বেদান্তসার ও কয়েকটি উপনিষদ প্রকাশ হইতে, খ্রীষ্টীয় মিশনরীদিগের সহিত তর্কবিতর্কে হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন হইতে, "ব্রাহ্মণসেবধি" ও "ব্রাহ্মিনিক্যাল ম্যাগাজিন" নাম দুইটি হইতে, বহু হিন্দু প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে ভূরিভূরি হিন্দুশাস্ত্রবচন উদ্ধার হইতে, এবং আরও নানা প্রমাণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, যে, তিনি হিন্দুত্ব হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। অথচ—অথবা তিনি প্রকৃত হিন্দু এবং আদর্শ ভারতীয় ছিলেন বলিয়াই—তিনি মুসলমানের কোরাণের এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানের বাইবেলের সাত্ত্বিক বাণীগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র শ্রদ্ধার সহিত মূল ভাষায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরমত-অসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম্মদ্বেষ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ও অন্য সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় যে নানা সাম্প্রদায়িক কলহ, বিবাদ, ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ও রক্তপাত, তাহা তাঁহার মত আচরণ ও আদর্শের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান বা হিন্দু কোন সম্প্রদায়ই এ-বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক যথেষ্ট অনুসরণ করেন নাই। রামমোহনের মত উদার জ্ঞানী সত্যদর্শী সমদর্শী নিরপেক্ষ দেশনায়কের প্রয়োজন এখন

বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে—অন্ততঃ হওয়া উচিত।

রামমোহন বাঙালী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের বা কেবল বাঙালীর সম্পত্তি ও শিরোমণি নহেন। তাঁহার হিতচিন্তা ব্রাহ্মসমাজে বা বাঙালী সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ভারতীয়, তিনি এশিয়ার মানুষ, তিনি মহামানব, তিনি বিশ্বমানবের আত্মীয়। তাঁহার "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব শ্লোকে, কথার কথায়, আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সময়ে যে-ইটালীতে যাইতে ছয় মাস লাগিত, তাহার নেপলস্‌বাসীদের স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ায় তিনি বিষাদমগ্ন হইয়াছিলেন, চীন পারস্য আফগানিস্থানের রাজনীতির আলোচনা নিজের সংবাদপত্রে করিতেন, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের জয়গান সোৎসাহে করিতেন, আয়র্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইলে চাঁদা তুলিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে যে দক্ষিণ-আমেরিকা যাইতে তখন এক বৎসর লাগিত তাহার স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী লাভ করিবার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি টাউন-হলে ভোজ দিয়াছিলেন, ইংলণ্ড প্রবাসকালে বলিয়াছিলেন, যে তথাকার রিফর্ম বিল (পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনবিধি সংস্কারের পাণ্ডুলিপি) আইনে পরিণত না হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিবেন, এবং সাধারণ ভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, "স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের বন্ধু নহে, তাহারা পরিণামে কখনও জয়যুক্ত হইবে না।" নিখিল জগতের নাগরিক এই মহামানব শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লিখিত একখানি চিঠিতে বলেন যে দেশে দেশে ঝগড়াবিবাদ মতানৈক্য হইলে যুদ্ধ ও রক্তপাত না করিয়া বিবদমান দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সভায় আলোচনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং তাহা করা উচিত। তিনি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের এই যে উপায় নির্দ্দেশ করেন, প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রধানতঃ সেই উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য লীগ অব নেশ্যন্স স্থাপিত হয়।

আধুনিক কালে অনেক মনীষী, রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও অন্য অনেক লোক বুঝিয়াছেন সকল দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গল অন্য সব দেশের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করে, কেহই সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারে না। শতবর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন রায় ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্তর্জাতিকতা (ইণ্টারন্যশন্যলিজ্‌ম্) প্রাণবান্ ছিল ও তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত, এবং তিনি অতি দূরবর্ত্তী দেশের লোকদের সুখদুঃখভাগী হইতে পারিয়াছিলেন।

মানুষের হৃদয় মনের ঐশ্বর্য্য—ভাব ও চিন্তা—তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন মানুষ যেমন অন্য এক জনকে নিজের এই সম্পদের অংশী করিয়া তাহাকে নিজের জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করে, তেমনি দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেও এইরূপ সম্পদের আদন-প্রদান দ্বারা তাহাদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। যখন রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন ছিল না, তখনও পুরাকালেও, এই আদান-প্রদান ছিল ;—তখনও দানে আতিথ্য এবং গ্রহণে ওদার্য্য ছিল। অন্য প্রকার আতিথ্যের মত, এই মানস আতিথ্যও ভারতবর্ষের ছিল। কিন্তু এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ভারতবর্ষ কেবল বিজেতার শক্তিতে পরাভূত হইয়া কিছু লইতে ও কিছু

দিতে বাধ্য হইত—তাহাতে আদান-প্রদানের আনন্দ ও ঔদার্য্য ছিল না, এবং ইহা কেবল বিজেতার সঙ্গেই হইত।

রামমোহন যে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে বিজেতার কৃষ্টি স্বীকার বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষ জাগতিক ভাব ও চিন্তার স্রোতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং জগতকেও নিজস্ব যাহা তাহা দিতে সমর্থ হইতেছে। রামমোহন নিজেই ইংরেজীর সাহায্যে, শুধু ব্রিটিশের নহে, অন্য পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতকে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার অংশী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবী নামক বৃহৎ জড়পিণ্ডের অংশ ছিল বটে কিন্তু জাগতিক মানস ঐশ্বর্য্যে ভারতীয়দের অধিকার ছিল না—তাহা হইতে তাহারা কিছু লইতে পারিত না ; সেই ঐশ্বর্য্যে কিছু রত্ন সংযোগ করিতেও তাহারা পারিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আমাদের গ্রহণ ও দান উভয়ই সম্ভব হইয়াছে, এবং এই প্রকারে ভারতবর্ষ আধুনিক জগতের অংশ হইয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিকতা উৎপাদিত হইয়াছে।

রামমোহনকে যে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়, তাহার এক কারণ, তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক হইবার পথে স্থাপন করেন, প্রাচীনের জরা পঙ্গুতা ও স্থাণুতার পরিবর্ত্তে তাহাকে নবীনের তারুণ্য, উদ্যম ও সচলতা দান করেন. অন্য কারণ, তিনি যুগপ্রবর্ত্তক ; তিনি আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, ধার্ম্মিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহু প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী

এই মহাপুরুষের মৃত্যুর শত বৎসর পরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে-সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের অন্ততঃ কতক লোক তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। হয়ত যখন তাঁহার জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী হইবে, তখন আরও অনেক বেশী লোকে তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত ও কৃতজ্ঞ হইবে, এবং ২০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যুর দ্বিশতবার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইবে, তখন ভারতবর্ষের অধিকতর স্থানে তাহা সম্পন্ন হইবে।

যেখানে যেখানে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ভাল। কিন্তু কেবল সভাসমিতি, আলোচনা, স্মারক-চিহ্ন স্থাপন, প্রভৃতিই যথেষ্ট নহে। রামমোহন যেমন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাহিয়াছিলেন, সকলে নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুসারে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিলে তবে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

রামমোহন বাঙ্গালী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে ব্রাহ্মের সংখ্যা বেশী। এই জন্য যদি বাঙালীদের দ্বারা ও ব্রাহ্মদিগের দ্বারা শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান বঙ্গদেশেই অধিকতম স্থানে হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময় বা প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু যদি বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে না হইয়া তাহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইবে। শতবার্ষিকীর রিপোর্ট বাহির হইলে ঠিক তথ্য জানা যাইবে।

বাংলা দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে ও অধিক সমারোহের সহিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যূনকল্পে পঞ্চাশটি স্থানে উৎসব হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাত আট দশ দিন ধরিয়া হইয়াছে। দশ বারটি জায়গায় প্রধান প্রধান রাস্তার নাম রামমোহন রায়ের নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে। বহু স্থানের টাউন-হলে বা অন্য হলে তাঁহার চিত্র রাখা হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভাষাগুলি বাংলা ভাষার সহিত একজাতীয় নহে, তথায় জাতিভেদের ও গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রভাব খুব বেশী। অথচ সেখানেই রামমোহনের প্রভাব এত বেশী অনুভূত হইবার কারণ কি, তাহা আলোচনার যোগ্য। মান্দ্রাজকে তমসাবৃত (benighted) প্রদেশ বলা হয় বটে ; কিন্তু সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা পড়াশুনা খুব করেন, ইংরেজী পুস্তক ও মাসিক পত্রাদির কাট্‌তি সেখানে খুব বেশী। মান্দ্রাজ প্রদেশবাসীদের মধ্যে কৃতী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাংবাদিক বিদ্যমান আছেন। ঐ প্রদেশে অন্ধ কুসংস্কারের প্রকোপ বেশী ছিল বা আছে বলিয়াই হয়ত প্রতিক্রিয়াবশতঃ তথাকার প্রগতিকামী লোকেরা সংস্কারের মর্য্যাদা বেশী বুঝিতে পারেন।

কলিকাতার শতবার্ষিক উৎসব যথাযোগ্য-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাঙালী, ভারতীয় ও অন্য দেশীয়েরা যোগ দিয়াছিলেন, বা দূর হইতে তাঁহাদের সহানুভূতিজ্ঞাপক বাণী পাঠাইয়া-ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিন কিছুকাল সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার আগে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ও বাহিরের নানা নগর হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতিজ্ঞাপক বার্ত্তার উল্লেখ করেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগ প্রথমে এই বার্ত্তাগুলির তালিকা পড়িয়া পরে তাহার কতকগুলির কোন কোন অংশ পাঠ করেন। যাঁহারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নীচে লিখিত হইল।

মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লণ্ডন হইতে সি এফ এণ্ড্রুজ, সারনাথ হইতে বৌদ্ধ মহাবোধি সমিতির সেক্রেটরী দেবপ্রিয় বলীসিংহ (সিংহলী), দার্জ্জিলিঙের নিখিল-ভারতীয় বৌদ্ধ কন্‌ফারেন্স, জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত রামদেব শর্ম্মা, পঞ্জাবের মাননীয় সর্দ্দার স্যর যোগীন্দ্র সিং (শিখ), সর্দ্দার প্রতাপ সিং, আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যর সৈয়দ রস মাসূদ, কলিকাতার খ্রীষ্টীয় লর্ডবিশপ রাইট রেভরেণ্ড পী পেকেন্‌হ্যাম্ ওয়্যাল্‌শ্ খ্রীষ্টীয় বিশপস্ কলেজের এ জে আপ্পাস্বামী, পাদ্রী ফাদার ভেরিয়ের এল্‌উইন, অক্সফোর্ডের য়ুনিটেরিয়ান্

রেভরেণ্ড ডব্লিউ এইচ ড্রামণ্ড, রুমেনিয়া দেশের খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদী বিশপ জর্জ্জ বোরোস, আমেরিকার ডক্টর জে টি স্যাণ্ডার্ল্যাণ্ড, আমেরিকার রেভরেণ্ড এফ সী সাউথওয়ার্থ ও তাঁহার পত্নী, আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ান সভার রবার্ট সী ডেক্সটার, আমেরিকার যুবজনের ধার্ম্মিক সম্মিলনীর ("Young People's Religious Union-এর) ড্যানা ম্যাকলীন আমেরিকার রেভরেণ্ড হেন্‌রী উইল্‌ডার ফুট, তথাকার এল্ ডি ওয়াল্ড ও এ এল্ লিস্‌বার্গার, অন্ধ্রদেশের একেশ্বরবাদীদের কন্‌ফারেন্স, ভী বরদারাজুলু নাইডু, আজমীরের দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস শারদা, জার্মেনীর কন্সাল জেনের‍্যাল, চেকো-শ্লোভাকিয়ার কন্সাল জেনের‍্যাল, চিত্রশিল্পী ও দার্শনিক নিকলাস রোয়েরিক, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এস্ শার্লেটি, ফ্রান্সের পক্ষ হইতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল বোনো, ইংলণ্ড হইতে স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং লণ্ডনের শতবার্ষিকী কমিটী।

ফ্রান্সের ম্যাডেম এল্ মোরিন রামমোহনের প্রতি ভক্তিমতী একজন ফরাসী লেখিকা। তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি কলিকাতার শতবার্ষিকীতে ফরাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে কিছু বলেন, এবং প্যারিস হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ অধ্যাপক সিল্‌ভেন লেভীর চেষ্টায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যেসব অনুষ্ঠান ফ্রান্সে হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করেন। অধ্যাপক লেভীর মূল ফরাসীতে লিখিত বাণী সভাস্থলে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

সেনেট হাউসে কলিকাতার শতবার্ষিকী সভার চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। বিনামূল্যে সেনেট হাউসে প্রবেশের কাহারও অধিকার ছিল না। তথাপি প্রত্যেক অধিবেশনে হল পূর্ণ হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনের কতক বৃত্তান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। পরে তাহাতে এবং অন্য অধিবেশনগুলিতে যাহা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মৌলবী আবদুল করীম কর্ত্তৃক ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, ইহুদী ধর্ম্মের দিক হইতে ইহুদী মিঃ ঈ এ আরাকীর রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা, বৌদ্ধধর্ম্মের দিক হইতে ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা, "অর্ডার অব্ দি গ্রেট কম্প্যানিয়ন্স"ভুক্তা কুমারী মার্গারেট বারের "বিশ্বমানবিক রামমোহন" সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, রামমোহন ও আধুনিক ভারতবর্ষের পুনর্জ্জাগরণ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আদ্যানন্দের প্রবন্ধপাঠ, আর্য্যসমাজের দিক হইতে রামমোহন সম্বন্ধে আর্য্যসমাজের পণ্ডিত ঋষিরামের প্রবন্ধপাঠ এবং রামমোহন ও শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যাপক উত্তম সিংহের প্রবন্ধপাঠ। রেভরেণ্ড ডক্টর আর্কহার্টের প্রবন্ধের ("A Pilgrimage in Memory from a Christian Standpoint"), মিঃ ডি জে ইরাণীর প্রবন্ধের ("Rammohun and the Teachings of Zoroaster") এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ("Rammohun Roy the Monotheist") সারমর্ম্ম, লেখকগণ অনুপস্থিত থাকায় অধ্যাপক কালিদাস নাগ পাঠ করেন।

ঐ দিন (২৯শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যাকালে সেনেট হাউসে মহিলাদের শতবার্ষিকী

কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। নিখিলভারতীয় মহিলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবার কলিকাতায় হইতেছিল। তাঁহারা শতবার্ষিকীতে যোগ দিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে উহার প্রতিনিধি ও সভ্যেরা সেনেট হাউসে আগমন করেন। শ্রীমতি কুমুদিনী বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তীর সমর্থনে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার বাংলা প্রার্থনা ও ইংরেজী অভিভাষণের পর মান্দ্রাজের ডাঃ শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্‌ডী এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন ঃ—

"This conference of women pays its respectful homage to Raja Rammohun Roy during his centenary celebration for his inestimable and magnificent services to humanity to his country and to the cause of Indian womanhood."

পঞ্জাবের শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কুআর ইহা সমর্থন করেন, এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিসেস্ কাজিন্স, ম্যাডেম এল্ মোরিন্, শ্রীমতী হেমলতা সরকার, বেগম শামসুল নাহার মাহ্‌মুদ ও শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইহার পোষকতা করেন। সময়ের অল্পতা বশতঃ শ্রীমতী শান্তা দেবী, সীতা দেবী, নিরুপমা দেবী, সরোজিনী দত্ত, শোভনা নন্দী, সুধা চক্রবর্ত্তী ও সরলাবালা সরকারের প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হয় নাই।

৩০শে ডিসেম্বর শতবার্ষিকীর তৃতীয় অধিবেশনের প্রারম্ভে অধ্যাপক ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রার্থনা করেন এবং ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকারের প্রস্তাবে ও ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর আচার্য্য বসু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ "রামমোহন ও রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সময় আচার্য্য বসু সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে সভাপতির কার্য্য করিতে বলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "রামমোহন ও আইন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অভিভাষণ হয়। তাহার বিষয় ছিল "Mysticism and Clarity as blended in Rammohun" । ইহার পর তিনি মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিয়ুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি এ নটেশনকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলেন এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক নরেশচন্দ্র রায় "রামমোহন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর লাহোরের ফর্ম্যান খ্রীষ্টিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর এস্ কে দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন, এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর "রামমোহন ও সকল ধর্ম্মের ভিত্তিগত ঐক্য" সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন "শিক্ষাক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কর্ম্মী রামমোহন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর মৌলবী ওয়াহেদ হুসেন "রামমোহনের একেশ্বরবাদের স্বরূপাবলী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ অধ্যাপক কালিদাস নাগ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

চতুর্থ অধিবেশনের প্রারম্ভে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রার্থনা করেন, এবং ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সমর্থিত মৌলবী আবদুল করীমের প্রস্তাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ম্যাডেম এল্

মোরিন রামমোহনের অল্প-দিনব্যাপী প্যারিস প্রবাস বর্ণনা করেন এবং বলেন, যে, তাঁহর ভক্তেরা এখন প্যারিসে তাঁহার প্রবাস-চিহ্নগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। মৌলবী আবদুল করীম "রামমোহন আধুনিক ভারতের আদর্শ ও অগ্রদূত" বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করেন। অতঃপর তাঁহার অনুরোধে আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি দুর্ব্বল থাকায় অধ্যাপক কলিদাস নাগকে তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে বলেন। তদনন্তর পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "উপাসনা সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা" বিষয়ক এবং পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্ত-বাগীশ "ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েন। ইহার পর মৌলবী আবদুল করীম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং রাওসাহেব ডক্টর ভি রামকৃষ্ণ রাও "রামমোহন ও একমেবা-দ্বিতীয়ম্" সম্বন্ধে ও ডক্টর সরোজকুমার দাস "রামমোহন ও বেদান্ত" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষোক্ত প্রবন্ধটি পঠিত হইবার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেনেট হাউসে আগমন করেন। তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অপঠিত থাকে ঃ—অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদারের "Rammohun the father of Modern Political Movements in Lndia," পঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম সাহনীর "Rammohun's Passion for liberty", অধ্যাপক সুকুমার সেনের ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর "রামমোহনের বাংলা গদ্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় এবং অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের "Rammohun the last link in the chain of India's Prophets" ।

সর্ব্বশেষে বক্তৃতা করিয়া এবং তাঁহার বহুপূর্ব্ব রচিত "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে" শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার রামমোহন রায় শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

কলিকাতার ও অন্য স্থানের রামমোহন রায় শতবার্ষিকীতে তাঁহার সম্বন্ধে যত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে এবং প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের, চেষ্টার ও কৃতিত্বের বিশালতা ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষ ওই শতবার্ষিকীতে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমার ভক্তির সীমা নাই রামমোহন রায়ের প্রতি, কিন্তু আমার শক্তির সীমা আছে।"

১৩৪০ ফাল্গুন

রামমোহন রায়ের সমালোচনা

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাকে সকল জীবের, সকল মানুষের, চেয়ে বড় বলিয়া মানেন। কিন্তু ঈশ্বরও সমালোচকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার কত দোষ ত্রুটি অসঙ্গতি অবিচার পক্ষপাতিত্বই না তাহারা দেখাইয়াছে! এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং কোন মানুষ যে সমালোচকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বস্তুতঃ সমালোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কাহারও পক্ষে ভাল নয়। সাধারণ মানুষ, যে-সে মানুষ ত সমালোচিত হইতেই পারে। কিন্তু মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহারা বড়-বড় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারা এবং সেই সেই সম্প্রদায়ের বাহিরের অনেক লোকের দ্বারাও সম্মানিত, তাঁহারাও সমালোচিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের সমালোচনা হইয়াছে, যীশু খ্রীষ্টের সমালোচনা হইয়াছে—কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমালোচনা হয় নাই?

অতএব রামমোহন রায়কে যাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহারা এরূপ আশা কখনও করিতে পারেন না, যে, তাঁহার সমালোচনা হইবে না। তাঁহার সত্যপ্রিয় ভক্তেরা এরূপ আশা বা অভিলাষ করেন নাই ; কেহ কেহ নিজেই তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাই চান, যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে সমস্তই বলা হউক এবং পরীক্ষিত হউক ; তাহার ফলে, সত্য যাহা তাহাই প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হউক। তাহাতে রামমোহনের মহত্ত্বের হ্রাস হইবে না।

মানুষ সাধারণ হউক, বা অসাধারণ হউক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে যথেষ্ট প্রমাণ-সহকারে বলা আবশ্যক, এবং প্রমাণগুলি পূরাপূরি সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা আবশ্যক।

তা ছাড়া, সমালোচনার সময়-অসময়ও আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে কয়েক জন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক শ্মশান অভিমুখে তাঁহাদের শবের অনুগমন করিয়াছে এবং তাহার পর তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বহু স্থানে সভা হইয়াছে। কোন মানুষই পূর্ণ মানুষ নয়, সকলেরই অপূর্ণতা আছে। ইহাঁদেরও অপূর্ণতা ছিল। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রাক্কালে বা স্মৃতি-পূজার সভার প্রাক্কালে তাঁহাদের অপূর্ণতাগুলি প্রদর্শন করা ভিন্নদলভুক্ত ভারতীয়েরাও শোভন ও সময়োচিত মনে করেন নাই। লোকমান্য টিলকের মৃত্যুর পর ষ্টেট্স্‌ম্যান তাঁহার অযথা দোষোদ্ঘাটন করায় উহার ভারতীয় অনেক গ্রাহক ও ক্রেতা উহা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিখ্যাত যে-সব লোক বহু পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বার্ষিক সভা হইয়া থাকে। অন্য সময়ে তাঁহাদের সমালোচনা হইলেও ঠিক এইরূপ সভা হইবার প্রাক্কালেই সমালোচনা অশোভন বিবেচিত হইয়া থাকে।

এইরূপ নানা কারণে, আমরা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকীর বৎসরে ও তাহার প্রাক্কালে তাঁহার কোন সমালোচনা মুদ্রিত করা অনুচিত

মনে করিয়াছিলাম। কেহ মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও আমরা তাহার উত্তর দিতে অগ্রসর হই নাই। আমরা চাহিয়াছিলাম, রামমোহনের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা অবাধে প্রাণ খুলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন—শতবার্ষিকী ত দুইবার আসে না, আর আসিবে না।

শ্রদ্ধাপ্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে দোষোদ্ঘাটন অশোভন বা অ-সময়োচিত বলিয়াই যে তাহা বর্জ্জনীয়, তাহা নহে ; অন্য কারণও আছে। মধ্যাহ্নকালেও চোখের সামনে ছাতা খুলিয়া ধরিলে, এমন জ্যোতিষ্মান্ যে সূর্য্য তাহাকেও মানুষ দেখিতে পায় না। ছাতাটা কাল ও ছোট, সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ ও অতি বৃহৎ। কিন্তু ছাতাটা মানুষের খুব কাছে, সূর্য্য দূরে। তাই ক্ষুদ্র বৃহৎকে ঢাকিয়া ফেলে। সেইরূপ অতি বিখ্যাত ও কৃতী ব্যক্তিরও কোন সত্য, অনুমিত, বা কল্পিত দোষ যদি পাঠকদের সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মহৎ চরিত্র এবং কীর্ত্তিও অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পাঠকেরা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে। রামমোহন রায়ের প্রতি যখন শ্রদ্ধা দেখাইবার আয়োজন হইতেছিল, তখন তাঁহার সত্য বা কল্পিত দোষ উদ্ঘাটন করা এই জন্য আমাদের বিবেচনায় অসমীচীন মনে হইয়াছিল। অবশ্য, যদি কাহারও মতে ইহাই সত্য হয় যে, রামমোহন মানুষের জন্য কল্যাণকর ও প্রশংসনীয় কিছুই করেন নাই, বা তাঁহার কার্য্য ও চরিত্রে প্রশংসনীয় অপেক্ষা অপ্রশংসনীয় অংশই বেশী ছিল, তাহা হইলে সময় অসময় শোভন অশোভন কিছুই বিবেচনা না করিয়া রামমোহনের দোষোদ্ঘাটন করা কোন সময়েই তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত নহে।

সব মানুষই অপূর্ণ। রামমোহন রায় মানুষ ছিলেন, সুতরাং অপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে-কোন দোষ যে-কেহ দেখাইয়াছেন বা দেখাইবেন, তাহাই সত্য বলিয়া আমরা মানিয়া লইয়াছি বা লইব, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে মানিব, নতুবা মানিব না। এ-পর্য্যন্ত সম্প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা লেখা বা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। পরে কি হইবে, জানি না।

১৩৪২ মাঘ

রামমোহন ও রাজারাম

[উত্তর]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার 'রামমোহন রায় ও রাজারাম' শীর্ষক প্রবন্ধ ১৩৩৬ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তাহার পর কয়েক মাস ধরিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা চলে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশ ও আলোচনার দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মত প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিৎ ও

ঐতিহাসিককে রাজারাম-প্রসঙ্গের পুনরায় অবতারণা করিতে দেখিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম।

আমার এই আশা সফল হয় নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে এমন একটি নূতন সংবাদ নাই যাহার দ্বারা রাজারাম সম্বন্ধে অকাটা সত্যনির্দ্ধারণের কোন সহায়তা হইতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রামমোহনের সহিত রাজারামের কি সম্পর্ক সে-সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ-প্রমাণ নাই, বোধ করি কোন দিন আবিষ্কৃতও হইবে না। এ-অবস্থায় নানা দিক হইতে টুকরা টুকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি একটা সম্ভবপর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই যুক্তি-পরম্পরার চূড়ান্ত খণ্ডন বা চূড়ান্ত সমর্থন একমাত্র নূতন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে। পৌষের 'প্রবাসী'তে রমাপ্রসাদ বাবু এইরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই ; শুধু আমার যুক্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, আমি রাজারাম সম্বন্ধে যে-অনুমান করিয়াছি তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। নূতন প্রমাণের অভাবে কেবল এই সকল যুক্তিতর্কে আমার পূর্ব্বমীমাংসার বিন্দুমাত্র খণ্ডন হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমার মূল প্রবন্ধে আমি তিনটি বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেগুলি এই ঃ—

(১) রাজারামের অপর নাম শেখ বখ্‌শু, অর্থাৎ জাহাজে উঠিবার অনুমতি-পত্রে যে-শেখ বখ্‌শুর নাম পাওয়া যায় সে ও রাজারাম অভিন্ন ব্যক্তি ; সুতরাং রাজারাম প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমান।

(২) রাজারাম অজ্ঞাতজন্মা এবং রামমোহনের পালিত পুত্র মাত্র, এই মর্ম্মে যে- সকল কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলি কাল্পনিক।

(৩) রামমোহনের এক জন মুসলমান-প্রণয়িনী ছিলেন.এইরূপ একটা জনশ্রুতি রামমোহনের সমকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; এই জনশ্রুতি সম্ভবতঃ সত্য এবং রাজারাম সম্ভবতঃ এই মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত রামমোহনের পুত্র। সাক্ষাৎ-প্রমাণ না-পাওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমানেই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই।

(১) রাজারাম ও শেখ্ বখ্‌শু কি একই ব্যক্তি?

সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে যে-যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম তাহা একটা সহজ হিসাব। রামরত্ন মুখুজ্যে, রামহরি দাস ও রাজারাম এই তিন জন রামমোহনের সহিত বিলাত গিয়াছিল ইহা একাধিক জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে ; ইহারা যে বিলাতে ছিল তাহারও সাক্ষাৎ-প্রমাণ আছে ; ইহারা যে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে ; সুতরাং রামমোহনের বিলাতযাত্রায় ও বিলাতপ্রবাসে এই তিন জন যে তাঁহার সঙ্গী ছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকারী দপ্তরে রামমোহনের তিন জন সঙ্গীর উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু উহাদের নাম দেওয়া আছে রামরত্ন মুখুজ্যে, হরিচরণ দাস ও শেখ বখ্‌শু। আমি আলোচনা করিয়া দেখাই যে, রামহরি দাস ও হরিচরণ দাস একই ব্যক্তি, সুতরাং শেখ বখ্‌শু রাজারাম ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না।

রামমোহনের সহিত তিন জনের অধিক সঙ্গী যায় নাই, এবং সরকারী দপ্তরে যে অনুমতির উল্লেখ আছে উহাই রামমোহনের বিলাতযাত্রার প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতি-পত্র, এই দুইটি কথা মানিলে আমার যুক্তি অখণ্ডনীয়। সেজন্য যাঁহারা রাজারাম ও শেখ বখ্‌শু এক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চান না তাঁহারা নানারূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, রামমোহনের সহিত উপরোক্ত তিন জন ছাড়া আরও দুই জন লোক গিয়াছিল ইহার উল্লেখ সংবাদপত্রে* আছে, এবং অনুমান করেন, সরকারী দপ্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া উহাদের অনুমতি-পত্রের উল্লেখ বা নকল পাওয়া যাইতেছে না। নিম্নলিখিত কারণে এই অনুমান আমি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি ঃ—

(১) ডাঃ কার্পেণ্টার রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট বন্ধু ; রামমোহনের শেষের দিনগুলি তাঁহারই সহিত ব্রিষ্টলে কাটিয়াছিল। ডাঃ কার্পেণ্টারের লেখা হইতে জানা যায়, এদেশ হইতে যাত্রা করিয়া রামমোহন যখন সর্ব্বপ্রথম লিভারপুলে অবতরণ করেন, তখন

* "Baboo Rammohun Roy and son, 4 servants."– *The John Bull* Nov. 13, 1830.

তাঁহার সহিত তিন জন সঙ্গী ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"On the 8th April, 1831, the Rajah arrived at Liverpool, accompanicd by his youngest son, Rajah Ram Roy, and two native servants, one of them a Brahunin..." (Mary Carpenter's *Last Days*, etc., p. 68.)

রামমোহনের সহিত যদি ইহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক পরিচারক গিয়া থাকে, ডাঃ কার্পেন্টার তাহাদের উল্লেখ করিলেন না কেন? আমরা দেখিতেছি তিনি পরিচারকদের জাতি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেছেন।

(২) ব্রিষ্টলে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও আমরা রামমোহনের তিন জন সঙ্গীরই—রামরত্ন, রামহরি ও রাজারামের—নাম পাই। (Ibid., p. 130) রামমোহনের সহিত অতিরিক্ত কোন পরিচারক যদি বিলাত গিয়া থাকে, তবে এই ঘটনার সময় তাহারা কি অনুপস্থিত ছিল, না ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল?

(৩) সরকারী অনুমতি-পত্র ব্যতীত জাহাজে বিদেশে যাইবার এখন যেমন উপায় নাই, তখনও তেমনই ছিল না। একখানি ছাড়পত্রে রামমোহনের নিজের এবং আর একখানি ছাড়পত্রে তাঁহার তিন জন সঙ্গীর বিলাত যাইবার অনুমতি আছে। তাহা হইলে আরও দুই জন লোক সরকারী অনুমতি ব্যতীত কোম্পানীর নিজ জাহাজে চড়িয়া বিলাত গেল কি করিয়া?

(৪) সংবাদপত্রের যে-বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া "পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহারে রামমোহন" বিলাত যাইতেছেন বলা হয়, তাহা ঠিক একই আকারে এদেশের একাধিক সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। সংবাদটি কোন কাগজে ১৮৩০ সনের ১৩ই নবেম্বর, কোন কাগজে বা ১৫ই নবেম্বর প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে সংবাদটি যে মুদ্রণের জন্য ১৩ই নবেম্বরের এবং রামমোহনের যাত্রার পূর্ব্বেই সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু রামমোহন সরকারের নিকট হইতে তাঁহার তিন জন সঙ্গীর অনুমতি-পত্র লন যাত্রার দিনই—১৫ই নবেম্বর। সুতরাং এই অনুমতিপত্র বাতিল করিয়া পুনরায় তিনি যে পুত্র ও চারি জন পরিচারকের জন্য নূতন ছাড়পত্র লইয়াছিলেন—এরূপ অনুমানের অবকাশ অতি অল্প। সুতরাং যে-কোন কারণেই হউক, শেষ-পর্য্যন্ত ঠিক ঐ সংখ্যক পরিচারকের যাওয়া হয় নাই।

বলা বাহুল্য, এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি খণ্ডন করিতে হইলে রামমোহনের সহিত যে তিন জনের অধিক সঙ্গী গিয়াছিল তাহার সাক্ষাৎ-প্রমাণের প্রয়োজন। সে-প্রমাণ নাই। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু এই পথ না ধরিয়া অন্য পথ ধরিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, আমি যে অনুমতি-পত্রের উল্লেখ পাইয়াছি উহা রামমোহনের যাত্রার প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতি-পত্র নয়, তাঁহার সহিত অন্য লোকও গিয়াছিল এবং অন্য অনুমতি-পত্রও লওয়া হইয়াছিল। তবে যদি আপত্তি উঠে পূর্ব্ব অনুমতি বাতিল করিয়া নূতন অনুমতি কেন লওয়া হইল, কি করিয়া এই নূতন অনুমতি লইবার সময় পাওয়া গেল, এবং এই নূতন অনুমতির উল্লেখ সরকারী দপ্তরে নাই কেন, তাহার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন ঃ—

(ক) 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ (যে-জাহাজে রামমোহন বিলাত যান তাহার নাম) ১৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে ছাড়ে নাই,—ছাড়িয়াছিল ১৯এ তারিখে, সুতরাং নূতন অনুমতি লইবার সময় ছিল ;

(খ) আগে রাজারামের সঙ্গে-যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু যাত্রার দিন যখন ঘনাইয়া আসিল—অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পরে—রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়াতে রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।

(গ) সরকারী দপ্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া উহাতে এই পরিবর্ত্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না।

রমাপ্রসাদ বাবু এক স্থলে আমার দলিল সংগ্রহ ও ব্যাখ্যান রীতি "বড়ই বিচিত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা প্রচলিত ধারণাকে বজায় রাখিবার জন্য নিজেদের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না, অথচ যে-প্রমাণ হাতের কাছে

রহিয়াছে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া 'অন্য প্রমাণ ছিল কিন্তু তাহা লোপ পাইয়াছে' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ও বালক রাজারাম কাঁদিতে বসিল এইরূপ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের ইতিহাস-চর্চ্চা যে কিরূপ বিচিত্র তাহা বোধ করি তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রত্যেকটি অনুমান যে ভিত্তিহীন তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে বুঝা যাইবে ঃ—

(১) 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ ১৮৩০ সনের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে ছাড়ে, আমার এই উক্তি রমাপ্রসাদ বাবুর মতে একটি "মস্ত ভুল"। তিনি বলেন, কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছিল ১৯এ নবেম্বর, কারণ এই মর্ম্মে মিস্ কার্পেন্টারের পুস্তকে রামমোহনের একটি উক্তি ("...he sailed from Calcutta, Nov 19, 1830") উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "মিস কলেটও ১৯শে নবেম্বর রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার তারিখ স্বীকার করিয়াছেন।" রমাপ্রসাদ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, "ব্রজেন্দ্রবাবু যে কেন রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না।" রামমোহনের এই উক্তিটি ১৮৩২ সনে বিলাতে প্রকাশিত তাঁহার একখানি পুস্তকে* প্রথমে পাওয়া যায়। উহা ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে লিখিত স্মৃতিকথা। উহার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা হইতে জাহাজ-ছাড়ার সঠিক তারিখ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবার কি বিপদ তাহা বোধ করি রমাপ্রসাদ বাবুর মত প্রবীণ ঐতিহাসিককে আমার বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু তিনি যদি আজ-পর্য্যন্ত তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে রামমোহনের যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে যে সাক্ষাৎ-প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে উহা হইতেই তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'অ্যালবিয়ন' জাহাজের যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে যে-সকল সমসাময়িক প্রমাণ আছে তাহা এই,—

(ক) ১৭ই নবেম্বর তারিখের ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

Departures

Nov. 15, Ship *Albion* N. Me Lcod for Liverpool.

(খ) ১৯এ নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

Station of Vessels in the River.

Nov. 17, 1830 Diamond Harbour *Albion* and *Diederica* (D) passed down.

(গ) ঠিক ১৯এ নবেম্বর তারিখেই বঙ্গোপসাগরের মাথায় খিজ্‌রি বন্দর হইতে রামমোহনের নিজের লিখিত একখানি পত্র পাই ("Kedgeree, Nov. 19 1830")।† এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ও পাণিনি আপিস হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৪৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) ২২শে নবেম্বর তারিখের 'জন্ বুল' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

Station of Vessels in the River.

Nov. 20. Kedgeree. ***Albion*** and ***Diederica***, (D),

proceeded down.

(ঙ) ২৪শে নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

The ***Andromache, Albion, and Diederica***, (D), gone to sea from Saugor on the 22nd November.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ কলিকাতা হইতে ১৫ই নবেম্বর তারিখে ছাড়িয়া ১৭ই তারিখে ডায়মণ্ড-হারবার অতিক্রম করিয়া ১৯এ খিজ্‌রি পৌঁছে ও ২০ তারিখে খিজরি হইতে ছাড়িয়া

* *Judicial and Revenue Systems of India*—Preliminary Remarks (Panini Office ed., p. 236.)

† সে-যুগে কলিকাতা হইতে বিলাতগামী জাহাজের সঙ্গে খিজ্‌রি পর্য্যন্ত পাইলট্ যাইত। খিজ্‌রি হইতে পাইলট্‌কে বিদায় দেওয়া হইত, এবং সেই প্রত্যাগামী পাইলট্‌ব্রিগ্-এর সুযোগ লইয়া যাত্রীরা তাহার হাতে কলিকাতাস্থ বন্ধুদের জন্য শেষ পত্র পাঠাইতেন। রামমোহনও এই ভাবেই তাঁহার শেষ চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।

২২এ তারিখে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিতে জাহাজের এই সময় লাগিত।

রমাপ্রসাদ বাবু যাহাকে "রামমোহনের উক্তি" বলিয়াছেন তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেন আমি ১৫ই নবেম্বরই রামমোহনের বিলাতযাত্রার প্রকৃত তারিখ বলিয়াছি তাহা বোধ করি তিনি এখন বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি যে এই প্রসঙ্গে কেন রামমোহনের নিজের গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকের দোহাই দিলেন ও মিস্ কলেটকে সাক্ষী হিসাবে মানিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলী দেখেন নাই? এবং এই ব্যাপারের প্রমাণ-হিসাবে মিস্ কলেটের "দু-হাত-ফেরা" (secondhand) উক্তির কোন মূল্য নাই তাহা জানেন না?

(২) রামমোহনের কলিকাতা হইতে যাত্রার তারিখ যখন ১৫ই নবেম্বর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তখন এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ বাবুর অন্য অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। তবু দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে রামমোহন ১৫ই নবেম্বর তারিখে তিন জন সঙ্গীর সম্বন্ধে যে অনুমতি পাইয়াছিলেন তাহা শেষ-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য ব্যক্তির জন্য অনুমতি লইয়াছিলেন ও রাজারাম "ব্যাকুল হইয়া পড়াতে" এই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল—এই দুইটি কথাই রমাপ্রসাদ বাবুর নিছক কল্পনা।

প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, সেক্রেটরী রামমোহনের তিন জন সঙ্গীকে অনুমতি দেওয়ার কথা কাউন্সিলে বিবৃত করিতেছেন ১৬ই নবেম্বর, অর্থাৎ 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার পরদিন।* জাহাজ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে সঙ্গীপরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হয় নাই। সুতরাং শেষ-মুহূর্ত্তেও সঙ্গীপরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে সেক্রেটরীর নিকট ১৬ই তারিখে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। এ-অবস্থায় তিনি রামমোহনের প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতির কথা কাউন্সিলে না-বলিয়া, বাতিল অনুমতির কথা কেন বলিতে যাইবেন?

দ্বিতীয় কথা, রাজারাম হঠাৎ "ব্যাকুল হইয়া" পড়ায় জন্য রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ও শেষ-মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ ১৫ই নবেম্বর তারিখে—তাহার জন্য নূতন অনুমতি লওয়া হইয়াছিল, উহা মানিলে, ধরিয়া লইতে হয় যে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত রাজারামের যাওয়ার কথা ঠিক ছিল না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, "রামমোহনের পুত্র তাঁহার সঙ্গে বিলাত যাইতেছে" এ-সংবাদ ১৩ই নবেম্বর তারিখেই সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি জাহাজ ছাড়িবার অন্ততঃ ১১দিন পূর্ব্বে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়,—" কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল" (রমাপ্রসাদ বাবুও তাঁহার প্রবন্ধের শেষে এ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ইহার মূল্য প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই।)। যখন যাত্রার এত দিন আগেই রাজারামের যাওয়ার কথা ঠিক ছিল এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ১৫ই নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ যাত্রার দিন তাহার জন্য অনুমতি না লইয়া অন্য লোকের জন্য অনুমতি লওয়া হইয়াছিল ইহা ধরিতে হইলে কল্পনাশক্তিকে অসাধারণ ভাবে প্রসারিত করিতে হয়।

(৩) এইবার সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্র অসম্পূর্ণ থাকার কথা বলিব। রমাপ্রসাদ বাবু যদি বলেন, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের আরম্ভ হইতে গবর্মেন্টের নিকট যত চিঠি, যত আরজী প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের সকলগুলির মূল দপ্তরে রক্ষিত নাই, সুতরাং দপ্তর অসম্পূর্ণ, তাহা হইলে তাঁহার

* PUBLIC DEPT. PROCEEDINGS dated 16 November
1830, No 36.

The Officiating Secretary reports that orders for the reception of.....the undermentioned individuals as passengers proceeding to the ports and places specified have beem issued on applications duly made for the purpose by the, individuals themselves or by others in their behalf on the dates subjoined.......

Ramrutton Mookerjee, Hurichurn Doss and Sheik Buxoo, 15th November, proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the Albion.

কথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু এই আপত্তি আমাদের আলোচনার পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। গবর্মেন্ট যে-সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেন বা যে-সকল আদেশ দিতেন তাহার বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ রক্ষিত আছে। কলিকাতা হইতে বিলাত যাইবার আদেশের বেলায়ও আমরা দেখিতে পাই, যখনই যে বিলাত যাইতেছে তাহার অনুমতিপ্রাপ্তির কথা সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীতে (Proceedings) রহিয়াছে। অনুমতি দেওয়া হইয়াছে অথচ বৈঠকের কার্য্যবিবরণীতে তাহার উল্লেখ নাই এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং সরকারী কার্য্যবিবরণী যদি সম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে কোথাও-না-কোথাও অনুমতির কথা থাকিবেই। আমি ১৮৩০ সনের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত পাবলিক-বিভাগের কার্য্যবিবরণী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি উহা সম্পূর্ণ আছে এবং উহাতে আমি রামমোহনের ও তাঁহার তিন জন সঙ্গীর যে-দুইটি অনুমতির কথা আবিষ্কার করিয়াছি উহা ভিন্ন অন্য অনুমতির চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং অন্য অনুমতি যে লওয়া হয় নাই তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, রামমোহনের মূল আরজী ইত্যাদি দপ্তরে নাই কেন, তাহার উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ এই সকল মামুলী আরজী দপ্তরে রাখিয়া দপ্তর ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় নাই। কেবল রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়, ১৮৩০ সালে অন্য যাহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মূল দরখাস্তও দপ্তরে রাখা হয় নাই,—রাখা হইয়াছে কেবল সেই সকল আরজী সম্বন্ধে Body Sheet বা সরকারী নির্দ্দেশ এই Body Sheet আবার সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীর (Proceedings) সংক্ষিপ্তসার।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজারাম যে শেখ বখ্‌শু নামে বিলাতযাত্রার অনুমতি পাইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, উহাই কি তাহার আসল নাম? সরকারী দরখাস্তে নাম ও জাতির আসল পরিচয় না-দিয়া অন্য পরিচয় দেওয়া আইনসঙ্গত নয়, সেজন্য আমি মনে করি, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বখ্‌শু রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গীদের আসল নাম। তবে উহাদের এক জন নিজ নামে এবং অপর দুই জন রামহরি ও রাজারাম নামে প্রচারিত হইল কেন ইহা জিজ্ঞাস্য। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন, রামমোহন সঙ্গীদের নাম 'রাম'-যুক্ত চাহিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ ঘটে।

রমাপ্রসাদ বাবু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, "নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় কোন্ প্রমাণের বলে যে দুই জনের নাম পরিবর্ত্তনের কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তিনি লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না।" রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র নন্দমোহনের কথা অমূলক নহে। যাত্রার পর রামমোহন যে তাঁহার কোন-কোন সঙ্গীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ-কথা পরে বাংলাসরকারেরও কানে গিয়াছিল। ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় দিয়াছি (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৫-৬)।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই নাম-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? সে-যুগের সংবাদপত্র পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, পাছে বিলাত যাওয়ার জন্য সঙ্গীদের জাতি গিয়াছে বলিয়া পরে কোন গোল হয়, সেজন্য রামমোহন সাধারণের নিকট উহাদের প্রকৃত নাম গোপন করিয়াছিলেন, এবং প্রকৃত সঙ্গীদের নাম যাত্রার পূর্ব্বে কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে কোন বাধা উপস্থিত হয়, এই জন্য যাত্রার দিনই সরকারের নিকট হইতে তাহাদের বিলাতযাত্রার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল। *

* রামমোহনের সঙ্গীদের যাত্রার আয়োজন যে অতি গোপনে করা হইয়াছিল, তাহা ১৮৩১ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে ঃ—

"শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি...।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪)

রাজারাম মুসলমানীর পুত্র বলিয়া তখনই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল (ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি), সুতরাং তাহার জাতি বাঁচাইবার ভাবনা নিরর্থক মনে করিয়া তাহার ডাকনাম বা আসল নাম কিছুই গোপন করা হয় নাই। রামরত্ন বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে 'শম্ভু' এই ডাকনামে এত পরিচিত ছিল যে তিন বৎসর পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও ধর্ম্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' রামরত্ন আসলে যে কে, সে-সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে নাই।† সুতরাং আসল নাম দিয়া তাহার পরিচয় যেরূপ গোপন করা হইল, কোন কল্পিত নামে উহার অপেক্ষা অধিক গোপন করা যাইত না। বাকী রহিল হরিচরণ দাস, তাহাকে 'হরিচরণ' বা 'হরি দাস' বলিয়া সকলে জানিত বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ নূতন নামকরণ হইল রামহরি দাস।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রমাপ্রসাদ বাবুর মূল বক্তব্যের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু তিনি ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। যে-কয়েকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক কেবল মাত্র সে-সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

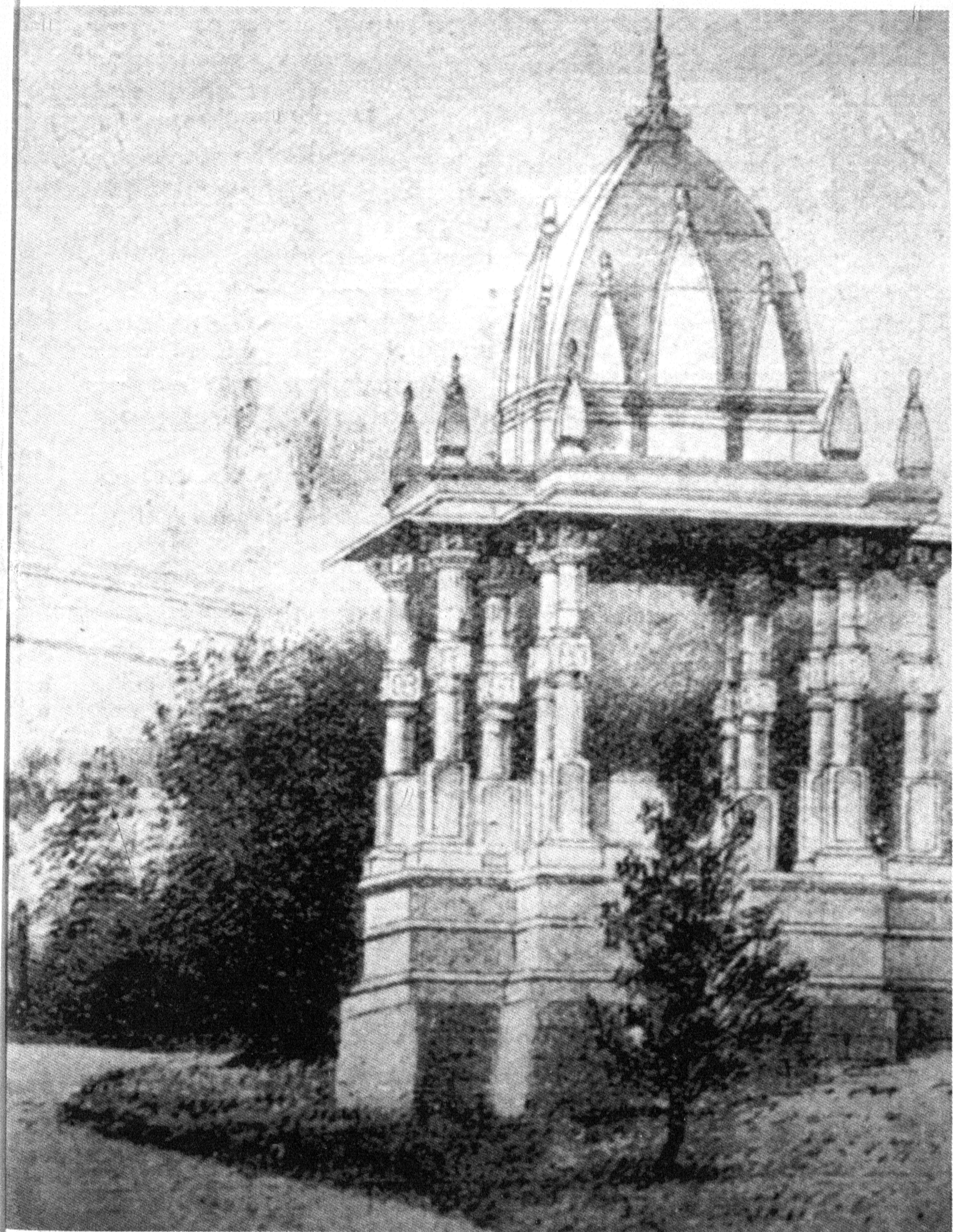
প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ বাবু বলেন আমি সরকারী দপ্তরে যে-অনুমতির উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছি উহা পাসপোর্ট, নহে, "জাহাজে স্থান দানের (berth reserve করিবার) অনুমতি"। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। রমাপ্রসাদ বাবু কি বলিতে চান এই অনুমতি টিকিট-কেনার মত সাধারণ ব্যাপার,—বিদেশে যাইবার আইনসঙ্গত অনুমতি নয়? তাহাই যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে বার্থরিজার্ভেশনের নির্দ্দেশ যাত্রার তারিখে না হইয়া কয়েক দিন পূর্ব্বেই দেওয়া হইত—বিশেষ করিয়া আমরা যখন দেখিতেছি নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে রামমোহনের বিলাতযাত্রার কথা অক্টোবর মাসের পূর্ব্ব হইতেই স্থির রহিয়াছে। * কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বার্থ রিজার্ভ করার মত সামান্য ব্যাপারের কথা গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে বিজ্ঞাপিত করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার দিনেও বিদেশযাত্রী মাত্রকেই জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইতে হইত। আমি যে নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিয়াছি, উহা যদি বার্থ-রিজার্ভেশনের আদেশ হইত, তাহা হইলে বিলাতযাত্রার অনুমতি কখন লওয়া হইল এবং উহার উল্লেখ সরকারী বৈঠকের কার্য্য-বিবরণীতে নাই কেন? আমি সরকারী

† রামমোহনের বিলাতযাত্রার তিন বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের অক্টোবর মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেনঃ—

"বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়।—এপ্রদেশ হইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না...।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশিত হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান...গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭)

* "Having at length surmounted all the obstacles of a domestic nature that have hitherto opposed my long cherished intention of visiting England I am resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November...'– Rammmohun Roy to Governor-General Bentinck (Miss Collet's *Rammohun Roy*, 2nd ed. p. 168)



রামমোহন সমাধি - মন্দির

দপ্তরে অন্ততঃ তিন বৎসরের কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি উহাতে বিলাতযাত্রী অন্য কাহারও ক্ষেত্রে এই এক 'Ordor for the reception on board' ভিন্ন অন্য কোন অনুমতি-পত্র বা আদেশ নাই। সুতরাং এই অনুমতি-পত্রই বিলাতযাত্রার চূড়ান্ত অনুমতি। রামমোহনের সঙ্গীদের ক্ষেত্রে এইরূপ মনে করিবার আর একটি প্রবল কারণ, ১৫ই নবেম্বর অর্থাৎ যাত্রার দিনে এই অনুমতির লইবার পর আর অন্য কোন অনুমতি লইবার অবকাশ ছিল না। এই অনুমতি নাম সে-যুগে 'পাসপোর্ট' ছিল, কি অন্য কিছু ছিল, তাহাতে কিছুই যায়-আসে না, জিনিষটা আসলে যে পাসপোর্ট সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও রমাপ্রসাদ বাবু যেন ইঙ্গিত করিতে চান যে অনুমতি-পত্রে উল্লিখিত "হরিচরণ দাস ও রামমোহনের সহযাত্রী রামহরি দাস এক ব্যক্তি নয়।" এই অনুমানের সপক্ষে রমাপ্রসাদ বাবু একটি মাত্র যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন, রামমোহনের সঙ্গীদের নাম-পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গে নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় "হরিদাস" নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, 'হরিচরণ দাসে'র উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং এই 'হরিদাস' ও 'হরিচরণ দাস' এক ব্যক্তি নয়। এই অনুমান যে কিরূপ অযৌক্তিক তাহা একটি প্রমাণ দিয়া বুঝাইব। রামহরি দাসকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ভাল করিয়া জানিতেন, কারণ সে তাঁহার শান্তিনিকেতনের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিল। সে যে রামমোহনের কাজ করিত ও তাঁহার সহিত বিলাত গিয়াছিল, এ-কথাও তিনি বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র (ছয় বার) 'রামহরি দাস'-কে 'রামদাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেজন্য কি ধরিয়া লইতে হইবে মহর্ষি কর্ত্তৃক উল্লিখিত 'রামদাস' ও রামমোহনের বিলাত-প্রবাসের সঙ্গী 'রামহরি দাস' এক ব্যক্তি নয়?

রমাপ্রসাদ বাবুর তৃতীয় অনুমান এই যে, শেখ বখ্‌শু সকলের নিম্নস্তরের অনুচর, কেন-না তাহার নাম সেক্রেটরীর রিপোর্টে রামরত্ন ও হরিচরণের পরে স্থান পাইয়াছে। পদমর্য্যাদার উল্লেখ না থাকিয়া কেবল মাত্র সর্ব্বশেষে নাম থাকিলেই কাহাকেও সর্ব্বনিম্নস্তরের ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। নামের পর্য্যায় যেমন পদমর্য্যাদা-অনুসারে হইতে পারে, তেমনই আবার বয়স অনুসারেও হইতে পারে। রামরত্ন, হরিচরণ ও শেখ বখ্‌শুর নামের পর "in attendance on Rammohun Roy" এই কয়েকটি কথা আছে। ইহাতে সব সময়েই যে ভৃত্য সূচিত হয় তাহা নহে,—সহচর, পার্ষদ প্রভৃতিও বুঝায়।

পরিশেষে, মূল বক্তব্যের সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক না থাকিলেও রমাপ্রসাদ বাবুর আর একটি কথারও প্রতিবাদ না-করিয়া পারিলাম না। তিনি বলেন, শুধু 'শেখ বখ্‌শু' বা শেখ বখ্‌শ কোন মুসলমানের নাম হইতে পারে না, কারণ 'শেখ' উপাধিবাচক ও 'বখ্‌শ' শব্দের অর্থ 'দান', কাহার দান না-বলিলে নাম সম্পূর্ণ হয় না ; সুতরাং শেখ এলাহিবখ্‌শ, শেখ খোদাবখ্‌শ প্রভৃতি নাম হইতে পারে, শুধু শেখ বখ্‌শ বা বখ্‌শু নাম হইতে পারে না।

এই আপত্তিতে রামপ্রসাদ বাবুর ফার্সী-জ্ঞান যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, লোকাচারের জ্ঞান তেমন প্রকাশ পায় নাই। তিনি কি জানেন না, ব্যক্তির নাম সকল সময়ে ব্যাকরণশুদ্ধ না-ও হইতে পারে। তাহা না হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তির পুত্রের নাম 'নারায়ণচন্দ্র' কি করিয়া হইল? শুধু 'প্রসাদ' (দান, অনুগ্রহ) কি করিয়া বাঙালী ছেলের নাম হয়? রমাপ্রসাদ বাবুর নিজের নামের অর্থ হয়, রাধাপ্রসাদ নামের অর্থ বুঝি, গোবিন্দপ্রসাদ নামের অর্থও বুঝি, কিন্তু প্রসাদ চৌধুরী বা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নাম কি করিয়া হয়? অথচ বাংলা দেশে এরূপ নাম বিরল নহে এ-কথা রামপ্রসাদ বাবু ভাল করিয়াই জানেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়শঃ 'আবদুল' এই নামটি পাই, কিন্তু শুধু 'আবদুল' এই কথার কোন অর্থ হয় না।

তবে রমাপ্রসাদ বাবুকে এ-কথাটা বলাও উচিত মনে করি, 'শেখ বখ্‌শ' বা আদরে 'শেখ বখ্‌শু' নামের যে অর্থ নাই তিনি বলিয়াছেন, উহা সত্য নহে। 'শেখ বখ্‌শ' অর্থাৎ 'শেখের দান'। কোন্ বিশেষ শেখের দান তাহার উল্লেখ না-ও থাকিতে পারে। উপাস্যের নাম উল্লেখ করিলে তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখান হয়, পাপ হয়—এই বিশ্বাস গুরুপন্থী হিন্দু-মুসলমান জগতে কি

একেবারে অজ্ঞাত বা বিরল? উত্তর-ভারতীয় মুসলমান-জগতে (এবং পশ্চিমের অনেক হিন্দুর মধ্যেও) এই বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে যে আজমীর-দরগার শেখ মুঈন্-উদ্দীনকে মানত করিলে বন্ধ্যা নারীরও পুত্রসন্তান হয়। সুতরাং উত্তর-ভারতে 'শেখের দান' এই অর্থবাচক নাম থাকিলে, এই শেখের প্রতি ইঙ্গিত বুঝা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের শেখ—গুলবর্গায় সমাহিত গীসু-দরাজ। অন্য জায়গায়ও এমন কোন শেখ থাকিতে পারেন যিনি এই দুই শেখের মত বিখ্যাত না হইলেও স্থানীয় লোকের নিকট শেখ par excellence, সুতরাং শুধু শেখ বলিয়াই পরিচিত। শেখ বখ্‌শু তাঁহারই দান বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি কি?*

(২) রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি কি বিশ্বাসযোগ্য?

রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে যে-সকল গল্প প্রচলিত আছে উহাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধেও রমাপ্রসাদ বাবু সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই। রাজারাম দৈবক্রমে রামমোহনের হাতে আসিয়া পড়ে এই মর্ম্মে তিনটি গল্প আছে। উহাদের প্রথমটির জন্য দায়ী ডাঃ কার্পেণ্টারের কোন অজ্ঞাতানামা বন্ধু, উহার তারিখ ১৮৩৫। দ্বিতীয়টির জন্য দায়ী চন্দ্রশেখর দেব, উহার তারিখ ১৮৬৩। তৃতীয়টির জন্য দায়ী অ্যাডামস্-পত্নী, উহার তারিখ ১৮৮৭।† ১৩৩৬ সনের অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমি তিনটি কাহিনীরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই যে, অ্যাডাম্‌স-পত্নীর কাহিনী ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর কাহিনীরই রূপান্তরমাত্র, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র মূল্য কিছুই নাই; আমি আরও দেখাই যে, অপর দুইটি কাহিনী পরস্পর-বিরোধী ও উহাদের প্রথমটিতে ডিক্ নামে যে সিবিলিয়ান সাহেবের উল্লেখ আছে, ঠিক তাহার সহিত মেলে এরূপ কোন ব্যক্তির উল্লেখ ডড্ওয়েল ও মাইল্‌স্-সঙ্কলিত এবং ১৮৩৯ সনে বিলাত হইতে প্রকাশিত *Alphabetical List of the Honourable East India Company's Bengal Civil Servants (1780-1838)* পুস্তকে নাই, সুতরাং গল্পগুলি কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। রমাপ্রসাদ বাবু আমার এই যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, দুইটি গল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও কতক মিল আছে; এই মিলটুকু উপেক্ষা করিবার নয়। আরও বলেন, উপরোক্ত ডডওয়েল ও মাইল্‌স্ সাহেবের পুস্তক যে ভ্রমপ্রমাদরহিত তাহার প্রমাণ আমি দিই নাই।

এই আপত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য সংক্ষেপে ১। প্রথমেই দেখিতে পাই, ডাঃ কার্পেণ্টারের বন্ধুর গল্প ও চন্দ্রশেখর দেবের গল্পের মধ্যে মিল শুধু এইটুকুতেই যে দুইটি কাহিনীতেই আছে রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র। অপর সকল বিষয়েই দুইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল। কোন অজ্ঞাতকুলশীল বালক যদি কাহারও নিকট পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে তাহার জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করা লোকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, সেই সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্য প্রতিপালকের বা তাঁহার বন্ধুবর্গের তাহাকে পালিত পুত্র বলিয়া প্রচার করাও তেমনই স্বাভাবিক। সুতরাং কথাটা ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধু, চন্দ্রশেখর দেব, বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনিই বলুন না কেন, রাজারামকে শুধু পালিত পুত্র বলিলেই তাহার জন্ম সম্বন্ধে সমস্যার নিরাকরণ হইবে না; রামমোহন উহাকে কোথায় কি-ভাবে পাইলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আবশ্যক। এই বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুই বলেন নাই; ডাঃ

* রমাপ্রসাদ বাবুকে হিন্দু নাম 'গুরুপ্রসাদ' ও মুসলমান নাম 'পীর বখ্‌শ' স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। এখানেও কোন্ গুরু বা কোন্ পীর তাহার উল্লেখ নাই। আশা করি তিনি এই দুইটি নাম অসম্পূর্ণ বলিয়া আপত্তি তুলিবেন না।

† ইহা ছাড়া ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ও রাজারামের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গ ক্রমে মুদ্রিত হয় ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড পৃ. ৩৬৪ দ্রষ্টব্য)। এই গল্পটি রমাপ্রসাদ বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উহা ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর গল্পের পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র মূল্য নাই।

কার্পেন্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধু বলিয়াছেন, ডিক্ নামে এক জন সিবিলিয়ান তাহাকে হরিদ্বারে এক মেলায় কুড়াইয়া পান, তাহার পিতামাতাকে, জাতিকুল কি সে-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই ; চন্দ্রশেখর দেব বলিতেছেন সে এক সাহেবের দরোয়ানের পুত্র। এই বৈষম্য কেন?

ইহার উত্তরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন, চন্দ্রশেখর দেব ও ডাঃ কার্পেন্টারের বন্ধু উভয়েই রাজারামের জন্মকাহিনী রামমোহনের নিকট শুনিলেও এক জন গল্পটি বলিয়াছেন ১৮৬৩ সনে ও অপর জন বলিয়াছেন ১৮৩৫ সনে ; সুতরাং গল্পটি শুনিবার অন্ততঃ তেত্রিশ বৎসর পরে চন্দ্রশেখর দেবের স্মৃতিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। কথাটা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। চন্দ্রশেখর রামমোহনের "intimate disciple" বলিয়া খ্যাত ; রামমোহনের কলিকাতা-বাসের সময় তিনি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তিনিই ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের প্রস্তাব করেন বলিয়া প্রকাশ। তাহা ছাড়া রামমোহনের এক মুসলমান-প্রণয়িনী ছিলেন ও রাজারাম তাহার সন্তান—এই জনপ্রবাদ তাঁহার জানা ছিল ; এই জনপ্রবাদ সত্য নয় তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এ-অবস্থায় তিনি যদি রামমোহনের নিকট রাজারাম সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার পক্ষে আংশিক ভাবেও ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সন-তারিখের কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ডাঃ কার্পেন্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর গল্পে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে মনে থাকিবার কথা নয়,—বিশেষতঃ যে-ব্যক্তি রাজারামের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছে তাহার পক্ষে। আরও একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। যে-গল্প ডাঃ কার্পেন্টারের বন্ধুর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল, তাহা চন্দ্রশেখর দেবেরও অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নয়। তবু এই দুই গল্পের মধ্যে এই গুরুতর বৈষম্য কেন?

এই স্থলে ডাঃ কার্পেন্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর পত্রের একটি অংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। এই পত্রলেখক বলিতেছেন ডাঃ কার্পেন্টারের পুস্তকে রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়া যে উল্লেখ আছে পাছে তাহাতে রামমোহনের চরিত্রে কোন কলঙ্ক আরোপিত হয় সেজন্য রামমোহনের এদেশীয় বন্ধুরা তাঁহাকে এই ভ্রম সংশোধন করিতে বলিয়াছেন। এই সাফাই উক্তিটি পড়িয়াই মনে প্রশ্ন আগে, রামমোহনের সুনাম সম্বন্ধে আগ্রহশীল এই দেশীয়-বন্ধুরা কে, তাঁহারা আরও আগে এই প্রতিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না কেন? রামমোহনের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারামকে তাঁহার পুত্র বলিয়া অনেক বার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রাজারামকে সর্ব্বত্র 'my son,' 'my youngster', 'my little youngster' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ডাঃ কার্পেন্টার রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া জানিতেন ; রাজারামের চাকুরীর জন্য বোর্ড অব কন্ট্রোলে যে দরখাস্ত গিয়াছিল তাহাতেও তাহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে এদেশের বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ-পত্রেও রামমোহনের পক্ষ হইতে তাহাকে "পুত্র" বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত বিজ্ঞাপনটির একটা বিশেষ মূল্য আছে। ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত খেদোক্তি" শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ কবিতায় রামমোহনের "যবনীপ্রেয়সী"র গর্ভজাত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং তাহার পরই বলা হয় "কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে [বিলাতে] চলিল"। এই উক্তিটি রামমোহনের প্রতিপক্ষের উক্তি। ইহার কয়েক দিন পরই, অর্থাৎ ১৩ই ও ১৫ই নবেম্বর তারিখের *The John Bull* ও *India Gazette* নামক দুইখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে যখন রামমোহনের পক্ষ হইতেও রাজারামকে "পুত্র"বলিয়াই বিজ্ঞাপিত হইল ("Baboo Rammohun Roy and son")* তখন

বিলাতযাত্রার কয়েক দিন পরেই 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়, এমন কি নিরপেক্ষ 'সমাচার দর্পণ' পত্রেও (২০ নবেম্বর) প্রকাশিত হয় যে রামমোহন "স্বীয় পুত্র" সহ বিলাত গমন করিয়াছেন।

কি ধরিয়া লওয়া যায় না যে রামমোহন নিজে রাজারামের পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে কিছুমাত্র ব্যগ্র ছিলেন না। তখন তাঁহার দেশীয় বন্ধুরা এই বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার কলঙ্ক মোচন করেন নাই কেন? জীবিতকালে যদি তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত না হইয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পর শুধু ডাঃ কার্পেন্টারের উক্তিতে কি তাহার অপেক্ষা গুরুতর কোন কলঙ্ক হইবার কথা?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামমোহনের জীবিতকালে রাজারাম রামমোহনের পুত্র বলিয়া প্রচারিত হইলেও কেহ তখন আপত্তি করেন নাই এবং রামমোহন নিজেও রাজারামকে পুত্র ভিন্ন অন্য পরিচয় দেন নাই. রাজারাম যে রামমোহনের পুত্র নয়,—এক সাহেবের দ্বারা পালিত অনাথ বালক, এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ আমরা পাই রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে এক জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পত্রে। এই পত্র যে রামমোহানের কোন-কোন দেশীয় বন্ধুর প্ররোচনায় লিখিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এই বন্ধুরা কে, তাহাদের স্বার্থ কি, তাহা আমরা জানি না ; এই পত্রলেখক কে, তিনি রামমোহনের নিকট কোথায়, কি ভাবে, কখন কাহিনীট শোনেন তাহা আমরা জানি না। এই উক্তি ডডওয়েল ও মাইল্‌স্-সঙ্কলিত পুস্তকের অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্যের বিরোধী হইলে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, ডড়ওয়েল ও মাইল্‌স্-সঙ্কলিত পুস্তক যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার। যে-সময়ের কথা হইতেছে সে-সময়ে ডিক্ নামে কোন সিবিলিয়ান হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন জায়গায় কখনও ছিল তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ যদি তিনি উপস্থিত করিতে পারিতেন, তবেই এ-প্রশ্ন উঠিতে পারিত।

আমার মনে হয় গোড়া হইতেই একটি নিশ্চিত ধারণার বশে চলিয়াছেন বলিয়া রমাপ্রসাদ বাবু ডাঃ কার্পেন্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তিকে এত নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। রাজারাম সম্বন্ধে এই বন্ধুর পত্রে যাহা আছে তাহাকে তিনি রামমোহনের নিজের উক্তি বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। উহা ঠিক নহে। আমার মূল প্রবন্ধে ও পরবর্ত্তী আলোচনায় বলিয়াছি, রাজারাম-সম্পর্কীয় কাহিনীগুলি রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রচারিত হইয়াছে। রামমোহন-সংক্রান্ত স্মৃতিকথার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু ও সঙ্গীরা তাঁহার মুখে শোনা বলিয়া এমন অনেক তথ্যের প্রচার করিয়াছেন, যাহা অতি সহজেই অমূলক অথবা সন্দেহজনক বলিয়া প্রমাণ করা যায়। ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। সেজন্য আমি রামমোহন-সম্পর্কে তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সঙ্গীদের যে-কোন স্মৃতিকথাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। ডাঃ কার্পেন্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তি এই ধরণের স্মৃতিকথা। এইবার চন্দ্রশেখর দেবের উক্তির কথা দেখা যাক্। রমাপ্রসাদ বাবু অবশ্য বলিয়াছেন, রাজারাম-সম্পর্কীয় কাহিনী যে রামমোহনের নিজের মুখে শোনা এ-বিষয়ে চন্দ্রশেখর দেব "সন্দেহের অবসর রাখেন নাই"। তিনি যদি এ-বিষয়ে মিস্ কলেটের রামমোহন-জীবনী হইতে তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত রাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক ধৃত বাক্যটি ভাল করিয়া পড়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন রামমোহনের নিকট শুনিয়াছেন, এরূপ কোন উক্তি চন্দ্রশেখর দেব করেন নাই।*

* আমার মূল প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর দেবের উক্তির যে বাংলা তাৎপর্য্য (ইংরেজী অংশ সমেত) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে অনবধানতাবশতঃ একটি ভুল ছিল। রামপ্রসাদ বাবু মিস্ কলেটের ইংরেজী বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নিজে আমার বাংলা তাৎপর্য্যের ভুলটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বাক্যটি এই—

"Chunder Sekhar Ded–the disciple who, it will be remembered, suggested the formation of the Brahmo Somaj–stated in coversation with a friend, R. D. H., at Burdwan, so late as January, 1863, that 'rumour had it that at one time he [Rammohun] had a mistress ; and people belived Rajaram was his natural son, though

তবু বলি, ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তি ও চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও রাজারামের পক্ষে যেমন রামমোহনের পালিত পুত্র হওয়া অসম্ভব নয়, তেমনই আবার অপর পক্ষে তাহার রামমোহনের পুত্র হওয়াও অসম্ভব নয়। এখন দেখিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণ বিবেচনা করিলে এই দুইটি সম্ভবপর ঘটনার কোন্‌টি বেশী সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

(৩) রাজারাম ও তাহার মাতা

এইবার রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র থাকা সম্বন্ধে কি-কি সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী সাক্ষ্য আছে তাহা দেখা যাক।

এই সকল সাক্ষ্যের আলোচনা করিতে গিয়া চন্দ-মহাশয় একটি গুরুতর ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজারাম যে রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র নহেন,—প্রণয়িনীর পুত্র, তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর প্রথম বাহক চন্দ্রশেখর দেব" (১৮৬৩)। ইহা ঠিক নহে, কারণ রামমোহনের জীবিতকাল হইতে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি ও অভিযোগ চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল জনশ্রুতিতে তাঁহার যবনী-সংসর্গের প্রতি যে ইঙ্গিত আছে তাহা কখনও প্রচ্ছন্ন কখন-বা স্পষ্ট। এই সকল সাক্ষ্য ও জনশ্রুতি যে-সকল পুস্তকপত্রিকাতে আছে নিম্নে তারিখ-অনুযায়ী তাহাদের নামও প্রকাশকাল দেওয়া গেল ; স্থানের অল্পতাবশতঃ এই ইঙ্গিতগুলি এখানে মুদ্রিত হইল না ঃ—

(১) ১৮২১ সনে রংপুর-প্রবাসী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রামমোহনের মতামতের প্রতিবাদ-স্বরূপ 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। উহার পৃ. ১৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮২২ সনে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" রচিত 'চারি প্রশ্নে'র চতুর্থ প্রশ্ন ('চারি প্রশ্নের উত্তর,' পাণিনি আপিস সংস্করণ, পৃ. ২৩৯) দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৮২৩ সনে প্রকাশিত 'পাষণ্ডপীড়ন' (রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকের প্রত্যুত্তর) গ্রন্থের পৃ. ১১৯, ১২৬-২৭, ১৫৮-৫৯ ও ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামক ব্যঙ্গকবিতা—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, ভূমিকা দ্রষ্টব্য। 'রাজা' বা রাজারাম যে রামমোহনের "যবনী-প্রেয়সী"র সন্তান, এই কবিতায় তাহার উল্লেখ আছে।

(৫) ১৮৪৭ সনে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'-সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য রচিত এবং ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত 'বিবাদভঙ্গার্ণব,' পৃ. ১৩ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও রামমোহনের 'পথ্যপ্রদান' এই দুই গ্রন্থের বিচার।

ইহা ছাড়া চন্দ্রশেখর দেব, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উক্তি আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি।

রমাপ্রসাদ বাবু উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ উক্তির অনেকগুলি দেখেন নাই। কিন্তু যেগুলি দেখিয়াছেন সেগুলির সম্বন্ধে তিনটি অদ্ভুত আপত্তি তুলিয়াছেন।

প্রথমে তিনি বলেন, 'চারি প্রশ্নে'র চতুর্থ প্রশ্নে "অনেক বিশিষ্ট সন্তান" এবং "তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের" যে উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে রামমোহনকে গণ্য করিবার অধিকার আমাদের নাই, কারণ এই অভিযোগ ব্যাপকভাবে বহুবচনে করা হইয়াছে,—ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, রাজারামের বয়সের যে হিসাব আছে তাহাতে তাহার জন্ম রামমোহনের কলিকাতায় আসার পর হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায় ;

he himself said Rajaram was the orphan of a Durwan of some Saheb, and Rammohun Roy brought him up." (Miss Collet, 2nd ed., p. 169.)

শেষের " he himself " কথা দুইটিতে চন্দ্রশেখর দেবকে সূচিত হইতেছে,—রামমোহনকে নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে রামমোহনের নিকট হইতেই এই কাহিনী শুনিয়াছেন, এ-কথা চন্দ্রশেখর দেব বলেন নাই।

চন্দ্রশেখর দেব তখন রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং রাজারাম রামমোহনের কোন প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান হইলে চন্দ্রশেখর দেব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই তাহা বলিতেন,—জনরবের দোহাই দিতেন না।

এই কয়টি আপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই ঃ—

(১) বিচারে পরাস্ত ও অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কাহাকেও কোন প্রশ্ন করা হয় এবং সেই প্রশ্নে যদি চরিত্র বা বিশেষ কোন আচার-ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত থাকে, তাহা হইলে শুধু উহা ব্যাপকভাবে বা বহুবচনে করা হইয়াছে বলিয়াই উহাতে প্রশ্নের লক্ষ্যীভূত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত নাই, এই তর্ক যে কত দূর অযৌক্তিক রমাপ্রসাদবাবু বোধ হয় তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। অথচ ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে হইলে উহা সোজাসুজি না করিয়া ব্যাপক ভাবে করিতে হয় তাহা তর্কযুদ্ধের প্রথম সূত্র মাত্র এবং সকলেরই জানা। রমাপ্রসাদ বাবু নিজেও অন্যত্র এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ('মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃ. ১৩১ দ্রষ্টব্য।)

'চারি প্রশ্নে'র ইঙ্গিত যে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি। 'চারি প্রশ্ন' প্রথমে মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণে' (৬ এপ্রিল ১৮২২) প্রকাশিত হয়। এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য একটি পত্রও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের এক স্থলে আছে, "প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য।"* এখানে "বিশিষ্ট-লোক" কথাটি বহুবচনে নাই। দ্বিতীয় প্রমাণ 'পাষণ্ডপীড়নে'র উক্তি 'চারি প্রশ্ন' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' একই ব্যক্তির রচনা। উহাতে পাই,—"কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয়, আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, জবনী গমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের জবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব, ও জবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন" (পৃ. ১৫৮-৯)। "নগরান্তবাসির† অদ্যাপি জবনী গমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজবাসস্থানের প্রান্তেই জবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন" (পৃ. ১৬৩)। সুতরাং 'চারি প্রশ্নে' যে রামমোহনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সিদ্ধান্ত এতই স্বয়ংসিদ্ধ যে রমাপ্রসাদ বাবু নিজেও উহা অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে "রামমোহন ও তাঁর বাংলা রচনা" নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ—

"১৮২২ সালে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই চারিটি প্রশ্নেই রামমোহন রায়ের চরিত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।"‡

আজ কি তিনি কেবলমাত্র তর্ক করিবার জন্যই অন্য কথা বলিতেছেন?

(২) রমাপ্রসাদ বাবু যে "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"কে "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়াছেন তাহাও

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড,পৃ ১৬৯।

† ['পাষণ্ডপীড়নে'] 'পাষণ্ড,' 'নগরান্তবাসী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে [রামমোহনকে] সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্ত-বাসী'র দুই অর্থ ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন ; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ চণ্ডাল।" ('মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং, পৃ. ১৪৩)

‡ 'বঙ্গলক্ষ্মী', ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ. ২৩১। রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধের অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন ঃ—"বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ পুস্তক প্রচার করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তকে রামমোহন রায়ের আচারের যথেষ্ট নিন্দা আছে।...এই সকল আক্রমণের উত্তরে রামমোহন রায় কখনও নিজের আচার সম্বন্ধে কোন কথা গোপন করেন নাই, এবং তাহা তন্ত্রের বিধির দ্বারা সমর্থন করিলেও কখন নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।"

তাঁহার প্রথম আপত্তি অপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই যদি "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে রামমোহন তাঁহার বিরুদ্ধা-চরণকারীদের চরিত্রে এই ধরণের যে-সকল অপবাদ আরোপ করিয়াছেন তাহাও "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে।

(৩) এইবার চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। রমাপ্রসাদ বাবুর ধারণা রামমোহনের যদি কোন প্রণয়িনী বা প্রণয়িনী-গর্ভজাত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্রশেখর দেবকে নিশ্চয়ই তিনি সাক্ষী করিতেন। রমাপ্রসাদ বাবুর মত প্রবীণ ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিব তাহা সত্যই আশা করি নাই। প্রণয়িনী বা প্রণয়িনী-গর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে লোকে—বয়োকনিষ্ঠ শিষ্য দূরে থাকুক, বন্ধুকেও অনেক সময়ে কিছু বলে না। রমাপ্রসাদ বাবুর এবং আমার জীবিতকালেও বহু দেশবিখ্যাত ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন কথা প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্ম্মীরা সাক্ষাৎ-জ্ঞান হইতে কিছু বলিতে পারিবেন না। এ-বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে রামমোহনের মুসলমানী-সাহচর্য্য সম্বন্ধে সমসাময়িক যে সকল সাক্ষ্য আছে তাহার বিরুদ্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। তবু এ-কথা আমি মানি যে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে রামমোহনের নামে কলঙ্ক আরোপ করা বা সেই কলঙ্ক অতিরঞ্জিত করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী থাকা যে একেবারে অমূলক অপবাদ নয় তাহা মনে করিবার প্রধান কারণ,—রামমোহনের দিক হইতে স্পষ্ট প্রতিবাদের অভাব। মুসলমানী-সংসর্গ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেও দূষণীয় নয় এ-কথা রামমোহন বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও উহা অস্বীকার করেন নাই। অন্য অন্য বিষয়ে যখনই যে-কেহ রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়াছে তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নীরব ও "শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রী" যে "বৈদিক বিবাহিত স্ত্রী"'র সমতুল্য তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার উপায় থাকিলে রামমোহন কি নিরুত্তর থাকিতেন?

উপসংহার

আগে যাহা লিখিয়াছিলাম এবং এখন যাহা লিখিলাম, তাহা ছাড়া অন্য কোন সংবাদ বা প্রমাণ এখন-পর্য্যন্ত আমাদের জানা নাই। সুতরাং নূতন প্রমাণ আবিষ্কার না-হওয়া পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে আর তর্কবিতর্ক নিতান্তই নিষ্ফল। তবে আমার মনে হয়, যে-সকল তথ্য আমাদের হাতে আছে তাহা হইতে চূড়ান্ত মীমাংসা হউক আর না-ই হউক, রাজারাম যে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর পুত্র হইতে পারে, এই সম্ভাবনা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। রমাপ্রসাদ বাবু অবশ্য তাহা অস্বীকার করিয়া সুধীজনের সম্মুখে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে-রামমোহন "বহুশ্রমসাধ্য শাস্ত্রচর্চ্চায় এবং তৎকালে অভাবনীয় ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া বা শৈববিবাহ কতটা সম্ভব, তাহা নিরপেক্ষ সুধীজনের বিবেচ্য।"

এই প্রশ্নে নৃতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ বাবুর মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি বলিতে পারি না। শাস্ত্রচর্চ্চা কিংবা সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন করিলেই কাহারও পক্ষে প্রণয়িণীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয় না। রামমোহন ভোগবাসনাত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন এ-কথা কেহ কখনও বলে নাই। রামমোহন নিজেও কখনও নিজেকে সর্ব্বত্যাগী বলিয়া প্রচার করেন নাই। তিনি গৃহী ছিলেন, পোষাকপরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারে রাজসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন তিনি শাস্ত্রীয় বিচারে ও সমাজ-সংস্কারে রত তখনও তাঁহার গৃহে মুসলমান-বাঈজীর নাচ কখন কখন হইত।* তাঁহার পক্ষে স্ত্রীপুত্রে আসক্ত হওয়া অসম্ভবও নয়, নিন্দার বিষয়ও নয়।

* *Wanderings of a Pilgrim* by Fanny Parkes, Vol. I. Chap. IV (Residencc in Calcutta, May 1823.)

তবু রমাপ্রসাদ বাবুর কোথায় আপত্তি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। প্রণয়িণীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হওয়া ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বা লম্পট হওয়া তাঁহার নিকট এক জিনিষ বলিয়া মনে হইতেছে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক-ঘটিত ব্যাপারে যদি কেহ প্রচলিত সামাজিক রীতিকে লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলেই তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি—একথা বলা চলে না। রমাপ্রসাদ বাবু হয়ত এ-দুয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিকট প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচারী মাত্রেই হয়ত ধর্ম্ম ও নীতিরও বিরুদ্ধাচারী। সুতরাং রামমোহন সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্রীর আচারে বিবাহিতা নন এরূপ কোন স্ত্রীলোকে অনুরক্ত ছিলেন এ-কথা স্বীকার করিতে তাঁহার মন কিছুতেই সরিতেছে না। কিন্তু কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত একমত হইবেন বলিয়া আমি মনে করি না। রামমোহন বিবাহিতা পত্নীর সাহচর্য্য বা প্রণয় বেশী পান নাই তাহা আমরা জানি। এ-অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অন্য কোন রমণীতে অনুরক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তবু, জনশ্রুতিতে তাঁহাকে কখনও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলিয়া প্রচার করা হয় নাই,—কোন মুসলমান-প্রণয়িনীতে অনুরক্ত বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। এই রমণী শৈবমতে বিবাহিতা হউন, আর নাই হউন, রামমোহন যে তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ একনিষ্ঠ ব্যক্তি সামাজিক আচার না মানিলেও একদার ব্যক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মের চক্ষে বেশী নিন্দনীয়, এ-কথা কি জোর করিয়া বলা যায়?

আর একটি কথা। সাধারণ ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক বিবাহের বহির্ভূত সন্তানকে অজ্ঞাত অখ্যাত জীবন যাপন করিতে দেয়। রামমোহন যে রাজারামকে এইরূপে দূরে সরাইয়া না রাখিয়া অবস্থানুযায়ী শিক্ষা ও সম্মান দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার চরিত্রবল ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

[এই বিতর্ক সম্বন্ধে আমার মত আমি পরে প্রকাশ করিব।—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক।]

১৩৪২ ফাল্গুন

'রামমোহন রায় ও রাজারাম'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের পালিতপুত্র রাজারামের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাহার পর আরও অনেকে ঐ বৎসরের প্রবাসীতে কিছু লিখিয়াছিলেন। আমিও কিছু লিখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কিছু লেখেন ও ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার উত্তর দেন। ১৩৩৬ সালে ব্রজেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, গত পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহার সমালোচনা করেন। মাঘের প্রবাসীতে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রত্যুত্তর বাহির হইয়াছে। আমি এই সমস্ত লেখা আবার দেখিলাম। সবগুলি সম্বন্ধে, অন্ততঃ প্রধান প্রধান সব কথা সম্বন্ধেও, আমি আলোচনা করিব না—তাহার কারণ, তাহা করা অনাবশ্যক,—সময়ের অভাবও আছে এবং প্রবাসীতে এবার যথেষ্ট জায়গাও নাই। কয়েকটি কথা মাত্র আমি বলিব। পরে আরও লিখিতে পারি, না-লিখিতেও পারি।

রাজারাম যে একটি অনাথ বালক, রামমোহন রায় তাহাকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবু ইহা বিশ্বাস না-করিবার কারণ লিখিয়াছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে একটা অপবাদ ছিল, ইহার পরিবর্ত্তে তিনি সেই অপবাদ বিশ্বাস করিবার কারণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য রাজারামের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তাহা তিনি বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, তাঁহার অনুমানগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণের যোগ্য।

রামমোহন রায়ের বিপক্ষেরা কেহ কেহ তাঁহার যে কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক বিবেচক কোন লোক বিশ্বাস করিতেন কিনা আমি অবগত নহি। সমসাময়িক লোকদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সুযোগ থাকে। কাহারও সম্বন্ধে কোন বিপক্ষ কোন নিন্দা রটনা করিলে তাঁহারা তাহার সত্যতা অসত্যতা অপেক্ষাকৃত সহজে পরীক্ষা করিতে পারেন। এই জন্য সমসাময়িক বিবেচক লোকেরা কোন্ কুৎসা, বিশ্বাস করেন না-করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রবাবুর দ্বারা সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা) তিনি ১৮৩২ সালের ৩রা নবেম্বরের "সমাচার দর্পণ" হইতে নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কাগজ তাঁহার মতে "নিরপেক্ষ"।

"শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহ করণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদয়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবিসাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।"

পাঠকেরা উপরে উদ্ধৃত অংশে "উন্মত্ততা-পূর্ব্বক" ও "রাগপূর্ব্বক" কথা দুটি লক্ষ্য করিবেন। দুটিই কুৎসাকারীদের অপ্রকৃতিস্থতা-সূচক।

"সমাচার দর্পণ" রামমোহনের স্ত্রী থাকিতে বিবিসাহেবকে বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ার জনরব "উন্মত্ত" লোকের অমূলক রটনা বলিয়াছেন এবং তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, এমন মিথ্যা-কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানিতিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।" ইহার পরিষ্কার অর্থ এই, যে, রামমোহন রায়ের "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক" যে সব কুৎসা রটাইয়াছেন "সমাচার দর্পণ" তাহা বিশ্বাস করেন না ; কিন্তু উন্মত্তদের প্রচারিত রামমোহনের বিবিসাহেব বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ার "অমূলক ও অগ্রাহ্য" জনরব যদি সত্য হয় (অর্থাৎ মিথ্যা যদি সত্য হয়), তাহা হইলে অন্য গ্লানি-তিরস্কারাদিও "সমাচার দর্পণ" বিশ্বাস করিবেন, নতুবা তাহা বিশ্বাস করেন না।

"সমাচার দর্পণ" রামমোহনের সমসাময়িক কাগজ, কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার দলের কাগজ ছিল না।

রামমোহনের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ করিয়াছেন নানা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের এরূপ মিশনারীরাও এবং এরূপ অন্য খ্রীষ্টীয়ানেরাও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত মাত্রও করেন নাই, করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে রামমোহনের ইংরেজী জীবনচরিতলেখিকা কুমারী কলেট লিখিয়াছেন ঃ—

"And his aggrived Trinitarian opponents, even in the heat of controversy, never breathed a whisper against his fair fame. The reputation that has passed scatheless and stainless the ordeal of criticism by missionaries, Baptist and Unitarian. Presbyterian and Anglican, hostile as well as sympathetic, may afford to ignore stale Hindu gossip served up a generation afterwards."

রামমোহনকে কলিকাতায় যাঁহারা স্বয়ং দেখিয়াছেন ও তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, এরূপ ইংরেজ ও ফরাসী লেখকদের তাঁহার চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা উদ্ধৃত করিব না. আমার বক্তব্য এই, যে, তাঁহার সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী যে-সব বিবেচক লোকদের তাঁহার বিরুদ্ধে রটিত কুৎসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবার সুযোগ ছিল তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নহে।

রামমোহন রাজারামকে যে এক জন ইংরেজের নিকট হইত পাইয়াছিলেন, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা''র দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৪ পৃষ্ঠার "আগ্রা আখবর" হইতে উদ্ধৃত ইহয়াছে। এইরূপ সংবাদ ১৮৩৬ সালের ১৭ই মে তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়্যার" কাগজে বাহির হয়। সদৃশ বৃত্তান্ত কুমারী কার্পেন্টারের Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থে আছে। ইহা যিনি ডাঃ কার্পেন্টারকে পাঠান, তিনি লিখিয়াছিলেন, যে, তিনি বৃত্তান্তটি রামমোহনের নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন এবং "আমার যাহা মনে আছে অন্যেরা তাহা সমর্থন করেন" ("and my recollectin is confirmed by that of othcrs") । এই প্রকার বৃত্তান্ত সর্ উইলিয়ম ফষ্টার প্রণীত "জন কম্প্যানি" নামক পুস্তকেও আছে। বাহুল্যভয়ে এগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। পরস্পর-সদৃশ এই সব বৃত্তান্ত একই ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত বা সকল লেখক কোন এক জনেরই লেখা নকল করিয়াছেন, ইহা মনে করিবার মত কোন প্রমাণ আমি অবগত নহি।

যাহা হউক, এই প্রকার সব বৃত্তান্ত ব্রজেন্দ্রবাবু অবিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহার অবিশ্বাসের প্রধান কারণ, বা অন্ততঃ অন্যতম কারণ এই যে, ডিক্ নামক যে ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে রামমোহন রাজারামকে পাইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তগুলিতে* কথিত আছে, সেরূপ কোন ডিক্ তিনি 'Alphabetical list of the Bengal Civil Servants. from 1780 to 1838" নামক বহিতে পান নাই। এই বহিটিকে তিনি প্রামাণিক মনে করেন—যদিও ইহাতে যে ভ্রমপ্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা নাই বা থাকিতে পারে না, তাহা তিনি দেখান নাই। এরূপ কোন বহি গবর্ন্মেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অসম্পূর্ণতাশূন্য না হইতে পারে, কিন্তু

* ফষ্টারের বহিতে ডিক্ নামটি নাই, কোম্পানীর চাকর্যে একজন ইংরেজ বলিয়া উল্লেখ আছে।

বেসরকারী এরূপ পুস্তক অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়ই হয়। বহিটি ডডওয়েল ও মাইল্‌সের বলিয়া মুদ্রিত আছে, ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংকলিত ও ১৮৪৪ সালে কলিকাতার ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত "General Register of the Honble East India Company's Bengal Civil Servants from 1790 to 1842" এইরূপ আর একখানি বহি।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার রামমোহন রায় সম্বন্ধে সরকারী রেকর্ড আফিসে ও হাইকোর্টে অনেক কাগজপত্রের ও পুরাতন খবরের কাগজের অনেক নকল লইয়াছেন এবং রামমোহন সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধও আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। তৎসমুদয় আমি এখনও মুদ্রিত করি নাই। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে সিবিলিয়ানদের উক্ত বর্ণানুক্রমিক তালিকা ("Alphabetical List") "অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ উহাতে যে কয়জন ডিকের নাম পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত কোম্পানীর অন্য সিবিলিয়ান ডিক্‌ও সেই সময় ছিলেন।....কাজেই ঐ তালিকাকে একেবারেই প্রামাণিক বা সম্পূর্ণ বলা যায় না। এমন কি যে সকল ডিকের নাম এই সিবিল লিষ্টে স্থান পাইয়াছে তাঁহাদেরও কর্ম্মনিয়োগ প্রভৃতির যে বিবরণ আছে তাহাও অসম্পূর্ণ দেখা যায়।" "একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, বাংলা সরকারের রক্ষিত রেকর্ডসে ইহাঁদের কর্ম্মনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মূল চিঠিপত্র আছে, তাহার দ্বারা।"

অতঃপর ডক্টর মজুমদার লিখিতেছেন ঃ—

"যাহা হউক, তর্কের খাতিয়ে যদি ধরিয়াও লওয়া হয়, যে, এরূপ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও উপরোক্ত তালিকাপুস্তকে প্রাপ্ত ডিক্‌দের কাহারও রাজারামের পালক হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি অপর যে কয়জন ডিকের নাম গবর্ণমেন্ট রেকর্ডসে পাওয়া যায় তাঁহাদের কেহ যে ঐ ডিক হইতে পারেন না তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডসে প্রাপ্ত তিন জন ডিকের নাম করিতেছি যাঁহাদের নাম উক্ত তালিকা-পুস্তকে পাওয়া যায় না। যথা—আর্ ডিক্, আর্ এইচ্ ডিক্ ও আর্ ডবল্যু ডিক্। দেখা যায়, আর্ ডিক্ ১৭৯৯ সালের ২৮শে জুন রামগড়ের কালেক্টর নিযুক্ত হন, আর্ এইচ্ ডিক্ ১৮০৩ সালের ২২শে মার্চ পূর্ণিয়ার কালেক্টর নিযুক্ত হন, এবং আর্ ডবল্যু ডিব্ ১৮০২ সালের ১৯শে জানুয়ারী যশোহরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। গোবিন্দপ্রসাদের সহিত ১৮১৭ সালে রামমোহনের যে মামলা হয়, তাহার সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় যে, বাংলা ১২০৬ সনে, ইংরেজী ১৭৯৯—১৮০০ সালে, রামমোহন পাটনা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন এবং তাহার অল্পকাল পরেই রামগড়, ভাগলপুর, রংপুর, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কর্ম্মসূত্রে ঘুরিয়া বেড়ান। সুতরাং এই সময় উল্লিখিত তিন জন ডিকের মধ্যে কাহারও না কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।" এবং তাঁহার পরিচিত কোন ডিকের নিকট হইতে তিনি রাজারামকে পাইয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য নহে।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার "দৃঢ়তর বিপক্ষ"দের দ্বারা রচিত কুৎসাটা কেন বিশ্বাস্য নহে, এবং তিনি যে রাজারামকে ডিক্ নামক এক ইংরেজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, তাহা কেন্ বিশ্বাসের অযোগ্য নহে, তাহা উপরে লিখিলাম। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সকলে

গ্রহণযোগ্য মনে না-করিতে পারেন। এই জন্য ব্রজেন্দ্রবাবু কেন সেখ বক্‌সু ও রাজারামকে অভিন্ন মনে করেন, সেই সমুদয় অনুমানও পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, আলবিয়ন জাহাজে রামমোহন রায়কে এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও সেখ বক্‌সুবে স্থান দিবার আদেশ সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় ; কিন্তু যখন রামমোহন ইংলণ্ড পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঙ্গে আছেন রাজারাম, রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায়। তাহা হইলে সেখ বক্‌সুর কি হইল এবং রাজারাম কোথা হইতে আসিলেন? অতএব, রাজারামই সেখ বক্‌সু। ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি আমি সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম, অনাবশ্যক বোধে তাঁহার সব কথা বিস্তারিত উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্রজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন, যে, সরকারী দপ্তরে যাহাদিগকে কোম্পানীর আমলে কোন জাহাজে স্থান দিবার আদেশ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া আর কাহাকেও ওরূপ কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই ; অর্থাৎ তদ্রূপ আদেশ সমস্তই এপর্য্যন্ত রক্ষিত আছে এবং এতদ্বিষয়ক সরকারী নথীপত্র সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু তিনি মাঘের প্রবাসীর ৫৪৩ পৃষ্ঠায় ইহাও লিখিয়াছেন, "তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, রামমোহনের মূল আরজী ইত্যাদি দপ্তরে নাই কেন, তাহার উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ এই সকল মামুলী আরজী দপ্তরে রাখিয়া দপ্তর ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় নাই। কেবল রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়, ১৮৩০ সালে অন্য যাহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মূল দরখাস্তও দপ্তরে রাখা হয় নাই—রাখা হইয়াছে কেবল সেই সকল আরজী সম্বন্ধে Body Sheet বা সরকারী নির্দ্দেশ। এই Body Sheet আবার সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীর (Proccedingsএর) সংক্ষিপ্তসার।" ব্রজেন্দ্রবাবু কারণ যাহাই অনুমান করুন, কোন কোন জিনিষ যে রাখা হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই বলিতেছেন, এবং বিস্তারিত কার্য্যবিবরণ না রাখিয়া কেবল তাহার সংক্ষিপ্তসার রাখা হইয়াছে, তাহাও তিনি বলিতেছেন। কেবল আরজীগুলি ছাড়া আর সবই আছে এবং সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া আবশ্যক কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? তাহার প্রমাণ ত পাইতেছি না। যাহা হউক, দপ্তরে কি নাই কেবল তদ্বিষয়ক অনুমান হইতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে না। অতএব, কি নাই বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত অন্য প্রকার উপকরণের সন্ধান লইতে হইবে।

এ বিষয়ে ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁহার অপ্রকাশিত প্রবন্ধটিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"রাজা রামমোহন রায় যে আলবিয়ান নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন তাহার যাত্রীদের নামের যে তালিকা তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় দেখা যায়, তাহার অল্পসংখ্যকের নামই এই গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রক্ষিত তালিকায় পাওয়া যায়। কেবল ঐ জাহাজের যাত্রীদের নহে, ঐ সময় আরও যে সকল জাহাজ ছাড়ে তাহার যাত্রীদের পক্ষেও ইহা সত্য। এরূপও দেখা যায়, যে, হয়ত স্বামী স্ত্রী যাত্রী ছিলেন ; কিন্তু স্বামীর নাম গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে পাওয়া যায়, স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডই অধিকতর প্রামাণিক হওয়াতে একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জাহাজের যাত্রীদের নামের

তালিকা ঠিক নহে, হয়ত ঐ সকল লোকের যাইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু শেষ অবধি যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই ;—যদিও প্রমাণান্তরের অভাবে এই অনুমানের যৌক্তিকতা দেখা যায় না, তথাপি তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও এ কথা বলিতে হইবে যে, আলবিয়ান জাহাজের যাত্রীদের নামের যে তালিকা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রক্ষিত তাহা অসম্পূর্ণ। কারণ রামমোহনের সহযাত্রী সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সাদারল্যাণ্ডের নাম উক্ত গভর্ণমেণ্টের জাহাজে স্থান দেওয়ার আদেশসমূহের রেকর্ডে কোথাও পাওয়া যায় না।* সাদারল্যাণ্ড সাহেব যে রামমোহনের সহযাত্রী রূপে আলবিয়ন জাহাজে বিলাত যান নাই, একথা বলিবার উপায় নাই। কাজেই ইহা

* ডক্টর মজুমদার সরকারী দপ্তরখানায় সাদারল্যাণ্ড সাহেবের একটি দরখাস্ত ও তাহার উপর আদেশ পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা আলবিয়নে বা কোন জাহাজে স্থান চাওয়া পাওয়া সম্বন্ধে নহে। তাহা এই ঃ—

"Mr. Sutherland

To H. T. Prinsep, Esq.,

Secretary to Government, &c. &c.

Sir,

I beg you will please to this my application to the Rt. Hon'ble the Governor-General in Council for a certificate of good conduct during my stay in Indis to enable me to return to this country should circumstances render such a measure necessary.

I have the honour &c.

Calcutta 14th October, 1830 (Sd.) J. Sutherland.

The officiating secretary reports that the request preferred in the foregoing letter has been complied with.

হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যে, এ বিষয়ে যে গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডের কথা বলা হইযাছে, তাহা অসম্পূর্ণ। সাদারল্যাণ্ডের নাম যখন গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে পাওয়া যায় না, তখন গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে যাহার নাম পাওয়া যায় পরিচয়বিহীন এরূপ অপর কোনও সাহেবকে কি সাদারল্যাণ্ড বানাইতে হইবে? সেখ বক্‌সর পরিচয় না জানায় ও গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডে রাজারামের নামের উল্লেখ না থাকায় সেখ বক্‌সুকে রাজারাম বানান অসঙ্গত।"

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি এইরূপ অনুমান করি, যে, রামমোহন ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে আলবিয়ন জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন তারিখে বা ১৫ই ও ১৯ নবেম্বরের মধ্যে কোন তারিখে ঐ জাহাজে রাজারামকে স্থান দিবার আদেশ লইয়াছেন, কিন্তু সেই আদেশ গবর্ন্মেণ্টের দপ্তরখানায় নাই, এবং যে কারণেই হউক, সেখ বক্‌সুর রামমোহনের সঙ্গে বিলাত যাত্রা ঘটিয়া উঠে নাই। গবর্ন্মেণ্ট রেকর্ডসের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিলে আমার অনুমান যে অসঙ্গত হয় না, তাহা আমি দেখাইতেছি।

রামমোহনকে আলবিয়ন জাহাজে স্থান দিবার আদেশ ১৮৩০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে দেওয়া হয়. তাহার পর ১৫ই নবেম্বর আলবিয়ন জাহাজ ছাড়িবার দিন তাঁহার সঙ্গে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হরিচরণ দাস ও সেখ বক্‌সুকে স্থান দিবার আদেশ দেওয়া হয়। মধ্যে যে এক মাস সাত দিন সময় ছিল, তাহার কোন দিন রাজারামের জন্য আদেশ লওয়া অসম্ভব ছিল না। রাজারাম যে রামমোহনের সঙ্গে যাইবেন, এই সংবাদ ১৫ই নবেম্বর তারিখের আগেই কোন কোন খবরের কাগজে

বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে আদেশ লওয়া হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর। তবে, খবরের কাগজে খবরটি অনুমানমূলক হইয়া থাকিলে ১৫ই হইতে ১৯শের মধ্যেও আদে লইবার সময় ছিল। ইহা বলিবার কারণ বলিতেছি।

ব্রজেন্দ্রবাবু প্রমাণ দেখাইয়াছেন, যে, আলবিয়ন জাহাজ ১৫ নবেম্বর কলিকাতা ছাড়ে। ইহা ঠিক্। কিন্তু রামমোহন যে ১৯শে কলিকাতা হইতে রওনা হন ইহাও ঠিক্। ইহা রামমোহনের স্মৃতি বিভ্রম নহে। ১৮৩২ সালের ক্রিশ্চ্যান রিফর্মার ছাড়াও এবিষয়ে অন্য প্রমাণ আছে। রামমোহন আলবিয়ন জাহাজে বিলাত পৌঁছেন, কিন্তু তিনি কলিকাতা হইতে ১৯শে নবেম্বর ফর্ব্বস্ (Forbes) নামক ষ্টীমারে রওনা হইয়া আলবিয়ন জাহাজ ধরেন। আলবিয় পালের জোরে চলিত বলিয়া মন্থরগতি, তাহাকে ধরা ষ্টীমার ফর্ব্বসের পক্ষে সুসাধ্য ছিল। ১৮৩০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের বেঙ্গল ক্রনিক্ল নামক কাগজে ইহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

"Rammohun Roy and about fifteen native gentle men of distinction who accompanied him, embarke on board the Steamer *Forbes,* on the 19th about ten in the morning, to proceed down to the *Albion* Kedgree. As they did not get down to the ship until next morning these native gentlemen experience the greatest inconvenience, which was increase by a heavy shower of rain at night and the want sleeping accommodation for so many. They bored all however with the greatest good humour, although they had never proceeded so far down the river before. They did back not their friend until the saw him safe on board the *Albion.* When the *Forbes* passed that ship on her return. conveying them back to Calcutta, they joined the Captain officers and European passengers in three hearty cheers in honor of the distinguished individual of whom they had taken leave with every token of cordiality and estee and some with heavy hearts and tearful eyes. The cheer was returned from the ship and most deep felt by Rammohun Roy, when it was explained him that it was in honor of him and his novel a singularly bold undertaking. When our letters left the *Albion,* the *Andromache* was a short distantastern of her in tow of the Emulous. Rammohun Roy was in excellent health and spirits."

ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে রামমোহন রায় কেন রাজারাম নাম ব্যবহার না করিয়া জাহাজে স্থান লইবার আরজীতে সেখ বক্সু নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'মিথ্যা নাম অভিহিত করিয়া" কাহাকেও বিলাত লইয়া গেলে "ধরা পড়িলে সাজা যাহাই হউক', ইত্যাদি। তাঁহার এই সব কথার আমি আলোচনা করিব না বলিয়া তাঁহার এই প্রসঙ্গে লিখিত সব কথা উদ্ধৃত করিলামনা সংক্ষেপে ঠিক তাৎপর্য্যও দিলাম না। কেবল ধরা পড়া না-পড়া সম্বন্ধে কিছু বলিব।

জাহাজে স্থান রাখিবার বা করিবার আদেশগুলিকে ব্রজেন্দ্রবাবু পাসপোর্ট বা কার্য্যতঃ পাসপোর্ট অর্থাৎ বিদেশে যাইবার অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র মনে করেন। আমি তাহা মনে করি না। কেন, তাহা বলিতেছি।

আমাকে ১৯২৬ সালে ইউরোপ যাইবার জন্য পাসপোর্ট লইতে হইয়াছিল। গত ১৯৫৩ সালে আবার তথায় যাইবার নিমিত্ত পাসপোর্ট লইয়াছিলাম—যদিও যাওয়া হয় নাই। ইহাতে একটি পাতায় আছে—সব পাসপোর্টেই থাকে,

"These are to request and require in the Name of the Viceroy and Governor-General of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him (or her) every assistance and proteetion of which he (or she) may stand in need."

তাহার পর তারিখ, সরকারী ছাপ এবং "By order of the Viceroy and Govornor-General of India" ইত্যাদি আছে ও থাকে।

যাহাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়, পাসপোর্টে তাহার নাম, পেশা, জন্মের স্থান ও তারিখ, হাল সাকিন, উচ্চতা (height), চোখের রং, চুলের রং, কোন দৃশ্য পরিচায়ক-চিহ্ন, পিতার নাম, ও ধর্ম্ম লেখা থাকে। পাসপোর্টপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ দেশ যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, তাহাও পাসপোর্টে লেখা থাকে। পাসপোর্ট লইবার দরখাস্ত করিবার সময় দরখাস্তকারীকে নিজের দুইখানা ফোটোগ্রাফ দিতে হয় ও নিজের স্বাক্ষর দিতে হয়। পাসপোর্টে উহার একখানা ফোটোগ্রাফ আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নীচে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষরটিও আঁটিয়া দেওয়া হয়। যাত্রীর সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী থাকিলে তাঁহারও ফোটোগ্রাফ ও স্বাক্ষর আঁটিয়া দেওয়া হয়। দুইখানা ফোটোগ্রাফের মধ্যে, অনুমান করি, একখানা সরকারী দপ্তরে রাখা হয়।

কোম্পানীর আমলের জাহাজে স্থান করিবার আদেশ পাসপোর্ট বা তত্তুল্য কিছু হইলে উক্ত সব বর্ণনা আদি কোথায়?

যাত্রী যখন বন্দরে নামে তখন জাহাজ হইতে নামিবার আগে জাহাজেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। তখন তাহার পরিচয় লওয়া ও পাসপোর্ট দ্বারা সনাক্ত করা হয় বা হইতে পারে। বন্দরে নামিবার সময় পাসপোর্ট খুলিয়া এই কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীকে নাম ও ফোটোগ্রাফ দেখাইতে হয়। তিনি যাত্রীদের মুখের দিকে তাকাইয়া চেহারাটা ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিলাইয়া লন। ১৮৩০ সালে ইহার মত সনাক্ত করিবার রীতি সম্ভবতঃ কিছু ছিল। সেখ বক্সুকে রাজারাম বানান গিয়া থাকিলে ইংলণ্ডে নামিবার সময় তাহাকে কোন্ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। কাগজপত্রে ও পুস্তকে রাজারামের যত উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তই হয়, যে, ভারতবর্ষে রামমোহনের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, শত্রু—কেহই—কখনও সেখ বক্সু নাম ব্যবহার করে নাই, জাহাজেও কেহ করে নাই, ইংলেণ্ডও কেহ করে নাই, তাহাকে বিলাতে চাকরী দেওয়া হয় রাজারাম নামে, সবাই সব সময়ে রাজারাম, রাজচন্দ্র, রাজা, রাজু, বা রাজী নাম ব্যবহার করিয়াছে, অথচ কেবল জাহাজে স্থান করিবার আদেশ লইবার জন্যই সেখ বক্সু নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব—অন্ততঃ অত্যন্তই কঠিন। এবং যে সেখ বক্সু নাম শত্রু মিত্র কেহই জানিত না, কেবল একবার তাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যকই বা কি ছিল? ধরা পড়িবার ভয়? সেখ বক্সু নাম যখন অন্য কেহই জানিত না, তখন রামমোহনকে ধরাইয়া দিবে কে?

ব্রজেন্দ্রবাবু পাসপোর্টের কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে যাহারা যে নামে বিদেশে যায়, স্বদেশে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে যাইবার সময়কার পাসপোর্টের সাহায্যে যাইবার সময়কার নামেই ফিরিতে হয়। ১৮৩৮ সালে যখন রাজারাম "জাভা" নামক জাহাজে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাহার যাত্রীদের তালিকায় উল্লিখিত আছে—"Raja Ram Roy, the son of tho late Rammohon Roy"। রাজারাম সেখ বক্‌সু হইলে অন্ততঃ তখন সেখ বক্‌সু নাম ব্যবহার করিতে হইত, নতুবা নাম ভাঁড়াইবার অপরাধে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন। যাত্রীদের তালিকায় যে তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, ব্রজেন্দ্রবাবু স্বীকার করিয়াছেন, যে, পালিত পুত্রকেও পুত্র বলা যায়।

মাঘের প্রবাসীতে ব্রজেন্দ্রবাবু রমাপ্রসাদ বাবুর সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনার‍্যালের কোম্পানীর আমলের মূল কার্য্যবিবরণী কলিকাতাতেই আছে শুনিয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবু লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস হইতে আনাইয়া তাহার নকল ছাপাইয়াছেন। দলীল সংগ্রহের এই প্রকার রীতি লক্ষ্য করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু হয়ত তৎ-সম্বন্ধে "বিচিত্র" বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, "Public Body Sheet, 21st October, 1830 No. 95" এর অনুবাদে ব্রজেন্দ্রবাবু গোড়ার কথা "Thc Secretary reports" বাদ দিয়াছেন এবং "অনুমতি পত্র" এই কথাটি আমদানী করিয়াছেন। প্রমাণের এইরূপ ব্যাখ্যাকেও রমাপ্রসাদ বাবু "বিচিত্র" বলিয়া থাকিবেন।

রাজারাম তাহার পালক পিতা রামমোহন রায়ের সহিত 'হয়ত' যাইতে ব্যাকুল হওয়ায় তিনি সেখ বক্‌সুর জায়গায় তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদবাবু এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। আমি এই অনুমানের সপক্ষে বা বিরুদ্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না ;—রাজারামের যাওয়া সম্বন্ধে আমি কিছু ভিন্ন রকম অনুমান আগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুর অনুমানের সমালোচনা করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু রামপ্রসাদ বাবুর এতদ্বিষয়ক বাক্যগুলির যে সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, তাহা ঠিক্ হয় নাই। রামপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছিলেন ঃ—

"রামমোহন রায় যখন আদৌ তিনজন অনুচরের জন্য আলবিয়ন জাহাজে জায়গা চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তখন রাজারামের যাওয়ার কথা ছিল না। তারপর যখন যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল, তখন পিতামাতা উভয় স্থানীয় পালক পিতার সঙ্গে যাইবার জন্য হয়ত রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া সহজ হইল না।" (পৌষের প্রবাসী, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।)

ব্রজেন্দ্র বাবু রমাপ্রসাদ বাবুকে বলাইয়াছেন, "কিন্তু যাত্রার দিন যখন ঘনাইয়া আসিল—অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পরে—রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়াতে রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।" (মাঘের প্রবাসী, ৫৪২ পৃষ্ঠা।)

রমাপ্রসাদবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার "হয়ত" কথাটির উপর আমি বেশী জোর দিয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার জায়গায়, "হয়ত" বাদ দিয়া, ব্রজেন্দ্রবাবু করিয়াছেন "রাজারাম 'বিশেষ' ব্যাকুল হইয়া পড়াতে।" রমাপ্রসাদ বাবু

লিখিয়াছিলেন, "যখন যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল"; ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার মানে করিয়াছেন, "অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পর"। কিন্তু যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসার অর্থ (আলবিয়ন জাহাজের) যাত্রার দিন নহে।

এই প্রকার সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা অনুচিত। সাধারণ পাঠকপাঠিকা রমাপ্রসাদ বাবু ও ব্রজেন্দ্রবাবুর লেখা পাশাপাশি রাখিয়া পড়িয়াছেন বা পড়িবেন, আশা করা যায় না। সেই জন্য রমাপ্রসাদ বাবু ঠিক্ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। তাহা না-করায় তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে ভ্রম উৎপাদিত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক।

ব্রজেন্দ্রবাবু মাঘের প্রবাসীর ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"রমাপ্রসাদ বাবু যে 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি'কে 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার প্রথম আপত্তি অপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই যদি 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয় তাহা হইলে রামমোহন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরিত্রে এই ধরণের যে-সকল অপবাদ আরোপ করিয়াছেন, তাহাও 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে।"

প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই রমাপ্রসাদ বাবু 'ক্ষেপার উক্তি' বলেন নাই, বিশেষ একটা উক্তিকে বলিয়াছেন।

রামমোহনকে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ-কারীদিগকে নৈতিকসদ্‌গুণশালিতা ও বিবেচকতা বিষয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু সমতুল্য মনে করেন কি না জানি না ; আমি সমতুল্য মনে করি না। অবশ্য রামমোহনের বিপক্ষেরা সকলে দুষ্ট লোক ছিলেন, ইহা বলাও আমার অভিপ্রেত নহে।

যাহা হউক আমরা শতাধিক বৎসর আগেকার মানুষদের সম্বন্ধে কি মনে করি, তাহার আলোচনা না করিয়া তখনকার সমসাময়িক "নিরপেক্ষ" লোক কি মনে করিতেন তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি।

মাঘের প্রবাসীর ৫৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্রজেন্দ্রবাবু "সমাচার দর্পণ" কাগজখানিকে "নিরপেক্ষ" বলিয়াছেন। এই নিরপেক্ষ কাগজখানি রামমোহনের কতকগুলি বিপক্ষের আচরণ বর্ণনা করিতে গিয়া "উন্মত্ততাপূর্ব্বক" এবং "রাগপূর্ব্বক" এই দুটি কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।) রমাপ্রসাদ বাবু ইহার বেশী কিছু করেন নাই।

১৩৪৬ আষাঢ়

পুস্তক-পরিচয়

রাজা রামমোহন রায়—তাঁহার জীবনী, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও বিশ্বমানবতা (কবিবর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা ও কবিতা সহ)। শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্ এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক, ১৬ নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫-৬৪। ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দিরের ছবি পুস্তকটিতে আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে গ্রন্থকারের ষোলপৃষ্ঠাব্যাপী জীবনবৃত্তান্ত আছে। মূল্য আট আনা।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও গ্রন্থকারের রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনাটি সুলিখিত। তাহার পর পরিশিষ্টে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর "রামমোহন রায়ের পারিবারিক তথ্য" ৫ পৃষ্ঠা এবং "আনন্দ বাজার পত্রিকার ১৩৪৩ সালের 'দোল'সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত" "রামমোহন রায় ও রাজারাম" ১১ পৃষ্ঠা, এই দুটি পরিশিষ্ট আছে।

পুস্তকখানিতে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। "মহাত্মা রামমোহন রায়ের সার্বজনীন ধর্ম ও বিশ্ব-মানবতা" অধ্যায়টি বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে।

মূল পুস্তিকায় রামমোহন রায়ের বহু গুণাবলীর উল্লেখ ও প্রশংসা আছে। তন্মধ্যে, তাঁহাকে "বিশ্বমানবতার অগ্রদূত" বলা হইয়াছে। করুণানিধানবাবু স্বলিখিত ভূমিকায় তাঁহাকে "সাহিত্যে ও শিক্ষায়, ধর্মে ও সমাজে এক যুগপ্রবর্ত্তক" বলিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, রামমোহনের প্রদর্শিত পথ "ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে।" এইরূপ মত প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কারণ, ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি রামমোহনের উচ্চতর প্রশংসাও করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনটি প্রধান বিষয়ে তিনি রামমোহনের নির্দেশানুযায়ী পন্থার অনুসরণ করিতেন। অতএব রামমোহনের প্রশংসা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন ও অপরকে বিশ্বাস করাইতে চান, যে, রামমোহনের এক "প্রণয়িনী" ছিল এবং রাজারাম রামমোহনের ও তাহার পুত্র, তাঁহারাও তাঁহাকে আবার যুগপ্রবর্ত্তকও মনে করেন। বহু জাতির পুরাণে তাঁহাদের দেবতাদের অপকার্য্যের বৃত্তান্ত আছে, অথচ ঐ দেবতারা তাঁহাদের পূজ্য। অনেক দেশের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবতার ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের কোন কোন দুষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। কিন্তু রামমোহনের মত কোন সাধারণ মানুষ (যিনি দেবতা নহেন, অবতার নহেন, "প্রেরিত" পুরুষ নহেন, যিনি ঈশ্বরের আদেশ পান নাই ও পান বলিয়া কখন দাবী করেন নাই, যাঁহার কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল না, এরূপ কোন মানুষ) চারিত্রিক গুরুতর দোষ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মত বহু জাতির বহুভাষাভাষীর বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত প্রাচীন-সভ্যতা-বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রবণ কোন বৃহৎ দেশের ধর্ম্মে

সমাজে শিক্ষায় রাষ্ট্রনীতিতে,...যুগপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে কিনা, রামমোহনের সমালোচকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। ও-রকম সাধারণ মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রতিভা ও কৃতিত্ব দ্বারা যুগপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, চরিত্রহীন হইলে পারেন না। চারিত্রিক হীনতা সত্ত্বেও মানুষ কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে কৃতী হইতে পারে ; কিন্তু ধর্ম্ম, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি মানবজীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে "যুগপ্রবর্ত্তক" হইতে পারে কি? যিনি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টার জন্য এবং নারীদের অন্য কোন কোন দুর্দশামোচনের চেষ্টার জন্য সম্মানিত, তিনিই স্ত্রীলোকের সহিত বহুবিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এরূপ আচরণ সত্ত্বেও যুগপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য।

ব্রজেন্দ্রবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে প্রবাসীতে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কথার উত্তরও প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সে সমুদয়ের খণ্ডন বা উল্লেখ তাঁহার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে করেন নাই। সান্যাল মহাশয়ও উভয় পক্ষের কথা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল ব্রজেন্দ্রবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমি একটি ছোট বহির পরিচয় প্রদান উপলক্ষ্যে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিতে চাই না। সাধারণ ভাবে আরও ২। ১টি কথা মাত্র বলিব।

উপরে যাহা লিখিয়াছি এবং পরে যাহা লিখিতেছি, তাহা লিখিবার কারণ, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সকল মানুষেরই সুনাম তাঁহাদের অমূল্য সম্পত্তি। তদ্ভিন্ন, প্রসিদ্ধ মানুষদের সুনাম, তাঁহারা যে-জাতির মানুষ, সেই জাতির অমূল্য সম্পত্তি। তাহা সহজে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়।

ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহনের বহু প্রশংশনীয় কার্য্য ও আচরণ গবেষণা দ্বারা সর্ব্বসাধারাণকে জানাইয়াছেন। ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি তাঁহার যে নিন্দা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবিতকালে কেবল কর্ম্মবিষয়ক কলহ উপলক্ষ্যে তাঁহার হিন্দু বিপক্ষদের লেখায় স্থান পাইয়াছিল, তাঁহার জীবিতকালে কোন ঐতিহাসিক বা জীবনচরিত-পুস্তকে স্থান পায় নাই। এই সব কলহে সত্য-নির্ণয় অপেক্ষা বিপক্ষকে হেয় করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী থাকে। এই জন্য কলহ উপলক্ষ্যে লিখিত নিন্দার বিশ্বাসযোগ্যতা কম। ইহার বিশ্বাসযোগ্যতা এই আর একটি কারণেও কম যে, রামমোহনের হিন্দু বিরোধীরা তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া থাকিলেও খ্রীষ্টিয়ান বিরোধীরা তাহা করেন নাই, বরং অনেকে তাঁহার চারিত্রিক প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তবিক দোষ থাকিলে মিশনরীরা ছাড়িয়া কথা কহিতেন না, নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যে "সমাচার দর্পণ"কে নিরপেক্ষ বলিয়াছেন, তাহার ১৮৩২ সালের ৩রা নবেম্বরের সংখ্যা হইতে তিনি "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"শ্রীযুত রামমোহন রায়। আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ

উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য।.তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।"

রামমোহন কোন বিবিসাহেবকে বিবাহ করেন নাই। সুতরাং তদ্বিষয়ক গুজব মিথ্যা রটিত হইয়াছিল। অতএব উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফটিতে উল্লিখিত "উন্মত্ততাপূর্ব্বক" রটিত গুজবটা সমাচার দর্পণ যেমন "অমূলক ও অগ্রাহ্য" বলিয়াছেন, রামমোহনের "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা" "রাগপূর্ব্বক" যে সব গ্লানি রটনা করিয়াছিলেন তাহাও সেইরূপ অবিশ্বাস্য, সমাচার দর্পণে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে। এই মত ব্যক্ত হইয়াছে এরূপ লোকের দ্বারা যাঁহার রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ছিল।

রামমোহন তাঁহার ব্যক্তিগত চারিত্রিক কুৎসার প্রতিবাদ করেন নাই, অতএব তাহা সত্য, ইহা বলবৎ যুক্তি নহে। ব্যক্তিগত কোন কোন জঘন্য মিথ্যা নিন্দা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ হয় নাই, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কেহ কেহ তাঁহাদের কুৎসার প্রতিবাদ করা আত্মমর্য্যাদার হানিজনক (beneath their dignity) মনে করিতে পারেন। রামমোহন তাঁহার কুৎসার সাধারণ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কুৎসার অন্তর্নিহিত প্রশ্নের দিকটা উত্তর দিবার যোগ্য মনে করেন নাই—ইহা অসম্ভব নহে।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের ও রাজারামের এক একটি ছবি দিয়াছেন। তিনি এই দুটিতে যে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুমানের সমর্থক মনে করেন। সাদৃশ্যের বিচারের পূর্ব্বে অন্য কতকগুলি কথা বিচার্য্য।

রামমোহন রায়ের কয়েকটি ছবি দেখা গিয়াছে। কোনটিই ফোটোগ্রাফ নহে। কোন কোনটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। কোন্‌টি যে ঠিক্ তাঁহার চেহারার মত, জানি না। রাজারামের ছবিও যে ঠিক্ তাঁহার চেহারা মত কি না, বলা যায় না। অতএব এই দুটি ছবি হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ছবি দুটি যদি ঠিক্ তাঁহাদের চেহারার মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আরও কিছু বিবেচ্য আছে। যথা—

বিস্তর পিতাপুত্র আছেন ও ছিলেন যাঁহাদের মধ্যে চেহারার মিল নাই, এবং এরূপ লোক অনেক আছে ও ছিল যাহাদের চেহারা প্রায় হুবহু এক অথচ যাহাদের মধ্যে কোন রক্তসম্পর্ক নাই। অল্পস্বল্প সাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইংলণ্ডে আজকাল অনিশ্চিতপিতৃত্ব শিশুদের পিতৃত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রক্তপরীক্ষার (Blood test এর) আলোচনা হইতেছে। চেহারার সাদৃশ্য নিশ্চিত প্রমাণ বা অনুমানভিত্তি নহে।

ব্রজেন্দ্রবাবু দুটি ছবির মধ্যে সাদৃশ্যই দেখিয়াছেন, অন্য অনেকে বৈসাদৃশ্য

দেখিয়াছেন। যেমন, একটির নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, কতকটা শুকনাসিকার মত ; অন্যটির নাসিকা স্থূলাগ্র ; ইত্যাদি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমানগুলির একটিরও আলোচনা আমি করিলাম না। তাহা না করিয়াও সাধারণ ভাবেও আরও অনেক কথা বলিবার আছে। বাহুল্যভয়ে বলিলাম না। যাহা লিখিলাম তাহাও আলোচ্য পুস্তকের ক্ষুদ্রতার তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৩৩৫ কার্তিক

'নিম্ন অধিকারী''

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রাচীনপন্থী হিন্দুও রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়া সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্যোগী আগে আগে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ও অন্যান্য সংস্কার প্রয়াসীরাই হইতেন। সুখের বিষয়, ক্রমশ অন্যেরাও এখন বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন। কারণ, রামমোহন রায় কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন। যে-কেহ তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, যে-কেহ তাঁহার আদর্শ অনুসরণীয় মনে করেন, তিনি তাঁহারই আত্মীয়। দেশী বিদেশী সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার।

বর্ত্তমান বৎসরে হিন্দু মিশন রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি সভা আহ্বান করেন। অনুরুদ্ধ হইয়া আমি তাহার সভাপতির কাজ করিয়াছিলাম। বক্তারা সকলেই রামমোহনের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। দুই জন বক্তা বলেন, রামমোহন রায় স্বীকার করিয়াছেন, যে, মূর্ত্তিপূজা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অনাবশ্যক বা অবৈধ নহে। তাঁহারা ঠিক্ কি কি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন মনে নাই, তাৎপর্য্য দিলাম। সভাস্থলে এ বিষয়ের কোন প্রকার আলোচনা করা আমি উচিত মনে করি না। এখানেও তাহা করিব না। নিম্ন অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা আবশ্যক, বৈধ, কর্ত্তব্য প্রভৃতি যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সসম্মান-অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের দেশের এমন কোন রাজনৈতিক দল বা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক সমিতি নাই, যাঁহারা ভারতীয় বিস্তর লোককে সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত মনে করেন না। বস্তুতঃ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, নানা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, সামরিক নানা বিভাগ—যে-কোন বিভাগের যে-কোন কাজের যোগ্য ভারতীয় লোক পাওয়া যায়, ইহা ভারতীয়েরা বিশ্বাস করেন, এবং এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন নহে। দর্শনের, বিজ্ঞানের, গণিতের, সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম জটিল, গভীর

ও দুরূহ তত্ত্ব ভারতীয়দের অধিগম্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা মনে করি, আমাদিগকে সকল বিষয়ে জোর করিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যদিকে, আমাদের প্রভু ইংরেজরা বলেন, "তোমরা অধিকাংশই নিম্ন অধিকারী ; দু দশ জন ধীরে ধীরে যেমন উচ্চ অধিকারী হইতেছে, অমনি তাহাদিগকে কঠিন কাজের ভার দেওয়া হইতেছে।" এরূপ কথার প্রতিবাদ করিয়া আমরা বলি, "না, আমরা উচ্চ অধিকারী ; তোমরা জোর করিয়া আমাদিগকে নিম্ন অধিকারী করিয়া রাখিয়াছ।"

প্রাচীন কালের বহু ঋষি, মধ্যযুগের নানক কবীর প্রভৃতি এবং আধুনিক সময়ে রামমোহন তাঁহাদের দেশবাসীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্চ অধিকারী হইবার ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ অধিকারী হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারতীয়দিগের মধ্যে, অশিক্ষিতদের কথা দূরে থাক, খুব প্রতিভাশালী বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেক লোকও বলিতেছেন, 'না, আমরা নিম্ন অধিকারী ; উচ্চ অধিকারের যোগ্য আমরা নহি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিম্ন অধিকারীই থাকিব।' যাঁহারা অন্য সব বিষয়ে ভারতীয়দের জন্য উচ্চ অধিকারের দাবী করেন, ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্চ অধিকারের দাবী না করিয়া তাঁহারা নিম্ন অধিকারীই কেন থাকিতে চান, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, ইহাই আমার সবিনয় অনুরোধ। এই প্রশ্নের উত্তর আমি চাহিতেছি না। মূর্ত্তিপূজকেরা নিম্ন অধিকারী, ইহাও আমার উক্তি নহে, তাঁহাদেরই কাহারও কাহারও উক্তি। মূর্ত্তি-পূজক না হইলেই উচ্চ অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া যায়, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। অন্য সব বিষয়ে নিজেদের উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিব, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে নিম্ন-অধিকার-বাদের সাহায্য অধিকাংশ দেশবাসীর পক্ষে আমরণ লইব, এবম্বিধ মনোভাবের কারণ সকলেরই চিন্তনীয়।

এবিষয়ে কোন আলোচনা বা বাদানুবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না, কিন্তু আমার লিখিত কোন তথ্যে ভুল থাকিলে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে।

রামমোহন ও বিবেকানন্দ

হিন্দু মিশনের রামমোহন স্মৃতিসভায় স্বামী বিবেকানন্দের নামের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উক্তিতে আমার মনে পড়িয়া যায় ও আমি বলি, ভগিনী নিবেদিতার একখানি বহিতে আছে, যে, স্বামীজি বলিতেন তিনি রামমোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেছেন। "ধম্মপদ" নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু তাহাতে বলেন, যে, তিনিও স্বয়ং স্বামীজিকে রামমোহনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ কথা বলিতে একাধিক বার শুনিয়াছেন।

যাঁহার স্বয়ং শক্তিমান, তাঁহারা নিজেদের উপর অন্যের প্রভাব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না।

রামমোহন ও শুদ্ধি

রামমোহন রায়কে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা নিজের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছেন। হিন্দু মিশনের সভায় একটি নূতন কথা শুনিলাম। তাঁহারা বলেন, রামমোহনই (কথায় না হইলেও) কার্য্যতঃ শুদ্ধির পথপ্রদর্শক। এক জন বক্তা বলিলেন, রামমোহন যে বালকটিকে পালন করিয়াছিলেন ও যে রাজারাম নামে পরিচিত, সে বংশতঃ মুসলমান ছিল। ইহার কোন প্রমাণের উল্লেখ বক্তা করেন নাই। একটি পরোক্ষ প্রমাণের কথা বা অনুমান আমাদের মনে হইতেছে। রামমোহন রায় যখন বিলাত যান, তখন তিনি যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুচরদের মধ্যে জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় শেখ বক্‌সু নামক এক জনের নাম ছিল, রাজারাম বলিয়া কোন লোকের নাম ছিল না। কিন্তু বিলাতে তাঁহার পোষ্যদের মধ্যে শেখ বক্‌সু নামক কেহ ছিল না, রাজারাম ছিল। এই গরমিলের কারণ এপর্য্যন্ত এই রূপ অনুমিত হইয়া আসিতেছে, যে এদেশ হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন কারণে শেখ বক্‌সুর যাওয়া হয় নাই, রামমোহন রায় তাহার জায়গায় রাজারামকে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অদলবদল ত হঠাৎ হইতে পারে না, জাহাতে বিদেশ যাত্রা করিতে হইলে হুকুম লইতে হয়। শেখ্ বক্‌সুর জন্য হুকুম লওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে, রাজারামের জন্য হুকুম লইবার কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য ইহাই সম্ভব, যে, বক্‌সুকেই রামমোহন রায় রাজারাম নাম দিয়াছিলেন।

এই অনুমান সত্য হইলেও অবশ্য ইহা প্রমাণ হয় না, যে, বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধি বলিতে যাহা কিছু বুঝায় রামমোহন তাহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য, যে, তিনি কোন ধর্ম্মের লোককেই অবজ্ঞা করিতেন না, সুতরাং মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, মনে করিতেন।

রামমোহনের অগ্রদৌত্য

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্য কোন কোন বিষয়ক যে-সব আন্দোলন ও প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, তিনি সেই সকলের সূত্রপাত তাঁহার নানা কাজে ও রচনায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত ও রচনাবলী সম্বন্ধে যত নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, ততই বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি আগাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের কথা তিনি আগেই বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের যে কয়টি চিঠি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের অগ্রদৌত্যের নূতন প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কোন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা সকল

মানুষের ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে যাহাই বলিয়া থাকুন, সকল দেশ ও জাতির ভাগ্য ও মঙ্গলামঙ্গল যে পরস্পরের সহিত জড়িত, সমুদয় মানব যে এক বৃহৎ পরিবারের মত, রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা সবেমাত্র অধুনা কথায় স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কাজে এখনও অল্পই স্বীকৃত হইয়াছে। এন্‌থ্রপলজিষ্ট অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এখনও শ্বেতবর্ণ এমন বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা উত্তর-য়ুরোপের জাতিসকলকে ও তাঁহাদের বংশধরদিগকে অর্থাৎ নর্ডিকদিগকে অন্য সব মানুষের চেয়ে মূলতঃ শ্রেষ্ঠ মনে করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীনীতি ও বিজ্ঞানের সেবকগণ সকলে এখনও সমগ্র মানবজাতির একত্ব স্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু ১৮৩১ সালে রামমোহন রায় ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখিতেছেন ঃ—

"It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deduction of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which the numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

তাৎপর্য্য। ইহা আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে, যে, শুধু ধর্ম্ম নহে কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত সাধারণ বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলও আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে সমগ্র মানবজাতি এক বৃহৎ পরিবার এবং নানা দেশবাসী জাতি ও উপজাতি তাহার শাখা মাত্র। এই জন্য সমুদয় মানবজাতির সুখ সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরের মিলামিশা ও আদান প্রদানের পথে সকল অন্তরায় দূর করিয়া এইরূপ মিলামিশা সহজ করিতে সব দেশের প্রজ্ঞালোকপ্রাপ্ত লোকেরা নিশ্চয়ই চাহিবেন।

১৩৪১ কার্তিক

রামমোহন রায়ের স্মৃতি

১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে পরলোগমন করেন। প্রতিবৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের অনেক নগরে ও গ্রামে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য জনসাধারণের সভায় অধিবেশন হয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের নানা দিক্ আলোচিত হয়। এ-বৎসরও তাহা হইয়াছে। সকল সভার উল্লেখ করা মাসিক কাগজের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা দুটির উল্লেখ করিব।

দার্জিলিঙের সভায় ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় যাহা বলেন, তাহার প্রতিবেদন এসোসিয়েটেড্ প্রেস এইরূপ দিয়াছেন ঃ—

"It will be a wrong reading of the Raja's life to consider him as a type of wild passionate youth aspiring to be a nation's leader," said Sir Jadunath Sarkar, in presiding over a public meeting held yesterday evening at the local Brahma Mandir Hall to commemorate the death of Raja Rammohun Roy. Sir Jadunath added,

"The Raja made long arduous preparations for his life's chosen task of founding a religion of concord. He went into the original sources of the chief religions of his day, by mastering Sanskrit, Arabic, English and Hebrew and probaly some amount of Tibetan. Mere emotionalism could not have created for him such a commanding position in the world of thought. Emotion is like alcohol administered to a sinking patient ; it can create a temporary stimulation, but if it is given as a permanent diet, it promptly kills him.

"The Raja's success had a more solid foundation than frothy rhetoric. He was truly a pioneer–like the early North American explorers who blazed a trail across the dark unknown and dangerous primitive forests to reach the West. At Rammohun's birth the old Indian civilisation was almost dead, and Rammohun was the prophet of a new Indian civilisation uniting the best elements of the East and the West, so that the Hindu race did not perish in the new age, as the American Indians have done.

"In Europe the Renaissance and the Reformation were two distinct movements. But in India they were united in the person of Rammohun. All modern Indians, Hindus, Muslims, Brahmos and Christians, irrespective of their special creeds, are the heirs of the rich legacy of spiritual and intellectual culture left behind by Rammohun Roy."

Concluding, the speaker said, "To contemplate his life and achievements is to eunoble our minds like glimpses of the pure lofty, serene Himalayan heights caught amidst our low daily surroundings."

তাৎপর্য্য। জাতীয় নেতা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পোষক অসংযতভাবোন্মত্ত ধাঁচের এক জন যুবক বলিয়া রামমোহনকে মনে করিলে তাঁহার জীবন ভুল বুঝা হইবে। মিলন ও সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম স্থাপনরূপ তাঁহার জীবনের নির্ব্বাচিত কার্য্যের জন্য তিনি দীর্ঘকাল দুঃসাধ্য শ্রম দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত আরবী, ইংরেজী, হিব্রু এবং সম্ভবতঃ কিছু তিব্বতী শিখিয়া তিনি তাঁহার সময়কার প্রধান ধর্ম্মগুলির মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কেবল ভাবোচ্ছ্বাসপ-পরায়ণতা চিন্তারাজ্যে তাঁহাকে এরূপ উচ্চ স্থান দিতে পারিত না। ভাবাবেশ ম্রিয়মাণ রোগীকে প্রদত্ত সুরাসারের মত। উহা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু উহা নিত্যগ্রহণীয় খাদ্যরূপে দিলে অচিরে তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

রাজার কৃতকার্য্যতার সৌধ ফেনিল বাগ্মিতা অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত পথনির্ম্মাতা অগ্রনায়ক ছিলেন। রামমোহনের জন্মকালে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। রামমোহন নূতন এক ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে, এবং যাহার ফলে নব যুগে হিন্দুজাতি লোপ পায় নাই।

ইউরোপের রেনেশাঁস (প্রাচীন সভ্যতার নব অভ্যুদয়) এবং রিফর্মেশ্যন (ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার) দুটা আলাদা প্রচেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুটি একা রামমোহনের জীবনে মিলিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টিয়ান—সমুদয় আধুনিক ভারতীয়, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমত নির্বিশেষে, রামমোহনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের উত্তরাধিকারী।

আমাদের দৈনিক জীবনের নিম্নস্তরের পরিবেষ্টনের মধ্যে হিমালয়ের উচ্চ প্রশান্ত নির্ম্মল শিখরসমূহের ঈষৎ ক্ষণিক দর্শন যেমন আমাদিগকে সেইরূপ উন্নততর লোকে লইয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে রামমোহন স্মৃতিসভায় অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এম্-এ, বলেন,

সমগ্র হিন্দু-ভারত বৎসরের এই সময় পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন। এমন একটি সময়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার সুযোগ হওয়ায় ভালই হইয়াছে। রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব মহামানবের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। তাই তিনি দেশকে একটি গৌরবময় লক্ষ্যের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক সেন বলেন, তাঁহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে সেই নিত্যজ্ঞানময়ের চরণেই তাঁহার নশ্বর দেহ উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগের তুলনায় দেশপ্রেম ছিল আরও অধিক। তাই তিনি জগতের নিকট দেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি সাহসের উপর ভর করিয়া নূতন যুগের সূচনাকল্পে কালের গুরু আহ্বানে একটা নূতন ভাবধারা বহন করিয়া আনিলেন, সেই ছিল তাঁহার জীবনের একটা যুগপ্রবর্ত্তনকারী শুভ মুহূর্ত। এই সময় দেশে সহসা বাহির হইতে একটা নূতন ভাবের বন্যা প্রবেশ করিয়া দেশবাসীকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ ও বিমোহিত করিল। তাহারই জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল এই মহামানবের। জাতীয় ইতিহাসের ইহা ছিল অতিশয় সঙ্কটমুহূর্ত্ত ; পুরাতন যাহা কিছু ছিল, তাহার বিরুদ্ধে চলিতেছিল একটা মারাত্মক অভিযান। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। এই সময় আসিলেন রামমোহন। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য বুদ্ধিবলে সুদক্ষ নাবিকের মত এই বিক্ষুব্ধ স্রোতাবর্ত্ত হইতে জাতীয় ভাবধারাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতিগত পরাজয়ের গ্লানি হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন প্রাচীন আদর্শকে একেবারে বর্জ্জন করেন নাই। ঐরূপ কোনও ভাব তাঁহার মনে স্থানও পায় নাই। কারণ, ভারতের বিশাল ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াই তিনি পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের মূলসূত্রকে আধুনিক জ্ঞানালোকের সাহায্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তাহা সংস্কারবাদী ও সনাতনী উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইয়াছে। এইরূপ অদম্য চেষ্টাদ্বারা তিনি জীবনের একটা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার বহুমুখী আদর্শ ও দূরদৃষ্টি দ্বারা ভারতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

অধ্যাপক সেন আরও বলেন, যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রামমোহনের দান রহিয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমের কথা পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তিনিই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন সুরু করেন। শিক্ষাসম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডে যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার দান কম নহে।

উপসংহারে অধ্যাপক সেন বর্ত্তমান ভারতের যুবকদিগকে এই মহৎ জীবনের ভাবধারা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবার জন্য অনুরোধ করেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৩৪৩ কার্তিক

রামমোহন রায়ের চাকরী-গ্রহণের কারণ

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাঁহার চাকরী-গ্রহণের কারণ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার অনুমান এইরূপ, যে, অন্য কারণ যাহাই থাকুক, তিনি শাসন, বিচার, খাজনা নির্দ্ধারণ ও আদায় প্রভৃতি নানা সরকারী বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যও চাকরী লইয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের ইতস্ততঃ গতির মত ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি জীবনে কি করিবেন, তাহা আগে হইতেই ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া থাকিবেন। ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংস্কার সাধন তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া মনে মনে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রাষ্ট্রীয় নানা বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সংস্কার সাধন করা যায় না। সেই জ্ঞান যে তাঁহার ছিল, তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িলে তাহা জানা যায়। বিলাতী পার্লেমেণ্টের অবগতির জন্য তিনি এ-দেশের বিচার-বিভাগ, খাজনা-বিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভ্রমরহিত ছিল। আমার অনুমান, ঐরূপ জ্ঞানলাভ তাঁহার চাকরী গ্রহণের, একমাত্র বা প্রধান না হইলেও, অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

রামমোহন রায়ের বিচার

আগে আগে ক্লাইব ও ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্বন্ধে ইংরেজরা যে-সব বহি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর যে-সব বহি লিখিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিতে দোষ ক্ষালনের ও চাপা দিবার চেষ্টা আছে। ইহার কারণ, ইংরেজরা স্বদেশের প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল লোক বলিয়া জগতের কাছে উপস্থিত করিতে চায়।

আমরা আমাদের দেশের কোনও প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির দোষ চাপা দিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে কেবল অনুমান করা যায়, প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই, সেখানে মন্দটাই অনুমান করিবার রীতি সমর্থনযোগ্য মনে করি না। মন্দটারই অনুমান মক্ষিকাবৃত্তি মাত্র।

রমাপ্রসাদ বাবু প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় (৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) মিঃ ক্রিস্পের একটা মন্তব্যে উল্লিখিত শোনা কথা ধর্ত্তব্য নহে বলিয়াছেন। কিন্তু ধরুন, যদি তাহা বোর্ডের চিঠিতেই থাকিত, তাহা হইলেও তাহা হইতে

রামমোহনের কোন একটা দোষই কেন কল্পনা বা অনুমান করা হইবে? রামমোহনের জীবনচরিতের আলোচক ও পাঠকেরা জানেন, যেমন সৌজন্য সেইরূপ আত্মসম্মানবোধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কোনও ইংরেজের চাকরী করেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধত, অশিষ্ট বা অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করিবার বা অবৈধ গর্হিত আদেশ পালন করিবার লোক তিনি ছিলেন না। সেকালের (এবং একালেরও) সব ইংরেজ কর্ম্মচারী ডিগ্‌বী সাহেবের মত ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন না। অন্য রকমের কোন ইংরেজ কর্ম্মচারী রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততা ও আত্মসম্মানবোধের জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে 'প্রতিকূল উল্লেখ' ("unfavourable mention") করিয়া থাকিতে পারেন, ইহা কি হইতে পারে না?

রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অনেকের যে একটা উদ্ধত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব ছিল, তাহা তৎকালীন সমর-সচিব (military secretary) কর্ণেল ইয়াঙের প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেন্থামকে রামমোহন সম্বন্ধে লিখিত ১৮২৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের চিঠি হইতে জানা যায়। কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছিলেন ঃ—

"His (Rammohun Roy's) whole time almost has been occupied for the last two years is defending himself and his son against a bitter and virulent persecution which has been got up against the latter nominally—but against himself and his abhorred principles in reality—by a conspiracy of his own bigoted countrymen ; protected and encouraged not to say instigated by some of ours—influential and official men who cannot endure that a presumptuous 'Black Man' should tread so closely upon the heels of the dominant white class, of rather should *pass* them in the march of mind."

তাৎপর্য্য। গত দুই বৎসর রামমোহন রায়ের সমস্ত সময় অতি তীব্র ও বিদ্বেষপূর্ণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আপনার ও আপনার পুত্রের পক্ষ সমর্থনে গিয়াছে। এই উৎপীড়ন নামতঃ তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে হইলেও ইহা বস্তুতঃ তাঁহার ও ঘৃণাস্পদবিবেচিত তাঁহার স্বাধীন মতসমূহের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কতকগুলি পরমতাসহিষ্ণু ধর্ম্মান্ধ স্বদেশবাসীর চক্রান্তের ফল ; তাহারা আমাদের স্বদেশবাসী (অর্থাৎ ইংরেজ) প্রভাবশালী কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর আশ্রয়প্রাপ্ত, তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত — বলিতে গেলে— প্ররোচিত হইয়া এই (মোকদ্দমা রূপ) উৎপীড়ন চালাইয়াছে। এই ইংরেজরা সহ্য করিতে পারে না, যে, এক জন 'ধৃষ্ট' কালা আদমী প্রভুত্বশালী শ্বেতকায়দের এত সমান সমান হইবে, অথবা বরং সত্য বলিতে গেলে, মানসিক অগ্রগতিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

ইহার পর কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছেন, যে, নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম আদালতে যুদ্ধ করিয়া রামমোহন বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে এবং ন্যায় তাঁহার পক্ষে ছিল বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছেন, বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে।

কর্ণেল ইয়াং যে-সময়ে এই চিঠি লিখিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় চাকরি করিতেন না এবং নানা বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া ভারতীয় ও ইংরেজ সমাজের অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বালক ছিলেন বলিলেও চলে, তখনও

স্বাধীন মত প্রকাশ করায় তাঁহার পিতা ও অন্য অনেকে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চাকরি করিবার সময় তাঁহার এই স্বাং ছিল না বা তাহা তিনি প্রকাশ করিতেন না, মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে, কোন উপরওয়ালা ইংরেজ কর্ম্মচারীর তাঁহার প্রতি অসন্তোষের কারণ, তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততা ও তাঁহার আত্মমর্য্যাদাসূচক উন্নত মস্তক ও ঋজু মেরুদণ্ড।

১৩৪৩ কার্তিক

রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি

গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতার প্রধান নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার শেষ ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার নেতা ও বন্ধু রামমোহন রায়ের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি তখনকার প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন গিবসনের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়া দেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহা নিজের বেলগাছিয়া উদ্যানে স্থাপিত করিবেন এই ইচ্ছা জানান। কিন্তু ইংলণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও ঋণ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং মূর্ত্তিটির বিষয় কাহারও বড় মনে ছিল না। পরে ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গৃহে রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করা হইবে, তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার পরিবারবর্গ ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২১১-সংখ্যক ভবনে শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইহার একটি ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত করিলাম।

১৩৪৪ কার্তিক

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দলিল

রামমোহন রায়ের জীবনচরিতসমূহে লিখিত আছে, যে, তাঁহাকে নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা কুৎসা প্রচার ত ছিলই, তাঁহার আত্মীয়েরা ও অন্যেরা তাঁহার ও তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদের নামে অনেক মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ ও সর্ব্বস্বান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কোন কোন প্রকার নির্যাতনে তৎকালিক অনেক

ইংরেজ কর্ম্মচারীর যোগ ছিল। তখনকার মিলিটরী সেক্রেটরী কর্ণেল ইয়ং দার্শনিক জেরেমি বেন্থামকে লিখিয়াছিলেন, যে, এই কর্ম্মচারীরা রাজার প্রতি এই কারণে ঈর্ষ্যান্বিত ছিল, যে, তিনি কালা আদমী হইয়াও "মনের অভিযানে" ("in the march of mind") তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। কর্ণেল ইয়ং লিখিয়াছেন, এই সব মোকদ্দমায় রামমোহন জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশ্রম, উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল।

এই সকল মোকদ্দমার আবশ্যকমত দলিল এবং রামমোহনের বৈষয়িক জীবনসম্পর্কীয় কতকগুলি কাগজপত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আরও সন্ধান লওয়া হইতেছে। কাগজগুলি প্রধানতঃ ইংরেজী। কিছু বাংলাও আছে। তিনটা মোকদ্দমার পারসী রায়ও পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজী অনুবাদসহ সেগুলিও প্রকাশিত হইবে। যে বহিতে এই সকল কাগজ একত্র সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহার ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইহার একটি ভূমিকা লিখিবেন।

রামমোহন রায়ের গদ্য

সকল দেশেই গদ্য লিখিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ গদ্যে কথা বলিত। সুতরাং গদ্যের সৃষ্টি কোন্ দেশে কোন্ মানুষ করিয়াছে, এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। পুস্তক-রচনায় গদ্য ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ও আদালতের দলিলে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। প্রথম লিখিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ কোনটি এবং তাহার রচয়িতা কে, জানা গেলেই বাংলা পুস্তক রচনাতে কে আগে গদ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, জানা যাইবে। রামমোহন রায়, বা অন্য কেহ, যে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম বাংলা গদ্য বহিও তিনি লেখেন নাই। তাহা হইলে গদ্যলেখক বলিয়া রামমোহন রায়ের প্রশংসা কি কারণে করা হয়? বিখ্যাত ইংরেজী লেখক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের এতদ্বিষয়ক মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ১৮৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির 'সমাচার দর্পণ' হইতে এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইতেছে।

"বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক। লিটিরেরি গেজেট নামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।"

"বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্য রচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামকগ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ

করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

"পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায় নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

"অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশ হওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন।"— "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা।

অতএব রামমোহন রায়ের সমসাময়িক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতে "নিরাবিল বাঙ্গালা" গদ্য রামমোহন রায় প্রথমে লেখেন।

ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ

১৩১১ ফাল্গুন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসারে "বড়লোক' নানা রকমের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহাদের রণকৌশল, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, রাজনীতিজ্ঞতা বা অন্য কোন গুণ তাঁহাদের চরিত্রদোষ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ এই মানুষগুলি যদি কোন অসামান্য কাজ না করিতেন, কিম্বা অসামান্য বাগ্মিতাদির অধিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানবসমাজে অতিশয় হেয় হইতেন। অন্যদিকে এমন অনেক মহানুভব ব্যক্তি সংসারে আবির্ভূত হন, যাঁহারা প্রসিদ্ধ না হইলেও কীর্ত্তিমান্ না হইলেও, অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হইলেও, চরিত্রগুণে নিজ পরিচিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় হইতেন। মহর্ষি এই শেষোক্ত শ্রেণীর পুরুষ এবং মহাপুরুষ।

হওয়া ও করা লইয়া মানুষের বিচার। কোন ব্যক্তি চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায়, স্বভাবের উৎকর্ষে, কোন্ স্থানের অধিকারী, তদনুসারে তাঁহার মহত্ত্বের এক প্রকার বিচার হইতে পারে। আবার তিনি কি কি কাজ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার বিচার হইতে পারে। অর্থাৎ তিনি কি হইয়াছেন ও কি করিয়াছেন, এই দুই প্রশ্নের উত্তরানুসারে তাঁহার মনুষ্যত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, মহর্ষি যে অতি উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ যে সকল দোষ না থাকিলে মানুষের চরিত্র ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা ত তাঁহার ছিলই না। অধিকন্তু অনেক সুবিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক ও প্রচারকের চরিত্রেও যে ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, সাংসারিকতা, পরধর্ম্মনিন্দাপরায়ণতা দেখা যায়, মহর্ষির তাহাও ছিল না। শম, শান্তভাব তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি কাজের হিসাবে যত বড় ছিলেন, চরিত্রে তদপেক্ষাও বড় ছিলেন।

আমাদের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস জন-শ্রুতিমূলক। আর দশ জনে বলে ঈশ্বর আছেন, সুতরাং আমরাও তাহা মানিয়া লইয়াছি। দশজন দার্শনিকে প্রমাণ করিতেছেন, ঈশ্বর আছেন, সুতরাং আমরা তাহাতে সায় দিয়াছি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ আমাদের অনেকের ঘটে নাই, তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে নাই। মহর্ষি এরূপ পরের মুখে ঝাল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি প্রকৃতির মধ্যে এবং আত্মাতে ব্রহ্মের অন্বেষণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সত্য বটে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ উপনিষদের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম উপনিষদ হইতে লব্ধ নহে। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে দেখা যায় যে, তিনি নিজের তপস্যাবলে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল ভাব মনের মধ্যে পাইতেন, তৎসমুদয়ের প্রতিধ্বনি উপনিষদে শুনিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, তিনি আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন ; ধর্ম্মের জন্য সংসারত্যাগ করা যে আবশ্যক নহে, তাহা তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের কয়েকটি কথা আমরা

নীচে তদ্রচিত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বৈরাগ্যের উদ্ভব ও তাহাতে আনন্দ।

"১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিতিস নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গা তীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যেমন আমাব কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।" গঙ্গা তীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল! আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।"

বৈরাগ্য ও বিষাদ।

"দিদিমার মৃত্যুর পর এক দিন আমার বৈঠক খানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, আজ আমি কল্পতরু হইলাম। আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব। আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ব্রজ বাবু বলিলেন যে, আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দি'ন, ঐ ছবিগুলান দি'ন, ঐ জরির পোষাক দি'ন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পরদিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য গৃহ-সজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরূপে আমার সকল আস্‌বাব বিলাইলাম। কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, তাহা আর ঘুচে না। কিসে শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না— আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের

প্রলোভন আর নাই কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান তুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল—"হবে, কি হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধি স্তম্ভে বসিয়া আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধি স্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইতাম।"

বালক দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন রায়।

"শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দুকালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন ব্রাদার ! এখন তুমি টান।

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম— রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ব্রাদার! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল। এত দিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না ; কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার সংকল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম।"

উপনিষদ্।

"এত সাধ্য সাধনার পর আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব যাহা কিছু আবির্ভূত হইল, উপনিষদে দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি। এবং উপনিষদের অর্থ আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারি দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি আমার

হৃদয়ে। অতএব উপনিষদের উপরে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, পাতা, বন্ধু ; উপনিষদে দেখি যে, তাহারই অনুবাদ—"স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা"। যদি তাঁহাকে না পাই, তবে পুত্র, বিত্ত, মান মর্য্যাদা আমার নিকটে কিছুই নহে ; পুত্র হইতে, আর আর সকল হইতে, তিনি প্রিয়। ইহার অনুবাদ উপনিষদে দেখি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"। আমি ধনবান হইতে চাই না, মানবান হইতে চাই না, তবে আমি কি চাই? উপনিষদ বলিয়া দিলেন যে, "ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান ভবতি"। যে ব্রহ্মকে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমি বলিলাম, ঠিক্, ঠিক্। ধনকে যে উপাসনা করে সে ধনবান হয়, মানকে যে উপাসনা করে সে মানবান হয়, ব্রহ্মকে যে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়, উপনিষদে যখন দেখিলাম, "য আত্মদা বলদা" তখন আমার প্রাণের কথা পাইলাম। তিনি কেবল আমাদের প্রাণ দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের আত্মাও দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের প্রাণের প্রাণ নহেন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। তিনি আপনার আত্মা হইতে আমাদিগের আত্মাকে প্রসব করিয়াছেন। সেই এক ধ্রুব নির্ব্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা স্বস্বরূপে নিত্য অবস্থিতি করিয়া অসংখ্য পরিমিত আত্মা-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা আমি উপনিষদে স্পষ্টই পাইলাম—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন। তাঁহাকে উপাসনা করিয়া তাহার ফল আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক ; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র। এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়—সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।"

অক্ষয়কুমার দত্ত।

"১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ সন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার

সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।”

“খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত।”

“১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদ-পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, “গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুই জনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্‌সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন”। এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল— “অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * * * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশ গুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া

তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা। রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দুহিতার্থী নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।”

ঋণশোধ।

“আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারিও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তায় বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে ১৭৬২ শকে আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া

এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া তিন জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন—আমরা কেবল তাহার উপসত্ব ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রথমবার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাসে একটা উইল করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন ; ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতালার বৈঠকখানা বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে এবং বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২০০০০ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গনের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের কার ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অৰ্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অৰ্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন ; ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অৰ্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম। গিরীন্দ্রনাথের খুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউসের উপর তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন একদিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন, যে, "যখন হাউসের মূলধন সকলি আমাদের, তখন সাহেবদিগকে হাউসের অংশ দেওয়া কেন" হয়? সমুদায় বিষয় আমাদের অধিকারে আসুক না কেন? এ কথা আমার মনে ধরিল না। বলিলাম—"এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনারদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবেরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা একা একা কিছু এই বৃহৎকার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাইই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ পায়, তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতনভোগী চাকর করিয়া রাখিলে তাহাদের মোটা মোটা মাহিয়ানা আমাদের যোগাইতেই হইবে ; অথচ এখন হাউসের লাভের প্রতি তাহাদের যে যত্ন আছে, তখন আর তাহা থাকিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে না"। তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক্ সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে—আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথাসর্ব্বস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি হইতেছে। আমাদের জমীদারির সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে—যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার এ রাক্ষসী ক্ষুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীরা ইহাতে এক পয়সাও দেন না"। এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা

করিয়া তাঁহাকে হাউসের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার দিলাম এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য প্রচুর অবসর পাইলাম।

"এখন আমরা তিন ভাই অবিভাগে সমস্ত হাউসের অধিকারী হইলাম। পূর্ব্বকার অংশী সাহেবদিগকে যাহার যেমন অংশ ছিল সেই অনুসারে কাহাকেও বা একহাজার টাকা কাহাকেও বা দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নূতন প্রণালী নিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

"আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানী টল্‌মল্‌ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে। এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল। সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানীর হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল—আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি, এম, গর্ডন সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উহাঁরা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের হাউসের মোট দেনা এককোটি টাকা—পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, "হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাঁদের জমীদারির সত্ব, সকলি আপনাদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন ; কিন্তু একটি ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না"। গর্ডন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—"গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট-সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে"। এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা

অনতিবিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই। আমরা নির্দ্দোষ ও নিরীহ। আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র হৃদয় হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইঁহাদের মনে দয়া প্রেরণ করিলেন যিনি আমার চিরজীবন সখা। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, ইহাঁরা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহাঁদের সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণের জন্য ইঁহারা প্রতি বৎসর ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক হাজার টাকা হইল। তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানী "ইন্-লিকুইডেশন" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

"আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—"আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম"। তিনি বলিলেন—"হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে, ইহাঁরা সকল ধন দিলেন "সর্ব্ববেদসং দদৌ।" আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম।—এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই সকল কথা বার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

"আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেস মিলে গেল—"

"বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক" বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ

করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। "দুমড়ীকি ঠুড্ডিয়া ময়েস্সর নহী কে চিবাকে পানি পিয়ুঁ।" যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ি ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম—ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

"এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যায় সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু সাধুরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম। হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলিলেন যে, "এতদিন চলিয়া গেল কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বসিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি"। আমি বলিলাম যে, এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। পরে আমরা পাওনাদারদিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন। তাহার পর কাজকর্ম্ম চালাইবার ভার আমরা নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই আফিস উঠাইয়া আনিলাম এবং সেই আফিসে একজন সাহেব ও একজন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আমাদের বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানীর ঘুড়ীর লক্ গুটাইতে লাগিলাম। মধ্যপথে এখন তাহা না ছিঁড়িলে হয়।"

লোকহিতার্থ হিমালয়ত্যাগ।

"আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি

কন্দরে কন্দরে নদী-প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্রভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জন [যদৃষ্ট] ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভারিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনিলাম —"তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম—ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃদ্‌কম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকম। "হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই।" আর কি আমি

শিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে—"এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্যসাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না ; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।" প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক ; আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে মহর্ষির মত।

"প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার নিবেদন—

তোমার গত দিবসের পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তোমার কন্যার বিবাহে তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবে না। পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই ব্রাহ্ম। যে ব্রাহ্ম আপনার তাবৎ সাংসারিক শুভকার্য্যে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের নিকটে প্রণত হয় এবং কোন প্রকারেই তাহার পরিবর্ত্তে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা না করে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করে। সুতরাং জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গত অনুষ্ঠান বলা যায়। বিবাহের সময় জামাতাকে মধুপর্ক অঙ্গুরী আসন বস্ত্র দিয়া যে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহাতে কিছু মধুপর্ক অঙ্গুরী আসন বস্ত্রাদির পূজা হয় না কিন্তু সেই সকল সামগ্রী দ্বারা বরের অর্চ্চনা ও অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহে বরকে অঙ্গুরী আদি দিয়া অভ্যর্থনা না করিলেই যে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবেক না এমত নহে। যদি তুমি বরকে অভ্যর্থনা না করিয়া তাহাকে কোন কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা করিবে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মের আপত্তি নাই। শর্ম্মণ্ বসু মিত্র প্রভৃতি যেসকল কুলের পদবী ক্রমাগত আবহমান চলিয়া আসিতেছে, তাহা পরিবর্ত্তন করা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং তিনি সৃষ্টিতে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা। এই পৃথিবীতে চিরকালই ধনকুলের মর্য্যাদার বৈষম্য থাকিবে। পৃথিবীতে যেমন পর্ব্বত সমুদ্র উচ্চ নিম্ন স্থান আছে, সেই প্রকার মনুষ্য মধ্যে ধন মানের আধিক্য ও অল্পতা থাকিবে। কিন্তু ধনী হউন বা মানী হউন, দরিদ্র হউন বা নীচ হউন, রাজা হউন বা প্রজাই হউন, সকলেরি কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ অনুসারে পুত্তলিকার পূজা ত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করেন। যতদিন না এ পৃথিবীতে সকল লোকে ধনে মানে পদে সমান হইবেন, ততদিন ব্রাহ্ম সমাজ আহ্বান করা যাইবে না বলিলে বোধ হয় কোন কালেই ব্রাহ্ম-সমাজকে আহ্বান করা যাইতে পারিবে না। আবহমান প্রচলিত পদবী থাকিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলিয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে। তাহা বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইলে যে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ হইল না, তাহা

স্বীকার করা যায় না। তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্নজাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেক এবং এমত পাত্রও আছে যে সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা পূর্ব্ব-পুরুষের নির্দ্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই গ্রহণ করি। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতেও আমরা সম্মত নহি। পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি নির্দ্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। প্রচলিত প্রথাতেই পৌত্তলিকতা বলা যুক্ত হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে এক প্রকার শোকের চিহ্ন অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে। প্রচলিত রীত্যনুসারে পিতার মৃত্যু হইলে পাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া শোক-চিহ্ন ধারণ করিলে যে সে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হয় ইহাতো আমার বোধ হয় না।

তোমার কন্যার বিবাহ যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে দিতে মানস করিয়াছ, তাহা একবার আমাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইবে বোধ হয়, তাহাতে আমার কোন আপত্তি হইবে না। তদনুসারেই তোমার কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। আমরা নামের জন্য কার্য্যকে ভুলি না। বাস্তবিক পুত্তলিকা পূজা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সাংসারিক বিবাহাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলেই নির্দ্দোষ হয়, আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রতের রক্ষা হয়। ইহা হইলেই বাঁচি। আর যত হয় ততই ভাল।

কলিকাতা, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"
১৩ই আষাঢ়, ১৭৮৪

সম্মুখের দেওয়াল এবং ঈশ্বর।

"তিনি [প্রসন্নকুমার ঠাকুর] আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" আমি বলিলাম, ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে আপনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর যে এই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি? তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি সমান হইল? হাঃ, দেবেন্দ্র বলে কি?" আমি বলিলাম যে, এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু—তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন।"

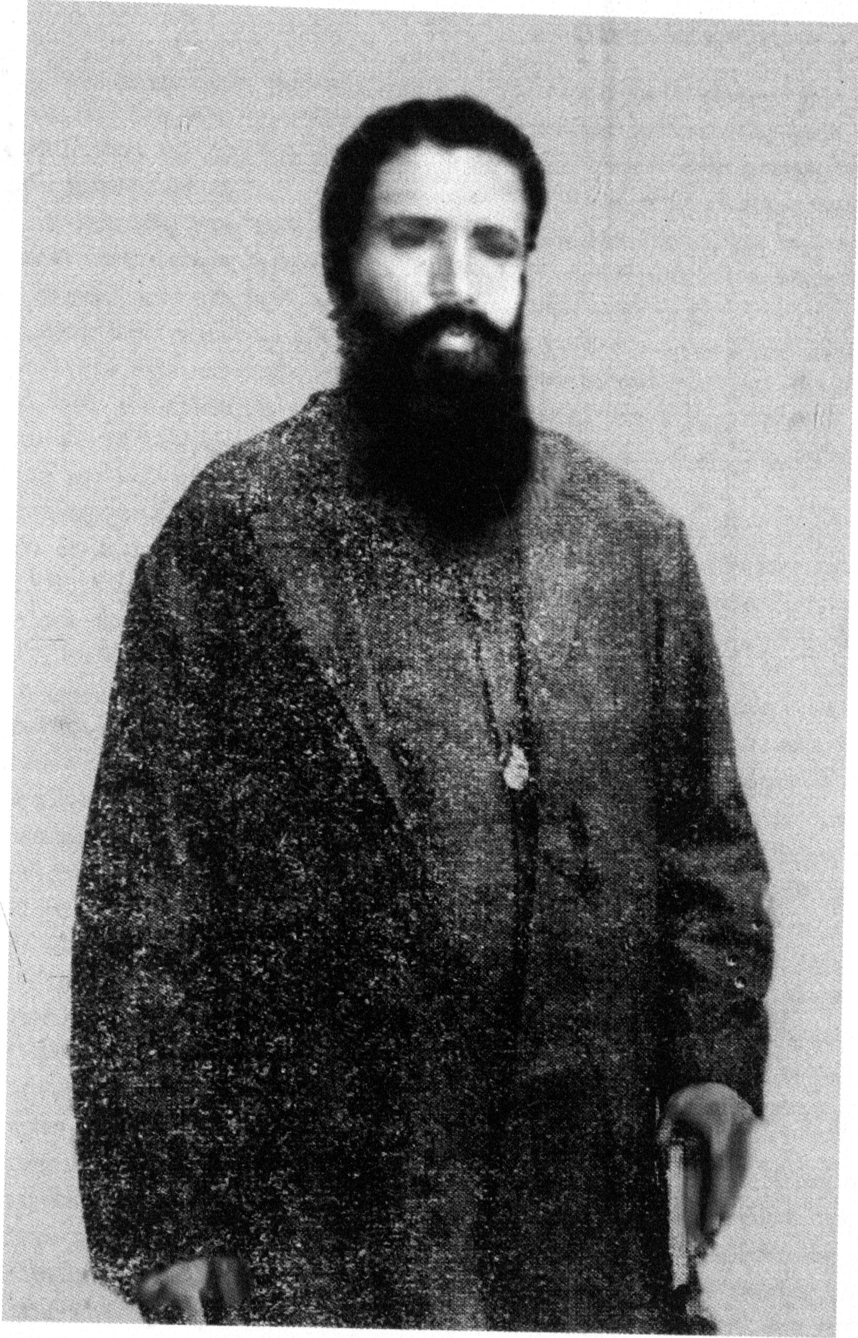
১৩১১ চৈত্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কোথায়?

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিয়োগে শোক প্রকাশ করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটী সভা হয়। উক্ত সভাতে একজন বক্তা একটী চমৎকার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। সে কথাটী এই—বক্তা বলিলেন, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ যাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া মনে হয় তিনি আরও শ্রদ্ধাভক্তির উপযুক্ত ; আরও শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া মনে হয় যথেষ্ট হইল না, তিনি আরও শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত। এইরূপে অনুভব করা যায় তিনি যেন অসীম শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত"। এই উক্তিগুলির অর্থ অতি গভীর, ও সুদূর-বিস্তৃত। বলিতে কি যাঁহাদের চরিত্রের অনুধ্যান করিতে গিয়া, শ্রদ্ধা ভক্তির উপরে একটা "কিন্তু" আসে না, কোনও প্রকার বাধা বা সংকোচ অনুভব করা যায় না, এরূপ মানুষ পাওয়া, এরূপ নেতা পাওয়া—একটী জাতির পক্ষে পরম সৌভাগ্য। ইহাঁরা জাতীয় মহাসম্পদ। জাতীয় দুর্ভাগ্য ও জাতীয় দারিদ্র্যের নিদর্শন এই যে, তাহার মধ্যে এরূপ নেতা পাওয়া দুর্লভ, যাঁহাদিগকে মন প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা যায় না ; করিতে গেলেই একটা "কিন্তু" আসে। এরূপ মনে হয় অমুক বেশ বাগ্মী, বেশ দেশ হিতৈষী—অমনি মনের ভিতর হইতে আর একটী বাণী বলে "কিন্ত" উঁহার এই দোষটী আছে। অমুক বেশ সুধী, সদ্বিবেচক, উদারচেতা—মনের ভিতরের বাণী বলে "কিন্তু ওই দিকে ওঁর একটু দুর্ব্বলতা আছে, মনে মুখে এক হইতে পারেন নাই"। অমুকের বেশ প্রখর ধীশক্তি, ক্ষুরধারের ন্যায় বুদ্ধি, লোকচরিত্র বিষয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—হৃদয়স্থিত বাণী বলিল "কিন্তু মানুষটার বিলক্ষণ স্বার্থপরতা আছে, মানুষটা যতই কেন লোককে চমৎকৃত করুক না, তলে তলে আপনারই স্বার্থের অন্বেষণ করিতেছে।" এরূপে একটা না একটা "কিন্তু"তে যে জাতির অধিকাংশ নেতাকে খাইয়া ফেলে, সে জাতির অতি হীনাবস্থা বলিতে হইবে। আবার অপর দিকে যে জাতি মধ্যে এরূপ নেতার অভাব নাই, যাঁহাদিগকে "কিন্তু"তে খায় না, সে জাতি যথার্থ সম্পদশালী ; তাহার উত্থান ও উন্নতির বীজ তাহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর নেতা ছিলেন, যাঁহাদিগকে "কিন্তু"তে খায় না।

কোন্ শ্রেণীর মানুষ জাতীয় চিত্তে মহৎ উদ্দীপনা আনিতে পারে? বা জাতীয় হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে? কেবল কি দুর্জয় সংকল্প, অপরিমেয় সাহস, ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা মানুষ বড় হয়, বা স্বীয় জাতিকে বড় করিতে পারে? এ সকল মহত্ত্বলাভের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল উপাদান স্বার্থসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে! যে স্থলে এ সমুদয় স্বার্থ ও ক্ষুদ্রাশয়তার সহিত জড়িত থাকে, তখন ইহারা জাতীয় চিত্তে ক্ষুদ্রাশয়তা প্রসব করে ; এবং মানবের দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার সীমান্ত রেখাকে সংকীর্ণ করিয়া আনে। কৃষ্ণ পান্তী সামান্য পানের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বুদ্ধির গুণে লক্ষপতি হইয়াছিলেন ; রামদুলাল সরকার হাটখোলার দত্ত বাবুদের সংসারে সামান্য সরকারি কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন, মতিলাল শীল সামান্য বোতলের ব্যবসায় হইতে উঠিয়া কলিকাতা সহরের প্রধান ধনী হইয়াছিলেন ; রামকমল সেন সামান্য প্রিণ্টারের কাজ আরম্ভ করিয়া নিজ প্রতিভাগুণে দেশ মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন, মাধব দত্ত শুভক্ষণে একটী পয়সার থলী স্কন্ধে করিয়া চুঁচুড়ার গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া, কলিকাতাতে আসিয়া, বিষয়বুদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতির গুণে লক্ষপতি হইয়াছিলেন ; এ সকল দৃষ্টান্ত অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনও জাতি মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। এ সকল দৃষ্টান্তে চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করে ; মনে বৈচিত্র্য রসের আবির্ভাব করে ;



শিবনাথ শাস্ত্রী (যৌবন কালে)

লক্ষ্মী কিরূপে উদ্যোগী পুরুষকে আশ্রয় করেন, তাহা দেখাইয়া দেয় ; কিন্তু হৃদয়ে সেরূপ উদ্দীপনা আনে না, যাহাতে চিত্তকে ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা হইতে তুলিয়া মহৎ ও উদারভাবে পূর্ণ করে।

এই সকল মানুষ হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কি প্রভেদ ! সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্মিয়া ইহাঁদের গতি হইয়াছিল ধন সম্পদের দিকে ; ধন সম্পদের মধ্যে জন্মিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গতি হইয়াছিল বিষয়-বিরাগের দিকে। এইখানেই দেবেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। নির্জ্জনে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্য মনে আসে না। মনে হয় দুস্তর অর্ণবে নাবিক যেমন ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার অভীষ্ট পথে অগ্রসর হয়, তেমনি এই একজন মানুষ কোনও এক ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে আপনার জীবন-তরণী একই পথে, একই লক্ষ্যের অভিমুখে, চালাইয়া গেলেন। বাস্তবিক পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সংসারে বাস করিলেন। রাশি রাশি বিষয় চারিদিকে থাকিয়াও তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না!

দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এরূপ একটী জীবন কিরূপ মহামূল্য তাহা ভাষা কি প্রকাশ করিতে পারে? বিদেশীয় রাজগণ দেশীয়দিগকে যতই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কার্য্য হইতে বঞ্চিত রাখিতেছেন, স্বজাতির ও স্বদেশের সেবার যতগুলি দ্বার আছে, যতই সেগুলিকে বন্ধ করিতে চলিতেছেন, ততই একটী মহানিষ্ট সাধিত হইতেছে। দেশের লোক সর্ব্ববিধ পরার্থচিন্তার অবসর ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তাতে নিমগ্ন হইতেছে। চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, এজাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তাই জাতীয় পরাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় ফল। এই জাতীয় ক্ষুদ্র মতি ও ক্ষুদ্র গতির মধ্যে মহর্ষির ন্যায় নেতারা গীতাকারের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন ঃ—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

হে দেশবাসিগণ! তোমরা আত্মশক্তি-প্রয়োগ দ্বারা আপনাদিগকে উন্নত করিয়া রাখ, আপনাদিগকে অবসন্ন হীন ও ক্ষুদ্র হইতে দিও না।

হায়! ইহা দেশের কি পরম বন্ধুর কার্য্য! যেরূপ উদ্যানে গোলাপের চারাটী বা ফলের বৃক্ষটী রোপণ করিয়া তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলটী বা সর্ব্বজনপ্রশংসিত ফলটীর দ্বারাই উদ্যানের উৎপাদিকাশক্তির বিচার করা যায়, তেমনি জাতি মধ্যে যে এমন মানুষ জন্মিতে পারে, ইহা দেখিয়াই আশা করি, এ জাতির ভাগ্যে অনেক উন্নতি সঞ্চিত আছে।

কেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের চিন্তনে এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, তাহার কিছু কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যে দিক দিয়াই বিচার করা যায়, তাঁহার চরিত্রের বৈলক্ষণ্য ও মৌলিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব তাঁহার ঋষিত্ব। কেন ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে মহর্ষি আখ্যা দিয়াছেন? কেনই বা দেশবাসী এই আখ্যাকে সুসংলগ্ন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন? কোথায় তাঁহার ঋষিত্ব? ঋষি শব্দের অর্থ কি? এ দেশে ঋষি শব্দের অর্থ এই, যিনি "মন্ত্রদ্রষ্টা" তিনিই ঋষি। সচরাচর লোকে ঋষিদিগকে "মন্ত্রকর্ত্তা" বা মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া জানেন ; কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে ঋষিগণকে "মন্ত্রদ্রষ্টা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভিতরকার ভাব এই, বেদমন্ত্র সকল ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয় যাঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং ঐ অবতারের মুহূর্ত্তে যাঁহারা সেই সকল মন্ত্রকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই ঋষি। মন্ত্রের বা মন্ত্রের অন্তর্ভূত সত্যের সাক্ষাৎদর্শনই ঋষিত্বের নিদানভূত কারণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অর্থে ঋষি। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের সাক্ষাৎদর্শন হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বলিখিত আত্ম-জীবন চরিতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ উক্ত ঘটনার এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন ঃ—

"আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্ত দেবকে সাক্ষাৎদর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই

তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় কামনা পরিতৃপ্ত হইল ; এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতোটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম কিন্তু তিনি এতোটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম,—জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয় মন্দিরের দেবতা হইলেন ; এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফললাভ করিলাম ; পঙ্গু হইয়া গিরিলঙ্ঘন করিলাম।"

এই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ইহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ভিতরকার কথা। ইহাই তাঁহাকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া নূতন শক্তি দিয়াছিল। একটী ভিতরে থাকাতেই তাঁহার বাক্যগুলি জ্বলন্ত মায়া গোলকের ন্যায় আমাদের অনেকের হৃদয়ে পড়িয়া অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিল। বাইবলে লিখিত আছে, যীশু যখন উপদেশ দিতেন তখন শুনিয়া লোকে বলিত, 'ইনি কথাগুলি যেরূপে বলিতেছেন, এরূপ ত কখনও কখনও মানুষের মুখে শোনা যায় নাই।" বাস্তবিক ঋষিত্ব লাভ করিলে মানুষের মুখ দিয়া প্রাচীন সত্যগুলি নূতন শক্তির সহিত আসে। কার্লাইলের জীবনচরিতে দেখি তিনি এডিন-বরানগরের সমুদ্রকূলে একাকী ব্যাকুলচিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, যাহা দেখিয়া তাঁহার জীবন বদলাইয়া গেল ; হৃদয়ে নবশক্তি আসিল ; প্রাণে নব উৎস খুলিল ; তৎপর তাঁর সকল কথাই তাজা তাজা, আর কিছুই মৃত নয়, আর কিছুই পরের শোনা কথা নয়। কি আশ্চর্য্য তাঁর Sarrtor Resarturs, তাঁর Heroe-worship, তাঁর French Revolutoin যাহা স্পর্শ করি, যেন আগুন। তাঁহার উক্তিগুলি যেন সুতীক্ষ্ণ অগ্নিময় বাণের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করে ; এবং বাক্য-গুলিতে যাহা আছে, তাহা আপেক্ষা [যদৃষ্ট] দশগুণ অধিক ভাব ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। কার্লাইলের ঋষিত্বলাভের দিন ক্ষণের ন্যায় তাঁহার ঋষিত্বলাভের দিন ক্ষণ অবগত নহি। কিন্তু তিনিও যে ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, কারণ তদ্ভিন্ন মানুষের উক্তিতে মানুষের হৃদয়ে এরূপ ভাব জাগে না। ঋষিত্ব দ্বারাই অন্তরের অন্তরে সেই ভিয়েন প্রস্তুত হয়, যে ভিয়েনের প্রভাবে যে চিন্তা বা যে বাক্যটী আসে তাহা অগ্নিময় হইয়া আসে।

জগতের রঙ্গভূমিতে মানবইতিবৃত্তরূপ বিধাতার যে মহানাটকের অভিনয় দেখিতেছি, তাহাতে জগতের ক্ষুদ্র ও মহৎ ঋষিগণের কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইঁহারা মানব জাতিকে সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রাশয়তা হইতে উত্থিত করিয়া উদার সত্যের চিন্তাতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; ইঁহারা অধ্যাত্ম ও পারমার্থিকতার প্রভার স্বীয় স্বীয় জাতীয় চিত্তে প্রবল রাখিয়াছেন ; ইঁহারা স্বার্থ ও বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন মানবকুলকে স্মরণ করাইয়াছেন "ভুলিয়া থাকিও না, বিষয় ও বিষয়সুখ তোমাদের সর্ব্বস্ব নয় ; তোমাদের উচ্চতর গতি আছে ; তাহার জন্য উন্মুখ হও।" এ কি সামান্য কাজ! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও স্বদেশবাসীদিগকে এই বাণী শুনাইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এই ঋষিত্ব তিনি কিরূপে লাভ করিলেন। এই ঋষিত্বলাভের প্রধান উপায় উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন ;—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্যগ্রয়া বুদ্ধ্য সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।

অর্থঃ—এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ় আছেন, প্রকাশ পাইতেছেন না ; সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ অগ্র্যা বুদ্ধির সাহায্যে ইহাকে দর্শন করুন।

অগ্র্যা বুদ্ধির অর্থ এক-নিষ্ঠ চিত্ত। চিত্তের একনিষ্ঠতা কাহাকে বলে? যে চিত্ত সে সময়ের জন্য আর সকলি ভুলিতে পারে, এবং যাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত তাহাতেই নিমগ্ন হইতে পারে, তাহাই এক-নিষ্ঠ চিত্ত। চিত্তের যে ব্যাকুলতাতে জগৎসংসার ভুলাইয়া দেয়, এবং একটী মাত্র পদার্থকে পরম পদার্থ করিয়া তোলে, তাহাই চিত্তের একনিষ্ঠতা। চিত্তের এই একনিষ্ঠতা ব্যতীত কে কবে ঋষিত্বলাভ করিয়াছে? একবার ভাবিয়া দেখ, যেদিন মহাত্মা শক্যসিংহ এই বলিয়া বোধিদ্রুমের তলে বসিয়া ছিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর পরিশুষ্ক হউক, ত্বক, অস্থি, মাংস সমুদয় বিলুপ্ত হউক বহু জন্মের দুর্লভ পরম জ্ঞান লাভ না করিয়া এ আসন হইতে উঠিব না।

সে দিন চিত্তের কি এক-নিষ্ঠতার উদয় হইয়াছিল! যীশু চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অনাহারে অরণ্য মধ্যে যখন পড়িয়াছিলেন, তখন কি এক-নিষ্ঠতা দেখা দিয়াছিল। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গুহাতে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অনাহার অনিদ্রাতে পড়িয়া যখন পরমতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্দেশ না পাইয়া যেদিন গিরিশৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেদিন কি একনিষ্ঠতার জন্ম হইয়াছিল! শ্রবণ কর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের একনিষ্ঠতার কি সাক্ষ্য দিতেছেন। ইহা যদিও অগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে তথাপি আর একবার উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"এইরূপে আমার সকল আসবাব বিলাইলাম। কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ সেই বিষাদ, তাহা আর কিছুতেই ঘুচে না। কিসে শান্তি পাইব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক একদিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বর-বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না—আমার বোধ হইতেছিল যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটী খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না ; পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব, জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান-তুল্য। কিছুতেই সুখ নাই ; কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত।"

ঈশ্বরের অদর্শনে হৃদয়ে কিরূপ ব্যাকুল হইলে, মানুষ উঠিয়া গিয়া আহার করিয়া আসিয়া তাহা ভুলিয়া যায়, হৃদয়ে কিরূপ অন্ধকার থাকিলে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের কিরণ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, যদি কেহ তাহার ধারণা করিতে পারেন করুন, আমি সে বিষয়ে অসমর্থ। এই একনিষ্ঠতার গুণেই তিনি ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন।

এই এক-নিষ্ঠতা তাঁহার জীবনে আর এক প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ধ্যান-সাগরের তলে নিমগ্ন হইয়া মহামূল্য মুক্তার ন্যায় যে সত্য উদ্ধার করিলেন, তাহা চিরদিন বক্ষে ধরিয়া থাকিলেন। ইহাই তাঁহার পরম সম্পদ জানিয়া অপর সকল সম্পদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। মান, সম্ভ্রম, উপাধি, খ্যাতি, ধনগৌরব, পদগৌরব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সম্পদের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত ছিল ; কিন্তু তিনি সে সকল দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। তাঁহার সমস্ত জীবন আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি যেন মনে ভাবিয়াছিলেন, পরম সম্পদ যখন পাইয়াছি, তখন অপর সম্পদ থাকে থাক্ যায় যাক্ সে জন্য প্রয়াসী হইব না। এই এক-নিষ্ঠতা দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়াছি। তাঁহার জীবনকালের মধ্যে আমাদের এই বঙ্গভূমির উপর দিয়া কত চিন্তা ও ভাবের বাত্যা প্রবাহিত হইয়া গেল। কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। কত লোকের কত বিভিন্ন ভাব দেখিলাম। আজ যে সংস্কারক, কল্য সে রক্ষণশীল ; আজ যে অত্যগ্রসর কল্য সে পশ্চাৎপদ ; আজ যে ব্রাহ্ম কল্য সে পুনরুত্থানকারী হিন্দু ; এইরূপে মানুষের কত পরিবর্ত্তনই দেখা গেল! কিন্তু এই পরিবর্ত্তনসমাকুল লোকারণ্যের মধ্যে মহর্ষি তুঙ্গশৃঙ্গ মহীরূহের ন্যায় চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিলেন! কোনও বাত্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। লোকে যাহা বলিল তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না ; কিন্তু "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান"কেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া তাহাতে মগ্ন থাকিলেন। এই এক-নিষ্ঠতা তাঁহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

তৃতীয় বিশেষত্বটীও বড় সামান্য নয়। সেটী এই। সাধারণ মানুষের জীবনে দেখিতে পাই, যে শক্তি তাহাদের জীবন নূতন ভাব আনিয়া দেয় বা

তাহাদের জীবনকে উন্নত করে, সে শক্তি অনেক সময় বাহির হইতে আসে ; পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে তাহার গতি। অপর জীবনের সংস্রবে আসিয়া, দশ জনের সঙ্গে মিশিয়া তাহারা সেই সকল ভাব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বাহিরের শক্তি তাহাদের অন্তরে আসিয়া তাহাদিগকে কার্য্যে উৎসাহী করে ; এমন কি তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনকেও গঠিত করে। কিন্তু মহর্ষির জীবনের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে ছিল না, পরন্তু কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক আয়াস, এক অন্তরের অন্তরে নিহিত উৎস হইতে উৎসারিত শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব হইতে উদ্ভূত ও তাঁহার ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গীভূত ছিল। তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, যে ঘোর মানসিক অবসাদের মধ্যে তিনি হঠাৎ বায়ুতাড়িত একখানি কাগজ প্রাপ্ত হন। তাহাতে ঈশোপনিষদের এই বচনটী ছিল, "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" অর্থ এক প্রভু পরমেশ্বর সমুদয় চরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, ইহা জানিয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয়ভোগ কর, পরের ধন গ্রহণ করিও না।" এই বচনকে তিনি নিজ জীবনের মহামন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা সাধন করিতে অগ্রসর হন। এই সময় হইতে উপনিষদ সকল তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম গ্রন্থ হয়। উপনিষদের উক্তি সকল তাঁহার জীবনে অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে। ইহার পর তিনি গায়ত্রী মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া শুভবুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছেন এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে এতই বদ্ধমূল হয়, যে ইহার পর তিনি অতি সামান্য কার্য্যও ধ্যানস্থ ও আত্মস্থ হইয়া উপাসনার ভাবে করিতেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মোপাসনার ভাবে থাকিতেন। লোক দেখিত তিনি যেন কোনও দরকারে যাইবেন এইরূপ পোষাকে সর্ব্বদা আছেন। তাঁহার গৃহ সুরভি ধূপগন্ধে আমোদিত, নব পুষ্পভারে সুশোভিত, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সকলি শোভন, মনোরম ও ভোগবিলাসের সূচক। তিনি সর্ব্বদা উপাসনার ভাবে থাকিতেন বলিয়া এইরূপে বাস করিতেন। তাঁহার প্রিয় উপনিষদে আছে, "মনোনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে" অর্থাৎ উপাসনার স্থানটী মনের অনুকূল হইবে এবং সেখানে চক্ষের পীড়াদায়ক কিছু থাকিবে না, তাহাই তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

তিনি তদীয় জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ উপনিষৎ বাক্য হইতে তিনটী উপদেশ পাইয়াছিলেন (১ম) অনন্তস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পূজা করিবে (২) অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবে (৩) পরধনে লোভ করিবে না। এই তিনটী উপদেশ কেমন আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার জীবনে ফুটিল। তিনি মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ষাটি বৎসরের অধিক কাল ব্রহ্মপূজাকে ধরিয়া থাকিলেন। দ্বিতীয়তঃ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মধ্যে স্থাপন করিলেন, তৃতীয়তঃ পিতার যে এক কোটি টাকার ঋণ তিনি মনে করিলেই নিজস্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিতে পারিতেন, তাহাকে পরধন জানিয়া তাহা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিলেন, এক কপর্দ্দকও অবশিষ্ট রাখিলেন না। এইরূপে তাঁহার সমুদয় বীরত্ব সমুদয় মহত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতে উদিত হইল।

লোকে মহর্ষিকে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলিয়া জানিত, গৃহধর্ম্ম তিনি কিরূপে পালন করিয়ছিলেন, তাহা অধিক লোকে জানিত না। তিনি অবিশ্রান্ত মনোযোগের দ্বারা নিজ সুবৃহৎ পরিবারে শাসন, সুশৃঙ্খলা, সদাচার, সদালোচনা, সাহিত্যচর্চ্চা, সুকুমার কলা প্রভৃতি কিরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা লোকে জানে না, তাহা দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পরিবার মধ্যে একটী শিশু জন্মিলেই সেটীর প্রতি মহর্ষির দৃষ্টি পড়িত, ও সেটীকে ফুটাইবার দিকে তাঁহার মনোযোগ থাকিত। দেশের লোক তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে জ্ঞানী, গুণী, কৃতী, সুলেখক দেখিয়া শত ধন্যবাদ করিতেছেন, কিন্তু এসকলের মূলে মহর্ষি কতদূর ছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ জানেন, এবং আমরা কিছু কিছু জানি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সমুদয় তাঁহার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত ছিল। তিনি একটী সামান্য কাজ করিতে

হইলেও উপাসনার ভাবে সংযত হইয়া বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সে-বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ করিতেন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত সমস্ত কার্য্যটী কল্পনাতে ধারণ করিতেন ; এবং তৎপরে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত ধীরচিত্তে তাহার অনুষ্ঠানের অবস্থা করিতেন। তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করা কঠিন হইত। ১৮৬২ সালে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে বরণ করেন। কিন্তু এই কার্য্য করিবার অগ্রে কলিকাতা হইতে অবসৃত হইয়া দুই তিন মাস বীরভুম জেলার এক আম্র কাননে অবস্থিতি করেন। সেখানে উপাসনার ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার যে সকল অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা জীবন পাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সেই সকল উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি তৎপূর্ব্বদিন হইতে সংযমে থাকিয়া, সে দিন প্রাতে সামান্য কিঞ্চিৎ আহার কবিয়া হয় ব্রহ্মসমাজ মন্দিরে গিয়া নতুবা নিজ গৃহে একান্ত হইয়া সমস্ত দিন ধ্যান ও উপাসনাতে যাপন করিতেন। ইহা তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি। তিনি তাঁহার প্রিয় বোলপুর শান্তিনিকেতন যখন প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কথার ভাবে আমরা অনুভব করিতেছিলাম যে তিনি একটা কি আশ্রম স্থাপন করিবার সংকল্প করিতেছেন। ধীরে ধীরে বহু চিন্তা, বহু ধ্যান, বহু উপাসনার ভিতর দিয়া শান্তি-নিকেতনের নব আশ্রমের ভাব ফুটিয়া উঠিল। যখন স্থির করিলেন যে ৭ই পৌষ তাঁহার নিজের ব্রাহ্মধর্ম্মদীক্ষার বার্ষিক দিবসে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিবেন, তখন প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— "তোমাকে প্রাতঃকালের উপাসনার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সমাগত ব্যক্তিদিগকে কিছু বলিতে হইবে।" উত্তর—"যে আজ্ঞা আমি বলিব।" তৎপরে বাড়ীতে আসিয়া চিন্তা করিলাম যে অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে কার্য্যপ্রণালীতে কিছু নাই। অথচ সেই সময়ে চতুর্দ্দিকের গ্রামস্থ অনেক লোক আসিবার সম্ভাবনা। আমার বক্তৃতাটা সেই সময়ে হইলে ভাল হয়। কয়েকদিন পরে আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অপরাহ্ণে আমার বক্তৃতার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। তিনি ক্ষণকাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিয়া, পরে শিরঃ সঞ্চালন দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, আমার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না। অনুমানে বুঝিলাম যে আমার প্রস্তাবটী গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার নির্দ্ধারিত কার্য্য প্রণালীতে অপরাপর পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যাহা একবার ধ্যানস্থ হইয়া উপাসনার মুহূর্ত্তে স্থির করিয়াছেন, তাহার এতটা পরিবর্ত্তন করিতে মন প্রস্তুত হইতেছে না। আর দ্বিতীয় কথা বলিলাম না। তাঁহার আদেশ মত কার্য্যই হইল।

তাঁহাকে বিষয়বিরাগী বলিয়াছি কিন্তু এবিষয়েও তাঁহার এক বিশেষত্ব ছিল। সচরাচর যাঁহারা বিষয়বিরাগী তাঁহারা বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে অমনোযোগী। জমিদারী উৎসন্ন যাইতেছে, ওদিকে তাহার প্রতি দৃকপাতও নাই। রাজা রামকৃষ্ণ কালীমন্ত্র সাধনে মত্ত আছেন। এরূপ কত গল্প প্রচলিত আছে। মহর্ষি সেরূপ ছিলেন না। তিনি বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন, কিন্তু গৃহধর্ম্মের অঙ্গীভূত জানিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইহাতেও তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রেরক ছিল।

তিনি সকল কার্য্য যথাসময়ে শৃঙ্খলামত করিতেন। বিশৃঙ্খল কার্য্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদা একটী ঘড়ি থাকিত, ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া স্নানাহার প্রভৃতি হইত। এই শৃঙ্খলাপ্রিয়তাও তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতে উদিত হইত। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের ন্যায় শোভন ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য কেহ করে না। প্রতিদিন যথাসময়ে তাঁহার সূর্য্য উদিত হয় ; ঋতু সকল যথানিয়মে গতায়াত করে ; সর্ব্বত্রই নিয়ম ও শৃঙ্খলা, তাঁহার ভাব লইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে আমাদিকেও সুশৃঙ্খল সুশোভনরূপে কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ যে তাঁহার এক কবিতাতে লিখিয়াছেন ঃ—

আদি কবি মহা কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।

এই ভাব তিনি তাঁহার পিতার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে মহর্ষির

ক্ষুদ্র মহৎ সমুদয় কার্য্য তাঁহার জীবনের গূঢ়তম স্থান হইতে, তাঁহার গাঢ় ধর্ম্মভাব হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব হইতে আর একটী বিষয় উঠিয়াছিল। এই বিশ্বরাজ্যে বিশ্বেশ্বরের মহিমা দর্শন করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইতেন যে, কি জড় রাজ্যে, কি মানব সমাজের ইতিবৃত্তে, কি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারে, কি শিল্প সাহিত্যের উন্নতিতে সর্ব্বত্রই তিনি সেই মহিমা লক্ষ্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। এই জন্য তিনি জ্ঞান-চর্চ্চাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে প্রাচীন মহর্ষি বলিয়া জানে, কিন্তু তিনি হিমালয় শৃঙ্গে বসিয়াও বর্ত্তমান কালের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সকল পাঠ করিতেন। অধিক কি, তাঁহাকে বিবিধ গ্রন্থপাঠে যেরূপ মনোযোগী দেখিতাম, এরূপ অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত যুবককেও দেখিয়াছি। তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। Mrs. Humphrey Ward যখন জেনিভাবাসী প্রসিদ্ধ সুধী Amiel এর Journal অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিলেন, তখন বিলাতের সংবাদপত্রে তাহার অতিশয় প্রশংসা বাহির হইল। ঐ প্রশংসা দেখিয়া আমরা কয়েক জন বন্ধু Amiel এর Journal পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম। পাইয়াই ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষ-খণ্ডের উপরে পড়ে তেমনি সেই Journal খানির উপরে পড়িলাম। দিন রাত্রি পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। মহর্ষি তখন কলিকাতায় পার্কষ্ট্রীটের এক ভবনে বাস করিতেন। আমার সংস্কার ছিল যে আমরাই সর্ব্বাগ্রে Amiel এর Journal পাঠ করিয়াছি। কিন্তু দুই তিন দিন পরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, যেই বসিয়াছি অমনি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "Amiel এর Journal পড়িয়াছ?" আমি বলিলাম 'হাঁ'। তখন তিনি সেই Jourral হইতে মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম তিনি যে কেবল তদগ্রে উক্ত গ্রন্থ আনাইয়া দেখিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে এতবার পড়িয়াছেন যে মুখস্থ হইয়াছে! ইহাতে সকলে বুঝুন তিনি বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতির সহিত কিরূপ যোগ রাখিতেন। ইহাও তাঁহার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত ছিল।

তাঁহার চতুর্থ বিশেষত্বটী তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য মৌলিকতাসূচক। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে যে সময়ে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, সে সময় বঙ্গদেশে ঘোর বিপ্লবের সময়। সে সময়ে নবশিক্ষিত ডিরোজিওর শিষ্যদল এই বাণী তুলিয়াছেন বর্জ্জন কর—বর্জ্জন কর,—বর্জ্জন কর। কুসংস্কার ভাঙ্গিতে হইবে, জাতিভেদ তুলিতে হইবে, পৌত্তলিকতা পরিহার করিতে হইবে, এই নব্য শিক্ষিত দলের প্রধান ভাব। কেবল তাহা নহে যাহা কিছু কুসংস্কারাপন্ন লোকের অপ্রীতিকর তাহার আচরণ করিতে হইবে অনেকের ভাব এতদূরও গিয়াছিল। এই ভাব হইতেই তাঁহারা আপনাদের মধ্যে সুরাপান ও অখাদ্য খাদন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে সময়ে যুবকদলের মধ্যে সর্ব্ব ধর্ম্মে অনাস্থা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ডাক্তার ডফের চরিত্যাখ্যায়ক জর্জ্জ স্মিথ সাহেব বলেন যে, সে সময়ে বিখ্যাত সংশয়বাদী টম পেনের গ্রন্থ এই যুবকদলের মধ্যে কয়েক মাসের ভিতরে এক হাজার বিক্রয় হইয়াছিল।

যাহা হউক ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারকদিগের বিষয়ে সাধারণভাবে একথা বলা যায়, যে তাঁহাদের দৃষ্টি বর্জ্জনের দিকেই অধিক পরিমাণে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না। বর্জ্জন অপেক্ষা গ্রহণ ও রক্ষণের দিকে তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল। তিনি যে কিছু বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ। উপনিষদের ব্রহ্মপূজা গ্রহণ করিলেন সুতরাং পরিমিত দেবতার পূজা আপনাপনি বর্জ্জিত হইয়া গেল। বরং একথা বলা যায় যে, কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা যাহা রক্ষণের উপযুক্ত ভাবিয়াছিলেন, তাহাকে আরও জোর করিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি দেশের ভাবী উন্নতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া অতীত হইতে একেবারে পা তুলিয়া লইতে চাহেন নাই। বলিয়াছিলেন ব্রহ্মপূজাকে তোমাদের বর্ত্তমান জীবনে, জ্ঞানালোক ও সভ্যতার মধ্যে স্থাপন কর, কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলাকে যথাসম্ভব রক্ষা কর। সে সকলকে ধর্ম্মের এলাকার মধ্যে আনিও না। সে বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা রাখ। এই স্থলেই

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার উন্নতিশীল বন্ধুগণের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল।

তিনি যে স্বভাবতঃ কিরূপ রক্ষণ-প্রয়াসী ছিলেন, তাহা তাঁহার ব্রহ্মধর্ম্ম-প্রচার-প্রণালীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি রচনা করিলেন, তাহা যথাসাধ্য প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ করিয়া করিলেন। ১৮৪৩ সালে বিংশতিজন বয়স্যের সহিত যখন তিনি আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হন ; তখন যে দীক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহা তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অপরাপর প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাটী নিহিত থাকে, যে "রোগাদি দ্বারা অশক্ত না হইলে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিব"। তিনি আমাকে একদিন বলিলেন—"আমি কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিষয়ে সকলের মন নাই ; তাই তাহা পরে পরিবর্ত্তিত করিলাম ; কিন্তু আমি আমার সেই দীক্ষাদিনের প্রতিজ্ঞার অনুসারে চিরদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিতেছি।"

তিনি ব্রাহ্মদিগের জন্য যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যথাসম্ভব প্রাচীন রীতি নীতি রক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যেও তাঁহার প্রধান ভাব এই দেখা যায়, পরিমিত দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপূজা স্থাপন করা। এই টুকু করিয়া তিনি প্রাচীনের যতটা সম্ভব রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল কার্য্যেই তাঁহার এই রক্ষণশীলতা দৃষ্ট হইয়াছে।

বর্জ্জন অপেক্ষা গ্রহণ ও রক্ষণের দিকে যেমন তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল, তেমনি ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়া বিষয়ে তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। এ বিষয়েও তিনি তাঁহার সমকালবর্ত্তী শিক্ষিত দল হইতে বিভিন্ন ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াই তিনি গঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মদিগকে এক নূতন উপাসক সমাজে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ নূতন উপাসনাপ্রণালী, নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ, নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সমুদয় গঠন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুভব করিলেন ব্রহ্মপূজাকে কেবল মাত্র বাক্য ও উপদেশে আবদ্ধ রাখিলে হইবে না, তাহাকে গৃহে, পরিবারে, সমাজে স্থাপন করিতে হইবে। তদনুসারে চারিদিক গঠন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে নিজ জীবনে ও নিজ গৃহে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। নিজ ভবনের পূজার দালানকে দৈনিক ব্রহ্মপূজার দেবালয়ে পরিণত করিলেন। নিজ পরিবারের সকল অনুষ্ঠান নিজপ্রণীত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নিজে দৈনিক ব্রহ্মপূজাকে জীবনের ব্রতরূপ অবলম্বন করিলেন। এই ব্রত তিনি কিরূপে পালন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর অনেকে শুনিয়াছেন। তাঁহার নিয়ম ছিল প্রতিদিন নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্নে ধরিয়া বসিলেন "আমাকে পূর্ব্ব মুখ করিয়া দেও"। উত্থানশক্তি রহিত, বধির, চক্ষু দৃষ্টিহীন, চীৎকার করিয়া বলা হইল যে উহা প্রাতঃকাল নহে সন্ধ্যা কাল ; কোনও প্রকারে ইহা জানাইতে পারা গেল না। কাজেই পূর্ব্ব মুখ করিয়া দেওয়া হইল। সেই ভাবে উপাসনা করিলেন। এইরূপে নিজের ও অপরের ধর্ম্মজীবন গঠনের দিকে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল।

তাঁহার আর একটী বিশেষত্ব এই, যখন সমস্ত দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মুখ পশ্চিমদিকে ফিরিয়া রহিয়াছিল, যে সময়ে তিনি প্রাচ্যানুরাগে পূর্ণ হইয়া স্বদেশীয় শাস্ত্রখনি খনন পূর্ব্বক রত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং ভারতীয় শাস্ত্র, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় ধর্ম্মভাব, ভারতীয় ধর্ম্মজীবন, সকলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না, যদি পড়িয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে একটু গূঢ় ও গভীর কথা আছে। প্রাচীন উপনিষদের যে জিনিস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করা। ইহা ভারতীয় হিন্দুদিগের সাধনের ধন, বিশেষ সম্পত্তি। ইহা মহর্ষির প্রধান সাধনের বিষয় ছিল। ব্রহ্ম কিরূপে অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে আছেন, তাহা বর্ণন করিতে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন, আত্মহারা হইতেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ও খ্রীষ্টীয়

জগতের ঈশ্বরের ভাব অন্য রূপ। তাঁহাদের ভাব এই প্রকার ঈশ্বর জগতের বাহিরে জগতের শাস্তারূপে থাকিয়া জগতকে চালাইতেছেন। এই জগতের বহিঃস্থিত শাস্তা ঈশ্বরের ভাব মহর্ষির পক্ষে অতি হালকা, অতি অজ্ঞজনোচিত বোধ হইয়াছিল রুচি হইত না। তিনি ভারতীয় ঋষিদের সুরের সহিত এই কারণেই বোধ হয় খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রপাঠ করিতে তাঁহার রুচি হইত না। তিনি ভারতীয় ঋষিদের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া আপনার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়াছিলেন। সেই সুরের মাধুরীতেই ভরপুর ছিলেন। অন্য সুর শুনিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। এমন কি পৌরাণিক, বা তান্ত্রিক, বা বৈষ্ণব হিন্দু ধর্ম্মকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই।

আর একটী বিষয়ে মহর্ষির বিশেষত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি, যাঁহারা একান্ত চিত্তে কোনও বিশেষ ধর্ম্মভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ভাবের বিরোধীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং অনেক সময় তাহাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছেন। মহম্মদ বহুদিন বিরোধিগণের নির্য্যাতন ধীরচিত্তে সহ্য করিয়া অবশেষে স্বীয় শিষ্যগণকে কাফেরকুল বিনাশের জন্য তরবারি ধরিতে অনুমতি দিলেন। যীশু তাঁহার বিরোধী ফ্যারিসীদলকে "কাল সর্পের বংশ"—বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বিরোধী দলকে অকথ্য ভাষাতে গালাগালি দিলেন। সকল বৈরভাবের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বৈরভাব বিশেষ তীব্রভাব ধারণ করে, ইহাই দেখিতে পাই। কিন্তু উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত মহর্ষির যখন মতবিরোধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে কত উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছেন ও কি উন্নত ও পবিত্র আধ্যাত্মিক হাওয়ার মধ্যে বাস করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শটী অবলম্বনীয় ও রক্ষণীয় ভাবিয়াছিলেন তাহা রক্ষার উপায়বিধান করিয়া নিজে প্রসন্ন-চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন ; আমাদের সমালোচনার প্রতি কর্ণপাতও করিলেন না। আমাদিগকে একদিনের জন্য স্নেহে বঞ্চিত করিলেন না। এ বিষয়ে তিনি কি ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা একবার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন—"আমার অবস্থা কিরূপ জান? ঠিক সেই মায়ের মত, যাহার শিশু সন্তানকে কালসর্পে দংশন করিতে আসিতেছে। সে মা কি করে? সর্পের দংশনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া শিশুর রক্ষার জন্য গিয়া সর্পটীকে ধরে। সর্পটীকে ধরিবা মাত্র সে ফিরিয়া মাতাকে দংশন করিল। রমণী বিষের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছে সে দিকে মন নাই, শিশুটি যে বাঁচিল ইহাতেই আনন্দিত। যখন তাহার প্রাণ যাইতেছে, তখনও তার মুখে আনন্দের চিহ্ন। তেমনি আমার সন্তোষের বিষয় এই, যে ঈশ্বর আমাকে ধর্ম্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন আমি তাহাকে রক্ষা করিলাম। এখন তোমরা আমাকে যতই দংশন কর না কেন আমি সে সকল অপরাজিত চিত্তে সহিতে পারি।" এই উচ্চ ও মহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে কোনও দিন তাঁহার স্নেহ ও সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অল্পদিন পরেই আপনাদের মধ্যে বড় শুষ্কতা অনুভব করিলেন। সেই অবস্থাতে তাঁহারা মহর্ষির উপদেশের জন্য ব্যাকুল হইলেন। মহর্ষির নিকট নিবেদন মাত্র তিনি আসিতে ও উপদেশ দিতে প্রস্তুত। উন্নতিশীল দল যখন প্রথম সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব ও খোল করতালে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন তাঁহাদের উৎসাহদানের জন্য মহর্ষিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহর্ষি অমনি প্রস্তুত ; আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে উৎসবানন্দে যোগ দিলেন। কেশবচন্দ্র যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন মহর্ষিকে সেই মন্দিরে আসিয়া একদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন মহর্ষি অমনি প্রস্তুত। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণ যখন তাঁহাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন মহর্ষিকে একদিন আসিয়া উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন মহর্ষি তখনি প্রস্তুত। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ যখন "সাধনাশ্রম" স্থাপন করিয়া তাহার উৎসবে মহর্ষিকে আসিয়া সাধনাশ্রমস্থ পরিচারকগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন তিনি আনন্দিতচিত্তে

আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক আমাদের মস্তকে হাত দিয়া "মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে উত্তীর্ণ করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। এইরূপে তিনি মতভেদ ও উন্নতি-শীলদিগের কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে কখনই ত্রুটী করেন নাই। অধিক কি, তাঁহার আত্মজীবন চরিত যে লিখিয়াছেন, তাহাতে সকলে দেখিবেন, তাঁহার ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের কার্য্যবিবরণ আছে। যে সময়ে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ, সেই সময় হইতে তাঁহার আত্মজীবন চরিতের অবসান। তৎপরে কি তিনি আর কোনও কাজ করেন নাই? অনেকের কাজ করিয়াছেন। তবে কেন তাহার উল্লেখ করিলেন না? এ বিষয়ে মহর্ষির দুইটী মনের ভাব ছিল। প্রথম ইহার পরে যে সকল কার্য্য হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা কেশবচন্দ্র ছিলেন, সুতরাং সে সকল কাজের গৌরব প্রধানরূপে কেশবচন্দ্রের প্রাপ্য সুতরাং সে গৌরবের অংশ নিজে লইতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় ইহার পরেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। ইহার পরে কিছু লিখিতে গেলে উন্নতিশীলদিগের কথার একটা উত্তর দিতে হয়। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের সমালোচনার উত্তর দিতে হইলে, তাঁহাদের ভূমিতে নামিতে হয়, ইহা মহর্ষির চক্ষে ক্ষুদ্রতা মনে হইল। তিনি তাহা পারিলেন না। শুনিয়াছি তিনি নাকি একদিন বলিয়াছিলেন—"সত্যেন্দ্র যদি আমার কোনও সমালোচনা করেন, আমার বিরোধী হন, আমি কি তাঁর কথার উত্তর দিবার জন্য তাঁর ভূমিতে নামিতে পারি? সেইরূপ কেশব যাহা ভাল বুঝিয়াছেন করিয়াছেন, আমি তাঁর ভূমিতে নামিতে পারি না। ঐ টুকুই আমার কাজ, ঐ টুকুরই বিবরণ রহিল।" সকলে দেখুন তিনি কত উচ্চে, উন্নত শিখরে বাস করিতেছিলেন। বাস্তবিক কেশববাবুর প্রতি চিরদিন তাঁহার কি স্নেহ ছিল তাহা ভাবিলে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। কেশববাবুকে বিরোধের বহুদিন পরেও যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে, অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কেশববাবুর মৃত্যুশয্যাতে মহর্ষি গিয়া কিরূপ পিতার ন্যায় স্নেহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাহা অনেক শুনিয়া থাকিবেন। আমি একটী ঘটনার সাক্ষী। আমাদের আদি সমাজত্যাগের বহুদিন পরে আমি একবার তাঁহাকে সিন্দুরীয়াপটী ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবে আনিয়াছিলাম। উপাসনান্তে যখন তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে যাইতেছি, ব্রাহ্মেরা মধ্যে রাস্তা দিয়া দুই ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিলাম সেই ভিড়ের মধ্যে কেশব বাবু আছেন। মহর্ষি দেখিতেন কম, সুতরাং তিনি দেখিতে পান নাই। আমি তাঁহার কর্ণে চীৎকার করিয়া বলিলাম "কেশব বাবু এখানে আছেন।" অমনি মহর্ষি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"কি কেশব এখানে আছেন?" কেশব বাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মহর্ষি তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"কেশব তুমি এখানে ছিলে? আমার সম্মুখে কেন বস নাই? তা হলে আমার উপদেশ আরও খুলতো।" আমি শুনিয়াছি তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমার যে সকল ব্যাখ্যানের তোমরা এত প্রশংসা কর, ও সমুদয় কিন্তু আমি কেশবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। কেশবকে সম্মুখে বসাইয়া ব্যাখ্যান দিতাম। তাই ভাব খুলিত।" কে কোথায় দেখিয়াছেন, নিজের ধর্ম্মভাবের বিরোধী, বিদ্রোহী ও সুতীব্র সমালোচনাকারী মানুষদের প্রতি এতটা প্রেম ও এতটা উদারতা। বাস্তবিক মহর্ষি অনেক বিষয়ে অসাধারণ ছিলেন। এসকল তাঁহার অসাধারণত্বের নিদর্শন। বঙ্গদেশ, শুধু বঙ্গদেশ কেন ভারতভূমি কি উচ্চ দরের মানুষ হারাইয়াছেন তাহা লোকে এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৩৪৫ চৈত্র

"তত্ত্ববোধিনী সভা'

"তত্ত্ববোধিনী সভা" ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কাজ চলিয়াছিল। এই কুড়ি বৎসরে বাংলা সাহিত্যের উপর এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনের অনেক বিভাগের উপর ইহার কল্যাণকর প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত ইতিহাস লিখিত হওয়া আবশ্যক। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস তাহার সূচনা করিয়া বাঙালীর একটি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের আভাস দিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহার উপক্রমণিকা লিখিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কত দিকে কৃতী কত বাঙালী ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহা প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝা যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভা যদি একটি কোন মানুষ হইতেন, তাহা হইলে এই বৎসর তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব হইত। কিন্তু মনুষ্যসমষ্টিরও তো এরূপ উৎসব হইতে পারে। তাহা হইলে বাঙালীদের একটি কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হয়।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ যে তত্ত্ববোধিনী সভার শাতাব্দ বৎসর তাহা গত চৈত্রের ও বৈশাখের দুটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। পাক্ষিক তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ১৬ই বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে সভার কৃতিত্বের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম ও তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে কয়েকটি চিন্তা অনিবার্য্য রূপে মনে উদিত হয়। প্রথমতঃ যে-তত্ত্ববোধিনী সভা উত্তর কালে ক্রমশঃ বঙ্গদেশের সমুদয় শিক্ষিত ও অত্যগ্রসর মানুষদের মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল, তাহার সূচনা এইরূপে কেবল দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি আত্মীয়কে লইয়া, প্রায় নিভৃতেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে-তত্ত্ববোধিনী সভা উত্তর কালে ব্রহ্মবাদ প্রচার, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, সর্ব্ববিধ কুসংস্কার উন্মূলন, কয়েকটি স্বাধীন বিদ্যালয় পরিচালন, সাহিত্য প্রচার, বিজ্ঞান প্রচার, বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠতম মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন, বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনারীতি প্রবর্ত্তন, বাংলাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদির সময়ে আর্ত্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ, খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের কৃত বেদান্তধর্ম্মের নিন্দার প্রতিরোধ, প্রভৃতি, তৎকালীন বঙ্গসমাজের শিক্ষিত ও অত্যগ্রসর মানুষদের

অবলম্বিত প্রায় সমুদয় কল্যাণকর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন,—সেই সভার জন্ম হইল এক জন শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ মানুষের শান্ত ধর্ম্মজীবনকে ভিত্তি করিয়া। বোধ হয় ইহাই কল্যাণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবি ঈশ্বর গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন।

১৩৪১ মাঘ

কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিসভা

যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেনকে প্রতি বৎসর স্মরণ করিয়া সমবেত ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন, যাঁহারা সমাজ-সংস্কার আবশ্যক মনে করেন কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহারাও এই সাধু পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন কর্ত্তব্য মনে করেন। আধুনিক যুগে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া এক দিক দিয়া সমাজসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন, বালিকাদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, সুরাপান-নিবারণ, প্রভৃতির চেষ্টা বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্রই প্রবর্ত্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিও কেশবচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই সুবিদিত হওয়ায় তিনি যে বাংলার সুলেখক ছিলেন তাহা যেমন লোকে ভাবে না, তেমনি কেশবন্দ্রকেও লোকে কেবল ধর্ম্মাচার্য্যই মনে করায় তিনি যে সরল ও প্রাণ-স্পর্শী বাংলা বলিতেন ও লিখিতেন, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। সস্তায় বাংলা খবরের কাগজের বহুল প্রচার তিনিই প্রথমে "সুলভ সমাচার" দ্বারা করেন। উহার দাম ছিল এক পয়সা। আমাদের মনে পড়ে আমরা যখন বাঁকুড়া জেলা-স্কুলে পড়ি তখন উহার অন্যতম শিক্ষক ভোলানাথ অধ্বর্য্যু সপ্তাহে ১৪০খানা পর্য্যন্ত ঐ কাগজ আনাইয়া বিক্রী করিতেন। প্রথম পৃষ্ঠায় উহার নামের নীচে চারি পংক্তি পদ্য ছাপা থাকিত। প্রথম দুই ছত্র—

"সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।"

অন্য দুই পংক্তি ঠিক্ মনে নাই। উহার পূজা-সংখ্যা রঙীন কাগজে ছাপা হইত ও আমাদের বড় প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে ইণ্ডিয়ান মিরারও কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। সাবেক আলবার্ট-হল তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে অনেকগুলি পরিবার সাম্যবাদী রীতিতে (communistic principleএ) বাস করিতেন। উহা অবশ্য রুশিয়ার কম্যুনিজমের মত হিংসার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই—মানবপ্রীতিরই উহা বাহ্য প্রকাশ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও কেশবচন্দ্রের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। যাঁহারা পরমহংস রামকৃষ্ণের মণ্ডলীভুক্ত বা

না হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহারা পরোক্ষভাবে কেশবচন্দ্রেরও নিকট ঋণী। কারণ রামকৃষ্ণ ও কেশব উভয়ের আধ্যাত্মিকতা যেমন নিজ নিজ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাধনায় তেমনি অংশতঃ পরস্পরের প্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

১৩৪২ মাঘ

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা

মহাপুরুষগণ যে কাজ করিয়া যান তাহার দ্বারাই তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষিত হয় ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য উপকৃত ও কৃতজ্ঞ জনমণ্ডলীরও চেষ্টা করা উচিত। ইহা সন্তোষের বিষয়, যে, গত মাসে আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"১৯৩৮ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি অট্টালিকা এবং হলগৃহ নির্ম্মাণ।

(২) সর্ব্ব ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীপূর্ণ একটি পাঠাগার স্থাপন।

(৩) ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) একটি ব্যায়ামাগার এবং

(৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি কারখানা স্থাপন।

কমিটি অবিলম্বে গঠন করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা এখন হইতেই করা আবশ্যক।

কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াই পরিচিত। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মের প্রচারে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। স্মৃতিসভায় ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার বলেন, "সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে, তাঁহার প্রতিভা আমাদিগকে বিস্মিত করে। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যে একটি অচ্ছেদ্য যোগ আছে, ইহা তিনি আমাদিগকে স্পষ্টরূপে ও প্রথম শুনান।"

ধর্ম্মবিষয়ে নেতৃত্ব ভিন্ন অন্য নানা দিকেও তাঁহার কৃতিত্ব আছে, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' সর্ব্বসাধারণকে রাজনীতি-চর্চ্চার সুযোগ দিয়াছিল। তাঁহার 'সুলভ সমাচার' বঙ্গের প্রথম সস্তা খবরের কাগজ। শিক্ষাদান ও মাদকতা-নিবারণের ক্ষেত্রেও তিনি খুব কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ কথিত বাংলার একটি তাৎকালিক আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। বিলাতে তিনি তাঁহার অনতিক্রান্ত বাগ্মিতা সহকারে যে-সকল বক্তৃতা করেন, তাহার দ্বারা ইংরেজরা বুঝিতে পারে, যে, ভারতীয়েরা, বাঙালীরা, নিকৃষ্ট জাতি নহে। "আরাম অধম, আমরা নিকৃষ্ট" এইরূপ ধারণা রাজনৈতিক ও অন্যবিধ

উন্নতির পথে একটি প্রধান বাধা। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা দ্বারা এই প্রকার ধারণা (অর্থাৎ inferiority complex) তৎকালে যে-পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল, সেই পরিমাণে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও অজ্ঞাতসারে বললাভ করিয়াছিল—যদিও তিনি স্বয়ং রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না।

আজকাল কিছুদিন হইতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রধান নেতা। এ-বিষয়ে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা তাঁহাকে আমরা পূর্ণমাত্রাতেই বরাবর দিয়া আসিতেছি এবং এখনও দি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দিক হইতে আমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

১৩৪৫ পৌষ

গরিফায় প্রস্তাবিত কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতিমন্দির

কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষদের আদি-নিবাস গরিফায়। সেখানে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত একটি স্মৃতিমন্দির থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কর্ণধার কানপুরের প্রথিতনামা ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশে লিখিত একটি আবেদন পাঠাইয়াছেন। তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

একটি বিশেষ নিবেদন লইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি। সেটি এই যে, প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে গরিফা-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বলরাম সেন প্রমুখ কয়েক জন ভদ্রমহোদয়ের ইচ্ছা হয় যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার্থে তাঁহার আদিনিবাস গরিফায় তাঁহার পিতামহের বাস্তুভিটার এক বিঘা জমি স্বত্বাধিকারীদের নিকট হইতে নাম-মাত্র খাজনায় ইজারা লইয়া কেশবচন্দ্র স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত করেন ; এবং এই উদ্দেশ্যে "কেশবচন্দ্র-প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি" গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺রামকমল সেন (কেশবচন্দ্রের পিতামহ) তাঁহার গরিফার সমস্ত সম্পত্তি ৺গিরিধারীজীউর নামে দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় থাকিয়া উক্ত বিগ্রহের সেবা করিবার ভার লইবেন, তাঁহারাই এই দেবোত্তর সম্পত্তির কর্ত্তা হইবেন বলিয়া উইল করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত সেবাইতদের মধ্যে দুই ভাইয়ের বংশধরেরা আছেন। এক পক্ষ হইতে সেন-বংশের অনেকের অনুরোধে "কেশবচন্দ্র স্মৃতিমন্দিরে"র জন্য এক বিঘা জমি ঐ দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেবাইতদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটাতে "স্মৃতিরক্ষা-সমিতি" উক্ত জমির উপর স্মৃতিমন্দির গঠন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। প্রায় ৮ বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যখন হাইকোর্টের কোন নিষ্পত্তি পাওয়া গেল না, তখন ঐ স্মৃতিরক্ষা-সমিতি অন্যত্র (উক্ত দেবোত্তর জমির সম্মুখে) জমি খরিদ করিয়া "কেশব-স্মৃতিমন্দির" গঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন ; এবং এক অংশ অর্থাৎ পাঠাগার তৈয়ার হইয়া গিয়াছে ; এখন অর্থাভাবে বাকী অংশ অর্থাৎ হলটা সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। "প্রতাপ-চন্দ্রস্মৃতিমন্দির" সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাঁর বংশধরদের সাহায্যে। কিন্তু অর্থাভাবে "কেশব-স্মৃতিমন্দির" অসম্পূর্ণ রহিয়া

গিয়াছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে, যদি, যে-মহাপুরুষের জন্মস্থান, আঁতুড়-ঘর দেখিতে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে মনীষীগণ কলুটোলার বাড়ীতে আসেন, তাঁহার আদিনিবাস গরিফায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। তবে বুঝিতে হইবে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। আমরা কি সেই মহামানবকে এত শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়াছি? তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যবর্গের এবং তাঁহার বংশধরদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা এই স্মৃতিমন্দিরটিকে স্থাপনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া এই উৎসবকে সার্থক করুন।

আমরা এই আবেদনটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। স্মৃতিমন্দিরটির অবশিষ্ট অংশ নিশ্চয়ই অবিলম্বে নির্ম্মিত হইয়া যাওয়া উচিত। কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী যত জায়গায় হইয়াছে। এবং অতঃপর হইবে, সর্ব্বত্র এই স্মৃতিমন্দিরটির জন্য চাঁদা সংগৃহীত হওয়া উচিত।

১৩৪৬ আশ্বিন

‘সুলভ সমাচার’ ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী

“শিশু ভারতী”র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত “সুলভ সমাচার” হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলন করিয়া উপরিলিখিত নামে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেগুলি কেশবচন্দ্রের নিশ্চয়ই নিজের লেখা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, সেগুলির নাম তিনি ভূমিকায় দিয়াছেন। এই পুস্তিকাটি প্রথম খণ্ড। পরে যোগেন্দ্রবাবু ইহারই মত মূল্যবান্ আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের মতের কিছু আভাস আমরা গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম। এই পুস্তিকায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতে কেশবচন্দ্রের অধুনা-বিস্মৃত বা অজ্ঞাত বিস্তর রচনা দেখিতে পাইবার আশা করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যান্য সাধারণ ও গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে সুলভ সমাচার বালকবন্ধু, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির যে-সব পুরাতন ফাইল আছে, যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিতে পাইলে তাঁহার প্রারব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ হইবে।

১৩১২ আষাঢ়

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

মহেশচন্দ্র ঘোষ

রামমোহন ধর্ম্মজগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি আমাদিগের পিতামহ। দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগের পিতা। ইঁহাদিগের নিম্নেই কেশবচন্দ্রের স্থান। ইনি আমদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রতাপচন্দ্র কেশবেরই দক্ষিণ হস্ত। এই সেদিন দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন—ভাই প্রতাপচন্দ্রও ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। একে একে সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। এখন ইহাঁদিগের স্থান কে পূর্ণ করিবে এই ভাবিয়া আমরা আকুল হইতেছি। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

প্রতাপচন্দ্র ১৮৪০ সালের অক্টোবর মাসে হুগলীর নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু গরিফা নামক গ্রামেই ইনি লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই গ্রাম কেশবের জন্মস্থল। ১৮৩৮ সালের নবেম্বর মাসে ইহাঁর জন্ম হয় ; সুতরাং কেশব এবং প্রতাপ প্রায় সমবয়স্ক। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে একটী আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই আকর্ষণই ভবিষ্যৎ জীবনে অচ্ছেদ্য বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। জনহিতকর প্রত্যেব কার্য্যেই কেশব প্রতাপের নিকট হইতে সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেন এবং প্রতাপও আনন্দের সহিত কেশবের অনুসরণ ও সাহায্য করিতেন।

গ্রামের পাঠশালাতে প্রতাপের অক্ষরপরিচয় হয়। হুগলী কলেজে ইনি এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ইহার পর পিতামাতা কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। প্রতাপ প্রথমে হেয়ার স্কুলে তৎপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৫৯ সালে ইহাঁর কলেজে লেখাপড়া শেষ হয়।

শিক্ষাবস্থাতেই (১৮৫৮ সালে) প্রতাপ চন্দ্রকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

বিষয় কর্ম্ম।

প্রতাপচন্দ্র ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটা পদে নিযুক্ত হন। এই আফিসে কেশবচন্দ্রও ৩০৲ টাকা মাহিনার একটী চাকরী করিতেন। একার্য্য কাহারও মনঃপূত হইল না। অবসর পাইলেই প্রতাপ ঐ আফিসগৃহেই প্রার্থনা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিয়া রাখিতেন। ইহাতে উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইত। একদিন এই হুকুম প্রচারিত হইল যে, কোন কর্ম্মচারীই আফিসের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না এবং এই মর্ম্মে সকলকে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। প্রতাপ ও কেশব দেখিলেন এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সহজ নয়, এই জন্য ইঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাদিগকে আর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল না।

দীক্ষা ও গৃহত্যাগ।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে প্রতাপচন্দ্র ১৮৫৯ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাতে আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক প্রতাপকে গৃহে আশ্রয় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় কেশব ও প্রতাপ উভয়েই সস্ত্রীক মহর্ষিভবনে উপস্থিত হইলেন. হিন্দুসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পর সমাজে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল।

১৮৭০ সালে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকাতে পরিণত হয়। প্রতাপ এই কাগজের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র যখন প্রচারে

বাহির হইতেন তখন প্রতাপকেই অধিকাংশ কার্য্য করিতে হইত। এই সময়ে তিনি পৈতৃকগৃহ ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক মিরার আফিসের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সাংসারিক সমুদয় অশান্তি দূরীভূত হইল। মনের সুখে ইনি জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইলেন।

জীবনের আদর্শ।

দেবেন্দ্রনাথ প্রাচ্যভাবে জীবনগঠন করিয়াছিলেন কেশবচন্দ্রের জীবন পাশ্চাত্যভাবে গঠিত। কেশবের দৃষ্টান্তে প্রতাপচন্দ্র দিন দিনই খৃষ্টের প্রতি অনুরাগী হইতে লাগিলেন। ১৮৬৬ সালে মার্চ্চ মাসে কেশবচন্দ্র একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার নাম "Jesus Christ, Eurpoe snd Asia"-"যীশুখৃষ্ট ; ইউরোপ ও এসিয়া।" বক্তৃতার ভাবার্থ এই ঃ—মানবজাতিকে উন্নীত এবং উদ্ধার করিবার জন্য যীশু বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং উক্ত মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি যীশুকে উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। "Sent by Providenec to reform and regenerate mankind, he received from Providence power and wisdom for that great work." এক দিকে তাঁহার জীবনের মাধুর্য্য ও কোমলতা, সহানুভূতি এবং মেষশাবকসদৃশ শান্তপ্রকৃতি, দয়াপ্রবণ হৃদয় এবং ক্ষমাশীলতা—অপর দিকে তাঁহার নির্ভীক স্বভাব, স্থিরচিত্ততা এবং সত্যপরায়ণতা—জগতে সমুদয়ই অতুলনীয়। তিনি জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ়,—তিনি অসাধারণ পুরুষ। যীশু এসিয়াবাসী, তাঁহার ধর্ম্ম এসিয়াতেই প্রথম প্রচারিত এবং এসিয়াবাসী কর্ত্তৃকই পরিবর্দ্ধিত। তাঁহার চিন্তা এবং ভাব সমুদয়ই প্রাচ্যভাবাপন্ন। কেশব আরও বলিলেন "এই সমুদয় কথা যখন আমি চিন্তা করি, যীশুর প্রতি আমার প্রেম শতসহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। আমি আমার হৃদয়ে তাঁহাকে স্পর্শ করি, জাতীয় ভাবের গভীরতর স্থানে তাঁহাকে অনুভব করি।"

প্রতাপচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন—"কেশব যে প্রকার উৎসাহ ও গুণগ্রাহিতার সহিত যীশুখৃষ্টকে messiah (অভিষিক্ত পুরুষ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আমিও এই মহান্ আত্মার সহিত বিশেষ একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলাম। কেশবের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সমুদয় মনের কথা জানিবার জন্য চিঠি লিখিলাম। ইহার উত্তর কেশব লিখিলেন ঃ—

মাণিকতলা, ১৮ই মে, ১৮৬৬।

প্রিয় প্রতাপ,

তুমি যে পুস্তকখানা (Ecce Homo) চাহিয়াছ, তাহা এত শীঘ্র পাঠাইতে পারিতেছি না। কারণ ইচ্ছা আছে ইহার প্রথম অধ্যায় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত করি। গরিফা যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছ আপাততঃ তাহাও পারিতেছি না—এ আনন্দযাত্রার সময় নহে—বিশেষতঃ উপভোগের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, আমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। তুমি আমার সেই বক্তৃতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যীশুর বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিব কিম্বা তৎসংক্রান্ত ধর্ম্মমতাদির আলোচনা করিব এ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। আমি যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও যীশুভাবে জীবন যাপন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যীশুর বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারি না। (Unless I can live Jesus to some extent at least, I cannot talk Jesus). যতদিন না বুঝিব আমাদের দেশে যীশুকে প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে ততদিন আমি এ বিষয়ে কিছুই প্রচার করিব না। প্রকৃত কথা, আমাকে উপযুক্ত হইতে হইবে, এবং যখন উপযুক্ত সময় আসিবে তখন আমি কার্য্য আরম্ভ করিব, যীশু যে অস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন তখন সেই অস্ত্র ধারণ করিব।....আমার নিকট যীশু ও আত্মত্যাগ একই বস্তু। তিনি উপযুক্ত সময়ে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত সময়েই তাহাকে প্রচার করিতে হইবে। ভারতে যতই আত্মত্যাগ আবশ্যক হইবে এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যতই দেখা যাইবে ততই যীশুকে এ দেশে প্রচার করিবার সুযোগ হইবে।

এ সমুদয় ১৮৬৬ সালের কথা। এই সময় হইতে প্রতাপচন্দ্রের প্রাণে যীশু বিষয়ে নানা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল ; তাঁহার হৃদয় নানা প্রকার সংশয়ে

আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন, কাহাকে আদর্শ ধরিয়া চলিবেন, কিসে মুক্তিলাভ করিবেন, এই সমুদয় চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৭ সালে (সম্ভবতঃ মে কি জুন মাসে) তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কেশবকে একখানা চিঠি লিখেন। তাহার ভাবার্থ এই ঃ—

প্রিয় কেশব,

আমার নিকট হইতে পত্র পাইবার অধিকার তোমার আছে কিন্তু জানি না আমার পত্র তোমার কি উপকারে আসিবে। আমি এখানে তোমার উদ্যানে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে এখানে বাস করিতে দিয়াছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যেখানেই থাকি না কেন আমার নিকট সব স্থানই সমান। প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে করিতে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এ জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু হৃদয়ের আবেগে আমাকে কত কথা বলিতে হইতেছে। হয় মৃত্যু, না হয় মুক্তি—নতুবা কিছুতেই আমার কল্যাণ নাই। তুমি বলিতে পার এত অধীর হইতেছ কেন। কিন্তু মন্দ কার্য্যে কি ধৈর্য্য ভাল? ভাল কার্য্যেই ইহা প্রশংসনীয়। এই দুষ্ট আত্মা লইয়া আমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারি না। মৃত্যু—চির নির্ব্বাণ—ইহাও আমার নিকটে বাঞ্ছণীয়। ধৈর্য্য ধারণ কাহার সঙ্গে? আমি নিজের অবস্থাতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব, ইহার অর্থ এই যে এই ঘৃণিত পাপময় জীবন যতদিন থাকে থাকুক। ঈশ্বর কঠোরহৃদয় বিদ্রোহীর মস্তক ত তখনি চূর্ণ করেন না। আমি ধৈর্য্যের ভাণ করিতে পারি ; নিজের নিকট হইতে আমার অনুপযুক্ততা, অলসতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অকর্ম্মণ্যতা ইত্যাদি সবই গোপন করিতে পারি এবং অপরের নিকট উচ্চস্বরে বলিতে পারি ধৈর্য্য! ধৈর্য্য! ধৈর্য্য! কিন্তু এই নির্লজ্জতা ও মূঢ়তা জনিত যে অপরাধ, কিসে তাহার ক্ষালণ হইবে? আমি নিজের অবস্থাতে ধৈর্য্য ধরিতে পারি কিন্তু আমাকে লইয়া কে ধৈর্য্য ধরিবে? তুমি কি অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? ভ্রাতৃগণ কি অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন? জীবন এবং মৃত্যু কি অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? কত কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, কত কর্ত্তব্য এখনও সম্পন্ন হয় নাই, প্রকৃত জীবন এখনও আরম্ভ হইল না। সময় চলিয়া যাইতেছে! যে মৃত্যুমুখে নিপতিত, সে কি করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে? একদিনের শ্রমের উপর অনন্তকালের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। তবু আমি নিদ্রিত—তবু আমি যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব এইত সময়, পরে আর সময় মিলিবে না। আমাকে মুক্ত কর, কোথায় মুক্তি, কিসে মুক্তি আমাকে বল। জীবনের সমগ্র কাজ সম্মুখে লইয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই দুঃখভার গ্রস্ত অধঃপতিত পাপীকে ঈশ্বর করুণা করুন।

(উক্ত পত্রখানি ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদিত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র—মধ্যভাগ ১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

Oriental Christ নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকাতেও এই অস্থিরতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

১৮৬৭ সালের কিম্বা ঐ সময়ে আমি ধর্ম্মজীবনে নিতান্তই একাকিত্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। বন্ধুগণের সহানুভূতি হইতে ক্রমাগতই বঞ্চিত হইয়া একাকী ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। এ সময়ে আমি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম। আভ্যন্তরিক পরীক্ষা ও যন্ত্রণা চরম সীমার উপস্থিত হইয়াছিল। কোন তারিখ, তাহা মনে নাই। তবে একদিন সন্ধ্যায় সময় নিজের আত্মার বিষয় ভাবিতেছিলাম। চিন্তা করিতেছিলাম আত্মার দুর্গতি কিসে বিনষ্ট হয়। বিধাতার সন্তানগণের জন্য কত সুখ কত শান্তি রহিয়াছে কিন্তু আমি এ সমুদয় হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, ক্রন্দন করিতেছিলাম, উষ্ণ অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছিল। আমি যেন মহাভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি বুঝিতে পারিলাম কেহ আমার নিকটে আসিয়াছেন। এ আত্মা কি পবিত্রতর কল্যাণতর এবং কি প্রেমপূর্ণ! আমি দুঃখভারাক্রান্ত মস্তক রাখিবার স্থান পাইলাম। যীশু আমার প্রাণে আশ্চর্য্য ভাবে, মানবীয় ভাবে—আত্মীয় প্রেমিক আত্মা রূপে, বিশ্রামের স্থল রূপে, শান্তিপ্রদ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। এ সম্পত্তি আমাকে ক্রয় করিয়া লাভ করিতে হইল না—ইহা ভোগ করিবার

জন্য আমি আহুত হইলাম। আমার প্রাণ হইতে তৎক্ষণাৎ—অসঙ্কুচিতভাবে প্রত্যুত্তরের ধ্বনি উত্থিত হইল। এই দিবস হইতে আমি যীশুকে নির্ভর করিবার ভূমিরূপে গ্রহণ করিলাম (Jesus from that day to me became a reality whereon I might lean). সে দিন প্রাণে ইহা ভাব মাত্র রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ; আজ ইহা—আমার জীবনের বিশ্বাস এবং ভিত্তি (Principle). শত সহস্র পরীক্ষাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। খৃষ্ট তখনও আমার নিকট দেহধারী ছিলেন না, এখনও দেহবিশিষ্ট নহেন। এই জীবন, এই প্রাণ, এই পবিত্র আত্মত্যাগী মহান্ আত্মা—ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। আমি যে আলোকলাভ করিয়াছি এই অনুসারেই আমি জীবনকে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এবিষয়ে অনেকেই সাহায্য করিয়াছেন বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন এবং উৎসাহিত করিয়াছেন—। বিশেষভাবে এবিষয়ে আমি বিশেষ এক জনের নিকট ঋণী। খৃষ্টের প্রকৃতি বিষয়ে চর্চ্চা করিবার আগ্রহ আমার নাই। যীশু যেরূপ হইতে আদেশ করিয়াছেন আমাকে সেইরূপই হইতে হইবে।—আমি জানি ইহলোকে মনষ্কাম পূর্ণ হইবে না। ইহার পুরস্কার এবং প্রাপ্তি অন্যত্র। আমি যে এই সত্য লাভ করিয়াছি ইহা বিধাতার কৃপায়। তিনিই অন্তরে থাকিয়া ইহা আমাকে বুঝিতে দিয়াছেন"। পৃঃ ১০—১২।

দান্তে বিএট্রিসের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু এ প্রেম পার্থিব প্রেম নহে—বিএট্রিস্‌ও মানবী নহেন। দান্তে মানসপুরে মায়াময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিতেছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের যীশুও একটী কল্পনাময়ী মূর্ত্তি। মোক্ষমুলার ইঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাকে বুঝেন নাই। প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টান ছিলেন না—তাহার জীবন খৃষ্টময় হইবে, এই তাঁহার আদর্শ ছিল। খৃষ্ট তাঁহার ভ্রাতা, বন্ধু, সহায়, সহৃদ, আত্মীয়, গুরু এবং আদর্শ। এ জন্য প্রতাপচন্দ্রকে অনেকের নিকট গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টানগণ চিনিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মগণও চিনিলেন না।

ধর্ম্মের এই আদর্শ ভারতবাসীর গ্রহণীয় হয় নাই এবং কখন যে হইবে সে আশাও নাই ; কিন্তু প্রতাপচন্দ্র যে ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

যাঁহারা সমুদয় আত্মাকে এক ছাঁচে ঢালিতে চাহেন তাহারা মহা মূর্খ। বৈচিত্রই বিধাতার নিয়ম। এই নিয়মেই প্রতাপ খৃষ্টকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহাঁর অভিজ্ঞতা পাইয়া জগৎ ধনী হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী।

প্রচার।

১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্রও এই সময়ে সমাজের সহকারী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন।

কেশবচন্দ্রের জীবিতাকথায় প্রতাপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭০ সালে "ভারত সংস্কারক সভা" স্থাপিত হয়। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনের জন্য ইহার একটী বিভাগ ছিল। প্রতাপচন্দ্র ইহার সভাপতি এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ শকে একটী উপাসক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮০১ সালে কেশবচন্দ্র ইঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

২৫বৎসর বয়স হইতেই প্রতাপচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথমে বাঙ্গালা এবং হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেন। যখন ইংরাজীতে দক্ষতালাভ করিলেন, তখন হইতে প্রধানতঃ ইংরাজীতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতেন।

বোম্বাই প্রদেশ ইহার কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বেহার, উত্তর-বঙ্গ, এবং অন্যান্য বিবিধ স্থানেও ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

প্রতাপ ইউরোপে তিনবার এবং আমেরিকাতে দুইবার পরিভ্রমণ করেন। উভয় স্থলেই নিমন্ত্রিত হইয়া বহু প্রার্থনামন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। বোষ্টন নগরে Lowell Institute এ চারিটী বক্তৃতা দেন।

এ সমুদয় বক্তৃতা এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে বিভিন্ন সময়ে ঐ গৃহেই ইহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার মহাধর্ম্ম মণ্ডলীতে (The Parliament of Religions) একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম ধর্ম্মজগতে এসিয়ার নিকট জগতের ঋণ—The world's Religious Debt to Asia। জাপানেও ইনি প্রচার করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ইহাকে সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ধর্ম্মভাব ও বক্তৃতার ক্ষমতায় সর্ব্বত্রই ইনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা University Institute ইঁহারই কীর্ত্তি। প্রতাপচন্দ্রই ইহা স্থাপন করেন—এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

বাগ্মিতা।

ইনি যে শ্রেণীর বক্তা, তদ্রূপ বক্তা ভারতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহাঁর ওজস্বিনী ভাষা, অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, শব্দবিন্যাসের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, ভাষার অসাধারণ লালিত্য, সমুদয়ই অতুলনীয়। যাঁহারা ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণ কিম্বা পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে একথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সাধারণতঃ বক্তাগণ বক্তৃতা লিখিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া লন, তৎপর সভাগৃহে তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র এ ভাবে অগ্রসর হইতেন না। সভাস্থলে কোন প্রকার চুম্বক লইয়া যাইতে হইত না। বক্তৃতার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির করিয়া লইতেন কি কি বিষয় কি শৃঙ্খলায় বলিতে হইবে। সভাস্থলে বক্তৃতার জন্য দণ্ডায়মান হইলে ভাষা আপনা আপনি বাহির হইত, এজন্য তাঁহাকে কোন প্রকার বেগ পাইতে হইত না। কোন অদৃশ্য শক্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন তিনি সমুদয় উচ্চারণ করিতেন।

পুস্তক প্রচার।

প্রতাপচন্দ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ ঃ—1. The faith and progress of the Brahma Samaj ; 2. The Life and teachings of Kesab chandra Sen ; 3. The Oriental Christ ; 4. Heart beats ; 5. The spirit of God. শেষোক্ত তিনখানা পুস্তকেই তিনি জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছেন—ভারতবর্ষ অপেক্ষা—ইউরোপ ও আমেরিকা ভূমিতেই এ সমুদয়ের আদর বেশী। ইংরাজী ভাষায় ইনি আরও কয়েকখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গলা ভাষায়ও ইহাঁর পুস্তক আছে।

বিষয় সম্পত্তি।

প্রতাপচন্দ্র কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সম্পত্তির মূল্য দশ পনের হাজার টাকা হইবে। এই অর্থে কলিকাতায় শান্তিকুটীর এবং কারসিয়াংএ একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর কখন ৬ মাস কখনও বা ৮ মাস কালও তিনি হিমালয়ে বাস করিতেন।

উপসংহার।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইবার পরে প্রতাপচন্দ্র অভিন্নহৃদয় কেশবের দলেই থাকেন ; কিন্তু সর্ব্ব বিষয়েই যে উভয়ে একমত হইতেন তাহা নহে। নববিধান প্রচারের সময় প্রতাপচন্দ্র কেশবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অনেকেই আশা করিয়াছিল কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রতাপ কেশবের স্থান অধিকার করিবেন। কিন্তু অনেকে বিরোধী হওয়ায় তিনি একটুকু সরিয়া পড়িলেন। জগৎ যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না। প্রতাপ কার্য্যক্ষেত্র পাইলেন না। এ সমুদয় গৃহবিচ্ছেদের কথা বলিবার আর ইচ্ছা নাই।

২৯ শে শনিবার অপরাহ্ণ ২ টা ২৭ মিনিটের সময় ভাই প্রতাপচন্দ্র এই কোলাহলময় দেশ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিদায়িনী জননীর শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। জননীর ইচ্ছা তাঁহার জীবনে পূর্ণ হউক।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

১৩২৬ অগ্রহায়ণ

শিবনাথ শাস্ত্রী।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া অল্পবয়স্কদের উদ্বোধন হইলে দেশের পরম মঙ্গল হইবে। তিনি নিজে মানুষকে মানুষ বলিয়াই ভাল বাসিতেন, জাতি ধর্ম্ম পাণ্ডিত্য অজ্ঞতা ধনশালিতা দারিদ্র্যের বিচার করিয়া তাহার পর মানুষকে ভালবাসিবেন কি না স্থির করিতেন না। আমরাও দেশের তরুণদিগকে, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন তাহা ভুলিয়া, তাঁহার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বুঝিতে আহ্বান করিতেছি, এবং নিজ নিজ আচরণ দ্বারা ইহা দেখাইতে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দরিদ্র ছাত্র আমাদের দেশে আগেও ছিল, এখনও আছে। আগেকার দরিদ্র ছাত্রেরা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখাপড়া শিখিতেন এবং কেহ কেহ যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, এখনকার দরিদ্র ছাত্রেরা তাহা করেন কি না বলিতে পারি না। শাস্ত্রী মহাশয় বাল্যে ও যৌবনে কি করিতেন, তাঁহার আত্মচরিতে তাহা লিখিত আছে। যেসব গরীব ছাত্র আজকাল গৃহশিক্ষকতা না পাইলেই বিদ্যালাভের আশা ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা শাস্ত্রী-মহাশয়ের ছাত্রাবস্থার বৃত্তান্ত পড়িলে সহজে নিরাশ হইবেন না। এক সময়কার কথা তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"যথাসময়ে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। বাসাতে ধূম পড়িয়া গেল। বাড়ীতেই ছাপাখানা খোলা হইল, কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির জন্য অনেক লোক বাসাতে থাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০ টা ১১ টা পর্য্যন্ত। তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ; আমার খাওয়া-দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশুনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে। আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া রাঁধি, বাসন মাজি, এবং কোনও প্রকারে নিজের পড়াশুনা করি।"

পরে আর-এক সময়ের কথা লিখিয়াছেন ঃ—

"মাতুলমহাশয় বাসা উঠাইয়া দেশে গেলে আমার পিতা আসিয়া আমাকে সুকীয়া ষ্ট্রীটে বাদুড়বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতার পিস্‌তুতো ভাই। তিনি কম্পোজিটরী কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্য গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। এরূপ স্থির রহিল যে তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক করিব। কিন্তু কার্য্যকালে এই দাঁড়াইল যে আমাকেই দুইবেলা পাক করিতে হইত। কেবল তাহা নহে ; বাসনমাজা, ঘর ঝাড়ু-দেওয়া, বাজার করা, জলতোলা, প্রভৃতি সমুদয় কাজ আমার উপর পড়িয়া গেল। অনেক সময় আমাকে বাম হস্তে পাঠ্য পুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের কাঠি লইয়া রন্ধন ও পাঠ একসঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহুকাল পরে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইয়ছি, তাহাতে বাম হস্তের হলুদের দাগ এখনও রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয় বাটনা বাঁটিয়া তৎপরে সেখানি পড়িবার জন্য লইয়াছিলাম সেই জন্য হলুদের দাগ লাগিয়াছে।"

শাস্ত্রী-মহাশয় এল্-এ করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞাতব্য। তখন ডিসেম্বরে পরীক্ষা হইত। তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার যোগ ছিল। তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপ

সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পরে বলিতেছি। এই সাহায্য করিতে গিয়া সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা বিশেষ কিছু হয় নাই। তাঁহাকে আড়াই মাসের মধ্যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে তিনি আড়াই মাসের ছুটি পাইলেন এবং এই সুবিধাও পাইলেন যে তাহাতে তাঁহার স্কলারশিপও কাটা যাইবে না। তাহার পর তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"আমার শৈশবের আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটি ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মগ্ন হইলাম। প্রাতে একবার স্নানাহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধঘণ্টার জন্য যাইতাম। নতুবা দিন রাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের জন্য শয্যাতে যাই নাই। সন্ধ্যার সময় চাকরেরা আলো জ্বালিয়া দিয়া যাইত, সেই আলো সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই চারি ঘণ্টা পুস্তক মাথার দিয়া সেই ঘরেই ঘুমাইতাম। যতদূর স্মরণ হয় পাঠের ঘণ্টা এইরূপ ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। অঙ্ক ছয় ঘণ্টা (দুই ঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চার ঘণ্টা অঙ্ক কষা) , ইতিহাস ছয় ঘণ্টা, ইংরাজী তিন ঘণ্টা, সংস্কৃত এক ঘণ্টা, লজিক দুই ঘণ্টা ; সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় আঠার ঘণ্টা। এইরূপ পড়িতে পড়িতে শরীর ও মন সময় সময় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত।"

"এইরূপ শ্রম করিতে করিতে যখন আড়াই মাস পরে পরীক্ষার সময় আসিল তখন দেখিলাম, এক নীচের ঘরে আড়াই মাস বন্দ থাকিয়া শুইয়া শুইয়া কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় একটি বালকের কাঁধে হাত দিয়া পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।"

যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল তিনি এল্-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ৩২ টাকা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ডফ বৃত্তি ১৫ টাকা এবং সংস্কৃত কলেজের প্রথম বৃত্তি ১২ টাকা,—সর্ব্বসমেত ৫৯ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। দেড় বৎসরের অধিক কাল নিয়মিত পড়াশুনা না করিয়া শেষে এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা আমরা ভাল মনে করি না। আমরা কেবল শাস্ত্রী-মহাশয়ের শ্রমশক্তির পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার আত্মচরিত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহার কঠিন শ্রম করিবার ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন ঃ—

"আমি দেখেছি, তিনি সমস্ত রাত্রি একমনে খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে রাত ১২ টার সময় চাহিয়া দেখি বাবার কলম রেলগাড়ীর মত ছুটিয়াছে—কেবল খস্ খস্ শব্দ, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বামহস্তে কাগজ সরাইতেছেন। রাত ২ টায় চাহিয়া দেখি, তখনও কলম দৌড়িতেছে, ৪ টার লেখা শেষ ও শয়ন। আবার ৫।। টায় উঠিয়া স্নান উপাসনা করিয়া বাহিরের কাজে ছুটিলেন।"

বার্দ্ধক্যেও, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, ততদিন তাঁহার শ্রম করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা খুব ছিল। ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সূচী প্রস্তুত করিবার ভার যাঁহার উপর ছিল, বহি প্রকাশিত করিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে দেখা গেল যে, তিনি কাজটি ঠিকমত করিতে পারেন নাই। তখনি শাস্ত্রীমহাশয় স্বয়ং বিস্তৃত সূচী প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন,

এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা লেখা ও ছাপা শেষ হইয়া গেল।

মানুষ হইতে হইলে ও দেশহিত করিতে হইলে তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে হইবে। আজকাল নেতা হইবার অনেক সোজা পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহাতে নেতা হওয়া যায়, বিখ্যাতও হওয়া যায় ; কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না, প্রকৃত দেশহিতও করা যায় না।

এল-এ পরীক্ষার পূর্ব্বে শাস্ত্রী-মহাশয় যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে তাঁহার দায়িত্ববোধ কিরূপ প্রবল ছিল, এবং দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কতদূর স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বিদ্যাভূষণ) বিপত্নীক হইবার পর দশ বার দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া যুবক শিবনাথকে সেই কথা জানাইলেন ও তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "যাও যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দশ বার দিন হলো তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটি আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে করবে ত, তাতে আমার মত নেই ; তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" যোগেন্দ্র সে দিন বিষণ্ণ অন্তরে ঘরে গেলেন। "দুদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবা বিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।" তৎপরে তাঁহাদের এক বন্ধু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা ভগিনী মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

"এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্কলার্‌শিপ ও ঈশানের স্কলার্‌শিপ মাত্র ভরসা দাঁড়াইল। তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন. তাঁহাদের স্কলার্‌শিপের সহিত আমার স্কলার্‌শিপ যোগ করিলে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নানা প্রকারে সাহায্য হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিয়া বসিলেন। আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্যদানে বিরত থাকি। সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম। বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন ; * * * । লিখিলেন যে তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে বাড়ীতে রাখিতে পারিবেন না এবং আমাকে সস্ত্রীক গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।"

"আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন, ঈশানের পাঠ ও নাইট-ডিউটীর হাঙ্গা মাতে অবসরাভাব হইল ; এদিকে চাকর চাকরাণী নাই ; সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিনতালাতে কাঁধে করিয়া জল প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এই-সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়।"

"এই-সকল করিয়া আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। সম্মুখে অন্যের শেষে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে না। এইরূপে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।"

সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অক্টোবরের প্রথমে যুবক শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি

একটা ভাল কাজে আছ, কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখ্‌বে ব'লে মনে আশা কর্‌ছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্কলার্‌শিপ পাওয়া দূরে থাক, পাস্‌ হও কিনা সন্দেহ।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া শিবনাথের মনে হইল, "আমি যেন কোন পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি। আমার সম্মুখে গভীর গর্ত্ত, আর এক পা বাড়াইলেই তাহার মধ্যে পড়িব। আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নিমেষের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল স্কলার্‌শিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্য এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। 'ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ,' বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। আড়াইমাস-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সে পরিশ্রম ও তাহার ফলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রীমহাশয় মহালক্ষ্মীর জন্য আরও কত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এখানে বলিবার স্থান নাই।

শাস্ত্রীমহাশয় পিতার কিরূপ বাধ্য সন্তান ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত পড়িলে বেশ বুঝা যায়। অথচ যাহা সত্য ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, তাহার জন্য পিতার কতই না বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পিতা তাঁহার মুখ দেখেন নাই। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধি, শ্রমশক্তি ও অন্য নানা গুণ ছিল, তাহাতে তিনি নানাদিকে সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার মন যায় নাই। তিনি বিদ্বান্‌, বাগ্মী, কাব্য উপন্যাস জীবনচরিত সন্দর্ভাদির সুলেখক, সুকবি, অতি সামাজিক ও হাস্যরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনায় কঠিন প্রাণও বিগলিত এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। তিনি যৌবনকালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহযোগে দেশের রাজনৈতিক দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য ভারতসভা স্থাপন করেন, এবং তজ্জন্য পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। পানদোষ নিবারণ ও সামাজিক পবিত্রতাবৃদ্ধির জন্যও তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুশিক্ষক ছিলেন, শিশু কিশোর ও তরুণদিগকে ভাল বাসিতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারিতেন। ছেলেমেয়েদের কাগজ "মুকুলে"র প্রথম সম্পাদক তিনি ছিলেন। বালকবালিকাদের জন্য লিখিত তাঁহার অনেক রচনা 'সখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠন জন্য তিনি কখন স্বয়ং একাকী, কখন বন্ধুদের সহযোগে সিটিস্কুল, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, রামমোহন সেমিনারী, প্রভৃতি স্থাপন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান কর্ম্মী, প্রধান আচার্য্য ও প্রধান প্রচারক তিনি ছিলেন। ইহার বাংলা ও ইংরেজী মুখপত্র দুটি তিনি স্থাপন ও বহুবৎসর সম্পাদন করেন। তৎপূর্ব্বে সমদর্শী ও সমালোচক স্থাপন করিয়া তাহা পরিচালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমিশন প্রেস স্থাপন করিয়া তিনি উহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তন আধুনিক ভারতে নূতন জিনিষ। শাস্ত্রীমহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর ইহা একটি কীর্ত্তি। এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইলে বিশ্বনিয়ন্তার

যেমন বিশ্বাস চাই, মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি আবশ্যক। সাহসেরও একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই সমুদয়ই ছিল। তাঁহার গৃহে অনেক অনাথ ও বিধবা আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল, তাহা তাঁহার গুণে বেশী কিম্বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রসন্নময়ী দেবীর গুণে বেশী, তাহা বলা কঠিন। এই ভগবদ্ভক্ত সত্যনিষ্ঠ দ্বেষঅসূয়াশূন্য পরচর্চ্চা-পরনিন্দাবিমুখ মানবপ্রেমিক দেশভক্ত অক্লান্তকর্ম্মা নির্লোভ ত্যাগী জিতেন্দ্রিয় সাধু পুরুষের কীর্ত্তি অনেক। মনুষ্যত্বে তিনি তাঁহার সমুদয় কীর্ত্তিরও বহু ঊর্দ্ধে। তথাপি তিনি নিজেকে অতি অধম মনে করিতেন। তাহার কারণ এই যে তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ এত উচ্চ ছিলে যে তিনি তাহার তুলনায় আপনাকে হীন মনে করিতেন।

আলোচনা

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত

"জিজ্ঞাসু"

গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীর ১৬০ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে আপনি লিখেছেন—"স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সংস্কারক শাখা মনে করিতেন।"

এ বিষয়ে আপনি যদি শাস্ত্রীমহাশয়ের লিখিত মত তাঁহার কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব। আমার ধারণা যে, তিনি এরূপ মত প্রকাশ করেননি, হয়ত বুঝ্‌তে ভুল হ'তে পারে।

সম্পাদকের মন্তব্য। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐরূপ মত বোম্বাইয়ের "ঈষ্ট এণ্ড্ ওয়েষ্ট্ নামক মাসিক পত্রে লিখিত তাঁহার এক প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহা এখন আমার নিকট নাই। ঐরূপ মত তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইয়াছে। "যথা, তিনি উহার ২৭৫ পষ্ঠায় বলিতেছেন :—

"The last and most characteristic defcct, as noted by outside observers, is the greater appreciation that the members of this Samaj have shown for western ideals and methods than those which are their own as Hindus." *History of the Brahmo Samaj,* Vol.ii,p. 275.

এই বাক্যটির শেষ চারিটি শব্দে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে হিন্দু বলিয়াছেন।

২৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"I hope thcir disposition to study thcir ancient seriptures and to walk in the path of Hindu commission will be further developed as time rolls on, and the Brahmo Samaj will come to be regarded as the truest and greatest expoment of higher Hinduism. With that hope and that prayer I close this part of the history of that section of the Brahmo Samaj with which I am persomally concerned."–*Ibid p. 279.*

এই বাক্যদুটিও আমাদের মতের সমর্থক।

প্রবাসীর সম্পাদক।

১৩১৩ আশ্বিন

চিত্র

বর্ত্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মূর্ত্তি একখানি। তাঁহার সম্বন্ধে "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশিত একটি গল্প বড় সুন্দর। তিনি বাল্যকালে হার্ডিঞ্জ স্কুল নামক বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন।

"একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; জন্মভূমি বলিয়া তথাকার সকলই তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। তিনি ঐ সময়ে হার্ডিঞ্জ স্কুল দেখিতে গমন করেন। স্কুলের এ শ্রেণী ও শ্রেণী ঘুরিয়া আনন্দমোহন যখন মধ্যস্থিত কামরায় শিক্ষকগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন একখানা চেয়ারে বসিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা হইলে তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিয়াছিলেনঃ "ইহা আমার শিক্ষকের আসন ;" কিছুতেই তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন না ; কাজেই সকলে আনন্দমোহনের উত্তর শুনিয়া নীরব হইয়া গেলেন। এতদপেক্ষা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে আনন্দমোহনের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, বঙ্গের শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ে যদি তাহা প্রসৃত হইত, তবে সত্য সত্য ভারত দেবনিকেতনে পরিণত হইত।"

[এই লেখাটি ছাড়া হেমলতা দেবীর 'স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু' এবং লাবণ্যপ্রভা বসুর 'আনন্দমোহন বসু' লেখাদুটি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। শিক্ষাবিভাগ, বেথুন কলেজ, রাজনীতিক্ষেত্র, ধর্ম্মসমাজে আনন্দমোহন বসুর অবস্থান সেখানে সশ্রদ্ধায় উল্লিখিত]।

১৩১৩ আশ্বিন

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

শ্রীহেমলতা দেবী।

২০শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬।। ঘটিকার সময় ভারত আকাশের উজ্জ্বল তারকা আনন্দমোহন বসু চিরদিনের মত অস্ত গিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া জননী জন্মভূমি মর্ম্মে মর্ম্মে রোদন করিয়াছেন। জননীর সেবাব্রতে দীক্ষিত যে কয়টী সুপুত্র তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তন্মধ্যে প্রীতিভাজন প্রিয়দর্শন আনন্দমোহন অকালে বিদায় লইলেন। যদিও একবৎসরের অধিক কাল তিনি ভগ্নদেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রভাব, তাঁহার পবিত্র মুখচ্ছবি কত প্রাণে কত আশা কত উৎসাহের সঞ্চার করিত। সেই শ্রদ্ধাবিনয়ে আপ্লুত প্রতিভাউদ্দীপ্ত মনোরম মুখচ্ছবি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া গিয়াছে। আনন্দমোহন বসুর পার্থিব দেহ আর নাই। আছে তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, আছে তাঁহার দেবচরিত্র, আছে তাঁহার অমৃত সৌরভ। তিনি

আমাদিগের জাতীয় সম্পত্তি। তাঁহার কীর্ত্তিকথা বিবৃত করা আমাদিগের পরম গৌরব।

১৮৪৭ সালে এই আগষ্ট মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন বসু ভূমিষ্ঠ হন। তিনি স্বর্গীয় পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মসময়ে তদীয় পিতা উক্তস্থানে কোন রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গের সহস্র সহস্র বালকের শৈশবশিক্ষা যেরূপে সম্পন্ন হয় আনন্দমোহনেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিলেন। গণিতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন, তাহাতেও তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন। উপাধি বিতরণের সভায় প্রসঙ্গ ক্রমে বক্তৃতার সময় ভাইস-চেনসেলার বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার বিশ্বাস, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে না। ইহা কি তৎকালীন ছাত্রের পক্ষে কম গৌরব? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এখানেই তাঁহার সম্বন্ধচ্ছেদ হইল না—তিনি প্রেমচাঁদ রাঁয়চাঁদ বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভূষণ আনন্দমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "রেঙ্গলার" উপাধি লাভ করিলেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবাসী কেহ ঐ গৌরব লাভ করে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এ ক্ষেত্রে ভারতবাসী আনন্দমোহনের পদানুসরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ৪ বৎসর বাস করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানেই আনন্দমোহনের ছাত্রজীবনের অবসান হইল। তিনি বিচিত্র বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। এতদিন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ক্ষমতা এবং মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। কেবল ব্যারিষ্টার হইয়া অগাধ ধনসঞ্চয় করিয়া আজ যদি তিনি গতাসু হইতেন, তবে এ হাহাকার, এ জাতীয় আর্ত্তনাদ দেশের চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইত না।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি সামান্য পারদর্শিতা দেখান নাই। তবে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই সত্য— সে তাঁহার যোগ্যতার অভাব হেতু নহে। তাঁহার মহৎ জীবনের সফলতা ব্যবসায় ব্যপদেশে সার্থক হওয়া কদাপি সম্ভব ছিল না। তাঁহার উন্নত চরিত্র, মহৎ প্রকৃতি বিষয়ান্তরে আত্মপরিতৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছিল। সুতরাং প্রভূত অর্থাগম কিম্বা ব্যবসায়ের সুযশ তাঁহার মহৎ প্রকৃতিকে কখনই বিমুগ্ধ করিতে পারে নাই। নচেৎ প্রখরা বুদ্ধি, ওজস্বিনী বাগ্মিতা, অদ্ভুত গবেষণাশক্তি যাঁহার সহায়, তাঁহাকে পরাভূত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

শিক্ষা বিভাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোভূষণ আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষাবিভাগে তাঁহার কার্য্যকরী শক্তির অল্প পরিচয় দেন নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যরূপে সেনেটে এবং সিনডিকেটে অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার প্রস্তাবই প্রধান ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এদেশে ভূ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তৎকালীন ডাইরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট্ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী লর্ড রিপণ তাঁহাকে শিক্ষা-কমিশনের ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এই ত গেল শিক্ষা সম্বন্ধে আনন্দমোহন বসুর পরোক্ষ কীর্ত্তি—প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি সিটি কলেজ, এবং বেথুন কলেজ। ১৮৭৯ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রথম শিক্ষক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার প্রথম সম্পাদক, আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার প্রধান পরিপোষক,—

তিনি অর্থে সামর্থ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার পশ্চাতে ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিলেও আনন্দমোহন বসু মহাশয় আজীবন পশ্চাতে রহিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার সমুদায় কর্ত্তৃত্ব সিটি কলেজের সকল ভার কতিপয় ট্রষ্টীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

বেথুন কলেজ।

আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ইংলণ্ডে অবস্থান কালে বঙ্গমহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ৺দুর্গামোহন দাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্যেগে কুমারী একরয়েডের তত্ত্বাবধানে "হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গনারীদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য বালীগঞ্জে এক প্রশস্ত উদ্যানবাটিকায় "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। ইহার ব্যয়ভার এই উভয় মহাত্মা বহন করিতেন। কালক্রমে এই "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া বেথুন স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া বেথুন কলেজের স্থাপনা হইল। তৎপূর্ব্বে বেথুন স্কুলের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নাবীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য আনন্দমোহন বসু মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য মহিলাগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধা।

রাজনীতি ক্ষেত্রে।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতে স্বদেশহিতৈষণা মানবের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আজ স্বদেশপ্রেমিকের অভাব নাই ; কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া মুষ্টিমেয় স্বদেশপ্রেমিক মিলিত না। সেই সুদূর অতীতে স্বদেশের সেবাকল্পে যে কতিপয় বঙ্গমাতার সুসন্তান বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন একজন। ১৮৭৬ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য "ভারত সভা"র প্রতিষ্ঠা হয়। তখন শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। সেই "ভারত সভা" অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। মদ্যপানে দেশ রসাতলে যাইতেছে দেখিয়া যাঁহারা এ ঘোর দুর্গতির উচ্ছেদ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আনন্দমোহন অন্যতম। ইংলণ্ডের রাজসভায় ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আন্দোলনের সূত্রপাত তাঁহা দ্বারাই হইয়াছিল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাইটনে তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ফসেট প্রভৃতির ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার অদ্ভুত শক্তির সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য হইলে কি হয়—দেশের জন্য যাঁহার প্রাণ দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছে, তাঁহার আবার বিশ্রাম। তিনি সেখানেও দেশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নানা কার্য্যে, নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, রসনা অবিরাম দেশের কথাই বলিতে লাগিল। বিশ্রামের পরিবর্ত্তে তিনি দুরন্ত শ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভ হইল না। সকলে ব্যথিতচিত্তে দেখিলেন তিনি ভগ্নদেহে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কি গৌরবে, কি সমাদরে ভারতবাসী তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। সেই এক স্বর্গীয় দিন। ১৬ই সেপ্টেম্বরে কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় বলিতে গিয়া তিনি মূর্চ্ছা গেলেন—সেই দিন যে মূর্চ্ছা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, সেই রোগই তাঁহার কাল হইল। জীবনের শেষ দিনেও তিনি মূর্চ্ছা গেলেন, আর জাগিলেন না, আর চক্ষু মেলিলেন না—চিরনিদ্রায় অভিভূত, হইলেন। গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন বঙ্গবাসী কি দৃশ্য দেখিয়াছিল। জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত রোগশয্যায় শয়ান কর্ম্মবীর আনন্দমোহন ভক্তদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষীণ কম্পিত হস্তে, অতুল বিশ্বাসের সহিত স্মিতমুখে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। বাঙ্গালীর

জাতীয়জীবনের জন্মকথা ঘোষণা করিলেন! কি পূত সেই স্পর্শ! কি উন্মাদিনী সেই শক্তি! অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কি মনোহারিণী! কি বিষাদময়ী! বঙ্গবাসী সে দিন ভুলিবে না—সে দিনকার বাক্যহীন বক্তৃতার মত উন্মাদিনী বক্তৃতা বাঙ্গালী কখন শ্রবণ করে নাই। ধন্য আনন্দমোহন! ধন্য বঙ্গভূমি! সে দিনকার চিত্র মানসপটে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখ। আনন্দমোহনের অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্যম, গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের তুলনা নাই। সেই নির্ভীক স্বাধীনচেতা অক্লান্ত কর্ম্মবীরের তুলনা কোথায়?

ধর্ম্মসমাজে।

এতক্ষণ আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অবান্তর গুণ সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি সমাজসংস্কারক রূপে, শিক্ষাবিভাগে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু এ সকলকে আমরা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি বলিতে পারি না—তিনি বিধাতানির্দ্দিষ্ট জীবনের একমহান্ পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া জীবনের পথ পার্শ্বে এই সকল অবান্তর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। যে সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে নবযুগের আবির্ভাব করেন, সেই শুভক্ষণে যে সকল ধর্ম্মপিপাসু আত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন বসু একজন। তিনি পঠদ্দশায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন, তখন আনন্দমোহন বসু মহাশয় কায়মনোবাক্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এবং উক্ত মহাত্মার সহিত একই অর্ণবপোতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দ্বিগুণ, উৎসাহে ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বিধাতার আহ্বান শুনিয়া তিনি ধর্ম্মসমাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। সেই আহ্বান শুনিয়াই চিরদিন এই পথে চলিয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র সাধনার বস্তু, একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মের নির্দ্দেশ না বুঝিয়া তিনি একটী পাদবিক্ষেপ করিতেন না। মৎস্য যেমন জলে বিহার করে, খেচর আকাশে, আনন্দমোহনের ভগবদ্ভক্ত আত্মা সেই রূপ ধর্ম্মে বিহার করিত।

ব্রহ্মোপাসনায়, ধর্ম্ম প্রসঙ্গে, ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার যে আনন্দ, যে পরিতৃপ্তি, যে শক্তি স্ফুরিত হইত, এমন ত কিছুতেই হইত না। তাঁহার জীবনতন্ত্রীর যে সুমধুর মহান্ গীতি ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়া নীরব হইয়াছে। ধর্ম্মই সেই তন্ত্রীর বাদক যন্ত্র। নরচক্ষুর অগোচরে বীজ ভূমিতে নিহিত হয়। নরচক্ষুর অগোচরে তাহা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পুষ্পবান ফলবান বৃক্ষ সকলকেই মোহিত ও চমৎকৃত করে। ধর্ম্মবীজ গোপনে নরচক্ষুর অগোচরে আনন্দমোহনের ভক্তিমান হৃৎক্ষেত্রে পতিত হইয়া নরচক্ষুর অগোচরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছিলাম ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর আনন্দমোহন বসু। আমরা দেখিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষক সেবক আনন্দমোহন বসু। আমরা দেখিয়াছিলাম ধর্ম্মসংগ্রামে অপরাজিত আনন্দমোহন বসু। কি শক্তিতে আনন্দমোহন শক্তিমান হইয়াছিলেন, কি বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, কি সাহসে অকুতোভয় হইয়াছিলেন, কি সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা ভিন্ন কে জানে? ধর্ম্মের গৌরব যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বসুর ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিস্মৃত হইবেন না। এবং আনন্দমোহন বসুর হৃদয়তন্ত্রীর মহান্‌গীতি তিনিই যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধার্ম্মিক ভিন্ন ধর্ম্ম-গত-প্রাণ মহাত্মাকে কে বুঝিবে? ভক্তি এবং বিনয় আনন্দমোহন বসুর চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, যিনি দেখেন নাই তাঁহার আনন্দমোহনের চরিতরহস্য পাঠ করা হয় নাই।

১৩১৩ কার্ত্তিক *

আনন্দমোহন বসু।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু।

অদ্য আনন্দমোহন বসুর জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে প্রকটন করিবার সময় নহে। বিগত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে যে কার্য্যবহুল জীবন দেশের সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের সহিত অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া আপনাকে তাহার বিপুল তরঙ্গে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এ স্থলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাহা জীবনবৃত্তের জাতীয় ভাণ্ডারে ভবিষ্যদ্বংশীয়-গণের জন্য অনেক দিন হইল রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার যে চরিত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, অদ্য তাহারই সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ বিবৃত করিব।

আনন্দমোহন বসু মহাশয় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পদ্মলোচন বসু মহাশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দরিদ্র অবস্থা হইতে অচিরকালমধ্যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রগণের অপ্রাপ্তব্যবহার অবস্থায় তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তখন বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও পুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থার ভার তদীয় বিধবা দেবী উমাকিশোরীর স্কন্ধে পতিত হয় ; পতিবিয়োগের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি এই গুরুভার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও অতুলনীয় দৃঢ়চিতা সহকারে বহন করিয়াছিলেন। দেবী উমাকিশোরী পুত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "আপনার অতুল সম্পত্তি। সুতরাং পুত্রদের অধিক বিদ্যালাভের প্রয়োজন কি? পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে উহাই উহাদের যথেষ্ট।" কিন্তু ইঁহাদের জননী সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেমন অন্যসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং সমাধা করিয়াছিলেন, পুত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বাহিরের কাহারও পরামর্শ না লইয়া কেবল তাহাদেরই প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষালাভের উদ্দেশে প্রথম বার ইংলণ্ড যাত্রার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে প্রথমে এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরে যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, যে ইহাতে তাঁহার পুত্রের উত্তরোত্তর উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তখন আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

তিনি ধর্ম্মজীবনে অতিশয় উন্নত ছিলেন। স্বকীয় বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মাচরণে তাঁহার অবিচলিত আগ্রহ, অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি। বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির পর বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত তাঁহার সমুদয় সময় পূজা, ব্রতপালন, ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও তীর্থ পর্য্যটনে পর্য্যবসিত হইত। ধর্ম্ম মতে পুত্রেরা তাঁহা হইতে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সাতিশয় মনঃপীড়ার কারণ হইলেও তিনি তাঁহাদের স্বাধীনতার পথে কখনও অন্তরায় উপস্থিত করেন নাই। একদা কেহ তাঁহার সমক্ষে পুত্রদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "আমার পুত্রেরা বিধর্ম্মী কিসে? উহারা কি সুরাপায়ী? না পরদ্রব্যলোভী? না অসচ্চরিত্র? সাবধান! তাহাদের সম্বন্ধে এমন কথা আমার সম্মুখে উচ্চারণ করিও না. আমি তাহাদের ঈশ্বর পূজা ও ধর্ম্মে নিষ্ঠা দেখিয়াছি। আমার ধর্ম্ম অনুসরণ করে না বলিয়াই কি উহারা বিধর্ম্মী হইল?" তিনি পুত্রদের সর্ব্বদাই এই মর্ম্মে পত্র লিখিতেন, "যাহাই কর, ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও দেবতায় ভক্তি রাখিয়া করিবে।"

আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই মনস্বিনী জননীর হৃদয় ও আত্মার সমগ্র কমনীয় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মাতার আত্মার অনুপম সৌন্দর্য্য এতদুভয়ই তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্বরূপে মিলিত হইয়াছিল।

* স্বর্গীয় মহাত্মার শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

আনন্দমোহন ছয় বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও তাহার তিন বৎসর পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আঠার টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষার পাঁচ মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিন মাস তাঁহাকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল ; নতুবা তিনি নিশ্চয়ই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। পরবর্ত্তী পরীক্ষা সকলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষা দেন এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়. পর বৎসর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এম, এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে না। শুনিয়াছি, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক একদা তিনটী প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, "যে ছাত্র প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, বুঝিব, সে এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আর যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইবে।" আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর যে তিনটীরই উত্তর দিতে পারিবে?" অধ্যাপক হাসিয়া কহিলেন, "তাহা কেহ পারিবে না।" আনন্দমোহন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি পারে? অধ্যাপক বলিলেন, "যদি কেহ পারে, তবে সে আমার আসন গ্রহণ করিবে।' আনন্দমোহন অনতিবিলম্বে সকল প্রশ্নেরই উত্তর মীমাংসা করিয়া দিলেন। বি, এ পরীক্ষায় অঙ্কে তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, যে পরীক্ষকেরা তাহাতে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে এম, এ উপাধি প্রদান করিবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সভা সমক্ষে বিশেষ ভাবে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা [illegible] অধ্যাপক তাঁহাকে এমন সম্মান করিতেন, যে, গবর্ণর জেনারেল যখন একবার প্রেসিডেন্সী কলেজ দর্শন করিতে আসেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সাট্‌ক্লিফ্ তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আনন্দমোহন এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই মিঃ সাট্‌ক্লিফ্ তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। এই কার্য্য করিতে করিতে পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তির যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বীকৃত হন। এই বৃত্তির টাকা লইয়া আনন্দমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সেখানেও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে সকলকে চমৎকৃত করেন। সেখানে তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন শিখিতে হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি এই দুই ভাষা জানিতেন না। দুইটী নূতন ভাষা শিক্ষা করাতে অপর ছাত্রগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার বড়ই অসুবিধা ছিল। যাহা হউক, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া তিনি র‍্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হন। গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার অধ্যাপকগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন, যে আনন্দমোহন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। এমন কি, বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক ডেইলী নিউসে প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনিই প্রথম র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই গৌরবস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। আনন্দমোহন এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া কেবল যে স্বয়ং সম্মান লাভ করিলেন এমন নহে, কিন্তু চিরদিনের জন্য তাঁহার দেশবাসীকে বিদেশীয়গণের সম্ভ্রমে উত্থিত করিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার চিরসুহৃৎ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতায় প্রবাসপ্রত্যাগত বন্ধুকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন :—

সাধিয়ে অসাধ্য কাজ, সুযশে ভূষিত,
হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হইলে উদিত!

কি দিব তোমারে মোরা দীনহীন বেশে,
দীন হীন আছি দুখিনীর দেশে।
দুঃখিনী জনমভূমি প্রাণের সন্তান
দিলেন তোমারে পুনঃ নিজ কোলে স্থান।
তোমার সুযশ শুনি আজি ঘরে ঘরে,
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি বলে নারী নরে।
ধন্য তুমি, যার নামে উজল ভবন,
দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন!
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকার।
তার মত বঙ্গবাসী কিবা উপহার
দিতে পারে? তাই বলি, হৃদয় খুলিয়া
ঘরে এস বন্ধুবর! লই হে বরিয়া।
ঘরে এস, জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন,
যা আছে তোমারে সব করি সমর্পণ।
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন,
দিব তাহা। অশ্রু আছে করি বিসর্জ্জন।

ময়মনসিংহ অবস্থান কালে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প। ইহার পর তিনি যখন শিক্ষালাভের উদ্দেশে কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন, তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবানুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তরুণ যুবক আনন্দমোহন কলিকাতায় আসিয়া বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় এই ধর্ম্মের অগ্নিশিখায় আপনাকে আহুতি দেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ভাদ্র পূজ্যপাদ আচার্য্য পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অপর বিংশ যুবার সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে পবিত্র ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহা অনুশাসন তাঁহার জীবনে যেমন শক্তি বিস্তার করিয়াছিল, তদ্রূপ অন্যত্র দেখি নাই। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সামঞ্জসীভূত মিলন, যাহা ব্রাহ্মের উচ্চতম লক্ষ্য, তাহা ইঁহার জীবনে সত্য হইয়াছিল। মানবজীবনের গাম্ভীর্য্য এমন প্রগাঢ়রূপে উপলব্ধি করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি এই জীবন যে কি পবিত্র ও গম্ভীর নয়নে দেখিতেন, এবং ইহার প্রতি মুহূর্ত্ত ও শক্তি কিরূপ সতর্কতা ও নিষ্ঠা সহকারে ব্যয় করিতেন, তাহা যিনি তাঁহার সহিত একত্র বাস না করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব নহে। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তিনি আত্মোন্নতি সাধন এবং ঈশ্বর ও মানব-সেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যদি বলি, যে পাঁচ মিনিট কাল তাঁহাকে অসার গল্প, লঘু ব্যাপার, বৃথা আমোদ বা আলস্যে কাটাইতে দেখি নাই, তবে যাঁহারা তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছেন,তাঁহারা বলিবেন, ইহা আমার অত্যুক্তি নহে। যে দুরন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের শেষ দেড় বৎসর চিকিৎসকের আদেশে সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকে অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। তিনি রোগের যাতনা অম্লান বদনে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে বহন করিতেন, কিন্তু নিষ্কর্ম্ম জীবনের বোঝা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইত। শয্যার লুণ্ঠিত হইয়া বালকের ন্যায় অধীর ভাবে ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন, "এরূপ ভাবে দিন কাটাইতে হইবে ইহাই যদি চিকিৎসকের আদেশ, তবে আর কেন? ইহলোক হইতে ত্বরায় আমায় বিদায় দাও।" বাস্তবিক সময় অপব্যয় করিতে তিনি এমনই অবর্ণনীয় যাতনা অনুভব করিতেন।

আমরা আনন্দমোহন বসুকে তিন ভাবে দেখিয়াছি, স্বদেশসেবক, জ্ঞানান্বেষী ও ঋষি। ভারতের সর্ব্বত্র তিনি স্বদেশসেবক বলিয়া পরিচিত আছেন। সকলে ইঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক যুগপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে এক জন বলিয়া জানেন। কিন্তু অপর সকলের স্বদেশপ্রীতির সহিত ইঁহার স্বদেশানুরাগের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ ইঁহার মনশ্চক্ষে যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কাহারও নয়নে হইয়াছিল কি না জানি না। কঠোর সাধনায় যে সর্ব্বতোমুখীন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উচ্চ জীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে তিনি দেখিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ উন্নতিতে ভারতের কল্যাণ ; ইহার কোনটী ত্যাগ করিলে আমাদের মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলিতে পারি, যে আনন্দমোহন বসুতে বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনের পূর্ণতম বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমুদয় আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইতেছে, তাঁহাতে সে সমুদয়ের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই বিষয়ে তিনি যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়েরই যোগ্য বংশধর। সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসে এই জন্য তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার স্বদেশসেবা তাঁহার ধর্ম্মেরই অঙ্গ ছিল। উহা সঙ্কীর্ণ বা একমুখীন ছিল না, কিন্তু সর্ব্বতোমুখী ও উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার নিকট অবসর সময়ের ক্রীড়া বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের সুলভ উপায় অথবা নীতিনিরপেক্ষ বাগ্‌যুদ্ধ ছিল না। দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সমুদয় প্রয়াস তিনি গভীর নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় ভক্তিভরে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার নিকট রাজনৈতিক আন্দোলন পবিত্র ঈশ্বর পূজার অন্যতম আকার ধারণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি ইটালীয় স্বদেশসেবক ঋষিবর ম্যাটসিনির অনুরূপ ছিলেন। মান্দ্রাজ জাতীয় মহাসমিতিতে সভাপতিরূপে বৃত হইয়া তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বলিয়াছিলেন, ‘‘ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন।''* তাঁহার বক্তৃতাতে অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কোন কথা ছিল না ; কিন্তু ইহাতে এমন অবর্ণনীয় গাম্ভীর্য্য, এমন একাগ্র নিষ্ঠা ও স্বদেশসেবার এমন উন্নত ও উদার আদর্শ ছিল, যাহা সেই সম্ভ্রান্ত ইংরাজের মতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন আর কাহারও মনে প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা যাহাকে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলিয়াছেন, আনন্দমোহনের প্রকৃতি সেই শ্রেণীর ছিল। যাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, ‘‘দীনাত্মার: ধন্য'', আনন্দমোহন সেই শ্রেণীর দীনাত্মা ছিলেন। বিনয়, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা নম্রতা, ভক্তিপ্রবণতা ও ঐহিকসুখে নিস্পৃহতা তাঁহার আত্মার ভূষণ ছিল। সাধারণতঃ ঐহিক সম্পদ ও জীবনের অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনে অলক্ষ্যে এক প্রকার তেজের আবির্ভাব হয়, যাহাকে আমাদের দেশে রাজসিক ভাব বলে। আনন্দমোহন বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানব জীবনের স্পৃহনীয় সমুদয় সম্পদ ও উহার সকল শ্রেষ্ঠ সুখ অজস্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ; কিন্তু রাজসিকতা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত সৌম্যমূর্ত্তিতে রেখামাত্র পাত করিতে পারে নাই। তাঁহার ভাবভঙ্গী, সমুদয় সুশোভন মধুর বিনয়ে চিরঅলঙ্কৃত ছিল। দীনতম ব্যক্তিও তাঁহার নিকট সম্ভ্রম ও সমাদর প্রাপ্ত হইত। অতি বিরক্তি ও উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির হইতে শুনি নাই ; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাতে তেজের অভাব ছিল না। অন্যায়ের প্রতিবাদে ও উৎপীড়নের দমনে তাঁহার স্বভাবধীর সৌম্য মূর্ত্তিতে নিমেষমধ্যে ভীমের বল ও সিংহের তেজ যুগপৎ আবির্ভূত হইত। এইরূপ বিবিধ বিরোধী গুণের সমবায়ে তাঁহার উচ্চ চরিত্র গঠিত হইয়াছিলে।

সারা জীবন তিনি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তাহাতেই লিপ্ত ছিল না। রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ও তদুৎপন্ন ঘাত প্রতিঘাত সাধারণতঃ মানবকে গভীরতাশূন্য ও বহির্ম্মুখীন করিয়া তোলে, কিন্তু আনন্দমোহন কার্য্যের স্রোতে পড়িয়া কোন দিন তাহার খর প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ব্রত অক্ষুণ্নভাবে পালন করিয়াছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, বাহিরে প্রভূত যশ ও উত্তেজনার মাদকতার মধ্যে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ও

* আমি কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবশনে উপস্থিত ছিলাম। কোনটিতেই সভাপতির বক্তৃতা শুনিয়া কাহাকেও অশ্রুপাত করিতে দেখি নাই। কিন্তু মান্দ্রাজে স্বর্গীয় বসুমহাশয়ের প্রথম ও শেষ বক্তৃতায়, বিশেষতঃ শেষ বক্তৃতায়, শ্রোতৃবর্গ বাষ্পাকুললোচন হইয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলাম। তাই কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, ‘‘আমি যাইতে পারি নাই : কিন্তু যাহা হউক, এখানেও (অর্থাৎ কংগ্রেসমণ্ডপেও) ব্রাহ্মসমাজের কিছু কার্য্য করিলাম।'' শ্রীযুক্ত গোখলে কিছু দিন হইতে বলিতেছেন যে আমাদের স্বদেশহিতৈষণাকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পূত ও উন্নত করিতে হইবে। স্বর্গীয় বসুমহাশয়ের স্বদেশানুরাগ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। প্রবাসী সম্পাদক।

সমাজসংস্কারের চির ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে চিরদিন বাস করিয়াছেন, কিন্তু এ সকলের জন্য কোন দিন ধর্ম্মের সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। দীক্ষার দিন যে পবিত্র ধর্ম্মের টীকা তিনি ললাট পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একাগ্র সাধনা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃপণের সুবর্ণরাশি রক্ষার ন্যায়, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আচারপূত দেহমনে পবিত্র অগ্নি রক্ষার ন্যায় চিরদিন সযত্নে পালন করিয়া গিয়াছেন। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, সারাদিনের দুরন্ত শ্রমের পর গভীর রাত্রি জাগিয়া জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, তাহার আলোচনা ও ধ্যান ধারণা করিতেন। রাত্রি একটা বা দুইটার পূর্ব্বে তাঁহাকে শয়নাগারে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। এই জন্য আমরা স্বদেশসেবক আনন্দমোহনের অন্তরালে ব্রাহ্মধর্ম্মের চির নবীন শিষ্য ও সাধক আনন্দমোহনকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম।

আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাঁহার জীবনের স্থায়ী ভাব যে ঋষিত্ব, তাহা দর্শন করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার মধ্যে ছিল না। স্বভাবতঃ তাঁহার মন সুরম্য অট্টালিকা অপেক্ষা কুটীর, বিবিধ উপাদেয় ভোজ্যবস্তু অপেক্ষা হবিষ্যান্ন, এবং রাজা বা পদস্থ লোকের সঙ্গ অপেক্ষা তাঁহার ঈশ্বরপিপাসু ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গ অধিক ভাল বাসিত। বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল। প্রয়াস করিয়া স্বাভাবিক প্রবণতাকে সংযত করিয়া তাঁহাকে বাহ্য আড়ম্বর এবং মান ও খ্যাতির প্রখর দীপ্তির সমক্ষে আসিতে দেখিয়াছি। এ সকলের অপেক্ষা ভগবৎপ্রসঙ্গে পূরিত তপোবনের পর্ণকুটীরে বাস করিতে তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা তৃষিত হইত। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ ধর্ম্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। বাহিরের কেহ জানেন না তাঁহার আত্মা অনুক্ষণ কোন্ পুরে বাস করিত। আমি ইহা অনেকবার অনুভব করিয়াছি, যে এই পরিদৃশ্যমান জগতে তিনি যত সময় বাস করিতেন, ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে জগৎ, তথায় তিনি ততোধিক সময় যাপন করিতেন। তাঁহার প্রাণের নিভৃত কন্দর হইতে ঈশ্বরপ্রীতির জ্বলন্ত অগ্নি হোমশিখার ন্যায় অনুক্ষণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইত। ইহারই গুণে তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যে বিমল বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব অপর আত্মার পক্ষে কিরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল, যাঁহারা তন্মধ্যে বাস করিয়াছিলেন কেবল তাঁহারাই তাহা জানেন। ঋষিত্ব যদি জটাজুটধারণ, বিভূতি লেপন, ফল মূল ভক্ষণ ও অরণ্যবাসের নামান্তর না হইয়া অনুক্ষণ ঈশ্বরে অর্পিত আত্মার শান্ত ও সমাহিত অবস্থা হয়, তবে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা সর্ব্বাংশে সেই স্পৃহনীয় উপাধির যোগ্য ছিলেন। আপনার রুচি ও ইচ্ছা অনুসারে বাস করিবার সুবিধা পাইলেই তিনি ঋষির আচারে বাস করিতেন। এ নিয়মের অন্যথা তিনি কখনই হইতে দেন নাই।

১৮৯৮ খৃঃঅব্দে তিনি শেষ বার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউন হলে ১৬ই সেপ্টেম্বর যে মহতী সভা আহুত হয়, তাহাতে উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হন। তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ। ইহার পরবর্ত্তী আট বৎসর তাঁহাকে বহুবার জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত হইতে হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি পরলোকপ্রস্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ১৯০১ খৃঃঅব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যাইবার সময় জাতীয় মহাসভায় এই শেষ যোগদান বলিয়া পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বিগত ১৯০৫ খৃঃঅব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। রোগভগ্ন শরীরে এত দীর্ঘ সময় উৎসব ক্ষেত্রে থাকিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলে উত্তর করিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে মাঘের উৎসব সম্ভোগ, এই আমার শেষ, ইহার জন্য প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?" তৎপর দিন ১২ই মাঘ পীড়া সঙ্কটভাব ধারণ করিল, প্রলাপ অবস্থায় কেবল এই কথা, "মা আমায় ডাকিতেছেন, আমায় আর এখানে ধরিয়া রাখিও না।" সেই বর্ষের ১৬ই অক্টোবরের স্মরণীয় দিনে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পরিবারস্থ সকলের নিকট সস্নেহে

বিদায় লইলেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, সমুদয় অন্তিম দিন নিকটবর্ত্তী স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য এমন দিনে দিনে পলে পলে প্রস্তুত হইতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। বিগত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে যথারীতি ভোজন করিলেন, তাহার পর পরিজন সকলের সহিত সার্দ্ধ দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রফুল্ল মনে কথাবার্ত্তা কহিলেন। পত্নীর নিকট জীবনের ভ্রম প্রমাদ ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলেই তুমি সুরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। পর দিন প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, "প্রগাঢ় শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।" তাহাই হইল। ১২০ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় সূর্য্যের শেষ জ্যোতির সহিত তাঁহার আত্মাকে যখন ধীরে ধীরে এ জগতে অস্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন উদিত হইল, "এই কি মরণ?" তাহার পর,

জগত জননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষিয়ে।

১৩২০ শ্রাবণ

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন প্রচারক ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সাতিশয় স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। শেষ বয়সে যখন চলাফিরা অতি কষ্টে করিতে পারিতেন, তখনও তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও জ্ঞানে কম অগ্রসর, কেহ কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিলে তিনি তাহা মন দিয়া শুনিতেন। তিনি চিরজীবন দারিদ্র্যে, কখন কখন অনশনে, কালযাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিজ দুঃখ ও অভাবের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কাহারও দয়ার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার বাগ্মিতা, তর্কশক্তি এবং বিশদ ভাবে জটিল তত্ত্বও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তিনি নিজে যেমন ধর্ম্ম ও সমাজবিজ্ঞানাদির নিগূঢ় তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতেন, অপরকেও তেমনি বুঝাইতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞানে যেমন কোন অস্পষ্টতা ছিল না, ব্যাখ্যানেও তেমনি কোথাও দুর্ব্বোধ্যতা ছিল না। পরব্রহ্মের জ্ঞান মঙ্গলাদি স্বরূপের অস্তিত্ব তিনি যেরূপ যুক্তি ও দৃষ্টান্তাদি দ্বারা তাঁহার তিন ভাগ "ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়" প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক মার্টিনো প্রভৃতির গ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ত নহেই, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সব বহি ইংরাজীতে লিখিত হইলে ইউরোপেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইত। তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নব নব দর্শনতত্ত্ব অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আশ্চর্য্য রকম প্রবল ছিল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত তাঁহার বৃহত্তম গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় যে অতি অল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে, ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থে কেবল যে রাজার জীবনচরিত আছে তাহা নয়, ইহাতে তাঁহার রচিত সমুদায় গ্রন্থের সার মর্ম্ম আধুনিক বাঙ্গালায় প্রাঞ্জলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাজার জীবনের সমসাময়িক ঘটনা সমূহের বৃত্তান্ত এবং নানা বিষয়ে তাঁহার মতের আলোচনাও ইহাতে আছে। আমেরিকার বিখ্যাত একেশ্বরবাদী থিওডোর পার্কার মহোদয়েরও একখানি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন। তাঁহারও জীবনচরিত লিখনযোগ্য।

তিনি বহুবৎসর ধরিয়া প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, শেষ বয়সেও করিতেন। মানুষের আত্মা দেহত্যাগ করিবার পরও যে বিদ্যমান থাকে এবং ইহলোকবাসী মানবগণের সহিত জ্ঞানের আদানপ্রদান করিতে পারে তাহার অনেক বিস্ময়কর প্রমাণ তিনি দিতেন।

তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে সুগায়ক ছিলেন এবং ভগবৎভক্তি বিষয়ক অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

জীবনের প্রথম অংশে ভারত-সভার পক্ষ হইতে তিনি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নানাস্থানে অনেক রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৩২৩ মাঘ

স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সভ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিষয়বুদ্ধি, ও সাধুতা দ্বারা সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব নহে। তাঁহা অপেক্ষা অল্প শিক্ষা ও অল্প টাকার পুঁজি লইয়া তাঁহা অপেক্ষাও দরিদ্র অবস্থা হইতে এই বাংলাদেশেই তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক অর্থ অনেকে উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি বাল্যকালে কেবলমাত্র পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াও নিজের চেষ্টায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উন্নত আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সেই আদর্শ অনুসারে বহু পরিমাণে চলিতে পারিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে অনেকের মানসিক দৃষ্টি কুসংস্কার ও বৃথা ভাবুকতার কুহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সামাজিক নানা বিষয়ের সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার চিন্তা ও বিচার করিবার শক্তি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নূতন নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। অধুনা দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় নিজে বেশ বড় বড় লেখা ভিন্ন পড়িতে পারিতেন না ; সুবিধা হইলে অপরকে দিয়া

পড়াইতেন। "প্রবাসী" সম্বন্ধে শেষ কিছুদিন বলিতেছিলেন, "তোমরা বড় ফিকা কালীতে ছাপিতেছ।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণে তিনি প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। উপাসনায় তিনি এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে সুস্থ থাকিতে এক রবিবারও মন্দিরের উপাসনায় অনুপস্থিত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মবালক বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যেকাজে হাত দিতেন, তাহা খাড়া করিয়া তুলিতেন। এ বিষয়ে তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা ভ্রমণ পাঠ লিখন প্রভৃতি অতি নিয়মিত ছিল। জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত কোন কাজের বা হিসাবের বাকী বকেয়া রাখিয়া যান নাই। কাজের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ছিল। তিনি সমাজের সকল রকম কাজ করিয়া গিয়াছেন ; সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং শেষ পঁচিশ বৎসর সমাজের দাতব্য-বিভাগের ভার তাঁহার হাতে ছিল। ইহা তাঁহার অতি প্রিয় কাজ ছিল। দাতব্য ভাণ্ডার হইতে জাতিধর্ম্মবয়সনির্ব্বিশেষে কতকগুলি অসহায় লোক সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কখন কখন দেখা যাইত তিনি পথের ভিখারীকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছেন। শিশুরা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তাহাদের জন্য বিস্কুট, কুল, কমলালেবু, প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন ও তাহাদিগকে দিতেন। ইতর প্রাণীদিগকে আহার দেওয়া তাঁহার একটি প্রিয় কাজ ছিল। তাঁহার দুতলায় বারান্দাসংলগ্ন একটি তক্তায় পক্ষীদের জন্য প্রত্যহ অন্ন রাখিতেন। তাহা তাহারা আনন্দে ভোজন করিত। বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা যেমন বাড়ীর ছোটবড় সকলের খবর লাইয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ যথাসাধ্য সমাজের সকল বিভাগের নানা গৃহস্থের খবর লইয়া বেড়াইতেন।

১৩২৪ মাঘ

সাধক ও সেবক ইন্দুভূষণ।

প্রেমিক সাধক ও সেবক ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় গত পৌষমাসে ৬৫ বৎসর বয়সে গয়ানগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত বিখ্যাত লোক ছিলেন না। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চিনিতেন।

তিনি সংগীত ও কবিতা রচয়িতা কবি, ভক্ত সাধক, সুগায়ক, এবং দরিদ্র ও আর্ত্তের প্রেমিক নির্ভীক অক্লান্ত সেবক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "অঞ্জলী" সুন্দর কবিতাপুস্তক। তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে অনাসক্ত থাকায় ইহা দ্বিতীয় বার ছাপাইবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার "রসলীলা" ও "আনন্দলীলা"য় তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট গান আছে। "প্রকৃতির বাণী" নামক আর একখানি বহি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন ; উহা এখনও ছাপা হয় নাই।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় "দাসাশ্রম" নামক একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিরাশ্রয়, চিররুগ্ন, দুশ্চিকিৎস্যরোগগ্রস্ত লোকদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া ইহাতে রাখা হইত, এবং তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করা হইত। স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় সস্ত্রীক ইহার সেবকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এবং আন্তরিক অনুরাগের প্রেরণায় নির্ভয়ে প্রেমের সহিত আর্ত্তদের সেবা করিতেন। বাঁকীপুরে ও এলাহাবাদে তিনি অসঙ্কোচে কত কত প্লেগ-রোগীর সেবা করিয়াছেন, কখনও ভীত হন নাই। অন্য-রকমের উৎকট সংক্রামক রোগে পীড়িত লোকদেরও তিনি সেবা করিতেন। দুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সাহায্য ও সেবাও করিতেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জানিতেন, এবং অবৈতনিক চিকিৎসা করিতেন।

তিনি বিশ্বাসী ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখে ধর্ম্মসংগীত ও ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বিস্তর লোক উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার শেষ চিকিৎসক এইরূপ সন্দেহ করেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার কি বড় কষ্ট হইতেছে?" তিনি বলেন, "হাঁ, যেন তপ্ত খোলায় ভাজিতেছে।" "আপনি কি নাম ভুলিয়া যাইতেছেন?" "না, এখনও ভুলি নাই ; পরে বিধাতার কি ইচ্ছা হইবে, জানি না।"

স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আমরা বহুবৎসর একত্র এক পরিবারের মত বাস করিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট আমরা ও আমাদের সন্তানবর্গ স্নেহের ও স্নেহপ্রণোদিত উপকারের ঋণে আবদ্ধ। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে সংযত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতেন, যে, তিনি কোন অবস্থাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই, যে, তিনি আহ্বান শুনিয়াছিলেন, ও সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। যাঁহার অনুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেন নাই। এখন তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পাইবেন ; প্রেমিকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হইবে।

১৩২৫ পৌষ

ভাই উমানাথ গু

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম সহচর-ও-প্রচারকদলের অন্যতম প্রবীণ প্রচারক ভাই উমানাথ গুপ্ত সম্প্রতি অশীতিবর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অন্য অনেক ভাল জিনিসের মত, দেশহিতকর সস্তা বাংলা খবরের কাগজ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কেশবচন্দ্র সেন। এই কাগজের নাম সুলভ সমাচার। বাল্যকালে আমরা ইহা পাঠ করিতাম। অতি উপাদেয় বোধ হইত। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভাই উমানাথ গুপ্ত।

আসল ও প্রথম সুলভ সমাচার বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে। হয় ত বলা দরকার যে

কয়েক বৎসর আগে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সুলভ সমাচার নামে যে কাগজ কিছুদিন বিতরিত হইয়াছিল, তাহা কেশবচন্দ্রের সুলভ সমাচার নহে।

১৩২৬ আষাঢ়

বীরেশলিঙ্গাম্ পাণ্টুলু।

সমুদ্রের উপকূলে বাংলাদেশের দক্ষিণে ওড়িশাদেশ, তাহার দক্ষিণে অন্ধ্রদেশ। ভাষা তেলুগু। এই দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বীরেশলিঙ্গাম্ পাণ্টুলুর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নানাদিকে অন্ধ্রদেশের উন্নতির মূলীভুত ছিলেন। তাঁহাকে লোকে অন্ধ্রদেশের বিদ্যাসাগর বলিত। তিনি ধনী লোক ছিলেন না, পণ্ডিতী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বাংলাদেশে যেমন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাকে ক্রমে ক্রমে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়াছেন, বীরেশলিঙ্গাম্ সেইরূপ তেলেগুভাষা ও সাহিত্যকে গড়িয়াছেন। দশ ভল্যুমে তাঁহার নানাবিধ গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।

তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য এবং সামাজিক পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বহুসংখ্যক বিধবা তাঁহার চেষ্টা ও ব্যয়ে পুনর্ব্বিবাহিত হইয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী এরূপ শক্তি ও সাহসের সহিত চালিত হইত যে অনেক ধনী ও উচ্চপদস্থ লোকেও তাঁহাকে ভয় করিত। তিনি পণ্ডিতী করিয়া ও স্বরচিত পুস্তক বিক্রয় করিয়া, যে টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিজের সামান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, অবশিষ্ট টাকা বিদ্যালয় স্থাপন, টাউনহল নির্ম্মাণ, উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ, অনাথালয় স্থাপন, অবনত জাতি-সকলের উন্নতির চেষ্টা, হিতকারিণী সভা স্থাপন ও পরিচালন, প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহার তেলুগুভাষী স্বদেশীয় লোকেরা নানা স্থানে সভা করিতেছেন।

১৩২৭ কার্ত্তিক

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ভুবনমোহন কর।

দিনাজপুরের প্রাতঃস্মরণীর দরিদ্রসেবক পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় নব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যহ শতশত লোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ আসিত। তিনি বিনামূল্যে সকলকে ব্যবস্থা ও ঔষধ দিতেন। দিনাজপুরে তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী লিখিয়াছেন—

তাঁহার ঋষিকল্প জীবন ও অশ্রান্ত লোকসেবা তাঁহাকে এরূপ সর্ব্বজনপূজ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র যাবতীয় আফিস, কাছারী, বিদ্যালয় তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ করা হয়, দিনাজপুরের মহারাজা ১৭টি ফুলের তোড়া একদল কীর্ত্তনকারী পাঠান, সকল শ্রেণীর দুইসহস্রাধিক লোক শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহায় মৃতদেহ সহরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করান, গবর্ণমেণ্ট হইতে মিলিটারী গার্ড অব্ অনার প্রদর্শিত হয়, ইউরোপীয় জজ ও পুলিস সাহেব পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিয়া শ্মশানঘাটে গমন করেন! অথচ সংসারের ধন, মান, বিদ্যা বা পদের গৌরব তাঁহার কিছুই ছিল না। একমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মজীবনই তাঁহার সকল প্রতিপত্তির মূল। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার স্থান শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

১৩২৮ পৌষ

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

"জীবজন্তু" নামক বালকবালিকাদের পাঠ্যগ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ৫৫ বৎসর বয়সে আকস্মিক মৃত্যুতে বালকবালিকারা একজন স্নেহশীল বন্ধু হারাইলেন। তিনি 'সখা ও সাথী' হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহু মাসিক পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধদের জন্যও লিখিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুবিস্তৃত ছিল, জ্ঞানপিপাসাও খুব বেশী ছিল। তিনি এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এবং ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া একবার কুলির বেশে আসাম চা-বাগানে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। ঢেন্‌কানাল রাজ্যে তিনি বহুবৎসর দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সদা প্রফুল্লচিত্ত ও তেজস্বী লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময় ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীর চালকদের সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

১৩২৯ কার্ত্তিক

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি বিশ্বভারতীর অর্থসচিব ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহুবৎসর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সামাজিকতা ও আথিতেয়তার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ ভালবাসিতেন। তিনি যদিও বহুবৎসরব্যাপী অনভ্যাস বশতঃ চলাফিরা সামান্যই করিতেন, তথাপি তাঁহার আরামকুর্‌সীতে বসিয়াই

শান্তিনিকেতন পল্লীর সকলের খবর লইতেন এবং সংবাদ পাইবামাত্র যাহার যাহা আবশ্যক তাহার বন্দোবস্ত করিতেন। আমরা যতদিন ঐ পল্লীতে ছিলাম তাহার মধ্যে কখনও কোন অসুবিধা হইলে যদি তাঁহাকে না জানাইতাম, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত যে মেলা হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য ও তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন।

১৩৩১ মাঘ

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশী বৎসরের অধিক বয়সে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের প্রাচীনতম সমাজসেবকের তিরোভাব ঘটিল। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ছিলেন। স্থাপন-কাল-অবধি উহার সভ্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মিলনক্ষেত্ররূপে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" স্থাপন করেন। তাঁহার প্রবীণ বয়সে স্থাপিত "দেবালয়"কে ঐ সাধারণ ধর্ম্ম-সভারই পরিণতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি "দেবালয়"কে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি অর্পণ জীবিতকালেই করিয়াছিলেন। যৌবনকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভূমির হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার-নিবারণ, শ্রমজীবীদিগের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা, ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন, হিন্দু বাল-বিধবাদিগের শিক্ষা ও বিবাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রমজীবীদিগের জন্য তিনি "ভারত শ্রমজীবী" নামক একখানি সংবাদ-পত্র স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বরাহনগর হিন্দু বিধবা-আশ্রমে বহুসংখ্যক বিধবা শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে সদুপায়ে উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং যে কুড়ি বৎসর ঐ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, তাহার মধ্যে চল্লিশটি বিধবার তিনি বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন, এবং রোগে ও বার্দ্ধক্যে একান্ত অক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অনলসভাবে কোন-না কোন কাজ করিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ও তাহার অধ্যক্ষ সভার ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নানাভাবে উক্ত সমাজের ও দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি অনেক শোক পাইয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকায় তিনি কখনও শোকে অভিভূত হন নাই

১৩৪৬ ফাল্গুন

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিকী

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি তথাকার কলের শ্রমিকদের সকল প্রকার দুঃখদুর্গতি মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রমিকেরা যাহাতে কলের মালিকদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত বেতন পায় এবং যাহাতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহার চেষ্টা তিনি করিতেন। সেই চেষ্টা যাহাতে সফল হয়, তাহার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাদিগকে একঘেয়ে কঠোর শ্রম করিতে হয়, কোন প্রকার নেশা করিয়া একটু আরাম ও আমোদের লালসা তাহাদের প্রবল হয়। এই কারণে কলকারখানার শ্রমিকরা অনেকে মদ খাইতে অভ্যস্ত হয়। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরের শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস নির্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, অন্য সকল রকমেও তাহাদিগকে সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন। তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, লাইব্রেরি ও ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সঞ্চয়ী করিবার নিমিত্ত সেভিংস ব্যাঙ্ক খুলিয়াছিলেন, এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি "ভারত শ্রমজীবী" নামক একখানি মাসিক কাগজ ছাপাইতেন ও সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তাহার অনেক হাজার গ্রাহক হইয়াছিলেন—কেহ বলেন ৮। ১০ হাজার কেহ বলেন ১৫ হাজার। তখনকার কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়েও শ্রমজীবীদের জন্য ওরূপ মাসিক পত্র নাই।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যই চেষ্টা করেন নাই ; বিধবা নারীদের হিতার্থও নিজের শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য আশ্রম স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাতে স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন, তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের বিবাহের চেষ্টাও করিতেন।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। সমুদয় ধর্ম্মের সত্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "দেবালয়" নামক ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য পরিচালিত হয়।

তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী কলিকাতায় ও বরাহনগরে গত মাসে অনুষ্ঠিত

১৩৩৩ বৈশাখ

স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলাত গিয়া সিবিল সার্বিসের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি নানা সরকারী কাজ খুব যোগ্যতার সহিত করিয়া রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য, আবগারী কমিশনার ও উড়িষ্যাবিভাগের কমিশনর হন। যোগ্যতা অনুসারে এবং প্রবীণতম সিভিলিয়ান বলিয়া তাঁহাকে বাংলাদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাট করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় বলিয়া গবর্মেণ্ট এতটা ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে সরকার লাটসাহেব না করিয়া মাছধরা বিভাগের কর্ত্তা করিয়াছিলেন! পরে তাঁহাকে লণ্ডনে ভারতসচিবের কৌন্সিলের সদস্য করা হইয়াছিল। এই কাজ তিনি এরূপ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন, যে, লর্ড মর্লী ভারতসচিবরূপে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পেন্স্যন লইবার পর গুপ্ত মহাশয় ভারতীয় সৈন্যদল সম্বন্ধে যে এশার কমিটি (Esher Committee) বসিয়াছিল, তাহার সভ্য হইয়াছিলেন, এবং উহার অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্টে সায় না দিয়া স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিলেন।

তিনি অনেকের নিকট তাঁহার এই মত বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, ভারতীয়েরা সৈনিক বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত না হইলে এবং সৈন্যদল আগাগোড়া ভারতীয় না হইলে, ভারতবর্ষ প্রকৃত আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে, কখনও ইহা বলা চলিবে না।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচারও অন্যান্য কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে উহার প্রতি নিজের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

১৩৩৯ মাঘ

হেমচন্দ্র সরকার

ডক্টর হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, ভি-ডি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি সাধনায় এবং সমাজহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর বাংলা ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি তাঁহার অনুরাগ উৎসাহ ও পরিশ্রমে উপকৃত হইয়াছিল। এখন এই সমিতি প্রায় সাড়ে চারিশত বিদ্যালয় চালাইতেছেন। তাহাতে সকল জাতের ছেলেমেয়েরা পড়ে। হেমবাবুর মত অনন্য সৎকার্য্যনুরাগ ও কর্ম্মোৎসাহ আমি অল্পই

দেখিয়াছি। কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল তিনি দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। অথচ তিনি এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। জীবনের শেষ ছয় বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছিলেন, রোগ বশতঃ তাঁহার কথা প্রায় বুঝা যাইত না, এবং তিনি কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার কাজের বিরাম ছিল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তিনি এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও চৈতন্যদেবের জীবনচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হেমবাবু অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যাবিষয়িনী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যদিও খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না, তথাপি তাঁহার জ্ঞানবত্তা এবং ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজহিতসাধনে উৎসাহের জন্য আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের মীডভিল্ তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষায়তন তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব্‌ডিভিনিটি ("পরমার্থতত্ত্বের আচার্য্য") উপাধি প্রদান করেন।

ললিতমোহন দাস

ললিতমোহন দাস মহাশয় দীর্ঘকাল সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে যখন বাংলা দেশে স্বদেশী পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বর্জ্জনের নিমিত্ত প্রবল আন্দোলন হয়, তখন তিনি একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। এই আন্দোলন দমনের জন্য যে-সকল সরকারী উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, যে-সব লোক রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন, তাঁহারা—সরকারী ত নহেই—বেসরকারী শিক্ষালয়সকলেও শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাজ করিতে পারিবেন না। ললিতমোহন দাস মহাশয় দরিদ্র হইলেও শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু রাজনীতির সংশ্রব ছাড়িলেন না। কংগ্রেসের সহিত তিনি বরাবর যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যখন কংগ্রেস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন, তিনি তখনও উহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলেন, এবং তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উহার প্রেসিডেন্টের কাজও তিনি কিছু দিন করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহাকে কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছিল। "সঞ্জীবনী"র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত বহু বৎসর তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি বরিশালের সেবা সমিতির অন্যতম নেতা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অতি শ্রদ্ধাভাজন অন্যতম আচার্য্য ছিলেন।

১৩৪১ ভাদ্র

প্রতুলচন্দ্র সোম

প্রতুলচন্দ্র সোম মহাশয় বিখ্যাত লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারে'র সম্পাদকরূপে ভারতবর্ষের, বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের একজন নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন। তিনি উত্তম বাংলা ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। দর্শনের ধর্ম্মতাত্ত্বিক অংশের, রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মমত বিষয়ে এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসনীয় জ্ঞান ছিল। তিনি ভক্ত সাধক ছিলেন। যত দিন সুস্থ শরীরে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য করিতে পারিয়াছিলেন, তত দিন চিন্তাশীলতা ও স্বাধীনচিত্ততার সহিত নিজের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

১৩৪৩ মাঘ

বিপিনবিহারী সেন

ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জননায়ক, ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় গত ৮ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১টার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। তিনি দরিদ্রের মাতাপিতা-স্বরূপ ছিলেন। কত দরিদ্র রোগী যে তাঁহার নিকট হইতে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছে, কত অনাথ ছাত্র যে তাঁহার গৃহে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাই আজ ময়মনসিংহের ঘরে-ঘরে শোকের হাহাকার উঠিয়াছে। তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বহুকাল ময়মনসিংহ কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন এবং যথেষ্ট সম্মানের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্যকে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকে অবহেলা করেন নাই। স্থানীয় সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতই তিনি সংসৃষ্ট ছিলেন। ময়মনসিংহে অল্পদিন পূর্ব্বে যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন ইহার প্রতিরোধের জন্য অসুস্থ দেহেও দিবারাত্র তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনেকের অনুকরণীয়। তিনি নয় বৎসরকাল ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে শহরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল কৌন্সিল অব মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশনের নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। পরলোকগমনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ম্মবীর সাধুপুরুষ পরলোকে চলিয়া গেলেন।

১৩৪৪ ফাল্গুন

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

অশীতি বৎসর বয়সে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের তিরোভাবে বঙ্গদেশ এক জন ভক্তিভাজন ও সুদক্ষ শিক্ষক হারাইল। শিক্ষক হইবার যোগ্যতা তাঁহার সকল দিক দিয়াই ছিল। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য। এই সাহিত্যে তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। যে-সকল পুস্তক তাঁহাকে পড়াইতে হইত, তাহার মধ্যে কঠিনতম পুস্তক ও গদ্য বা পদ্য রচনাগুলির চিন্তা ও ভাবের গভীরতম প্রদেশে তিনি ব্যাখ্যার দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিতেন। আমি আধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমাকে অবস্থাচক্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে পড়িতে হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দুটি কলেজে বাঙালী, ইংরেজ, এংলোইণ্ডিয়ান, এবং ইংরেজ নহেন এরূপ ইউরোপীয়, কয়েক জন যোগ্য ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের সকলের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে চাই, যে, গভীর ভাব ও চিন্তার ব্যাখ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কোনও অধ্যাপকের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কোন্ বাক্যে কোন্ শব্দটির ঠিক্ অর্থ কি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে তিনি বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। এই জন্য ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে তিনি প্রায়ই বড় বড় অভিধান দেখিতেন। তিনি মনোজ্ঞ ও বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। যাহা লিখিতেন তাহাতে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্যও লক্ষিত হইত। কথিত আছে, তিনি এমার্সন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া গ্রিফিথ প্রাইজ পান, তাহার বস্তু ও ভাষার উৎকর্ষ এই সন্দেহের উদ্রেক করে যে, তাহা হয়ত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের লেখার হুবহু নকল। সেই জন্য এমার্সন সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পুস্তক আনাইয়া দেখা হয় নকল কিনা। কোথাও প্রবন্ধটির কোন অংশ না-থাকায় প্রবন্ধটি পুরস্কৃত হয়। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না। তাহা সীল-করা স্বতন্ত্র খামে ছিল। প্রবন্ধ পুরস্কৃত হইবার পর তাহা জানা যায়।

আদর্শ শিক্ষক হইতে হইলে শুধু জ্ঞান থাকিলে ও শিক্ষাদাননৈপুণ্য থাকিলেই চলে না। শিক্ষকের চরিত্র নির্মল হওয়া আবশ্যক, এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহা হইতে ছাত্রেরা অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারে। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় এরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

তিনি সুনীতির কঠোর ও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। অন্য দিকে, তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানিতেন তাঁহার হৃদয় কিরূপ কোমল ও পরদুঃখকাতর ছিল, তিনি কিরূপ স্নেহশীল ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি।

সুনীতি ও সুরুচির প্রতি যাঁহাদের সমধিক দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা অনেকে সৌন্দর্য্যের প্রতি বীতরাগ হইয়া থাকেন। হেরম্বচন্দ্র সেরূপ ছিলেন না। প্রকৃতিতে, মানুষে এবং মানুষের রচিত ও

সৃষ্ট সমুদয় বস্তুতে, সাহিত্যে চিত্রে স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে, সৌন্দর্য্যের তিনি চির-অনুরাগী ও রসগ্রাহী ছিলেন।

তিনি স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। এই কারণে সরকারী শিক্ষাবিভাগে ভাল কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও অন্যায় ও অত্যাচার দেখিলে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে, অসহযোগ-আন্দোলনের গোড়ার দিকে, কলেজ ষ্ট্রীট ও হারিসন রোডের মোড়ে কতকগুলা সৈনিককে অকারণ পথিকদিগকে আঘাত করিতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং তাহার ফলে নিজেও লাঞ্ছিত হন। ইহা তখনকার গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশের গোচর হওয়ার গবর্ণর তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

মৈত্রেয় মহাশয় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। "সঞ্জীবনী"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন। আগেকার আমলের কংগ্রেসে বহুবার প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগ দিয়াছিলেন এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসম্পর্কে প্রায়ই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইত। তাঁহার এই সব বক্তৃতা কংগ্রেসের ভাল ভাল বক্তৃতার মধ্যে পরিগণিত হইত। তাঁহার ধর্ম্ম ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতাগুলি চিন্তার গভীরতা, ভাষার লালিত্য এবং অধ্যয়নের ব্যাপকতার পরিচয় দিত।

তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ মর্ম্মস্পর্শী হইত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, পরীক্ষক, এবং সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে তাহার সহিত তিনি বহু বৎসর যুক্ত ছিলেন ও তাহার সেবা করিয়াছিলেন। এক বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে নিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাত গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থও ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ আদৃত হইয়াছিল।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের দীর্ঘকাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে আমি সম্পাদকতা শিখিয়াছিলাম।

তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি অপরের শোককে নিজের শোক করিয়া লইতেন। পারিবারিক শোক ব্যতীত যে ঘটনা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ দিয়াছিল, তাহা সিটি কলেজের ছাত্রদের বহু বৎসর আগেকার সেই আন্দোলন যাহা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাবে প্রবল হইয়া কলেজটিকে প্রায় বিনষ্ট করে।

তাঁহার অনেকগুলি ইংরেজী রচনা পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। তিনি সবগুলিকে ভাল করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া অনবদ্যরূপে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

জীবন-ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়, সংখার-যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়। দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক, জরা-আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক। নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

২ রা মাঘ ১৩৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪৪ কার্ত্তিক

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনকাল হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দীর্ঘকাল এই সমাজের সম্পাদক ও আচার্য্যের কাজ তিনি করিয়া-ছিলেন। তিনি বহু বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি "অভিব্যক্তিবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। নূতন গবেষণার ফলে অভিব্যক্তিবাদ এখন যেআকার ধারণ করিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার ঐ বহিটি সংশোধন করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিলে বঙ্গীয় পাঠকসমাজের উপকার হইবে। আমরা যত দূর জানি, বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ে ঐরূপ বহি আর নাই।

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ক্ষিতীন্দ্রবাবু যখন হাবড়া মিউনিসিপালিটির সম্পাদক ছিলেন তখন ঐ পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

১৩৪৮ অগ্রহায়ণ

খাসিয়া পাহাড়ে যুগপ্রবর্তক নীলমণি চক্রবর্ত্তী

খাসিয়া পাহাড়ে যুগপ্রবর্তক মানবহিতৈষী নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আধ শতাব্দী পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। চেরাপুঞ্জী তাঁর কাজের কেন্দ্র ছিল। পৃথিবীর সকলের চেয়ে অধিক বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জী বিখ্যাত। উঁচু পাহাড়েও জায়গা, তার উপর বৃষ্টি সুতরাং এখানে সম্বৎসর শীত লেগেই থাকে।

নীলমণি বাবু যখন খাসিয়া পাহাড়ে যান, তখন সেখানকার ভাষা কিছুই জানতেন না। খাসিয়ারা তাদের কোন নিজস্ব বর্ণমালা ও সাহিত্য অতীত কাল থেকে পায় নি। খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা রোমান অক্ষর প্রচলিত করেন এবং তাঁদের ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও ঐ অক্ষরে ছেপে প্রকাশ করেন। নীলমণি বাবু খাসিয়াদের ভাষা শিখে ঐ ভাষায় অনেকগুলি ভগবদ্বিষয়ক বাংলা সংগীত অনুবাদ করেন এবং গদ্য পুস্তক পুস্তিকাও অনেকগুলি ছেপে প্রকাশ করেন। পরে খাসিয়া লেখক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত জীবন রায় ও তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়কে উৎসাহিত ক'রে তাঁদের সাহায্যে খাসিয়া সাহিত্য গ'ড়ে তোলেন। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে খাসিয়াদের ভাষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, নীলমণি বাবুর চেষ্টা তার মূলে। তিনি খাসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী ছাড়া আরও অনেকগুলি জায়গায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। সেগুলির কাজ চলছে। অনেক খাসিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করেছে। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হন নি। খাসিয়াদের নানা কুসংস্কার বিনষ্ট করবার চেষ্টা তিনি ক'রেছিলেন এবং তাদের মধ্যে দুর্নীতির

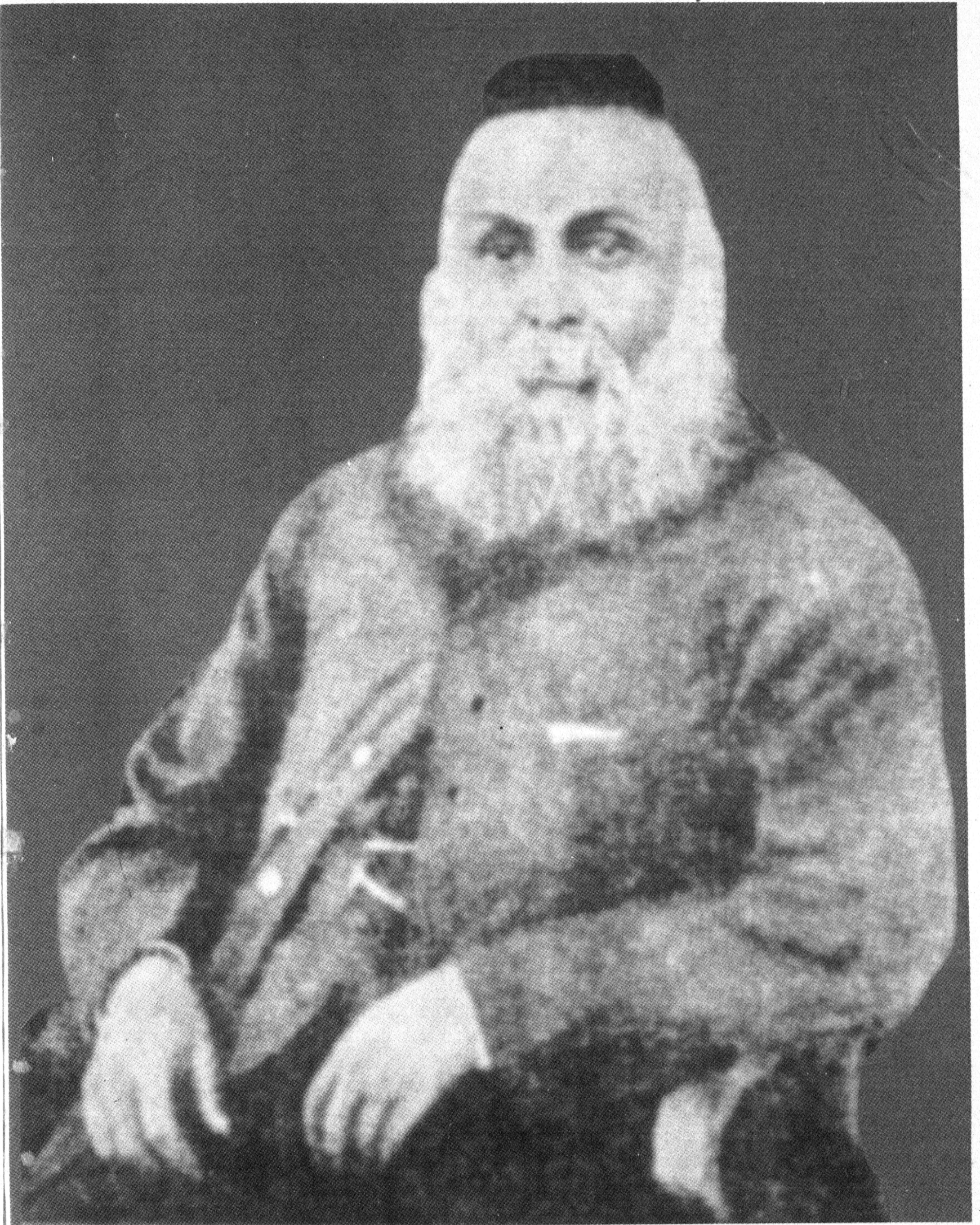
পরিপোষক অনেক কুপ্রথা ও কুঅভ্যাস উন্মূলনের চেষ্টা ক'রে বহু পরিমাণে সাফল্য লাভ ক'রেছিলেন। এদের মধ্যে মদ্যপান খুব প্রচলিত ছিল। গাঁজা ও আফিঙের চলনও খুব ছিল। তাতে তাদের নানা রোগ হ'ত এবং নানা দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ছিল। আফিং ও গাঁজার বে-আইনী আমদানীও এরা করত। দেশী সিপাইদের কাছ থেকে এরা জুয়াখেলা শেখায় তাতেও এদের খুব অনিষ্ট হ'তে থাকে। নীলমণি বাবু এই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর চেষ্টায় মদ্যপান অনেক কমে গেছে এবং বেআইনী গাঁজার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। জুয়াখেলাও আর তত বেশী হয় না। এই সব কারণে খাসিয়াদের নৈতিক উন্নতি হয়েছে।

সদুপায়ে যাতে খাসিয়াদের আয় বাড়ে তার জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন। তাঁর লেখা ''আত্মজীবনস্মৃতি'' তে এই সকলের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। দৈনিক ''ভারত'' তাঁর লেখা থেকে নিচের বাক্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন।

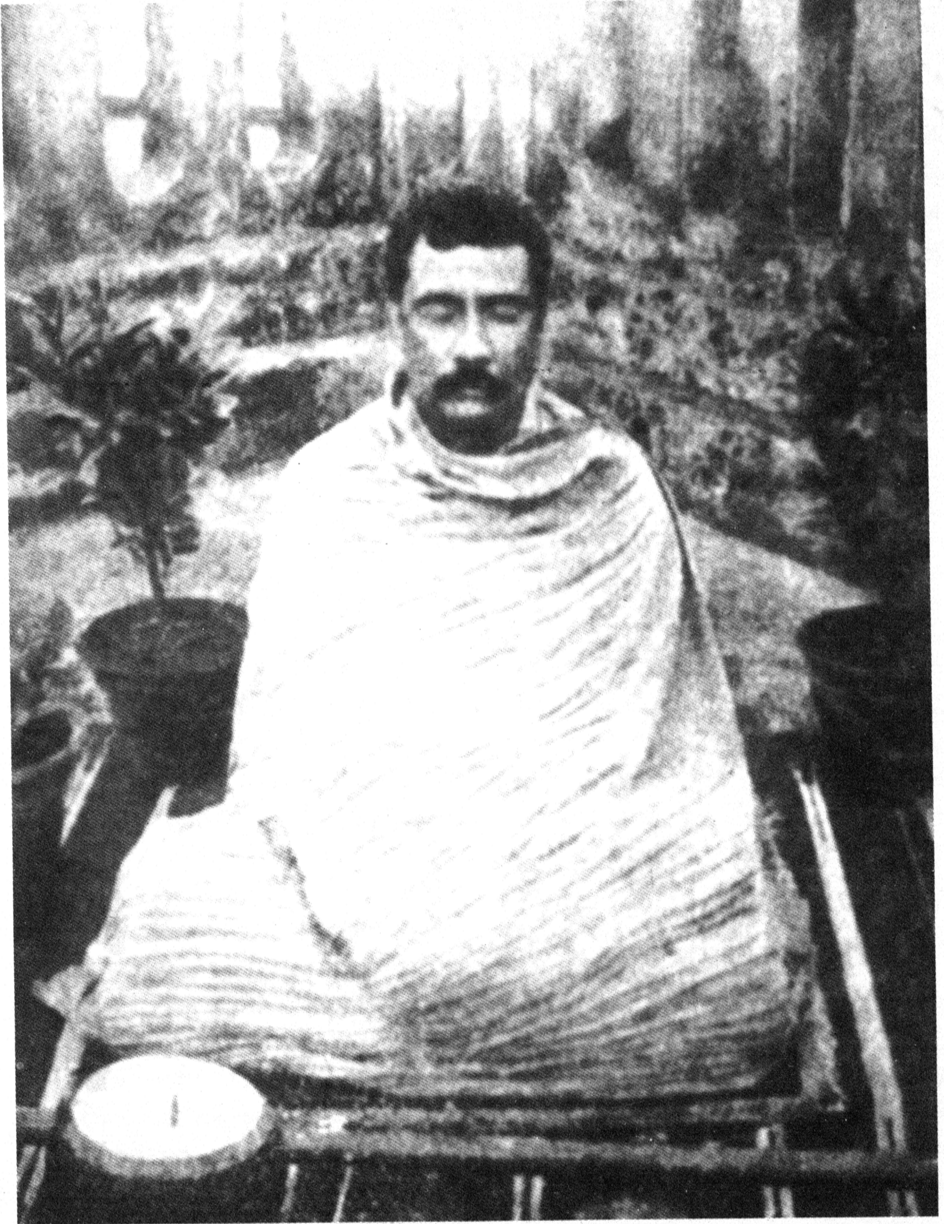
''খাসিয়া জাতির উন্নতির জন্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কৃষি বিভাগের সহকারিতায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছি. আলুর নূতন প্রকারের বীজ প্রথমে বিতরিত এবং পরে বিক্রীত হওয়াতে কৃষকগণ উন্নত প্রণালীতে আলুর চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে। বৰ্দ্ধন নামে একজন খাসিয়া আমার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া প্রথমে এরারুট প্রস্তুত করিয়া ও পরে 'লেমন গ্রাস অয়েল' প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিল জয়কৃষ্ণ নামে এক খাসিয়া রাজসাহী হইতে রেশমের চাষ শিখিয়া আসে। যে কফি পূর্ব্বে সাত আট টাকা মণ বিক্রয় হইত, আমার চেষ্টায় কলিকাতার সওদাগরদিগের নিকট এক্ষণে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা মণে বিক্রয় হইতেছে।''

নীলমণি বাবু জুতা মেরামতের জন্য মুচির কাজ করতে নিজে শিখেছিলেন এবং স্বয়ং জুতা মেরামত করতেন। ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ প্রভৃতিও তিনি জানতেন ও করতেন। খাসিয়া পাহাড়ে যাবার আগে তিনি রাঁধতে জানতেন না। সেখানে তাও করতে হয়েছিল। বাংলার যে ''জুতাসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ'' প্রবাদবাক্য আছে নীলমণিবাবুর জীবনে তার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এক দিকে যেমন জুতা মেরামত এবং অন্যান্য সামান্য কাজ তিনি জানতেন ও করতেন, তেমনি আবার ভগবানের নাম গান, তাঁর আরাধনা, তিনি করতেন, ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দিতেন ; নিজে সাহিত্য রচনা করতেন ও অপরকে সেই কাজে উৎসাহিত করতেন। তিনি বিবাহ করেন নি ; চিরকুমার, আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বিরাশী বৎসর বয়সে গত ৩০শে অক্টোবর তিনি চেরাপুঞ্জীতে দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর ''আত্মজীবনস্মৃতি'' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।



নীলমণি চক্রবর্তী



গিরিডি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির
প্রতিষ্ঠাতা ঁঅমৃতলাল ঘোষ

১৩৩৫ ভাদ্র

ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। এই শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ কি কাজ করিয়াছেন, তাহা সকল ভারতীয়দিগের ও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তনীয় ও স্মর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেশে ব্রাহ্মদিগের যে প্রভাব ছিল, এখন তাহা হ্রাসের, কারণ কি তাহাও চিন্তনীয়। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মেরা আগেকার ব্রাহ্মদিগের ন্যায় হিতসাবন কেমন করিয়া করিতে পারেন, এই উৎসবে ব্রাহ্মেরা বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা করিলে এবং সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তদনুসারে কাজ করিলে সুফল হইবে।

১৩৪১ চৈত্র

গিরিডির বিবিধ প্রতিষ্ঠান

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে কিরূপে গিরিডিতে লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিলেন, তাহার বিশদ ইতিহাস দিতেছি।

গিরিডি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ৺তিনকড়ি বসু মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগে তাঁহারই পচম্বাস্থিত বাটীতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহা পচম্বা ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইত। তিনকড়ি বাবু যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল। সমাজ-প্রতিষ্ঠার সময়ে গিরিডিতে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এক জনও ছিলেন না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মকতপুরা নামক স্থানে পচম্বার তৎকালীন টীকাইৎ ৺সিদ্ধনাথ সিংহ মহাশয় প্রদত্ত নিষ্কর জমির উপর একটি ক্ষুদ্র কাঁচা মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হয়। সমাজের স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৺আনন্দমোহন বসু, ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺তিনকড়ি, বসু, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি অছিমণ্ডলী (Board of Trustees) গঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা পরে স্বর্গগত হইলে ৺ভি. রায়, ডি-এল ও শ্রীযুত শশীভূষণ বসু, এম্-এ মহাশয়েরা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হন। এতাবৎ ৺তিনকড়ি বাবুর হস্তে সমাজ-সংক্রান্ত সকল কার্য্যের ক্ষমতাই অর্পিত ছিল। তাঁহার এই গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৺ভি. রায়, মিঃ পি. এন্. দত্ত (পার্ব্বতীচরণ দত্ত), ৺তিনকড়ি বসু, ৺ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৺রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺উমেশচন্দ্র নাগ, এই সাত জনকে লইয়া প্রথম একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করা হয় ও শেষোক্ত দুই জন যথাক্রমে উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। উক্ত সভ্যগণের মধ্যে মিঃ পি. এন. দত্ত ও শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত আছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন কাঁচা মন্দিরগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া প্রায় চারি

সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হয়। অর্থসাহায্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলেও কিয়দংশ ৺তিনকড়ি বসু, ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ও ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতেও পাওয়া গিয়াছিল। এই মন্দিরের সুপ্রশস্ত উপাসনাগৃহে প্রায় দুই শত ব্যক্তি সমবেত ভাবে উপাসনা করিতে পারেন। প্রতি রবিবারে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। উনিশ-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে গিরিডিতে দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল প্রায় সাতচল্লিশ জন ; বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় সত্তর জন। উপাসনাগৃহে বিজলী আলোকের বন্দোবস্ত হইলে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। এ-বিষয়ে গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীরা চেষ্টিত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস মহাশয় পূর্ব্বে সব্‌জজ্ ছিলেন। পরে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সাত-আট বৎসর হইল গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অদূরে বারগণ্ডা রোডের উপর সুদৃশ্য 'নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির' অবস্থিত। এক বিঘা বার কাঠা হাতার মধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন কলিকাতার হ্যারিসন রোডের সুপরিচিত জুয়েলার্স মেসার্স ঘোষ এণ্ড সন্সের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী ৺অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে সমাজের গৃহ-প্রবেশ-উৎসব কুচবিহারের মহারাণী ৺সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। সমাজের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য ৺অমৃত বাবু পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিজেরও গিরিডিতে অনেকগুলি বাড়িঘর আছে। কুচবিহারের মহারাণী প্রদত্ত এক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সমাজের প্রচারক আশ্রম উক্ত হাতার মধ্যে নির্ম্মিত হয়। গিরিডিতে নববিধান-সমাজ-অন্তর্গত ব্রাহ্মের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ;—মাত্র তিন ঘর। এ-স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা ও অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার যোগানন্দ রায় মহাশয় উপস্থিত এই সমাজের সম্পাদক ও শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয় ইহার সহকারী সম্পাদক। জীবনকৃষ্ণ বাবুর গিরিডিতে নিজস্ব বাটী আছে ; তিনি এ স্থানের স্থায়ী অধিবাসী।

গিরিডিতে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণ উদাসীন ছিলেন, সেই সময়ে প্রধানতঃ কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বাঙালী ভদ্রলোকের উদ্যোগে এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় ইহার নাম ছিল ছোটনাগপুর বালিকা-উচ্চবিদ্যালয় (Choto Nugpur Girls' High School)। পরে ইহা গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। সংস্থাপকবর্গের মধ্যে শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুত বামনদাস মজুমদার, ৺রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত শশীভূষণ বসু, শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলা রায়, ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকারের ভগ্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র, মিস ৺রাধারাণী লাহিড়ী (যিনি এক সময়ে কলিকাতা বেথুন কলেজ হোষ্টেলের লেডী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন), শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺তিনকড়ি বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে মাত্র আট জন ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমেত উনপঞ্চাশটি ছাত্রী হইলে বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী-আবাস স্থাপিত হয়। সেই সময়ে দুই জন পাঞ্জাবী ও কয়েক জন আসামী ছাত্রী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়। উত্তরকালে পুরুষ-শিক্ষকের অপেক্ষা মহিলা-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ অধিকতর সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের বর্ত্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হন। বর্ত্তমান বিদ্যালয়-বাটী পূর্ব্বে কবি ৺কামিনী রায়ের অধিকৃত ছিল ; সেই সময়ে তিনি ঐ বাটী এক বৎসর বিনা-ভাড়ায় বিদ্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার বাটীতে ছাত্রী-আবাস-স্থাপনের অনুমতি

দিয়াছিলেন ও ভাড়া-বাবদ তাঁহার প্রাপ্য প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা তিনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন নাই। মিঃ পি. এন. দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে তের শত টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন ; তিনিও ঐ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ৺এম্. এন. দত্ত মহাশয় বহুদিবসাবধি বিদ্যালয়কে মাসিক এক শত টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত গৌরীকান্ত রায়, শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু প্রভৃতির নিকট হইতেও অর্থসাহায্য লাভ করিয়া স্কুল-কমিটি উপকৃত হইয়াছিল। বিহার-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও বিভিন্ন সময়ে মাসিক তিন শত পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সালে নানা কারণে বিদ্যালয়টি অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় নীত হয়। তৎকালে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে মাত্র আটত্রিশ জন হয় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্য পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্কুল-কমিটি শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ, এম-এ, বি-টি মহাশয়াকে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। ইঁহার উদ্যোগে ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন মন্ত্রী ফকরুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট পুনরায় পূর্ব্বমত মাসিক পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্যদান আরম্ভ করেন। উপস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা সর্ব্বসমেত চুরানব্বই জন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বিহারী, এক জন ওঁরাও ও এক জন ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সর্ব্বসমেত দশ জনের মধ্যে নয় জন বাঙালী ; তন্মধ্যে তিন জন গ্রাজুয়েট, এক জন শিক্ষয়িত্রী ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ও বিদ্যালয়েরই ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী। ইহা ভিন্ন এক জন বিহারী পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন। বিদ্যালয়ের ও ছাত্রী-আবাসের নিজস্ব গৃহ না থাকার মাসিক বহু অর্থ বাড়িভাড়া-বাবদ ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রয়ের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীতও হইয়াছে। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত পিতা সাতকড়ি দেব মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ছাত্রী-আবাস-নির্ম্মাণের জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। রামগড় ওয়ার্ড এষ্টেট দুই সহস্র মুদ্রা ও রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর পাঁচ শত মুদ্রা বিদ্যালয়-বাটী-নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। মিঃ ডি. পি. শর্ম্মা, আই-সি-এস, মিঃ এস. সলোমন, আই-সি-এস, রায়-বাহাদুর ভবদেব সরকার, মিঃ এইচ, হুইটেকার, আই-সি-এস (ছোটনাগপুরের বর্ত্তমান জুডিশিয়াল কমিশনার) প্রভৃতি স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সাবডিভিসনাল অফিসারেরা গৃহনির্ম্মাণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ জার্ম্মান অভ্র-ব্যবসায়ী মূর সাহেবের বাসাবাটীটি (যাহা উপস্থিত রাণাঘাট নটুদহের জমিদার ৺নফরচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্রগণের অধিকার আছে) বিদ্যালয়ের-গৃহের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ঐ বাটীতে বর্ত্তমান বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবার আশা আছে। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যবালা ঘোষ মহাশয়া ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর যাবৎ কটক র‍্যাভেন্‌শ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ও লক্ষ্ণৌ থবর্ণ কলেজের প্রফেসর ও রীডার রূপে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি স্বনামখ্যাত রেভারেণ্ড ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী ও খ্রীষ্টিয়ান-সমাজভুক্তা। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ইনি গবর্ণমেণ্ট মনোনীত একমাত্র ও প্রথম মহিলা সদস্যা। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রীত হইলে বাড়িভাড়া-বাবদ মাসিক ব্যয়ের কিছু সঙ্কোচ হইবে। বিদ্যালয়ের-পরিচালনের বর্ত্তমান মাসিক ব্যয় প্রায় আট শত টাকার মধ্যে পাঁচ শত টাকা গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য ভিন্ন সাধারণের অংসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত পৃথিবীব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য নানা কারণে সাধারণ সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় বিদ্যালয়-পরিচালন বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য সম্পাদিকা মহাশয়ার আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ শ্লাঘনীয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি হাজারিবাগ ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানস্থ অধিবাসীদের নিকট স্বয়ং সাহায্য ভিক্ষা করিতে যাইতেও কুণ্ঠিতা হন না। তাঁহার নিরলস চেষ্টা ব্যতিরেকে বিদ্যালয়-পরিচালন যে বিশেষ কষ্টকর

হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে সেবাশুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, গৃহস্থালী, রন্ধন ও নীতি শিক্ষা দিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কাপড় কাটা ও সেলাই, নানা প্রকার কারুকার্য্য, উল-বোনা, চিত্রাঙ্কণ ও মৃত্তিকা সাহায্যে খেলনা প্রস্তুত করিতেও নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। চরকা ও কুটীর-শিল্প শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বালিকাদের এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পুরস্কার পদক প্রভৃতিও প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ সমবেত অসাম্প্রদায়িক উপাসনার বিধান আছে। সাধারণ কেতাবী বিদ্যাদান ভিন্ন ছাত্রীদের শরীর, মন ও হৃদয় উন্নত করিয়া, তাহাদের শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মবোধকে জাগ্রত করাই এই শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গিরিডির স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে চলাফেরা খেলাধূলা করিতে পারায় ছাত্রীদের প্রায় সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবতী। তাঁহাদের শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতাও প্রশংসনীয়। বাঙালী ধনী ব্যক্তিগণ যদি এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের জন্য সকলে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন, অথবা অন্ততঃ যদি সকলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙালীদের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

গিরিডির বর্তমান উচ্চ-ইংরেজী (বালক) বিদ্যালয় স্থাপনার মূলেও প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন। প্রথমে পচম্বায় বাঙালীদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গিরিডিতে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন ৺পূর্ণানন্দ মিত্র মহাশয়। এই দুইটি বিদ্যালয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক হইয়া যায়। পচম্বা রোডের উপর ভাণ্ডারডিহি নামক স্থানে ৺তিনকড়ি বসু, ৺পূর্ণানন্দ মিত্র, ৺রাখালদাস কুণ্ডু প্রমুখ ভদ্রলোকদের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের বর্তমান নিজস্ব বাটী নির্ম্মিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে পচম্বার তৎকালীন টীকাইৎ অনুগ্রহ করিয়া জমি দান করেন। পরে শক্তিকণ্ঠ বাবুর চেষ্টায় বিদ্যালয়-বাটীর বহু উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ; পরে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া গিরিডিতেই ওকালতি করিতে থাকেন। তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা উপস্থিত সর্ব্বসমেত চার শত উননব্বই জন ; তন্মধ্যে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা এক-শ চল্লিশ জন মাত্র। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণিলাল সান্যাল, এম-এ মহাশয় ১৯১৮ সাল হইতে কার্য্য করিতেছেন। অন্যান্য শিক্ষক সর্ব্বসমেত চব্বিশ জনের মধ্যে বাঙালী বারো জন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ, দ্বিব-এল মহাশয় প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়ের সম্পাদক রহিয়াছেন।

স্থানীয় উচ্চপ্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় আর একটি বিশেষ কার্য্যকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা ৺ভি. রায়, ডি-এল, ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺উমেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় মকতপুরায় বারগণ্ডা রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়-বাটী বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। গৃহনির্ম্মাণে দেশীয় এক ভদ্রলোক কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ছাত্রী-সংখ্যা উপস্থিত চল্লিশ জন। দুই জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ও এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা সকলেই বাঙালী। গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এই বিদ্যালয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্তমান সম্পাদক।

গিরিডি 'বঙ্গশিশু-বিদ্যালয়' প্রায় কুড়ি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রবাসী বঙ্গসন্তানেরা যাহাতে শৈশব হইতে মাতৃভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া প্রধানতঃ ড়ি বসু ও শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা উদ্যোগী হইয়া ইহা স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যের সমান শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ছাত্রের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছেচল্লিশ জন ; ইহারা সকলেই বাঙালী। ছাত্রদের বেতন ও স্থানীয় বাঙালীদের অর্থসাহায্য সম্বল করিয়া বিদ্যালয়টি চালিত হইতেছে। ইহার নিজস্ব কোন বাটী নাই। গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীদের ইহার নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিস

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক। ইনি উপস্থিত রেল-কোম্পানীর কয়লা-খাদে লেবার ইন্সপেক্টর রূপে কার্য্য করিতেছেন। নিউ বারগণ্ডায় নিজস্ব বাটী করিয়া ইনি স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। ইনি এই স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্।

গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনার সহিতও স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ও শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তৎকালে সাবডিভিসনাল অফিসারই মিউনিসিপ্যালিটির পদহেতুক (Ex-officio) চেয়ারম্যান হইতেন ও ভাইস্-চেয়ারম্যান্ কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রথম ভাইস্‌চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। উত্তরকালে চেয়ারম্যানও কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে থাকেন। উপস্থিত সর্ব্বসমেত কুড়ি জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের মধ্যে সাধারণ কর্ত্তৃক ষোল জন ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত বাকী চার জন। ইঁহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত নয় জন ; তন্মধ্যে সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আট জন। গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্ত লাবণ্যবালা ঘোষ, এম-এ, বি.টি মহাশয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীতা সদস্যা। এ-পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান পদ দুইটিতে স্থানীয় বাঙালীরাই নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। গত বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর ও ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীপতি সামন্ত মহাশয়। এ-বৎসর কোন বাঙালী চেয়ারম্যান অথবা ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন নাই। লোকমুখে শুনিলাম, বাঙালী কমিশনারদের মধ্যে দুই-এক জন তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্দেশ্যে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত বাঙালী প্রার্থীদের সমর্থন না করিয়া স্বাজাতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন ; তাহাতেই বাঙালীদের এই শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ দুঃখ ও লজ্জার কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গিরিডির প্রবাসী বাঙালীগণ পরবর্ত্তী কমিশনার নির্ব্বাচনকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এমন প্রার্থীদের যেন সমর্থন করেন যাঁহাদের দ্বারা অন্যায় ভাবে বাঙালীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন আশঙ্কা না থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বত্রিশ বৎসর যাবৎ উক্ত পদে, কার্য্য করিতেছেন। ইনি অতি কর্ম্মকুশল ব্যক্তি এবং গিরিডির স্থায়ী বাসিন্দা ; এ-স্থানে তাঁহার নিজস্ব বাটী আছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ কুড়ি বৎসর একাদিক্রমে মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার রূপে কার্য্য করিতেছেন।

হাজারিবাগ ব্যাঙ্কের একটি শাখা পচম্বা রোডের উপর অবস্থিত। বাটীটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিকট ব্যাঙ্ক বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ব্যাঙ্ক-পরিচালনে বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন।

স্থানীয় র‍্যাটারে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রধানতঃ ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাজকৃষ্ণ সাহানা, ৺গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু, শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ৺ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার প্রভৃতির উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদয় ইষ্টক ক্রয়ের ব্যয় বহন ও চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বহু বৎসরাবধি এক শত টাকা করিয়া মাসিক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ৺অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই একখানি প্রতিকৃতি চিকিৎসালয়ের একটি কক্ষে এখনও শোভা পাইতেছে। ইহার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ভিন্নও গিরিডিতে অনেকগুলি বাঙালী চিকিৎসক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ যোগানন্দ রায় মহাশয়ের পসার সর্ব্বাধিক। ডাঃ জয়ন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ও গিরিডির এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। তদ্ভিন্ন ডাঃ হরেন্দ্রনাথ

মল্লিক, ডাঃ শিরীষচন্দ্র বসু, ডাঃ গোপীবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এ. বি. দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই স্থানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যোগানন্দ বাবু, গোপীবল্লভ বাবু ও হরেন্দ্র বাবু বাড়িঘর করিয়া এই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। ইহা ভিন্ন গিরিডিতে কয়েক জন বাঙালী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কয়েকজন কবিরাজও আছেন।

স্থানীয় উকীলের সংখ্যা সর্ব্বসমেত আটত্রিশ জন ; তন্মধ্যে বাইশ জন বাঙালী। য়্যাডভোকেট চারি জনই বাঙালী ;—তাঁহাদের নাম, শ্রীসতীশ-চন্দ্র রায়, শ্রীশক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সামন্ত ও শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় উকীল-লাইব্রেরীটি শক্তিবাবু, ৺ধরণীধর বাবু প্রমুখ বাঙালীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ইহার সংলগ্ন একটি টেনিস্-কোর্টও আছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই। গিরিডির সাধারণ জনহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই মুখ্যতঃ প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এ-যাবৎ স্থানীয় জনসাধারণের সহিত প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক মধুর সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি উগ্র প্রাদেশিকতা প্রকট হওয়ায় বিহারী ভ্রাতারা বাঙালীদের অন্য চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও এ-বিষয়ে আন্দোলনও সুরু হইয়াছে। যাঁহারা গিরিডিকে নিজের দেশ বলিয়াই জ্ঞান করেন, গিরিডির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন ও স্বোপার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করেন, —বস্তুতঃ গিরিডির বর্ত্তমান সমৃদ্ধির মূলে যাঁহারা, তাঁহাদের বিপক্ষে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা নীতির দিকে দিয়া যে কত বড় অন্যায় ও কিরূপ অশোভন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

উপসংহারে আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। স্থানীয় বাঙালী যুবকদের সামাজিক জীবনে আশানুরূপ প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য না করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে মিলন ও নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য মিলনক্ষেত্র আছে বলিয়া শুনি নাই ; যদিও "মিলনী" নামে একটি নামমাত্র সমিতি আছে। সেদিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরী বলিতে গিরিডিতে কিছু ছিল না। সম্প্রতি একটি ছোট লাইব্রেরী হইয়াছে। গিরিডিতে স্থায়ী বাঙালী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী না থাকায়, তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা অথবা মানসিক উৎকর্ষের বিষয়ে যদি কেহ কটাক্ষ করে, তাহা হইলে সপক্ষে বলিবার তাঁহাদের হয়ত বিশেষ কিছু থাকিবে না। সুখের বিষয়, সাহিত্য-আলোচনা, আবৃত্তি, গীতবাদ্য প্রভৃতির জন্য সময়ে সময়ে 'বাণী বৈঠকে'র অধিবেশন হয়। বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক যাঁহারা, তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান লাইব্রেরীটির উন্নতির অথবা একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যত্নবান হইতে পারেন। উন্মুক্ত বাতাসে যুবকদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চ্চার জন্য কাছারীর নিকট সাধারণের অর্থসাহায্যে একটি সুপরিসর ক্রীড়াক্ষেত্র বহু দিন হইল ক্রীত হইয়া পড়িয়া আছে শুনিয়াছি ; তাহার এক পার্শ্বে একটি ক্লাব হইবারও কথা আছে। কথা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইলে, বিশেষ সুখের বিষয় হইবে। ক্রীড়া-কৌতুক, গীতবাদ্য, বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যচর্চ্চা, সামাজিক মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রবাসী বঙ্গযুবকদের অগ্রণী দেখিতে আশা করি, সেই জন্য এই মন্তব্যটি করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।*

* শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত আশুতোষ বসু প্রভৃতির নিকট হইতে প্রবন্ধ-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ মহাশয়ার সৌজন্যে গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কিত ছবিগুলি ও মেসার্স লালজী এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে গিরিডি ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর বাটীর ছবিখানি পাইয়াছি। বাকী ফটোগুলি প্রায় সমস্তই গিরিডির ফটোগ্রাফার মিঃ এইচ্. সি. দত্ত অল্পমূল্যে তুলিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৩৪৩ পৌষ

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন গত ৪৬ বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। এবার ইহার ষট্‌চত্বারিংশ অধিবেশন পূজার ছুটিতে টাঙ্গাইলে হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে এই সম্মিলনীর কোন গুরুত্ব আছে কিনা তাহা স্থির করিবার ভার তাঁহাদের উপর—আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক। কিন্তু দুটি কারণে টাঙ্গাইলের অধিবেশনটির বিশেষত্ব ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য লোকদের নিকটও আছে, ইহা বলা আবশ্যক মনে করি।

ইহার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু ব্রাহ্মদের চেয়ে সংখ্যায় বহু শতগুণ অধিক স্বদেশবাসীর সেবা, রাজনীতি, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, মাদকতা নিবারণ, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, সুনীতি সংরক্ষণ, অবনত জাতিসমূহের উন্নতিসাধন, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দান, নারীরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যক্ষেত্রে করিয়া গিয়াছেন। সার্ব্বজনিক কার্য্যে বৃহৎ সভাস্থলে এই কর্ম্মবীরের শেষ আবির্ভাব টাঙ্গাইলে হইয়াছিল, ইহা স্মরণীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানাধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশী নানা পণ্যশিল্পের কারখানার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া সুবিদিত, দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদের অন্যতম প্রধান সহায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে, এক দিকে চরখা ও খদ্দরের এবং অন্য দিকে স্বদেশী কাপড়ের মিলের কার্য্যতঃ সমর্থক তিনি, দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদাতা, এবং তাহাদেরই মত দীনভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহক তিনি। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব আছে। টাঙ্গাইলেই তিনি প্রথম, অন্যান্য কথার মধ্যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপযোগিতার কথা বলিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্যা একটি নহে, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্ভাব ও বিরোধ তন্মধ্যে অন্যতম। সে-বিষয়ে আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন ঃ—

হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ-ধ্বংসের ন্যায় যেরূপ আত্মঘাতী মহা-মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষ-বহ্নির ধূমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব-সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিযাছে, তাহাতে নিঃসংশয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ,—

"এক জাতি, এক ভগবান
এক দেশ, এক মন প্রাণ",

এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত সহস্র বৎসরেও সম্ভব হইবে না।

প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী মানুষেরই ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে। আচার্য্য রায় তাঁহার মত অনুসারে উপায় বলিয়াছেন।

আর একটি সমস্যা হিন্দু অবনত জাতিদের অবস্থা এবং তাহাদের অসন্তোষ। আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণের একাধিক স্থানে ইহার উল্লেখ

করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের অবনত শ্রেণীর দুর্দ্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন—

"যদি কারুর আমাদের চেয়ে নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা ভরসা নাই —সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু?—এ কি অত্যাচার! আমেরিকার সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎ মান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা রাখে। আর, আমাদের দেশে? Once a cobbler, over and always a cobbler–মুচির ছেলে ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই—থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।"

পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—

হিন্দু পড়্ হে পোঁথিয়া, মুছলমান কোরাণ
চূড়া লীচ গ্লীচীয়া না জিমিন না আস্‌মা।

হিন্দুর পুঁথি আছে, মুসলমানদের কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চূড়াদের স্বর্গও নাই, মর্ত্ত্যও নাই—তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতেই আসিয়াছে।

হায় আমরা কি মানুষ!—ঐ যে হাড়ী, ডোম, বাগ্দী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল, তোমার বাড়ীর আশেপাশে চারিদিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই যুগযুগান্তর ধরিয়া কি ক'রেছ ব'লতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, কাছে আস্‌তে দাও না—দূর দূর কর! জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াও—আর সুশ্রী সবল হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্-নুদুস্ মুচির ছেলেটি যদি, ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে, তবে জাত গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া হুঙ্কার দিয়া ওঠ।

এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্ম্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃতধারায় সম্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও।

বাঙ্গালার নিগৃহীত, এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে আজ সঙ্গীত উঠুক,—

"ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদায় উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
জীর্ণ আবেশে, কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।"

১৩১৮ বৈশাখ

[নূতন ব্রাহ্ম বিবাহ বিল]

১৮৭২ সালের তিন আইন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন নামে পরিচিত। এই আইন অনুসারে ব্রাহ্মদিগের বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়া থাকে। এইরূপ বিবাহে বরকন্যাকে এই কথা বলিতে হয় যে তাঁহারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্সি বা ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মই হিন্দুবংশজাত, এবং অনেকে মনে করেন যে তাঁহারাও হিন্দু। এই জন্য অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে অহিন্দু বলিতে অনিচ্ছুক। এবং অনেকে তাঁহাদের ধর্ম্ম কি নহে তাহা বলা অপেক্ষা কি বটে, তাহা বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এইজন্য কিছুদিন হইতে উক্ত আইনের সংশোধন বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে। এই আইন অনুসারে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক থাকিলে বিবাহ হয় না, সেরূপ স্থলে বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, যেমন কায়স্থ ব্রাহ্মণে, বিবাহ হইতে পারে। এই আইন অনুসারে বিবাহ করিয়া কেহ পত্নীর জীবিতকালে দারান্তর গ্রহণ করিলে সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। সুতরাং বহুবিবাহ নিবারণের ইহা একটি উপায়।

সম্প্রতি মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে, বরকন্যাকে, আমি হিন্দু নই, বৌদ্ধ নই, ইত্যাদি বলিতে হইবে না। এই বিল আইনে পরিণত হইলে কেহ ইচ্ছা করিলে আপনাকে অহিন্দু না বলিয়াও জাত্যন্তরে বিবাহ করিতে পারিবে। এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাসাদিতে অনেক দেখা যায়। মনুতে এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। নেপালে এখনও অনুলোম বিবাহ চলে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অনেক স্থানে এখনও কায়স্থ ও বৈদ্যের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত আছে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যাহা হউক, এই বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় শেষ করায় অনেক হিন্দু ভূপেন্দ্র বাবুকে গালাগালি দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার ন্যায্য কারণ দেখিতেছি না। এই আইনটা কেবল একটা অনুমতি দেওয়া মাত্র, ইহাতে কাহাকেও এতদনুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইতেছে না। অর্থাৎ এই আইন পাশ হইলে কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ-কন্যা র পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের বিবাহ বৈধ (valid) এবং তাঁহাদের সন্তান বৈধ (le-gitimate) বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এই আইন ইহা বলিতেছে না যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে কায়স্থ-কন্যা বিবাহ করিতে হইবে। যাহারা এরূপ বিবাহ করিবে, তাহাদিগকে অহিন্দু বলিতে ও সমাজচ্যুত করিতে। এখন যেমন হিন্দুদের অধিকার আছে, পরেও তেমনি থাকিবে। বিধবাবিবাহ আইন আছে বলিয়া প্রত্যেক হিন্দু বিধবা বিবাহ করিতেছেন না, বা প্রত্যেককে বিবাহ করিতে বাধ্য করাও হইতেছে না। ভূপেন্দ্র বাবুর বিল আইনে পরিণত হইলেই যে ঝুড়ি ঝুড়ি অসবর্ণ বিবাহ হইবে তা নয়। সুতরাং হিন্দুদের আশঙ্কা অমূলক বরং তাঁহাদের একটা সুবিধা হইবে। ভূপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবিত আইন অনুসারে সবর্ণ (যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে কায়স্থে) বিবাহও করা চলিবে, অথচ বহুবিবাহ এই আইন অনুসারে দণ্ডণীয়

থাকিবে। মেয়ের সতীন হয়, ইহা কেহ চায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া রীতিমতো শাস্ত্রীয় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই আইনেরও আশ্রয় লওয়া হয়, তাহা হইলে কন্যার সপত্নীসম্ভাবনা নিরুদ্ধ হইবে। ইহা কম লাভ নয়। আর একটা লাভ এই যে এখন কেহ অসবর্ণ বিবাহ করিতে চাহিলে আপনাকে অহিন্দু বলিতে বাধ্য হন। ভূপেন্দ্র বাবুর আইনে সমাজ যাহাই বলুন, রাজকীয় সেন্সসে তিনি হিন্দু বলিয়াই গণিত হইবেন। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা কমিবে না। একথা বলিতেছি এইজন্য যে সম্প্রতি সেন্সসে নমঃশূদ্র আদিকে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে বাদ দিবার চেষ্টা করায় হিন্দুদিগের তরফ হইতে ঘোরতর আপত্তি হইয়াছিল। এই আপত্তি হইতে ইহাই বুঝা যায়, যে, হিন্দুবংশজাত কেহ পার্য্যমানে হিন্দুর শ্রেণী ও মোট সংখ্যা হইতে বাদ না যান, হিন্দুগণের ইহাই ইচ্ছা। সুতরাং ভূপেন্দ্রবাবু পরোক্ষভাবে সে ইচ্ছার আনুকূল্য করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আর একটা লাভ এই হইবে যে বর কন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় বরপণ ও কন্যাশুল্ক কমিয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগর ও সংস্কার আন্দোলন

প্রাসঙ্গিক কথা

বাংলাদেশে 'কেবল' সমাজসংস্কারক বলতে বিদ্যাসাগরকেই বোঝাবে। অন্য যাঁরা সমাজসংস্কার কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের সকলের পিছনেই ধর্মের টান ছিল। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন ধর্মে অনাসক্ত। মানবপ্রেমকে ধর্ম করেই তিনি তাঁর সর্বস্ব সংস্কার-কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। সংস্কারমূলক তাঁর কার্যক্ষেত্র হিন্দুসমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং প্রচলিত দেশাচারমূলক হিন্দুধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বলে বর্তমান খণ্ডে তাঁকে রামমোহনের পরেই স্থাপন করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের দেহান্তের পরেই *প্রবাসী* প্রকাশিত হয়। সেই কারণে তাঁর সম্বন্ধে *প্রবাসী*- সম্পাদকের লেখা কোনো শোকনিবন্ধ বেরোয়নি এবং সমসাময়িক প্রতিক্রিয়ার কথাও। পরবর্তীকালে কিছু বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ *প্রবাসী* পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

বিদ্যাসাগর মনে করতেন বিধবাবিবাহ প্রবর্তনই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। তা ছাড়া বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গেও তিনি লেখনী চালনা করেছেন। *প্রবাসী*-তে স্বতই বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ এই দুইটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে লিখিত হয়েছে।

এই পর্বে সাক্ষাৎ বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের সঙ্গে বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় সম্পাদক ভাবাবেগে বিচলিত না হয়ে সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা বিধবাদের সামাজিক অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন।

সমাজ ও সমাজ-সংস্কারক

১৩২১ ভাদ্র

বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধসভা

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে দেশের নানা স্থানে তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ সভা হইয়া থাকে। সভাতে তাঁহার অসামান্য দেবোপম চরিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্কুল কলেজ স্থাপনাদি দ্বারা তিনি শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, লোকসেবার জন্য যাহা করিয়াছেন, সমস্তই বর্ণিত হয়। তাঁহার স্বাবলম্বন, দৃঢ়চিত্ততা, বিলাস-বিমুখতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উল্লেখ হয়। কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনের সমুচিত উল্লেখ অনেক সভায় হয় না, কোথাও কোথাও তাহার উল্লেখ হয়ই না, আবার কোথাও বা তাহার নিন্দাও হয়। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তনকে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে স্বীয় নানা কার্য্যের মধ্যে কিরূপ স্থান দিতেন, তাহা তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিত নিম্নে মুদ্রিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে ঃ—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে ; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনও মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি ; এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি ; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং

আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১ শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণ।*

১৩২৩ ভাদ্র

বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা

গত ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশের নানাস্থানে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক সভায় তাঁহার সম্বন্ধে আর অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু তিনি যে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। ইহা রামবিহীন রামায়ণের মত। কলিকাতার ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটে যে সভা হয়, তাহাতে কোন কোন বক্তা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তির উল্লেখ ও প্রশংসা করেন, এবং বালিকা বিধবাদের বিবাহের সমর্থন করেন। কিন্তু বাঙালীদের চালিত ইংরেজী দৈনিকগুলিতে এই সভার যে বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বিধবা-বিবাহ কথাটি পর্য্যন্ত ছিলনা। বেঙ্গলীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বালিকা বিধবাদের বিবাহের বিরোধী নহেন। কিন্তু রিপোর্টার ও সহকারীদের মধ্যে অন্য রকমের লোক থাকায় এইরূপ অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিজনক বৃত্তান্ত তাঁহার কাগজে বাহির হইয়া থাকিবে।

১৩৩৮ ভাদ্র

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভা এই রাজনৈতিক মাতামাতি দলাদলির দিনেও যে সামান্য ভাবেও এবার হইয়াছিল, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু নেতৃত্বের দাবি যাঁহারা করেন, তাঁহারা এইরূপ স্মৃতিসভার আয়োজন করিলে, অন্ততঃ তাহাতে যোগ দিলে, কর্ত্তব্য করা হইত। যাঁহারা এইরূপ সভার আয়োজন করেন, তাঁহাদেরও রাজনৈতিক এবং অন্য সকল প্রকার কর্ম্মীদের সহযোগিতা চাওয়া উচিত। কারণ, বিদ্যাসাগর সকল বাঙালীর সকল ভারতীয়ের আত্মীয়।

সমাজসংস্কারের জন্য তাঁহার চিন্তা অধ্যয়ন পরিশ্রম আত্মোৎসর্গ এবং কীর্ত্তি অনতিক্রান্ত।

* শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিদ্যাসাগর", তৃতীয় সংস্করণ, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা।

সাধারণ শিক্ষা, বালিকাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতার সহিত অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলীর রচনায় তাঁহার সমকক্ষ বিরল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা সহজ এবং বৈজ্ঞানিক-প্রণালীসম্মত করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম করেন। দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া করিবার পথ প্রদর্শন তিনি করেন। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত লোকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা স্বয়ং করিবার দৃষ্টান্ত তিনি প্রদর্শন করেন। মহৎ জীবনের সহিত সাদাসিধা চালচলনের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাতে লক্ষিত হইত। স্বাবলম্বন ও সত্য আচরণ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার খাঁটি মনুষ্যত্ব। তাঁহার মেরুদণ্ড কখনও ধনের কাছে, বলের কাছে নত হয় নাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একাধারে কুসুমের মত কোমল ও বজ্রের মত দৃঢ় ছিলেন। এই রকম আর একটি মানুষ এপর্য্যন্ত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

বিদ্যাসাগর-ভবন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র অনেক হাজার টাকা দেনা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিতকালেই তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে, দেনা পরিশোধের কোন উপায় হইলে তাঁহার পিতার বাসবাটীটিতে লোকহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে তাহা উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে সেরূপ কোন চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্র ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তদ্রূপ কোন চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগর-ভবন নীলামে উঠে। নীলামের ডাকে ৭২,০০০ টাকায় হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী ঐ বাটী ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে চাঁদা তুলিয়া বাড়ীটি কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া উহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় কোন লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় হয়। কোম্পানী বাড়ীটি কিনিয়া রাখিয়া সর্ব্ব-সাধারণকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কাজের দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ ও সময় দিয়া দেশের সমুদয় অধিবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দেশে এমন ধনী আছেন, যাঁহারা প্রত্যেকে লক্ষ টাকা দিতে পারেন। তাঁহাদের কেহ দিবেন কি না, তাঁহাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভাল কাজে টাকা দিবার ভার ধনীদের উপর অর্পণ করিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া, ও, আবশ্যক মত, কর্ত্তব্যে অবহেলা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া, আমরা কেহই নিজের নিজের কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি না। আগামী ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শনের জন্য দেশের ছোট বড় বহু গ্রামে নগরে অনেক সভা হইবে। সমুদয় সভার শ্রোতার সংখ্যা মোট এক লক্ষের কম হইবে না। শ্রোতারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভক্তি করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—যদিও ঠিক্ কিসের জন্য করেন, তাহা সকলে হয়ত বলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে যদি গড়ে এক টাকা করিয়া দান করেন, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা অনায়াসে উঠিতে পারে। তা ছাড়া, যাঁহারা কোন সভায় যাইবেন না, এমন বহু লক্ষ নারী ও পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভক্তি করেন। তাঁহারাও টাকা দিবেন, আশা করা যায়। আদায় করিবার মানুষ জুটিলে টাকা নিশ্চয়ই উঠিবে।

বাড়ীটি বহু বৎসর বেমেরামত অবস্থায় থাকায় ভাল করিয়া মেরামত করা আবশ্যক হইবে ; কোন কোন অংশ ভাঙিয়া গড়া দর্‌কার হইতে পারে। এইজন্য বাড়ীটির মূল্য ৭২,০০০ ছাড়া আরও অনেক হাজার টাকা—মোট এক লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে বোধ হয়। তা ছাড়া, উহাতে যে প্রতিষ্ঠানটি রক্ষিত হইবে, তাহারও ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এমন কিছু মূলধন দর্‌কার যাহার আয় হইতে ঐ খরচ চলিতে পারে। মূলধন কত চাই, তাহা প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি এবং ক্ষুদ্রতা বা বিশালতার উপর নির্ভর করিবে। বিধবাদের যাহাতে কল্যাণ হয় এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

এই বৎসরের বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভাগুলির প্রধান কাজ হউক বিদ্যাসাগর ভবনটি লোকহিতকর কার্য্যের জন্য [ক্রয়] করিবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ।

বিদ্যাসাগর ভবন বাদুড়বাগানে একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত। তা ছাড়া উহার হাতায় গাছ পালা অনেক এই কারণে আমাদের জন্য বিশেষভাবে তোলা ছবি দুটিতে বাড়ীটির অল্প অংশই দেখা যাইতেছে।

দেশ-বিদেশের কথা

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কন্যাগণ-

বাঙালীর পক্ষে অপরিসীম লজ্জার কথা যে, দানবীর দেশগতপ্রাণ ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইটি কন্যা আজ উদরান্নের জন্য দেশবাসীর নিকট সাহায্য-প্রার্থিনী। ডাক্তার শ্রীযুক্তা বিধুমুখী বসু নানা সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত করুণ কাহিনীটি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী উভয়েই অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর দান মাত্র ১৫৲ টাকায় নিজের, কন্যার ও দুইটি দৌহিত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে কাশীতে বাস করিতেছেন, কারণ সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়ত তিনি সেখানে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও কিঞ্চিৎ আয় করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়, সংসারে তাঁহার একটি পঙ্গু পুত্র ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাদের পুরাতন মালীর গৃহে একটি বারান্দার বাস করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে অগ্রসর হন, তখন কয়েকজন আত্মীয় তাঁহাকে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই লজ্জাজনক সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই কিছু সাহায্য করেন নাই। এই কারণেই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও তেজস্বী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও তাঁহাকে এই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর বাঙ্গালাদেশে অনেকেই আছেন।

তাঁহার অন্নে পরিপুষ্ট না হইলেও বঙ্গদেশে এমন লোক খুবই বিরল যিনি বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের নিকটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী নন ; অতএব আশা করা যায়, প্রত্যেকেই সেই মহাপুরুষের স্মৃতি মনে রাখিয়া তাঁহার সন্তানগণকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যাঁহারা উপরোক্ত মহদুদ্দেশ্যে কিছু সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমতী বিধুমুখী বসুকে ৯৩/১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, জানাইলে তিনি বাধিতা হইবেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-কলেজের (ভূতপূর্ব্ব মেট্রোপলিটন কলেজ) ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক এক সহস্র। ইহাদেরও এই কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা আশা করি শ্রীযুক্তা বসুর এই আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

বিধবা বিবাহ

১৩১৪ আশ্বিন

বালিকা বিধবার বিবাহ।

ষোল বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। বৎসর বৎসর নানা স্থানে তাঁহার জন্য শোকসভা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সভায় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বালবিধবার বিবাহপ্রচলন চেষ্টার উল্লেখ পর্য্যন্ত হয় না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। বালিকা-বিধবাদের প্রতি এই অত্যাচার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের সামাজিক অধোগতির একটি প্রধান কারণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আমাদের দেশে, বালবিধবার বিবাহ্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, একথা এখন আর কোন যথার্থ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু এখন শিক্ষিত হৃদয়হীন লোকেরা আর একটা তথাকথিত যুক্তির প্রয়োগ করেন। ১৩১০ সালের মাঘ মাসের "উদ্বোধন" কাগজে এই যুক্তিটি ছিল। তাহার উত্তরে আমরা ১৩১১ সালের বৈশাখমাসের কাগজে লিখিয়াছিলাম ঃ—

প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন ঃ—

বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী। ইত্যাদি।

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে "মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী" এই তথ্যটি লেখক কোথায় পাইলেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রীপুরুষের আপেক্ষিক সংখ্যা একরূপ নহে। বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের সেন্সস-রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায় হইতে নিম্নে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"With very few exeptions, the females outnumber the males in all European countries, *but in India the reverse is the case*, and in the whole country taken together there are only 963 females to 1,000 males. The general result is shared by all provinces and states except the Central Provinces and Madras,where there is a marked excess of females, and Bengal where the two sexes are on a par. In the last-mentioned provinces females are in marked defect in the greater part of Bengal Proper, and in excess throughout Bihar, Orissa and Chota Nagpur. The deficiency of females is extraordinarily great in Coorg, Baluchistan, the Pubjab and Kashmir, where it exceeds 1 in 9, and is almost as marked in Ajmir and the Rajputana Agency. *** Women are also in a clear minority in the extreme east–in North Bengal, Assam and Burma. (Vol. 1, p. 107).

ইউরোপে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী, ভারতবর্ষে কম। সুতরাং ইউরোপের সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়। ভারতবর্ষেরও সব প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা একরূপ নহে। বিহার, ওড়িষা, ছোট নাগপুর, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে স্ত্রীলোক বেশী, উত্তর-বঙ্গ বঙ্গের, অধিকাংশ স্থান, আসাম, কুর্গ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে স্ত্রীলোক কম। সুতরাং নরনারীর সংখ্যার ন্যূনাধিক্য অনুসারে যদি বৈবাহিক নিয়ম চালাইতে হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম চালান উচিত। কেবল তাহাই নয়। দেখা উচিত, কোন্ যায়গায় হিন্দু নর-নারীর সংখ্যা কত। কারণ, হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হয় না। শুধু তাহাতেও চলিবে না। দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদি জাতির যে শ্রেণীর, যে মেলের, যে প্রকার কুলীন

বংশজাদির পরস্পর বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে নরনারীর সংখ্যা কিরূপ। নতুবা কেমন করিয়া নিয়ম চালান যাইবে?

যাহা হউক, ভারতবর্ষে নরনারীর মোট সংখ্যা অনুসারে প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে ; কারণ, মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশী ত নয়ই, সমানও নয় ; —বরং কম। সুতরাং সংখ্যা দেখিয়া তর্ক করিতে হইলে বরং বলিতে হয় যে, বিধবাবিবাহ হওয়াই উচিত। নতুবা অনেক পুরুষের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আমরা দেখিতেও পাই, বাঙ্গালাদেশে অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়, অনেকে প্রতারিত হইয়া অব্রাহ্মণী বিবাহ করে। কারণ, তাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা কন্যা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া জুয়াচোরেরা ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্যাকে অনেক সময় ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া চালাইয়া দেয়। গুজরাত প্রদেশেও এরূপ হয়। এই সে দিন বোম্বাইয়ের অনেক ভাটিয়া স্বদেশে পাত্রী না পাইয়া উত্তর-ভারতে নিজেদের মত এক জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হয়, এবং তজ্জন্য আদালতে মানহানির মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের যুক্তি ভারতে খাটে না।

তাহার পর, যদি মেয়েদের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে কুমারীরা যাহাতে অন্ততঃ একবার বিবাহ করিতে পায়, তজ্জন্য না হয় বিধবাবিবাহ অপ্রচলিতই হইল। কিন্তু যেখানে পুরুষদের সংখ্যা বেশী (যেমন ভারতবর্ষে) তথায় বিপত্নীকগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করে কি হিসাবে? প্রবন্ধ-লেখক তাহাদের পুনর্ব্বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবেন কি? শুধু সংখ্যা ধরিয়া সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তন বা রহিত করিতে হইলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বহুবিবাহ এবং অন্য অনেক প্রদেশে বহুপত্যাত্মক বিবাহ (polyandry) চালাইতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন,—"বিধবাদের একবারের অধিক পতিলাভের অবসর দেওয়া হবে, তারা [কুমারীরা] একবারও পাবে না।" কিন্তু যাহারা শৈশব বা বাল্যে বিধবা হয়, কোন্ বুদ্ধিমান সত্যবাদী ব্যক্তি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তাহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে পতিলাভ ঘটিয়াছে? অথচ ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের এরূপ শিশু ও বালিকা-বিধবার সংখ্যা সামান্য নয়। কত তাহা নিয়ে দেখাইতেছি ঃ—

বয়স।		সংখ্যা।
০—১	...	৮৫৯
১—২	...	১০৩৯
২—৩	...	১৮৮৬
৩—৪	...	৩৭৩২
৪—৫	...	৮১৮০
৫—১০	...	৭৮৪০৭
১০—১৫	...	২২৭৩৬৭

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টও বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সকল বয়স ও অবস্থার নরনারীর সংখ্যার উপর নিজের যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। তিনি বলেন যে বিবাহযোগ্য বর অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা বেশী ; কিন্তু তাঁহার মতে কোন্ বয়সের নরনারী বিবাহযোগ্য তাহা তিনি বলেন নাই। যাহা হউক, শ্রীমতী বেসাণ্টের যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষা বলবত্তর ;—অবশ্য যদি ভিত্তিটা পাকা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা নয়। কারণ, সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ১ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ ঃ—

বয়স।	পুরুষ।	স্ত্রী।
০—৫	১২৫৭৬৪৯৩	১২৮৮৩৫২১
৫—১০	১৩১৬১২১৯	১১৯৬০৯৬১
১০—১৫	১১১১১২৯১	৫৬৩৪৩২৭
১৫—২০	৫৬১১৮৫৪	১১৬৮০০৫
[মোট ...	৪২৪৬০৮৫৭	৩১৬৪৬৮১৪]

পাঁচ ও তন্নিম্ন বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে বালিকা কিছু বেশী ; কিন্তু তেমনি তদূর্দ্ধ বয়সে [এবং মোটের উপর] অত্যন্তই কম। বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক, সর্ব্ববিধ অবস্থায় নরনারীর সংখ্যার অনুপাত, তালিকায় উল্লিখিত বয়সে ঠিক্ ঐরূপ দাঁড়ায়। কেবল বাঙ্গলা দেশ ধরিলেও সংখ্যার অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

তাহার পর আর এক কথা। প্রবন্ধ-লেখক এবং বিবি বেসাণ্টের যুক্তি সারবান্ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বালবিধবাদের বিবাহ কেন না হইবে? তাহাদের ত যথার্থ বিবাহ হয় নাই। তবে কোন্ ন্যায়ের বলে তাহাদিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্থলে পাপানলে দগ্ধ কর?

তদ্ভিন্ন, বিধবা ও কুমারীর অবস্থা কি এক, যে বলিতেছেন, যে, "বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে?" কুলীনের ঘরে কুমারীরা কি বিধবাদের মত সমুদয় শুভকার্য্য হইতে দূরীভূত হন, না জীবনের সমুদয় সাধ আহ্লাদে বেশভূষায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন? তা ছাড়া, কুমারীদের আশা আছে ও থাকিবে ; বিধবাদের আশা কোথায়? আশা মানুষকে কেবল যে সুখে রাখে তাহা নয়, সৎপথেও রাখে। যাহার নিরাশ ও হতাশ, তাহারা আশান্বিত অপেক্ষা সহজে কুপথগামী হয়।

আমরা বলি, বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুনর্ব্বিবাহিতা বাল-বিধবাকে বিবাহিতা কন্যা অপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে করা উচিত নয়। অন্য বিধবাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহিতা হইয়াছেন, যাঁহারা সন্তানবতী, এরূপ বিধবাদের বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে দিলে সকল বয়সের বিধবাই বিবাহ করিবে, সুতরাং সামাজিক আদর্শ হীন হইবে ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ মনে করা ভুল। ইউরোপে বিধবার বিবাহ সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে, ঐ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১০০০ বিপত্নীক আছে, তথা ২৫০০ বিধবা আছে। ইহার অর্থ এই যে নারীপ্রকৃতিতে স্বভাবতই একনিষ্ঠতা অধিক। সুযোগ পাইলেও, যত বিপত্নীক পুনরায় বিবাহ করে, তত বিধবা কখনই বিবাহ করিবে না। অতএব, সামাজিক পবিত্রতার, করুণার, ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়া সকলকে বলি, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সকলে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

নিম্নে আমরা ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে হিন্দু বিধবার তালিকা দিতেছি ঃ—

বয়স।		সংখ্যা।
০—১	...	৪৩৩
১—২	...	৫৭৬
২—৩	...	৬৫১
৩—৪	...	১৭৫৬
৪—৫	...	৩৮৬১
৫—১০	...	৩৪৭০৫
১০—১৫	...	৭৫৫৯০
১৫—২০	...	১৪২৮৭১
২০—২৫	...	২১৯৪৯১
২৫—৩০	...	৩৪৭০২৬
৩০—৩৫	...	৪৮৩৪৯০
৩৫—৪০	...	৪৮১১০৯
৪০—৪৫	...	৭৩৭৩১৮
৪৫—৫০	...	৪৯৫৮১৩
৫০—৫৫	...	৭৪৭৪৪৮
৫৫—৬০	...	৩২৫৭৮৪
৬০ ও তদূর্দ্ধ	...	১৩৩৭১১৯
মোট	...	৫৪,৩৫,০৪১

বালবিধবা ; তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের বিধবাদের মধ্যেও অনেকে বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই।

অনেকে বলেন, বৈধব্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল। উহা কে খণ্ডাইবে? আচ্ছা, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহা হইলে পুরুষের যে স্ত্রী মরে, তাহাও ত কর্ম্মফল। তবে বিপত্নীকদের বিবাহ দিয়া কর্ম্মফল খণ্ডান যায় কেমন করিয়া?

যে অল্পসংখ্যক বালবিধবার হিন্দুসমাজে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মফল খণ্ডিল কেমন করিয়া? তা ছাড়া, কেবল বৈধব্যই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে ঘটে, এরূপ ত কেহ বিশ্বাস করে না ; অন্যান্য যাহা কিছু বিপদ ঘটে, কর্ম্মফলবাদীরা তৎসমুদয়কেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল মনে করেন। তাহাই যদি হইল, এবং কর্ম্মফল খণ্ডাইবার চেষ্টা যদি বৃথা হয়, তাহা হইলে, কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তার করিরাজ ডাকা হয় কেন? যুক্তি অনুসারে চলিতে হইলে, হয় কোন বিপদেরই প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত নয় ; নতুবা সকল বিপদেরই মানবের সাধ্যায়ত্ত প্রতীকার চেষ্টা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালাদেশে বিধবাবিবাহের চেষ্টা একেবারেই হইতেছে না, এমন বলা যায় না। তবে, অত্যন্ত কম হইতেছে, বলিতে হইবে। একটি শুভ লক্ষণ এই যে আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মত মান্যগণ্য ব্যক্তি স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, এবং বিবাহস্থলে সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা চেষ্টা করিলে অনেক বালবিধবার দুঃখ মোচন হইতে পারে।

অবশ্য আমরা একথা বলি না যে বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আর তাঁহাদের দুঃখমোচনের ও সৎপথে রাখিবার অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া নিজের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম করা যাইতে পারে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সেবাব্রতধারিণী করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজে পুরুষেরা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ খুঁজিলে নারীদিগকে কখনও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া যায় না। যাঁহারা নারীর অবস্থা ভাল করিতে চান, তাঁহারা নিজে ভাল হউন। নিজের জন্য সুখ আরাম, আমোদপ্রমোদ, এবং বিধবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপস্যা, এ ব্যবস্থা যেমন হাস্যকর ও অবজ্ঞেয়, তেমনই নিষ্ফল।

অনেকে বিবাহ অপেক্ষা কৌমার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদি বিবাহ মানে ইন্দ্রিয়চর্চ্চাই হয়, তবে এই মত ঠিক্। কিন্তু বিবাহের উচ্চ উদ্দেশ্য ধরিলে ইহা ঠিক্ নয়। ইহা ঠিক্ হইলে, কাহারও মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তি থাকিতে পারে না।

১৩২৩ ভাদ্র

ভারতবর্ষে ও বঙ্গে হিন্দুবিধবার সংখ্যা।

হিন্দু বালিকা বিধবাদের বিবাহ বাংলাদেশে এখন প্রায় হয় না বলিতেই হয় ; সুতরাং তাঁহার যে-সব স্মৃতিসভা করা হয়, তাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশ প্রায় মৌখিক বলিলেও দোষ হয় না। হিন্দু বাঙালীরা তাঁহার মহত্ত্ব অস্বীকার করিতেও পারেন না, আবার তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতেও পারেন না। অগত্যা তাঁহার অন্য নানাবিধ কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন। বিধবাবিবাহের কথা নিতান্তই যদি উত্থাপিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নানা অসার

যুক্তির অবতারণা করিয়া বলা হয় যে উহা চলা উচিত নয়। এরূপ তর্ক যে নিতান্তই বাজে কথা, তাহা অনেকবার দেখান হইয়াছে। বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক তাহাদিগকে বিধবা মনে করাই অনুচিত। কুমারীদের যেমন বিবাহ হয়, তাহাদেরও বিবাহ সেইরূপ হওয়া উচিত।

হিন্দু বিধবাদের মধ্যে যে অনেক নিতান্ত অপোগণ্ড শিশুও আছে, তাহা ১৯১১ সালের সেন্সস হইতে উদ্ধৃত নীচের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

বয়স।	সংখ্যা।
০-১	৫
১-২	১৬
২-৩	৭৬
৩-৪	২০৮
৪-৫	৬৪১
মোট ০-৫	৯৪৬
৫-১০	৮৪৩৮
১০-১৫	৩১৩৭০
১৫-২০	৯৩১৬৭
২০-২৫	১৪০৭২১
২৫-৩০	২০৯৩১৮

পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমুদয় বিধবাকে নিশ্চয় বালিকা বলিতে পারা যায়। তদূর্দ্ধ বয়সের যত বিধবা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত হাজার যে শৈশবে বা বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

বঙ্গে সমুদয় হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০৭। বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ বেশী। তাহা সত্ত্বেও মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২৭, অর্থাৎ হিন্দুবিধবার চেয়ে ৭ লক্ষ কম। বঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের দ্রুততর সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ হিন্দুসমাজ অপেক্ষা মুসলমান-সমাজে বিধবাবিবাহের অধিকতর প্রচলন। বঙ্গে হিন্দু বিপত্নীকের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮৯৩, অর্থাৎ বিধবাদের চেয়ে ২০ লক্ষ কম ; মুসলমান বিপত্নীকের সংখ্যা ২৮৮০৪৪, অর্থাৎ বিধবাদের চেয়ে ১৫ লক্ষ কম। মুসলমান-সমাজে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও যে এত বেশী বিধবা আছে, তাহার কারণ, (১) পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক একনিষ্ঠ, এবং (২) বাঙালী মুসলমান-সমাজ অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন।

সমগ্রভারতে মোট হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২ কোটি ১৯ হাজার ৫১। কম বয়সের বিধবাদের সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল।

বয়স।	বিধবার সংখ্যা।
০—১	৮৬৬
১—২	৭৫৫
২—৩	১৫৬৪
৩—৪	৩৯৮৭
৪—৫	৭৬০৩
মোট ০—৫	১৪৭৭৫
৫—১০	৭৭৫৮৫
১০—১৫	১৮১৫০৭
১৫—২০	৩৬২৯৬৬
২০—২৫	৭০২০১৩
২৫—৩০	১০৭১৮৪৫

১৩২৩ ভাদ্র

কারাগারে বিধবা

চিরবৈধব্যের জন্য অনেক স্ত্রীলোক নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। ইহা যে অনেকের চরিত্রভ্রংশের কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পতিতা নারীদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে অনেকে বাল্যে বিধবা হইয়াছিল ; তাহার পর দুষ্টলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া এক্ষণে পাপব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এসব কথা অনেকেই জানেন বা অনুমান করিতে পারেন ; কিন্তু ইহা অনেকের জানা নাই যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা আইনভঙ্গ করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা খুব বেশী।

বাংলাদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা ৩২$\frac{১}{২}$ লক্ষ বেশী ; সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৫২.৩ জন মুসলমান এবং ৪৫.২ জন হিন্দু। কিন্তু ১৯১৫ সালে যে ২৯,১৮৮ জন আসামী বাংলাদেশে জেলে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৬.৪২ জন মুসলমান, এবং ৪০.২২ জন হিন্দু। সুতরাং, যে কারণেই হউক, মোটের উপর হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা বেশী আইন ভঙ্গ করিয়াছিল।

কিন্তু যদি শুধু স্ত্রীলোক অপরাধীর হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে ১৯১৫ সালে আদালত হইতে মোট ৭০২ জন স্ত্রীলোককে জেলে পাঠান হয়। তাহার মধ্যে ৩২২ জন হিন্দু, ১৯৫ জন মুসলমান, ৮ জন বৌদ্ধ ও জৈন, ৯১ জন খৃষ্টিয়ান, এবং ৮৬ জন অন্য নানা সম্প্রদায়ের। মোট হিন্দু স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে ১০,০৯৭,১৬২ জন, এবং মোট মুসলমান স্ত্রীলোক আছে ১২,৩৭৭,২১৫; কিন্তু হিন্দু স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা কম হইলেও হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা মুসলমান অপরাধিনীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। ইহার কারণ কি? ইহা আরও চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে হয় যখন দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে মোটের উপর হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে আইনভঙ্গ কম করিয়াছিল (যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)।

তারপর আবার দেখুন মোট অপরাধিনী ৭০২ জনের মধ্যে ২৩৫ জন বিবাহিতা, ৭ জন অবিবাহিতা, ২৭৩ জন বিধবা, এবং ১৮৭ জন পতিতা নারী। এই পতিতাদের অনেকেও যে বিধবা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে অপরাধিনীদের মধ্যে বিধবাদের সংখ্যা কুমারী ও বিবাহিতাদের চেয়ে বেশী। দেশের সমগ্র অধিবাসিনীদের মধ্যে মোট অবিবাহিতা বিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যা বিবেচনা করিলে এই ন্যূনাধিক্য মনকে আরও পীড়া দেয়। বঙ্গে মোট অবিবাহিতা ৭৫,৬০,৮২৫ জন, বিবাহিতা ১,০৪,২৪,৩২২ জন এবং বিধবা ৪৫,১৬,৯০২ জন ; অর্থাৎ বিধবাদের মোট সংখ্যা বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের মোট সংখ্যার সিকি মাত্র। কিন্তু অপরাধিনী বিধবাদের সংখ্যা অপরাধিনী বিবাহিতা অবিবাহিতাদের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং ইহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকে না যে বৈধব্য আমাদের দেশের

স্ত্রীলোকদিগকে এমন অবস্থায় ফেলে যে তাহাদের মধ্যে অনেক বেশী স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে আইনভঙ্গ করে। হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা যে মুসলমান অপরাধিনীদের চেয়ে বেশী, তাহারও অন্ততঃ অন্যতম কারণ যে হিন্দুনারীর চিরবৈধব্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। যাঁহার বিশ্বাস হয় না, তিনি অন্য কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করুন।

১৩২৭ শ্রাবণ

হিন্দুবিধবার বিবাহ

শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। তজ্জন্য বৎসর বৎসর কোন কোন শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা আহ্বান করা হইয়া থাকে। কিন্তু এত সভা করিয়াও দেশের লোকে বিধবাদের দুঃখ-মোচনের বিশেষ কোন চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান্ লোক দেশে অনেক জন্মিয়াছে। তিনি বহি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারের অভাব নাই। তিনি স্কুলকলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাহা অন্যেও করিয়াছে। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন ; অনেক ধনী সমস্ত জীবনে তাঁহা অপেক্ষা বেশী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিবার কারণ কি? কারণ, তাঁহার নানাদুর্লভগুণসমন্বিত মনুষ্যত্ব। দক্ষিণ ভারতে মানুষের নামের গোড়ায় তাহার বংশের জন্মস্থানের নাম বসান হয় ; যেমন, তাঞ্জোর মাধব রাও, চিত্তুর শঙ্করন্ নায়ার, ইত্যাদি। গত বৎসর একটি বিদ্যাসাগরস্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বলিয়াছিলেন, যে, এই রীতি অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের গোড়ায় তাঁহার জন্মগ্রামের নাম সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বীরসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিলে নামটি অন্বর্থ হয়। তাঁহাতে যেমন দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা দৃঢ়চিত্ততা, সাহস, অধ্যবসায় ও পুরুষকারের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, এরূপ আর কোন প্রসিদ্ধ বাঙালীতে দেখা যায় না। এবং এই-সকল গুণ, তাঁহার বিধবাবিবাহ চালাইবার চেষ্টায় যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার আর-কোন কাজে সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। অথচ অধিকাংশ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় তাঁহার এই চেষ্টার উল্লেখ মাত্রও হয় না, কিম্বা শুধু উল্লেখই হয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা ঠিকই যে এইসব সভায় বিধবাবিবাহ সমর্থিত হয় না। কারণ, সমর্থন করিব অথচ কাজে কিছু করিব না, এরূপ ভণ্ডামি অপেক্ষা উহার উল্লেখ না করাই ভাল।

হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় এরূপ কোন যুক্তি নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় যাঁহা খণ্ডন করেন নাই। তাহার পর আরও অন্যরকমের অনেক কুতর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, বিধবাবিবাহ চলিতেছে না ; গুজরাত, পঞ্জাব অযোধ্যা, অন্ধ্র, প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাংলা দেশে কুতার্কিক, ভণ্ড, দেশাচারের দাস বেশী ; ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা কম। "আমাদের বিধবারা দেবী" বলিয়াই বাঙালী নিশ্চিন্ত। বিধবাদের মধ্যে অতি

পবিত্রস্বভাব পরহিতপরায়ণা অনেকে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক, যে, অন্য অনেকে প্রতিকূল অবস্থা, প্রলোভন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ায় দেবীত্ব লাভ করিতে পারেন না, অধিকন্তু পাপপঙ্কে নিমগ্ন, হন, এবং অন্যান্য শ্রেণীর নারী অপেক্ষা অধিত্ব সংখ্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইহা মনে রাখা দরকার যে যে-দেশে পুরুষসমাজে পাশব ও পৈশাচিক ভাবের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, এবং ন্যায়নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়, তথায় নারীসমাজে দেবীত্ব সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না।

আমাদের মন্তব্য পড়িয়া কেহ কেহ হয়ত পাশ্চাত্য সমাজের নানা পাপ ও কুপ্রথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ খারাপ প্রমাণ হইলেই আমাদের সমাজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ হইবে, ইহা মনে করা মূর্খতা। আমাদের দেশের দোষ দেখাইলেই পাশ্চাত্য সমাজের প্রশংসা করা হইল, ইহা মনে করাও তদ্রূপ মূর্খতা। পাশ্চাত্য সমাজ ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য নহে। আমাদের আলোচ্য এই যে আমরা কিরূপে ভাল হইতে পারি।

১৩৩৩ আশ্বিন

বাল্য-বিবাহের কুফল

আমাদের দেশের লোকের আয়ু ক্রমে ক্রমে ভীষণ কমিয়া যাইতেছে! অবশ্য, দারিদ্র্য হেতু খাদ্যাভাব, অশান্তি অপরিমিত পরিশ্রম ইহার জন্য খুবই দায়ী। কিন্তু এই আয়ু-হ্রাসের অন্যান্য বিশেষ কারণও আছে। তন্মধ্যে বাল্য-বিবাহ একটি প্রধান কারণ। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা বহুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিত আছে বলিয়া প্রাচীন-পন্থীরা বলেন যে, বাল্য-বিবাহ দোষের কারণ নহে। কিন্তু ও মত সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ও অজ্ঞতার ফল। মানবদেহ যতদিন নিজে সম্পূর্ণতা লাভ না করে ও যতদিন সকল পুষ্টি তাহার নিজ গঠন-কার্য্যেই ব্যয়িত হয়, ততদিন তাহার সাহায্যে অপর দেহ সৃজন-চেষ্টার ফলে জনক ও জাত উভয় দেহই দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হয়। তের বৎসর বয়সে দুর্ব্বল অপুষ্ট বালিকা সন্তান লাভ করিলে তাহার স্বাস্থ্য ত ভগ্ন হইবেই, আর যে-সন্তান সে প্রসব করিবে সেও দুর্ব্বল হইবে। এইরূপ জননীর সন্তান দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করিলে দেশে দুর্ব্বল-প্রাণ লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইহাতে দেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যদৈন্যের দিনে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করা উচিত।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে এক মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া তাহার বালিকা স্ত্রী আত্মহত্যা করে! এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"বাল্য-বিবাহ প্রথা নৈতিক ও দৈহিক উভয় দিক্ হইতেই পাপ। কারণ ইহাতে আমাদের নৈতিক ও ও শারীরিক অবনতি ঘটে। এই প্রথা পালন করিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে ও স্বরাজ-লাভ হইতে দূরে সরিয়া যাইব। বালিকার

কোমল বয়স সম্বন্ধে যে-লোকের বিবেচনা নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা নাই। যে-লোক অপুষ্টদেহ, স্বাধীনতার সংগ্রাম করিবার শক্তি তাহার নাই, আর স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিবার শক্তিও তাহার নাই। স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অর্থে কেবল রাজনৈতিক জাগরণ বুঝায় না ; তাহাতে সমাজ, শিক্ষা, নীতি, অর্থনীতি রাজনীতি, সকল প্রকার জাগরণই বুঝায়।

"সম্মতির বয়স বর্দ্ধিত করিবার জন্য আইন-ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে অল্প লোকেরই শিক্ষা হইবে। কিন্তু আইনের দ্বারা সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত পাপ নিবারিত হইবে না ;—সর্ব্ব সাধারণের মত ও বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে এ পাপ বিদূরিত হইবে না। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে যদি প্রবল জনমত দেশে থাকিত তাহা হইলে মান্দ্রাজের ঐ ঘটনা ঘটিতে পারিত না। যে-যুবকের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে, সে অশিক্ষিত শ্রমিক নয়, বুদ্ধিমান শিক্ষিত টাইপিষ্ট। বাল্য-বিবাহ যদি দেশের সাধারণের অনুমোদিত না হইত তাহা হইলে ঐ যুবক ঐ বালিকাকে বিবাহ বা স্পর্শ করিতে পারিত না। সাধারণত ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।"

দেশের শিক্ষিত সাধারণ মহাত্মা গান্ধীর কথাগুলি ভাবিয়া দেখুন।

বিধবা বিবাহ

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহু দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের শাখাগুলি সুন্দর কাজ করিতেছেন। বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে পুনর্বিবাহিত করার প্রয়োজনীয়তা আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা উপলব্ধি করিতেছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। বিগত জানুয়ারী ১৯২৬ হইতে জুলাই ১৯২৬ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে মোট ১৭০৯ টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। জাতি ও প্রদেশ হিসাবে তাহা এই ঃ—

জাতি হিসাবে—

ব্রাহ্মণ ৩২৪ ; ক্ষত্রী ২২৬ ; অরোরা ২৪৬ ; আগরওয়াল ২৫৪ ; কায়স্থ ৪৯ ; রাজপুত ১৫৬ ; শিখ ১৮১ ; বিবিধ ২৭৩ ; — মোট ১৭০৯।

প্রদেশ হিসাবে—

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১১৬৪ ; সিন্ধুদেশ ৪০ ; দিল্লী ৫১ ; সম্মিলিত প্রদেশে ৩৫০ ; বঙ্গদেশ ৬৪ ; মান্দ্রাজ ৬ ; বোম্বাই ৫ ; মধ্য ভারত ৮ ; আসাম ৫ ; বিহার ও ওড়িষ্যা ১৬ ;—মোট ১৭০৯।

এই কার্য্যে গত জুলাই মাসে স্বেচ্ছাকৃত দান পাওয়া গিয়াছে ১১৬৲ টাকা, এবং গত বৎসরে পাওয়া গিয়াছে ৭০৩১৲ টাকা।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কুমিল্লা বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা গত দুই বৎসরে ৬৬টি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা, সমাজের নানা দিক, সংস্কার প্রক্রিয়া

প্রাসঙ্গিক কথা

অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি যা সমাজদেহের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে। এ সম্পর্কে রামানন্দ দীর্ঘদিন ধরে সকলকে সচেতন করবার চেষ্টা করেছেন। অবনমিত জাতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল প্রগাঢ় সহানুভূতি। অস্পৃশ্যতার মতো ভিন্ন সামাজিক আচণের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ মন্তব্য নিয়মিত করে গেছেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে ধর্মত্যাগের প্রবণতা তাঁর গভীর বেদনার কারণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ-জীবনের নানা তথ্য তাঁর লেখায় অনিবার্যভাবে এসেছে। ব্রাহ্ম রামানন্দ নিজেকে হিন্দু বলেই মনে করতেন এবং হিন্দুসমাজের স্বার্থ তাঁর কাছে ছিল আত্মস্বার্থ।

এই সূত্রেই হিন্দুসমাজ-ক্ষয়কারী আর একটি সামাজিক বিধির অসারতা নানা যুক্তিযোগে তিনি দেখিয়েছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা-বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। হিন্দুসমাজসংস্করকেরা যেমন তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তেমনই বিতৃষ্ণার লক্ষ্য হয়েছে মদ্যপানাদি কদভ্যাসে নিরত মানুষেরা। সব জড়িয়ে সমাজসচেতন দায়িত্বশীল একটি মানুষকে আমরা পাই।

হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা

১৩১৬ অগ্রহায়ণ
[নমঃশূদ্র উন্নতির আন্দোলন]

কিছুদিন হইতে কাগজপত্রে ও সভাসমিতিতে নমঃশূদ্রদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য অল্পাধিক আন্দোলন চলিতেছে। কাজে বেশি কিছু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যতদূর জানি, ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোক খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামকে কেন্দ্রস্থল করিয়া নমঃশূদ্রদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছেন। আর কোথাও কেহ কিছু তাঁহাদের জন্য করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা নিজ সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের নিজ সংবাদপত্রও আছে। এইরূপ চেষ্টার মূল্য খুব বেশী।

নমঃশূদ্রদের সংখ্যা ১৮ লক্ষেরও অধিক। বাংলা দেশে আর কোনও জাতির সংখ্যা এত বেশি নহে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক বিশিষ্ট আরও কোন কোন জাতি আছে, যাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা নমঃশূদ্রদের অপেক্ষাও শোচনীয়। নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছে, মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারীও আছে, ২। ১ জন সরকারী উচ্চপদও পাইয়াছেন। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাউরীদের অবস্থা ধরুন। ইহাদের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষের উপর। ইহাদিগকে বাঁকুড়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের জেলাতেই বেশী দেখা যায় এই ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে মোটে ২০০০ লোক সামান্য লিখিতে ও পড়িতে পারে, অর্থাৎ হাজার করা ৪ জন ; বাকী হাজার করা ৯৯৬ জন নিরক্ষর। ৫ লক্ষের মধ্যে মোটে ১০ জন অল্প ইংরাজী জানে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এরূপ নিরক্ষর জাতি বোধ হয় আর একটিও নাই। ইহারা অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র। ইহারা অত্যন্ত মদ্যপানাসক্ত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে সতীত্বজ্ঞান বড় কম। বাউরীদের মধ্যে কুষ্ঠরোগ বড় বেশী দেখা যায়। ইহারা শূকর মুরগী প্রভৃতি বধ করিয়া খায়। গোরু বধ করিয়া খায় না, কিন্তু রোগে বা অন্য কারণে গোরু মরিলে ইহারা তাহার শব আনিয়া ভক্ষণ করে।

আমাদের বাড়ী বাঁকুড়া সহরে। আমরা পূজার বন্ধের সময় বাঁকুড়া জেলার সরকারী বৃত্তান্ত (Distrct Gazetteer of Bankura) দেখিতেছিলাম। তাহাতে দেখিলাম, ঐ জেলার ১১ লক্ষাধিক লোকের মধ্যে ১ লক্ষের উপর বাউরী, ১ লক্ষের উপর সাঁওতাল, ৯০ হাজারের উপর বাগদী, এবং ব্রাহ্মণ মোটামুটি ৯০ হাজার। আমরা ভাবিলাম, যে তাহা হইলে বাঁকুড়া, জেলার উন্নতি বলিতে এই বাউরী, সাঁওতাল ও বাগদীদের উন্নতিই প্রধানতঃ বুঝা উচিত। কিন্তু ইহাদের উন্নতির জন্য কি চেষ্টা হইতেছে? খ্রীষ্টায় মিশনরীগণ কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা কি করিতেছি?

প্রত্যেক জেলার শিক্ষিত লোকেরা যদি নিজের নিজের জেলার ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকসংখ্যা দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সংখ্যাই বেশী। অতএব কেহ যদি বাস্তবিক দেশের বা বাঙ্গালীজাতির উন্নতির চান, তাহা হইলে তাঁহাকে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের জন্য দস্তুর মত দিনের বেলা পাঠশাল খুলিয়া, বা নৈশ ইস্কুল খুলিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত।

বই, কাগজ, ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া কেবল মুখে মুখেও তাহাদিগকে নানা বিষয় শিখান যাইতে পারে। একটা যদি ম্যাজিক লণ্ঠন থাকে, তাহা হইলে ত খুবই ভাল হয়। শিক্ষা পাইয়া যে সবাই চাকরীর উমেদার হইবে তা নয়। প্রকৃত শিক্ষার গুণ এই যে উহা মানুষের চোখ খুলিয়া দেয়। মানুষ তখন নিজের দুরবস্থা বুঝিতে পারে, এবং তাহার ব্যবসা, জীবিকা, বা জীবনের কাজ যাহাই হোক না কেন, তাহাতে উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

এই যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষাদান কার্য্য, ইহা করে কে? এই কাজ করিবার জন্য উৎসৃষ্টজীবন লোক কি পাওয়া যায় না? অন্ততঃ ২।৪ জনও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, হাজার হাজার শিক্ষিত লোক দিবসের কাজ শেষ হইলে সন্ধ্যাকালটা কেবল পরের কুৎসা, গল্প গুজব, তাসখেলা, বা অত্যন্ত ঘৃণিত নানাভাবে যাপন করেন। তাঁহারা ২।১ ঘণ্টা সময় সন্ধ্যার পর এই পবিত্র কার্য্যে দিলে নিজেরাও ধন্য হইবেন, দেশেরও মঙ্গল করিতে পারিবেন।

যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা আর একটি উপায় অবলম্বন করুন। তাঁহারা এক একটি সৎ ও বুদ্ধিমান্ বাউরী, বাগদী, নমঃশূদ্র আদি বালকের শিক্ষার ভার লউন। অর্থাৎ বালকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বা জাতীয় বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে, তাহাকে ততদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার ভার লউন। এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বালকটি যদি স্বজাতির শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে, তাহা হইলে ত খুবই ভাল হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি কেবল নিজ সাংসারিক উন্নতির চেষ্টাও করে, তাহা হইলেও তাহাতে সুফল ফলিবে।

১৩২৫ অগ্রহায়ণ

সমাজ সংস্কারে বঙ্গের ঔদাসীন্য

এক দিন বঙ্গদেশ সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী ছিল। এই বঙ্গদেশেই রাজর্ষি রামমোহন নৃশংস সতীদাহ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন ও শাস্ত্রের সাহায্যে হিন্দু রমণীর দায়াধিকার প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই মহাত্মা হেয়ার, বেথুন ও বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, কবি হেমচন্দ্র ও রাসবিহারী প্রভৃতি মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ ও বিধবার চির বৈধব্য প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষিণী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বঙ্গ দেশেই নারী-জাতির উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রথম উন্মুক্ত হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশেই মহাত্মা কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ যুগযুগান্তের অত্যাচার ও অবিচারের 'বেষ্টাইল' দুর্গ জাতিভেদ-প্রথা ভূমিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বঙ্গ দেশেই শিবনাথ, আনন্দমোহন, দুর্গামোহন ও নগেন্দ্রনাথ লাঞ্ছিতা অপমানিতা নিগৃহীতা ও পুরুষ-পদদলিতা নারিজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই অবনত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রথম চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশেই সেবাশ্রম, নৈশবিদ্যালয়, শ্রমজীবী-বিদ্যালয় প্রভৃতি আধুনিক সময়োপযোগী জনহিতকর

কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এই কয়েক বৎসরের ভিতর বঙ্গদেশ সমাজসংস্কারে ভারতের সকল প্রদেশের পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনার ভারতভৃত্য সমিতি এবং পঞ্জাবের আর্য্য সমাজ শিক্ষাবিস্তারের জন্য যতদূর চেষ্টা করিতেছেন, বাঙ্গালায় সেইরূপ চেষ্টা কিছুই হইতেছে না। বোম্বাই ও মাদ্রাজের "ডিপ্রেসড্‌ক্লাস" মিশন এবং পঞ্জাবের আর্য্য সমাজ "অস্পৃশ্য" জাতির উন্নতির কল্পে যতখানি পরিশ্রম করিতেছেন, বাঙ্গালার "ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাশ" মিশন তাহার দশমাংশ পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচারিণী সভার সাহায্যে পঞ্জাব ও বোম্বাই অঞ্চলে শতশত বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে ; অথচ বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশে বিধবাবিবাহ এক প্রকার অনুষ্ঠিত হয় না বলিলেই চলে। বোম্বাইর সেবা-সদন, মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্য্য সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কই বাঙ্গালায় ত সেইরূপ কোন কার্য্য হইতেছে না। বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিক্ষিতা মহিলাগণ দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকার্য্যে পুরুষদের সহযোগিনী ; আর বাঙ্গালার মহিলাগণ অবরোধের অন্তরালে আলাস্য বিলাস ও কলহে নিজেদের জীবন ব্যর্থ করিতেছেন। বাঙ্গালা সমাজ-সংস্কারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পিছনে গড়িয়া যাইতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার প্রধানতম কারণ ভ্রান্ত স্বদেশপ্রেম। বাঙ্গালাদেশেই এই ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেমের উৎপত্তি। ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধান মনীষিগণ এই ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেমের প্রচারক। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রচণ্ড আঘাত হইতে ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সাধনা রক্ষা করিয়া ইহাঁরা দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের দ্বারাই আবার আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিও হইয়াছে। জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁরা দেশের অনেক ভ্রান্ত আদর্শ কুসংস্কার কুপ্রথা ও কদাচারে সমর্থন করিয়াছেন। তাই আজ-কাল শিক্ষিত লোকেরাও বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার চিরবৈধব্য, জাতিভেদ ও নারীজাতির অধীনতা সমর্থন করিয়া থাকেন। যত দিন এই ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেম সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই।

—নমঃশূদ্রহিতৈষী, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন।

১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

নমঃশূদ্র-সমস্যা

নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক বিদ্রোহী ভাবের প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নমঃশূদ্রগণ সচেষ্ট থাকিলে সমাজ আর ঘুমাইতে পারিবে না। বামুনদের মধ্যে ২। ১ জন এবিষয়ে অদ্ভুত যুক্তি দেখাইতেছেন। একজন পণ্ডিত বলিতেছেন, নমঃশূদ্রেরা তাহাদের পূর্ব্বজন্মের-দুষ্কৃতিবশতঃ নিম্ন জাতিতে জন্মিয়াছে ; অতএব তাহারা তাহা মানিয়া লউক। তাহাদের ইহজন্মের সুকৃতি দ্বারা ইহার পরজন্মে "উচ্চ" জাতি হইবার আশা থাকিতে পারে, ইত্যাদি। এই চমৎকার যুক্তিটি যে শুধু সামাজিক বিষয়ে প্রয়োগ করা যায়, তা নয় ; রাজনৈতিক, আর্থিক, জ্ঞানিক, সব বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে। পরাধীন জাতির স্বাধীন হইবার, দরিদ্র জাতির ধনী হইবার, অজ্ঞ জাতির জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করা উচিত নয় ; কারণ তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে। অতএব, সকলে স্বাধীন, ধনী, জ্ঞানী ইত্যাদি হইবার চেষ্টা না

করিয়া কেবল "সুকৃতি" করিতে থাক ; তাহার দ্বারা পরজন্মে স্বাধীন, ধনী, জ্ঞানী হইতে পারিবে। "সুকৃতি"র একটা মানে অবশ্য ব্রাহ্মণ-দিগকে বেশী বেশী দক্ষিণা ও ভোজ্য আদি দান।

আর-একজন পণ্ডিতপুঙ্গব "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদিগকে মানবদেহের কোন কোন অস্পৃশ্য স্থানের সহিত উপমিত করিয়া অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করেন। তাহা পরীক্ষা করিয়া আমাদের সময় ও প্রবাসীর জায়গা নষ্ট করিতে চাই না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণপুঙ্গব কি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, যে, এই তুলনা দ্বারা ঐসকল জাতির লোককে অপমান করা হইতেছে কি না?

নমঃশূদ্রদের ভবিষ্যৎ তাঁহাদের নিজের হাতে। তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছেন মনে হইতেছে। অল্পদিন হইল বঙ্গের যে সর্কারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাডিরেক্টর হর্নেল্ সাহেব তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"their present position in education and their present social advancement bring them under a higher category."

"শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক উন্নতি তাহাদিগকে উচ্চতর শ্রেণীতে আনিয়াছে।"

পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টটিতে লেখা হইয়াছে,

"The community is raising its status rapidly, and, arguing mainly from its consistent educatinal advance is constantly making out a case for being regarded as other than backward."

"নমঃশূদ্রসমাজ দ্রুত নিজের সামাজিক পদবী উন্নত করিতেছে, এবং প্রধানতঃ শিক্ষাবিষয়ে ইহার যে অবিরাম ক্রমোন্নতি হইতেছে তাহা হইতে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত জাতি বিবেচিত না হইবার প্রমাণ নমঃশূদ্রেরা সর্ব্বদা উপস্থিত করিতেছে।"

রিপোর্টের উপর সরকারীর্ মন্তব্যেও লিখিত হইয়াছে,

"Of the backwand classes the most advanced are the *Namasudras:* education has spread among them to such an extent that it is doubtul whetcher they should now be included among the backward classes."

"অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে নমঃশূদ্রেরা সকলের চেয়ে অগ্রসর ; তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এরূপ হইয়াছে যে, তাহাদিগকে এখন পশ্চাৎপদ শ্রেণীর অন্তর্ভূত মনে করা উচিত কি না, সন্দেহ।"

দক্ষিণ ভারতে জাত্যভিমান

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের ভাইকম্ নামক স্থানের একটি দেবমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া "নিম্ন" শ্রেণীর কতকগুলি জাতিকে ব্রাহ্মণাদি "উচ্চ" বর্ণের লোকেরা যাইতে দেয় না ; "নিম্ন" শ্রেণীর লোকেরা যাইবার অধিকার স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ত্রিবাঙ্কুড় গবর্ণমেণ্ট মন্দিরটির ট্রষ্টী অর্থাৎ ন্যাসরক্ষক। ঐ গবর্ণমেন্ট্ "নিম্ন" শ্রেণীর যাহারা ঐ রাস্তায় যাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া

জেলে পাঠাইতেছেন। এইপ্রকার সত্যাগ্রহ চলিতেছে।

দক্ষিণ ভারতেই তিন্নেভেল্লী সহরের একটি রাস্তার অধিবাসীরা "উচ্চ" বর্ণের। তাহারা বলিয়াছে, তাহারা মিউনিসিপ্যালিটিকে "নীচ" জাতির কুলি দ্বারা ঐ রাস্তাটি মেরামত করাইতে দিবে না ; "উচ্চ" জাতের কুলি চাই! অপরের পরোক্ষ সম্পর্শে তাঁহাদের পবিত্রদেহ অপবিত্র হইবার যখন এতই আশঙ্কা, তখন তাঁহারা রাস্তা মেরামত নর্দ্দমা সাফ, পায়খানা পরিষ্কার প্রভৃতি সব কাজ নিজেরাই করুন না?

দক্ষিণে জাত্যভিমানের এইরূপ অতিবাড়। অতএব আমরা ভারতীয়েরা কোন্ মুখে বলিব, যে, দক্ষিণ অফ্রিকার শ্বেতকায়েরা তথাকার ভারতীয়দিগকে বিশেষ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাখিবার আইন করিয়া আমাদের অপমান, অনিষ্ট ও নির্য্যাতনের চেষ্টা করিতেছে? আমাদের নিজের দেশেও ত কোন কোন শ্রেণীর লোক অপর কোন কোন শ্রেণীর লোকের প্রতিও অবজ্ঞাসূচক অমানবিক ব্যবহার করিতেছে। ভারতের যে প্রদেশেই হউক, যেসব উচ্চবর্ণের লোক নিম্নবর্ণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ও অবমাননাকর দেশাচার কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা দেশের ও মানবসমাজের শত্রুর কাজই করিতেছেন।

১৩৩২ বৈশাখ

হোষঙ্গাবাদে 'অস্পৃশ্যতা'

মধ্য প্রদেশের হোষঙ্গাবাদ সহরের সহরের কতকগুলি তথাকথিত অস্পৃশ্য লোক সাধারণের কূপ হইতে জল তুলিবার অনুমতি কর্ত্তৃকপক্ষের নিকট চাহিয়াছিল, নতুবা তাহাদিগকে দারুণ গ্রীষ্মে ও রৌদ্রে বহুদূরবর্ত্তী নর্ম্মদানদী হইতে জল আনিতে যাইতে হয়। অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতিকূলতায় তাহারা কূপ হইতে জল তুলিতে পারিতেছে না। এ-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদনায়ের শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে, খবরের কাগজে তাহার বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা ভারতীয় বা হিন্দু বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, গোঁড়ারা বলিয়াছেন, হিন্দু মহাসভাকর্ত্তৃক মনোনীত সমগ্র ভারতীয় বিদ্বজ্জনসভা যদি সাধারণের কূপ হইতে "অস্পৃশ্যদিগকে" জল তুলিবার অধিকার দেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন। হোষঙ্গাবাদের মিউসিপ্যাল্ সভাপতি এখন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে এই বিদ্বজ্জনসভার নিকট বিষয়টি উপস্থিত করিয়া শীঘ্র ব্যবস্থা লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেখা যাক্, হিন্দু মহাসভার কলিকাতার অধিবেশনে কি হয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে সামাজিক সংকীর্ণতা ও ভীরুতা এত বাড়িয়াছে, যে, হিন্দু মহাসভা বা বিদ্বজ্জনসভা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা দিলেই যে তাহা দেশের সর্ব্বত্র গৃহীত ও অনুসৃত হইবে, এমন আশা হয় না।

কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার কাজ

এবার বাংলা দেশে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইতেছে। বঙ্গে হিন্দুর ক্রমশঃ হ্রাস ও অধোগতি হইতেছে। ইহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সামাজিক প্রধান চারিটি উপায়—(১) বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের উচ্ছেদসাধন, (২) নিঃসন্তানা অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ পূরা প্রচলন, (৩) স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ বিস্তার, এবং (৪) যে-সকল জাতিকে লোকে ভ্রান্ত-সংস্কার-বশতঃ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সামাজিক অধিকার ও সম্মান প্রদান, এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন। এই চারিদিকে উন্নতির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন মূল্যহীন হইবে।

আমরা কাহাকেও অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করি না। সুতরাং কোন-কোন জাতির নামের উল্লেখ এখানে করিলে কেহ-যেন মনে না করেন, যে, আমরা তাঁহাদিগকে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত মনে করি। ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিলাম, বঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৩৯ মাত্র। বৈদ্যদের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষের উপর। কায়স্থদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৩৬। সেন্সস্ রিপোর্টের মতে চাষী কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যদের সংখ্যা ২২ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮৪। নমঃশূদ্রের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৬ হাজার ২৫৯। রাজবংশীদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ১১১, ইত্যাদি। অতএব ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরাই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহারা এরূপ ভাণ করিলে চলিবে না।

নমঃশূদ্রেরা ইতিমধ্যেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে তাঁহাদের অনেকে মুসলমান ও অনেকে খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইবেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নিন্দনীয় নহে ; অন্য কোন কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নমঃশূদ্রদের পক্ষে এবং সাধারণতঃ হিন্দু-সমাজের পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে না।

১৩৪২ মাঘ

অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচেষ্টার কিছু পূর্ব্বকথা

অস্পৃশ্যতা জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদের অপকৃষ্টতম সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর রূপ বটে। কিন্তু জাতিভেদ দূর না করিলে অস্পৃশ্যতা সমূলে বিনষ্ট হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়া সেদিন "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছেন, "Caste must go," "জাতিভেদকে বিদায় দিতে হইবে।" আধুনিক যুগে মত প্রচার দ্বারা ও আচরণ দ্বারা হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দূর করিতে প্রথম চেষ্টা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। রামমোহন রায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রণীত জাতিভেদবিরোধী "বজ্রসূচী" সানুবাদ প্রকাশ করিয়া, ব্যক্তিগত কোন কোন আচরণে

জাতিভেদ না মানিয়া, এবং সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপ গিয়া জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রথম কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রে সতীদাহ-নিবারণ এবং নারী জাতির অকল্যাণকর অন্য কোন কোন ব্যবস্থা ও প্রথার পরিবর্ত্তন লইয়াই তিনি প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিলেন, অসবর্ণ বিবাহ আদির প্রচলন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সাক্ষাৎ চেষ্টা তিনি কিছু করেন নাই। আমরা যত দূর জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত আচরণে অস্পৃশ্যতা মানিতেন না, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎভাবে জাতিভেদ নষ্ট করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। সেই চেষ্টা কেশবচন্দ্রই নানা দিক্ দিয়া প্রথম করেন। অসবর্ণ বিবাহ আদি তিনি প্রথম চালান। স্বামী বিবেকানন্দ অবনত জাতিদের অভ্যুত্থান দ্বারা ভারতবর্ষ ও হিন্দুজাতি শক্তিশালী হইবে মনে করিতেন ও বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের উপর তিনি খুব আস্থা রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই কেহ কেহ লিখিয়াছেন (এবং আমরাও দেখিতেছি) যে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই, যদিও তাঁহারা আর্ত্তত্রাণে প্রভৃত প্রশংসনীয় চেষ্টা এবং শিক্ষাবিস্তারার্থ কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কংগ্রেসের কৃত্যসমূহের অঙ্গীভূত করিতে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিঠল রাম শিন্দে মহাত্মা গান্ধীকে প্রবৃত্ত করেন। তাহার আগে হইতেই শিন্দে মহাশয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবনতশ্রেনীসহায়ক মিশন (Depressed Classes Mission) চালাইয়া আসিতেছিলেন। এই মিশন এখনও বিদ্যমান ও সক্রিয় আছে। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত কে রঙ্গরাও কংগ্রেস এ-বিষয়ে মন দিবার আগে হইতেই মাঙ্গালোরে ঐ প্রকার কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও এই কাজ এখনও চলিতেছে। আর্য্যসমাজ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অনেক চেষ্টা করিয়া

১৩৪৩ অগ্রহায়ণ

লাহোর হরিজন কন্‌ফারেন্স্

লাহোরে নিখিল ভারত হরিজন কনফারেন্স স্থির করিয়াছেন, যে, হরিজনরা হিন্দুই থাকিবেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিবার নিমিত্ত যে দেশব্যাপী চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা প্রীত ; কিন্তু হিন্দু সমাজসংস্কারের মন্থর গতিতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট। এই অসন্তোষ ভিত্তিহীন নহে। জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে যথাসম্ভব মুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা, হিন্দুদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহার স্বদেশবাসীদের পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারেন।

১৩১৮ চৈত্র
[সাহারা কি শুঁড়ি?]

বারেন্দ্র সাহাদিগকে ১৯১০ সালের সেন্সসে শুঁড়ি বলিয়া গণ্য করায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হয়েন। তাঁহারা বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, তাঁহারা বৈশ্য, শুঁড়ি নহেন। মদ প্রস্তুত ও বিক্রী করা অতি নীচকাজ ও পাপকাজ (ঔষধার্থ ব্যতীতে)। তাঁহারা সদাচারী, এরূপ কাজ করেন না, এবং শুঁড়িদের সঙ্গে সংস্রবও রাখেন না। অতএব তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া ভদ্রশ্রেণীর লোক মনে করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

১৩২৪ ফাল্গুন
রিপন কলেজ ছাত্রাবাসে

ইহা সকলেই জানেন, যে, বাংলাদেশে শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে লোকাচার ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আহার-ব্যবহারে জাতিবিচার করিলেও, তদপেক্ষা বেশী লোক সেরূপ বিচার করে না। বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে জাতিবিচার প্রধানতঃ বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনেই করা হয়। রেলে, ষ্টীমারে, চা-পানের দোকানে, হিন্দু ও অহিন্দু হোটেলে, খাবারের দোকানে, বন্ধুবর্গের মধ্যে ভোজে, বরযাত্রীর ভোজে পর্য্যন্ত, পাংক্তেয়তার বিচার বড় দেখা যায় না। সুতরাং পাংক্তেয়তা লইয়া একটি কলেজের ছাত্রাবাসে জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে শুনিলে বড় দুঃখ হয়। রিপন কলেজের ছাত্রাবাসের কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র বৈশ্য সাহা জাতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এক ভোজনকক্ষে খাইতে অস্বীকার করায় গোলমাল হইয়াছে। কলেজের স্থাপনকর্ত্তা সুরেন্দ্রবাবু ও কমিটির অন্যতম সভ্য তাঁহার জামাতা লেফ্‌টেনণ্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ মনোমালিন্যের বিরোধী। আশা করি, এত দিনে গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। আমরা এমন কথা বলি না, যে, কাহারও অন্য জাতের লোকের সঙ্গে এক ঘরে বা পংক্তিতে বসিয়া খাইতে আপত্তি থাকিলেও তাহাকে একসঙ্গে খাইতে বাধ্য করিতে হইবে ; কখনও না। কিন্তু তেমনি জোরে ইহাও বলি যে যাহাদের একত্র খাইতে আপত্তি নাই, তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র খাইতে বাধ্য করা উচিত নয়। আবশ্যক হইলে, একত্র খাইবার ও স্বতন্ত্র খাইবার দুই রকমেরই বন্দোবস্ত থাকা উচিত ; যেমন রবিবাবুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আছে। সেখানে উভয় বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একত্র খাওয়ার দলই বড়।

যাঁহারা একত্র অন্য জাতির সহিত একঘরে খাইতে চান না, তাঁহাদের একটু আত্মপরীক্ষার দরকার। তাঁহারা রেলগাড়ীতে, রেলওয়ের প্লাটফর্মে ষ্টীমারে, বয়স্যাদের মধ্যে ভোজে,

জাতিবিচার রক্ষা করিতে পারেন কি না ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা কেহ চা-পানের দোকানে, হিন্দু বা অহিন্দু হোটেলে, এবং খাবারের দোকানে খান কি না, ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা ভাতের মণ্ড দিয়া পাকান ও জড়ান চুরুট খান কি না, এই ভাত নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের রাঁধা কি না, চুরুট-প্রস্তুতকারীরা সুব্রাহ্মণ কি না, এবং যত হাত দিয়া চুরুট দোকানে আসিয়াছে ও বিক্রী হইতেছে, তাহারা ব্রাহ্মণ কি না, সব ভাবিয়া দেখিবেন। দেশী বিদেশী বিস্কুট ও অন্যান্য অনেক জিনিষ সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্ন করা যায়।

বৈশ্য সাহা ছাত্রগণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি। কিন্তু তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া যে আমরা তাঁহাদের পক্ষে, তাহা নয় ; তাঁহারা মানুষ বলিয়াই আমরা তাঁহাদের পক্ষে। এই কারণে আমরা তাঁহাদিগকেও একটি কথা বলিতে চাই। ব্রাহ্মণ কোন কোন ছাত্র তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় ও ভোজনকক্ষে সাহচর্য্যের অযোগ্য মনে করায় তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ; ক্ষুণ্ণ হইবার যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু সামাজিক প্রথা অনুসারে যাঁহারা তাঁহাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া বিবেচিত হন, সাহারা কি তাঁহাদের সহিত সমান সমান ব্যবহার করিতে ও তাঁহাদের সঙ্গে এক কক্ষে ও পংক্তিতে বসিয়া খাইতে রাজী আছেন? যদি রাজী থাকেন, উত্তম। কিন্তু যদি রাজী না থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাঁহাদের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। ভেদ যদি মানিতে হয়, সকলের বেলায়ই মানিতে হইবে ; যদি মানিতে না হয়, তাহা হইলে কাহারও বেলায় মানিতে হইবে না। এক ঘরে এক পংক্তিতে সকল জাতির সহিত বসিয়া খাইলে ঐহিক বা পারত্রিক, শারীরিক বা আধ্যাত্মিক, কোনও অকল্যাণ হয় না।

ওড়িয়া কুলির অপঘাত মৃত্যু

কয়েকটি ইংরেজী কাগজে একজন ওড়িয়া কুলির অপঘাত মৃত্যুর বৃত্তান্ত দেখিলাম। তাহাতে অসম্ভব বা বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু না থাকায় খবরটি সংক্ষেপে দিতেছি। একজন ওড়িয়া কুলি একখানা আফিস-যান ঘোড়ার গাড়ীর আঘাতে পড়িয়া যায়, ও গুরুতর আঘাত পাওয়ায় মুর্মুষু দশায় উপস্থিত হয়। একজন পথিক মুমুর্ষু লোকটির মৃত্যুযন্ত্রণার লাঘব করিবার নিমিত্ত জল চাওয়ায় নিকটবর্ত্তী একটি দোকান হইতে একটি পিতলের ঘটী করিয়া জল আনীত হয়। পথিক যখন আহত লোকটির রক্ত ধুইতেছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহাকে জল পান করাইতে-ছিলেন, তখন অকস্মাৎ ঘটীটি তাঁহার হাত হইতে জোরে কাড়িয়া লওয়া হইল। ঘণ্টা খানেক পরে কুলিটি মারা পড়ে। তাহার স্পর্শে পিতলের ঘটীটি অপবিত্র হইবার ভয়ে বোধ হয় উহার মালিক উহা কাড়িয়া লইয়াছিল! জল পাইলে কুলিটি বাঁচিত কি না, জানি না ; কিন্তু ঘটীটি কাড়িয়া না লইলে প্রমাণ হইত যে সমাজদেহে কুসংস্কার অপেক্ষা দয়ামায়ার শক্তি বেশী। কিন্তু প্রমাণ যাহা হইয়াছে, তাহা এই, যে মরণাপন্ন একজন কুলির প্রাণরক্ষা বা দুঃখলাঘব অপেক্ষা পিতলের ঘটী "পবিত্র" রাখা বেশী বাঞ্ছনীয়, এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন লোকের আছে।

শতকরা কতজন লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, জানি না।

সংবাদটি মিথ্যা হইলে সুখের বিষয় হয়। কিন্তু মিথ্যা কি না কেমন করিয়া জানিব?

১৩২৭ চৈত্র

তথাকথিত "অনাচরণীয়" দিগের কথা

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় যখন স্বদেশী আন্দোলন হয়, তখন অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান তাহাতে যোগ দেন নাই, অধিকাংশ নমঃশূদ্রও যোগ দেন নাই। এখন যে সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মত আগে আগে প্রকাশ করিয়াছি, এখন পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, এখন কুড়ি লক্ষ নমঃশূদ্রদিগকে এই বলিয়া উহাতে যোগ না দিতে বলা হইতেছে, যে একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টই তোমাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, আর কেহ করে নাই, অতএব এই আন্দোলনে যোগ দিও না, ইত্যাদি। পাদ্রী মীড্ সাহেব এইরূপ কথা বলিতেছেন। এসব কথা কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা আমরা করিব না।

দক্ষিণ ভারতে অ-ব্রাহ্মণ প্রচেষ্টা দ্বারাও ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলকে ব্রাহ্মণদিগের হইতে পৃথক্ রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

এবম্বিধ নানা চেষ্টায় জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভে প্রভূত বাধা জন্মিয়াছে।

আমরা ধর্ম্মের দিক্ দিয়া কোন জাতি বা জা'তকে হেয় হীন অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য মনে করি না। রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যে, যতদিন সামাজিক রীতি কোন জা'তকে হীন অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য আখ্যা দিবে, ততদিন জাতীয় সংহতত্ব ও আত্মকর্ত্তৃত্ব সুদূরপরাহত থাকিবে।

দক্ষিণ ভারতে এই শ্রেণীভুক্ত, সংখ্যায় ষাট লক্ষ, "আদ্রি দ্রাবিড়"দিগের সভায় তাঁহারা গত নবেম্বর মাসে অতি কঠোর ভাষায় একটি প্রস্তাব ধার্য্য করেন। তাহার শেষ অংশ তুলিয়া দিতেছি।

All this meeting is firmly convinced that General Dyer was an angel of mercy compared with the caste system of Varnashrama Dharma which resulted in racial segregation and consequently living death of sixty millions of men and women for so many centuries and that Colonel Frank Johnson, who ordered Indians to crawl on their bellies through certain streets in Amritsar, was the soul of compassion compared with those Varnashrama Dharmists who would not allow members of our community even to crawl on their bellies through their streets, and calls upon Mr. Gandhi and his co-workers to have moral courage to remove these grosser and greater social wrongs of ages before trying to redress lesser political wrongs of yesterday and seeking to destroy the Brit-

ish Government which has been still and is on the whole the justest and best Government which India has or can have at the present imperfect stage of her national evolution.

এই প্রস্তাবটির ভাষা ভাব ও মতের সমালোচনা বা সমর্থন কিছুই করিব না (যদিও ইহা সত্য যে দক্ষিণ ভারতে শত শত গ্রামে ও নগরে ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চজাতিদের অধ্যুষিত পল্লীতে "অস্পৃশ্য" জাতিরা, পায়ে চলিয়া ত নহেই, বুকে হাঁটিয়াও যাইতে পায় না)। কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, যে-দেশে লক্ষ-লক্ষ লোকের মনের ভাব অপর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতি, এইরূপ, সেদেশে যেমন জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা করা দরকার, সামাজিক সদ্ভাব ও সাম্য স্থাপনের জন্য অন্ততঃ ততটা চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। আমরা যে কত বৎসর ধরিয়া এসব কথা বলিতেছি মনে নাই। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টা উপলক্ষে বহুবার বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা" দূর করিতে না পারিলে, ৮ মাসে কেন এক শতাব্দীতেও আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব না। ইহা অতি সত্য কথা।

১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ

অবনমিত জাতির প্রতি অত্যাচার

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন ঃ—

১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে ঢাকা সদর মহকুমার অন্তর্গত নয়ানগর গ্রামে চাউলপিণ্ডের পরিবর্ত্তে নমঃশূদ্রেরা অন্নপিণ্ড দিতে আরম্ভ করাতে স্থানীয় কতিপয় দুর্দ্দান্ত লোক শতাধিক লাঠিয়াল-প্রেরণ করতঃ বিবিধপ্রকার ভীষণ অত্যাচার করে। সরলমতি নিরক্ষর নমঃশূদ্রদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়া ঘরের বেড়া, দুয়ার, ও শ্রাদ্ধমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করে এবং গৃহস্বামী দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ ৭জন লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার, মারপিট ও জখম করিয়া ৫ জনকে কয়েদ করিয়া লইয়া যায়। পুলিশ মন্থরগতিতে তদন্ত করিয়া বহু সপ্তাহ পরে বিচারার্থ চালান দিতে বাধ্য হয়। অবনতজাতির উন্নতিবিধায়িনী-সমিতির সম্পাদক পুলিশের প্রতি-পদবিক্ষেপে তাহাদের কার্য্যের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিতেছিলেন। প্রহারের ১০ দিন পরে হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়, কিন্তু ডাক্তার-সাহেব বলেন প্রহার সে মৃত্যুর কারণ নহে। অতঃপর আবার কয়েক সপ্তাহ আসামীগণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করায় পুলিশ তাহাদিগকে ধৃত করিতে অশক্ত হয়। অবশেষে একজন জমিদার আসামী অনুগ্রহ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে ১৮জন আসামীর মধ্যে কেবলমাত্র ৯জন আসামীর প্রথম বিচার গত মে মাসে আরম্ভ হয়।

এই বিচার আরম্ভের পর অবশিষ্ট ৯ জন আসামী ১ জন ২ জন করিয়া ৭ই জুলাই হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। বিগত ৭ই আগষ্ট বিচারালয়ে অর্পিত ৯ জনের ৩ জন খালাস পায় ও ৬ জনের ৩ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত হাঙ্গামা ও কয়েদ করার অপরাধে কারাদণ্ড হয়। উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া আসামীগণ জজ কিম্বা হাইকোর্টে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই।

এদিকে শেষোক্ত ৯জন আসামী গ্রেপ্তার হইলে কিম্বা আত্মসমর্পণ করিলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের বিচারের দিন বিগত ৩রা নভেম্বর স্থিরীকৃত হয়। ঐ তারিখে বিচারক রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের

অনুপস্থিতি, ১ জন আসামী অসুস্থ বলিয়া আদালতে না আসায় নূতন বিচারক আর-বি-মুখোপাধ্যায় মোকদ্দমা মুল্‌তবী রাখিয়া ২৫শে নভেম্বর বিচারের দিন ধার্য্য করেন।

৩রা নভেম্বর হইতে ২৩শে নভেম্বর এই ২০ দিনের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। ২৫শে নভেম্বরের ১ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে বাজারে গুজব উঠে যে এ মোকদ্দমা নাকি পুলিশ উঠাইয়া লইবে ; বাদীপক্ষ তাহা শুনিয়া অবাক্ এবং বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক হয়। নির্দ্ধারিত তারিখের ২ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর মধ্যাহ্নে সরকার বাহাদুরের কোর্ট-পুলিস গবর্ণমেন্ট-প্রোসিকিউটার নাম ধারণ করিয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য বিচারক রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট দর্‌খাস্ত উপস্থিত করেন।

বিচারক মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার হুকুম দিবার পূর্ব্বেই, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার সাক্ষীদিগকে আদালতে হাজির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্যই কোনরূপে অবগত হইয়াছিলেন যে মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে হুকুম দেওয়া হইবে। আবেদন পাইয়া বিচারপতি রায় বাহাদুর মহাশয় অবলীলাক্রমে এবং কোনও কারণ প্রদর্শন না করিয়া উহা তুলিয়া লইতে হুকুম দিলেন। উপরোক্ত সংবাদ শুনিয়া মৃত দ্বারকানাথের পুত্র জগৎচন্দ্র রায় অনুনয় বিনয় করিয়া আবেদন করিলেন যে পুলিশ মোকদ্দমা না চালাইলেও আমি উহা চালাইব এবং সমুদয় খরচ বহন করিব, আমাকে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেওয়া হউক। সেই দর্‌খাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া রায় বাহাদুর হুকুম দিলেন।

রায় বাহাদুরের হুকুমের অর্থ এই ২ জন একজনকে খুন করিয়াছে। একজন প্রথমে ধৃত হইয়াছিল, তাহার সাজা হইয়াছে। দ্বিতীয় আসামী কয়েক দিন পলাইয়া থাকিয়া পরে ধরা দিয়াছে। তাহাকে সাজা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। তাই মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে বিচারপতি টীউনন্ এবং সি সি ঘোষ নূতন আসামীদের বিচারের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক, এক কপর্দ্দকও না লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করতঃ উদ্যমশীল মিষ্টভাষী যুবক উকীল শ্রীমান্ হেমেন্দ্রকুমার দাস নমঃশূদ্রদিগের পক্ষে সমর্থন করিয়া যে কার্য্যকুশলতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নমঃশূদ্র-সমাজে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

হাইকোর্ট স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর আসামীদিগকে খালাস দিয়া বে-আইনী কার্য্য করিয়াছেন। অতএব তাহাদের পুনর্ব্বিচার হইবে। একটা প্রশ্ন—এই পুলিস কেন আসামীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমায় অত্যাচারীরা পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছে। পুলিশের ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয় হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যে তাহাদের অযোগ্যতা ও কর্ত্তব্যে অবহেলা, উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। অবহেলার কারণ কি? ফৌজদারী বিচারে বিচারকেরা কখন কখন পুলিশের কিরূপ আজ্ঞাকারী হয়, তাহারও প্রমাণ এই মোকদ্দমায় রহিয়াছে। "বঙ্গীয় অবনত সমাজের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতির" সম্পাদক রায় সাহেব রাজমোহন দাস এই মোকদ্দমায় মন না দিলে অত্যাচারীর দণ্ড হইত না। তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

নমঃশূদ্রেরা চাউলপিণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্নপিণ্ড দিলে অন্যের তাহাতে কি আসে যায়? যদি তাহারা মনে করে যে, অন্নপিণ্ড দিয়া তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বাড়িবে, তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার যাহারা করে, তাহারা অতি অধম। এই ব্যাপারে মুসলমানদের যোগদান অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। নমঃশূদ্রের সামাজিক কার্য্যে মুসলমানের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই যে মানুষকে পদদলিত করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি, এই যে লাঞ্ছিত শ্রেণীর উন্নতি-চেষ্টায় পরশ্রীকাতর হইয়া তাহাতে বাধা দেওয়া ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা, ইহা কেবল বাংলাদেশের বিশেষত্ব নহে, অন্যান্য প্রদেশেও

আছে। গান্ধী মহাশয়ের কাগজে লেখা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ভারতে "অস্পৃশ্য" জাতীয় লোকেরা একটু ভাল কাপড় পরিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতির কোন চিহ্ন দেখিলে, "উচ্চ" শ্রেণীর লোকেরা ঈর্য্যান্বিত হয়, এবং মনে করে, যে, ঘোর কলি উপস্থিত, সনাতন ধর্ম্ম আর টেকে না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতে দেখা যায়, যে, তিনি একদা মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালে কোন পারেয়াকে নূতন কাপড় পরার অপরাধে কোন কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হওয়ার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। নানা স্থানের "উচ্চ" শ্রেণীর লোকদের এই যে অতিজঘন্য ও ঘৃণ্য মনোভাব, ইহার কথা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, জাতীয় একতা ও উন্নতি সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। বক্ষ্যমান অত্যাচারের মত অত্যাচার যখন দেশে হইবে না, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে, অত্যাচার হইলেও তাহার ন্যায়বিচার ও ন্যায়দণ্ডবিধান দেশনায়কদের দ্বারা হইতে পারিবে তখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

১৩২৮ ভাদ্র

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

গান্ধী মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের মধ্যে সকল জাতির লোককে অস্পৃশ্য মনে করা হয়, তাঁহাদের যে এই অস্পৃশ্যতার বিশ্বাস কার্য্যতঃ দূর করিতে না পারিলে, "স্পৃশ্য" জাতিদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে না পারিলে, এক বৎসরে কেন, একশত বৎসরেও স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে এইরূপ ব্যবহার করেন। কিছুদিন আগে, স্বরাজ লাভের জন্য দেশের লোকদিগকে কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যে ব্যবস্থা দেন, তাহাতে "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণকে প্রথম স্থান দেন।

সেইজন্য তাঁহার অনুবর্ত্তী স্বরাজপ্রার্থীদিগের এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, এরূপ কথা হইয়াছে, যে, ব্যারিষ্টার, উকীল বা মোক্তার আইনের ব্যবসা ত্যাগ না করিলে প্রকাশ্য সভায় নেতারূপে বক্তৃতা করিতে [পারিবেন] না ; এরূপ কথা উঠিয়াছে, যে, আইন ব্যবসায়ে [নিত্য] ব্যারিষ্টার উকীল বা মোক্তার কংগ্রেস্ কমিটির সভ্য [হইতে] পারিবেন না ; এরূপ কথা উঠিয়াছে, যে, "খাদি" না পরিলে কংগ্রেস্-সম্পর্কীয় সভায় কোন সভ্য [উপস্থিত] হইতে পারিবেন না।

কিন্তু এরূপ কথা বেশী লোকে তুলেন নাই,— একজনও আছেন কি না জানি না—যে, যিনি শুধু মুখের কথায় [নহে] কাজেও, "অস্পৃশ্যতায়" বিশ্বাস ত্যাগ না করিবেন, তিনি [অসহযোগ] সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না কংগ্রেস্-কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না, কিম্বা [কংগ্রেস্] সম্বন্ধীয় কোন সভায় সভ্যরূপে উপস্থিত হইতে [পারিবেন] না।

গান্ধী মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে অস্পৃশ্যতা মানেন না বটে, কিন্তু তিনিও এ বিষয়ে নিজের

সমুদয় কর্ত্তব্য করিতেছেন না। স্বরাজ লাভের জন্য তাঁহার মতে এখন যে পাঁচটি কাজ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে অস্পৃশ্যতা-নিবারণকে তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন বটে ; কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নানা বিষয়ে প্রস্তাব ধার্য্য হইল, কিন্তু অস্পৃশ্যতা বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীও কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন না!

অমানুষের মধ্যে মানুষ

যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার অধিকাংশ উকীল গান্ধী মহাশয়ের আদর্শ অনুসারে স্বরাজলিপ্সু ও "অসহযোগী" কি না, জানি না ; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ, যে, গান্ধী মহাশয়ের আদর্শ অনুসারে স্বরাজ পাইবার অধিকারী নহেন, তাহা নীচে "কল্যাণী" হইতে উদ্ধৃত চিঠিগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

নড়াইলের উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জাতিতে নমঃশূদ্র। লাইব্রেরীর পিওন শ্রীপ্রিয়নাথ পাল ক্রমিক ছয় মাস তাঁহাকে জল দিবার পর হঠাৎ একদিন সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়া জানায় যে নমঃশূদ্র উকিলটিকে সে আর জল ও পান দিতে পারিবে না। উকিল জ্যোতিষবাবু (মিত্র) ও প্রহ্লাদ-বাবু ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য করিতে বলেন এবং তাঁহারা বলেন সামাজিক জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উকিলকে উকিল-জ্ঞানে যিনি জল ও পান দিতে প্রস্তুত এমন লোক আমাদের নিযুক্ত রাখা উচিত। কিন্তু এই দুই উকিলের প্রস্তাব ভোটে পরাজয় স্বীকার করে এবং প্রিয়নাথের আবেদন সমর্থিত হয়। প্রায় সপ্তাহাধিক কাল বেচারা দেবেন-বাবু নিরম্বু ও নিস্পান থাকিতে বাধ্য হন।

তখন "কল্যাণী"-সম্পাদক সেক্রেটারীর নিকট নিম্ন পত্রখানি লিখেন।

"KALYANI" OFFICE, Narail
11 th July, 1921,To The
Secretary, BAr Libray Narail.

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, পরস্পর শ্রুত হইলাম, যে, নড়াইল বারের উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় জাতিতে নমঃশূদ্র বিধায় আপনাদের বর্ত্তমান দপ্তরী প্রিয়নাথ পাল মহাশয় তাঁহাকে জল ও পান দিতে অস্বীকার করায়, বিধিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেবেন-বাবুর জন্য পৃথক কোনও বন্দোবস্ত করিবার ভার সেক্রেটারী মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছেন। পরস্পর ইহাও শ্রুত হইলাম যে দেবেন-বাবুকে জল ও পান দেওয়ার কোনও সুবন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

যদি উপরোক্ত বৃত্তান্ত সত্য হয়, তবে, মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনারা যে দু'চার দিন দেবেন-বাবুকে জল পান দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব করিতেছেন, সে কয়েক দিনের জন্য মাত্র দেবেন -বাবুকে ঐ দুই বস্তু দেওয়ার কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। সামান্য কয়েক দিনের জন্য আমি কোনও বেতন প্রার্থনা করি না। মহাশয়ের আদেশাপেক্ষায়

একান্ত বিনীত
(স্বাক্ষর) শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

ঐ চিঠির উত্তরে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী মহাশয় লিখেন ঃ—নং৭

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু ঃ—

নড়াইল বার লাইব্রেরীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের জল পান দিবার কোনরূপ সুব্যবস্থা হইতেছে না বলিয়া এবং যতদিন ঐরূপ কোন ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন আপনি উক্ত সদস্যকে

জল ও পান দিবার জন্য নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিয়া আমার নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা পাইয়া প্রীত হইলাম। উক্ত কার্য্যের জন্য আপনার পত্র অনুসারে আপনাকে সাময়িক-ভাবে বার লাইব্রেরী হইতে নিযুক্ত করা সাব্যস্ত হইয়াছে। আপনাকে এই পত্র দিয়া জানাইতেছি যে, 'আপনি আগামী কল্য হইতে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবেন। আগামী কল্য বেলা ১২ টার সময় আপনি বার লাইব্রেরীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ-মত কার্য্য করিবেন। ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক,
বার লাইব্রেরী, নড়াইল।

সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে কার্য্যে যোগদান করিয়া নিম্নে উপদেশ দুইটি প্রাপ্ত হয়েন এবং সুস্থ মনে ও সরল চিত্তে উহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

উপদেশ—

(১) দেবেন-বাবুর চাকর উকিল-বাবুদের সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না।

(২) নমঃশূদ্র দেবেন-বাবুর চাকর সাধারণ উকিল-বাবুদের জল ও পান স্পর্শ করিবেন না। গৃহের বাহির হইতে দাঁড়াইয়া প্রিয়নাথের নিকট হইতে ঐ দুই বস্তু গ্রহণ করিবেন।

কার্য্যগতিকে সম্পাদক মহাশয় কলিকাতা যান। পরে তাঁহার উপর নিম্ন নোটিশখানি জারি করা হয়—

শ্রীযুত জলধর চট্টোপাধ্যায়, "কল্যাণী"-সম্পাদক, নড়াইল।

আপনার ১১।৭।২১ তারিখের প্রার্থনা-মত আপনাকে আপনার প্রার্থিত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি ১১।৭।২১ তারিখে কেবল একদিন মাত্র কার্য্যে যোগদান করতঃ বিনা নোটীশে অনুপস্থিত হইতেছেন, কোন কার্য্য স্বীকার করিয়া এইরূপ বিনানুমতিতে স্থান ত্যাগ করা অথবা অনুপস্থিত হওয়া আইন, ন্যায় ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ। আপনার এইরূপ আচরণে ও অবহেলায় বার-লাইব্রেরীর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বিনা নোটীশে আপনি কেন অনুপস্থিত হইতেছেন, তাহার সন্তোষজনক উত্তর অবিলম্বে প্রদান করিবেন। ইতি

Tarit Kumar Bhadra, Asst Secretary, 19-7-21

Bar-Association, Narail.

ঐ পত্রের উত্তরে সম্পাদক মহাশয় লিখেন,

To The Bar Lidrary, Narail.

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া বড়ই বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। "মাত্র দেবেন বাবুকে ঐ দুই বস্তু" দেওয়ার কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। এ বিষয়ে দেবেন-বাবুই আমার সাক্ষাৎ প্রভু, সুতরাং আমার আচরণ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেবেন-বাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করাও উচিত নহে কি? দেবেন-বাবুকে ঐ দুই বস্তু দেওয়া ব্যতীত বারলাইব্রেরীতে আমার অন্য কোনও কর্ত্তব্য নাই।

দেবেন-বাবুর নিকট হইতে আমি যে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সঙ্গে তাহাও প্রদত্ত হইল।

অনুগত ভৃত্য—
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

This is to certify that Babu Jaladhar Chatterjee left the station with my permission and I Pelt no inconvenience during his absence. I am satisfied his kind conduct. and most benevolent treatment rendered.

Narail. (Sd) Dedendranth Biswas,
25-7-21. Narail,

ঐ চিঠির উত্তর—

বার-লাইব্রেরী নড়াইল,
২৩।৬।২১

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু—

আপনি বার-এসোসিয়েসনের অধীন চাকরী গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যে চাকরী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বেলা ১১টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত বার-লাইব্রেরী গৃহে উপস্থিত থাকিতে হয়। হাজিরা বহিতে নাম লিখিত হইবার নিয়ম।

* আপনার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক নহে। আপনাকে বলা যাইতেছে যে, আপনি আগামী সোমবার হইতে ১২টায় সময় বার-লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকিবেন।

আপনার অনুপস্থিত থাকা হেতু আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

By order
(Sd.) A. Ghosh,
Asst. Secretary

নড়াইলের উকীল মহলে জাতি সমস্যার কথা আমাদের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না এবং বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব ছিলাম। কিন্তু সত্য প্রকাশের সৎসাহসের অভাব বলিয়া আমাদিগকে অনেকে নিন্দা করিতেছেন। সে যাহা হউক, দেবেন-বাবুর ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত জল পানের ব্যবস্থা হয় না, এবং দুইজন সদস্য বাবুর অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করায় তাঁহারা ধিকৃত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় আমি মাত্র দেবেন-বাবুকে, মাত্র দুই চারদিনের জন্য, মাত্র জল ও পান দিবার ভার লইয়াছিলাম। এবং আমার কার্য্যে দেবেন-বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন তাহাও সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম ; অথচ আমার অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নষ্ট করিয়া হাজিরা বহিতে নাম লেখা দিয়া ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত বারলাইব্রেরীর মেজেতে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া থাকিতে হইবে এরূপ নূতন সর্ত্তে কেন বাধ্য করিতেছেন বুঝিতেছি না। আজ ১ মাস গত হইতেছে দেবেন-বাবুর এই জল পান দিবার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন।

কল্যাণী-সম্পাদক।

কল্যাণী, ১১শ্রাবণ, ১৩২৮।

দেবেন্দ্র-বাবু ও জলধর-বাবুর প্রতি যে-সব উকীল এইরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণে "ভদ্রতা," মানবিকতা ও লজ্জার চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। এই প্রকার অ"ভদ্র" অমানুষিক ও নির্লজ্জ আচরণ কোন্ কোন্ জেলার সদরের ও মহকুমার কোন্ কোন্ উকীল হেয় মনে করেন, এবং এরূপ আচরণ কাহার কাহার পক্ষে অসম্ভব, জানিতে পারিলে, গান্ধী মহাশয়ের মত অনুসারে স্বরাজ প্রাপ্তি কত শীঘ্র বা বিলম্বে হইতে পারে, তাহার একটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এরূপ ব্যবহার পায়, যাহা গাধা, গরু, কুকুর বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, মহিষ পায় না। অথচ আমরা অন্য দেশের লোকদের কাছে কেন মনুষ্যোচিত ব্যবহার পাই না, তদ্বিষয়ে কলম চালাইতে ও চেঁচাইতে লজ্জিত হই না।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ

"অস্পৃশ্যতা"

নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের যে চুম্বক দৈনিক কাগজসমূহে বাহির হইয়াছে, তাহাতে "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে ঃ—

'A perceptible change for the better is slowly coming over the question of untouchability, and although the difficulty of the problem is mixed up with religious belief, the general state of antipathy has disappeared and there is no room for despair."

নৈরাশ্যের কারণ নাই, ইহা আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু অসহযোগ-প্রচেষ্টা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে, এ আশাও নাই। কতজন

উকীল আইনের ব্যবসা ছাড়িয়াছিলেন বা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা যেমন কমিটি দিয়াছেন, তেমনি যদি কমিটি কত জন "উচ্চ" জাতির গোঁড়া লোক অস্পৃশ্যদের সঙ্গে স্পৃশ্যদের মত ব্যবহার কাজে করিতেছেন, তাহার সংখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইত। ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি, যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে অসহযোগ-প্রচেষ্টা আমাদের জাতির যত লোককে যতটা সজাগ করিয়াছে, অন্য কোন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধার্ম্মিক-প্রচেষ্টা তাহা করে নাই। কিন্তু কমিটি যে বলিয়াছেন, যে, সমস্যাটির কঠিনতা ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত, ঐ কথার মধ্যেই সমাধানের সঙ্কেত এবং এ বিষয়ে অসহযোগ-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ নিহিত রহিয়াছে।

বস্তুত ঃ অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ-প্রথার অঙ্গীভূত এবং ইহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্গীভূত এবং ইহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অমানুষিক লক্ষণ বা উপসর্গ। অস্পৃশ্যতাকে বিনাশ করিতে হইলে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাকেও ভাঙিতে হইবে। তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের জাতিভেদ-প্রথা পাশ্চাত্যদেশের শ্রেণীবিভাগের মত নহে, কারণ পাশ্চাত্য শ্রেণীবিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একত্র আহার এবং উদ্বাহিক আদান প্রদানে ঐকান্তিক বাধা নাই। আমাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে বরং আমেরিকার শ্বেতকায় ও নিগ্রোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের তুলনা করা যায়। যে-কারণে আমরা আমেরিকাকে দোষ দি, সেই কারণে আমাদের নিজেদেরও দোষ স্বীকার ও সংশোধন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আমেরিকা নিগ্রোকে অবজ্ঞা করিয়া এবং অপমানকর অবস্থাতে রাখিয়াও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে উহা এ পর্য্যন্ত রক্ষাও করিতেছে। সুতরাং কোন দেশে কোন অবস্থাতেই শ্রেণীবিশেষের অস্পৃশ্যতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, এমন নয়। বাংলা দেশে, মহারাষ্ট্রে, এবং অন্য অনেক প্রদেশে অনেকে এই কারণে মনে করেন, যে, অসহযোগ-প্রচেষ্টায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে এত বড় একটা স্থান দিবার প্রয়োজন নাই। এরং এইরূপ একটা মত থাকায় আমরাও মনে করি, যে, কেবল রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণার বশে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে না। যে প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বারা হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলে আমেরিকার শ্বেতকায়েরা নিগ্রোদিগকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যলাভে বাধা দিবে না, আমাদের মধ্যেও সেই প্রকার আধ্যাত্মিক প্রভাব যদি কাজ করে, এবং তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে "অস্পৃশ্যতা" সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে। তখন বর্ত্তমান আকারের জাতিভেদও টিকিবে না ; যদি উহা থাকে, ত, উহা কেবল শ্রেণীবিভাগরূপে থাকিবে। এই-সব পরিবর্ত্তন আধ্যাত্মিক প্রভাবে হইলে সুফল হইবে।

১৩৩১ বৈশাখ

ত্রিবাঙ্কুড়ে অস্পৃশ্যতা

ত্রিবাঙ্কুড়ে ভাইকম্ নামক স্থানে একটি দেবমন্দির আছে। দক্ষিণভারতের অনেক জায়গার মত সেখানেও মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া "অস্পৃশ্য" লোকেরা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারাও ত মানুষ। তাহারা বলিতেছে, তাহারা ঐসব্ রাস্তা দিয়া যাইবে ; যাইতে আরম্ভও করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুড় দেশী রাজ্য। উহার রাজার গবর্ণমেন্ট্ এই "অনাচার" বন্ধ করিতে বলেন। কিন্তু "সত্যাগ্রহী"রা তাহা না শুনায় তাঁহাদের গ্রেফ্তার হইতেছে। প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, মথুরা বৃন্দাবন, কোথাও এমন সাধারণ রাস্তা নাই, যাহা দিয়া মেথরেরাও যাইতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, কেরলে, আছে। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ কেরলকে ভারতবর্ষের পাগ্‌লা-গারদ বলিয়াছিলেন।

অথচ এই ত্রিবাঙ্কুড় ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব প্রদেশ ও রাজ্য অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রসর ; কেবল পুরুষদের প্রাথমিক শিক্ষায় ব্রহ্মদেশের নীচে। তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়, যে, কেবল লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ মানুষ হয় না।

নমঃশূদ্রদিগের খৃষ্টিয়ান্ হইবার ইচ্ছা

খবরের কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, হাজার হাজার নমঃশূদ্র, হিন্দুসমাজের "উচ্চতর" জাতিদের দ্বারা অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হওয়ায়, খৃষ্টিয়ান্ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। "উচ্চতর" জাতিদের যদি এবিষয়ে কোন কর্ত্তব্য-বোধ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বক্তৃতা, সভায় প্রস্তাব ধার্য্যকরণ, প্রভৃতি মৌখিক ব্যাপার ছাড়া কাজে কিছু করুন।

খৃষ্টিয়ান সমাজেও শাদা ও কালার সমান স্থান নাই, এবং 'উচ্চজাতি' হইতে যাঁহারা খৃষ্টিয়ান্ হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকে "নিম্ন-শ্রেণীর"র খৃষ্টিয়ান্‌দিগকে নিজেদের সমান মনে করেন না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ আছে, বঙ্গে তাহা নাই ; এবং হিন্দু নমঃশূদ্র অপেক্ষা খৃষ্টিয়ান্ নমঃশূদ্রের হিন্দুসমাজের নিকট হইতে অধিক বাহ্য সম্মান পাইবার সম্ভাবনা।

নমঃশূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মসমাজেরও কর্ত্তব্য আছে। তাহা করিতে হইলে যে সহৃদয়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মানবপ্রকৃতিতে বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা ব্রাহ্মদিগের থাকিলে তাঁহারা কিছু করিতে পারিবেন।

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ

ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সকল বাঙ্গালী হিন্দুর প্রণিধানযোগ্য। তিনি আরম্ভে বলিতেছেন ঃ—

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে-বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা আজ অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়াছে : নিম্নে যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি প্রকারে ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

(প্রতি ১০ হাজারে)।

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু—	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মুসলমান—	৫৯৬৯	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৫৫

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাধি মৌরশী পাট্টা করিয়া রহিয়াছে ; হিন্দু ও মুসলমান এইসমস্ত ব্যাধির সমভাগী কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন-দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি-প্রকারে সন্তান-উৎপাদন (birth control) বন্ধ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে ; কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে আমাদের আত্মকৃত দূষণীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণগুলি, যথা—

(১) বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাব।

(২) বিধবার বিশেষতঃ বালবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনর্বিবাহ নিষেধ।

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী ; কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায় ; আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর—বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দু-সমাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটি অপরিণত-বয়স্কা বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে বালিকাবধূ ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পশ্চিম দেশীয় খোট্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যে অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি-অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে—পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যা-পাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এইপ্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।

সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলাদেশের বড়-বড় নদীতে ষ্টীমার যাতায়াত করে এবং ইংলণ্ড আমেরিকার বড় বড়-বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্র-বক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারঙ্, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব্ব-বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকায়াব, মেসোপটেমিয়া

প্রভৃতি দূরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি চাট্‌গাঁয়ের অনেক গ্রামে এইপ্রকারে প্রতিমাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা-ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবৎসর সহস্র-সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্ব্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার-জালে জড়িত ; ছুৎমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়। এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে।

জাতিভেদরূপ-ব্যাধিজর্জ্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজকে আবদ্ধ করিয়াছে। ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না—কুমোর কামারের কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানদিগের কোনো-প্রকার বাধাবিপত্তি নাই ; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে ; এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া।

বাংলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং অজস্র টাকা রোজগার করিয়া স্ব-স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে। কিন্তু আমরা "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি। নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াস-লভ্য জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত, এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে এবং গেরুয়াধারীরও অভাব দেখা যাইতেছে না। বাবাজী ও স্বামিজী পাতাল-ফোড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে।

এই-প্রকারে "কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত" করিয়া এবং হিন্দু-সমাজ আজ যে কি-প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও কিছু কিছু জানাইয়া রায়-মহাশয় "উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ" কল্পে বলেন ঃ—

১ম। বিধবাবিবাহ প্রচলন।

২য়। যে-সমস্ত কুলবধূ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে এবং দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা-প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া।

৩য়। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। যদি আমাকে কোনো বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন, —৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলি? আমি এক-কথায় তাহার উত্তর দিই—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, স্বরাজ-লাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এককথায় উত্তর দিব—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। সভা-সমিতিতে বড়-বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি, যথা ঃ—"সর্ব্বভূতেষু নারায়ণ" কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গেলাস জল কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয় তখনই জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তিসমেত উঠিয়া পলাই। সোডা, লিমনেড পান করিব, বরফজল খাইব—যেন সেগুলি নৈকষ্য-কুলীন শুদ্ধস্নাত পূত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে-করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত করে। ষ্টীমারে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বাবুর্চ্চির নিকট যাইয়া এক প্লেট্ মুরগীর কারি ও ভাত লইয়া অক্লেশে উদরস্থ করিব। এইসমস্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না। কলিকাতার এবং অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের যত রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রায়ই খোট্টা না হয় উড়িয়া, তাহাদের জ্ঞাতি গোত্রের কোনো খবর রাখি না—চেহারা দেখিলে অনেক সময় ডোম কি চামার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একগুচ্ছ সূত্র গলদেশে প্রলম্বিত হইলেই হিন্দুত্ব বজায় থাকে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এইসকল বামুন যাহারা পরিবার সঙ্গে আনে না তাহাদের অনেকেরই স্বভাব-চরিত্র কলুষিত, এবং শতকরা ৯৫ জন কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহাদের হস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ভণ্ডামি ও কপটাচরণ ধর্ম্মের প্রধান আবরণ হইয়াছে—দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

বিশুদ্ধ রক্তের অহঙ্কার করিবার লোক শুধু বঙ্গে বা ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। অথচ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান এই সত্য কথা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, যে, বিশুদ্ধ জাতি, অর্থাৎ যে-জাতির সহিত অন্য কোনো জাতির রক্তের মিশ্রণ কখনও হয় নাই, কোথাও নাই—উহা একটা কাল্পনিক পদার্থ। এইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কথাগুলি খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

যাঁহারা লোকতত্ত্বের (Ethnology) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনার্য্য ও দ্রাবিড়ীয় শোণিতের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক ও হূণ বংশোদ্ভব—হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে। আসামের অহোম কুচবিহার ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এইপ্রকারে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। এক-সময়ে প্রায় সমস্ত বরেন্দ্র-ভূমি কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারেন্দ্র-শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিকাল বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল ;—তখন প্রকৃতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশূর ও বল্লালসেনের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার লাভ করে, তখন কত-রকম গলদ যে সমাজ মানিয়া লইলেন তাহার আলোচনার সময় নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি না। ইতিহাসে আছে কি না জানি না যে, তাঁহারা স্বীয়-স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। আবার সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণের নিকট সকল যুক্তি পরাস্ত। নাসিকার ছিদ্র (nasal slit) ও মুখের সৌষ্ঠব ও আকৃতি (facial contour) প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিলে বাংলাদেশে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি সুবর্ণবণিক্‌গণের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লালসেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দিয়া এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় ঋণ দিতে অস্বীকৃত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারাও আজ কৌলীন্য-মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। হায় রে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ—ধন্য তোর মহিমা। বেদ-সঙ্কলয়িতা ও মহাভারত রচয়িতা মহামুনি ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও দেবর্ষি নারদ কেহ বা দাসী পুত্র কেহ বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম কি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন?

ব্যাস বশিষ্ঠ নারদকে কেহ এখন প্রত্যাখ্যান করেন না বটে ; কারণ তাঁহারা এখন অশরীরী। কিন্তু তাঁহারা এখন জীবিত থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গে আজকালকার বামুনরা পংক্তিভোজন করিতেন না ; অধিকন্তু, কেহ তাহা করিলে, বর্দ্ধমানের ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ফতোয়া দিতেন।

পুরাকালে কোনো-কারণে কোনো হিন্দু-নারীর পদস্খলন হইলে তাঁহার আবার ধর্ম্মপথে আসিবার ও থাকিবার উপায় ছিল এবং তিনি ধর্ম্মশীলা হইলে ভক্তির পাত্রীও হইতেন। ইহা দেখাইবার জন্য হিন্দুসভার সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বলেন ঃ—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চনারী স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং"॥

কই, সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক-সময়ে হিন্দুধর্ম্ম কি-প্রকার উদার ছিল। যে-সকল বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিয়া আদর্শ সতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই স্মরণ করিতে হইবে। সে একদিন আর আজ একদিন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও দেখা যায়, কোনো-কোনো নারী চরিত্র-ভ্রংশ হইবার পরেও ধর্ম্মশীলা হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন এবং থেরীরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধুদেশই প্রথমে বিদেশী মুসলদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের ফলে অনেক হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। তাহাদের পুনর্ব্বার হিন্দু হইবার ব্যবস্থা "দেবল-স্মৃতি"তে আছে। মুসলমান পুরুষের ঔরসে যে-সকল হিন্দু স্ত্রীলোকের সন্তান হইত, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা ঐ "দেবল-স্মৃতি"তে দৃষ্ট হয়।

বাঙালী হিন্দু সমাজের দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রায়-মহাশয় বলেন ঃ—

মুসলমানগণকে বাদ দিলেও বাংলায় মোটামুটি ২০০ লক্ষ হিন্দু—তাহার মধ্যে কায়স্থ ব্রাম্রণ ও বৈদ্য মাত্র ২৫। ২৬ লক্ষ—অষ্টমাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈসপ্ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে উদর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগড়া বাধিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী আমাদেরই রক্তমাংস। দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দুসমাজে যাহা-কিছু তাহা ইহাদেরই মধ্যে বিদ্যমান, ইহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে? ঘরশত্রুতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—অপর দিকে আমাদের মধ্যে আত্ম-কলহ। এই ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব, না এইসমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান নির্ম্মাণ করিব?

হিন্দুদের সংখ্যা কেন যথেষ্ট বাড়িতেছে না, বরং কোথাও-কোথাও কমিতেছে, তাহা বলিতে গিয়া বক্তা কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

হিন্দু-সমাজের লোক-সংখ্যা হ্রাসের আর-একটি প্রধান কারণ এই—ইদানীং আমার সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রধান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে-প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন অনুসরণ করে, ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। কতকগুলি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন তাহারা ইহা বর্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রূণ ও শিশুহত্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। ১৯১১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় সমগ্র বাংলার লোক-সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি ২ কোটী হিন্দু এবং ২৩।।০ কোটী মুসলমান, বাকি শতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২) খৃঃ অব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল।

আর-একটি কারণ অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে।

নিম্নে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে-তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেন আমাদের ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে।

বয়স	হিন্দু-বিধবা	মুসলমান-বিধবা
১—৫	১৪৩৯	১৪০৬
৫—১০	৮৭৫১	৭৫৫৮
১০—১৫	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫—২০	৯৬৪৭০	৫২১৭৯
২০—২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫—৩০	২৩০৭৯০	১২৪৪৬৯

উপরের তা   টি-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। বাংলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী ; হিন্দুনারী অপেক্ষা মুসলমান নারীর সংখ্যা বেশী।

হিন্দুনারী—৯৯, ৫০, ৮২৫।

মুসলমান নারী—১,২৩,৮১,৮১৭।

ইহা-সত্ত্বেও বিধবাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম। ইহার কারণ, হিন্দুবিধবাদের—এমন-কি বালিকা ও শিশু বিধবাদেরও বিবাহ হয় না, কিন্তু মুসলমান-বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে বলিয়া তাহারা অনেকে বিবাহ করিয়া সধবাদের শ্রেণীভুক্ত হয়, বিধবা-পর্য্যায়ভুক্ত থাকে না। হিন্দুসমাজের সংস্রবে থাকায় মুসলমানদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহে বিরাগ কতকটা প্রবেশ করিয়াছে ; নতুবা তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা আরও কম দেখা যাইত।

মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের মধ্যে অধিক-সংখ্যক নারী জননী হন ; হিন্দুদের মধ্যে উহার প্রচলন না থাকায় অল্পবয়স্কা বিধবাদেরও মাতৃত্ব ঘটে না। মুসলমানদের অধিকতর বংশবৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, হিন্দু বিধবাদের মধ্যেও কেহ-কেহ মুসলমানের পত্নী বা উপপত্নী হওয়ায়, তাহাও মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ হয়। বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজে, নিতান্ত কচি বয়সে অনেক কন্যার বিবাহ হয় এবং অল্প বয়সেই তাহাদের সন্তান হয়। এই শিশুদের অনেকের শৈশবেই মৃত্যু হয় ; যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও বেশ সুস্থ সবলও দীর্ঘজীবী হয় না। অন্যদিকে, বিধবাদের বিবাহ যখন হয়, তখন সাধারণত যৌবন-প্রাপ্তির পরই-হইয়া থাকে, তাহাদের সন্তানও জন্মে যৌবন-প্রাপ্তির পর। এইসব সন্তানের জীবনী-শক্তি, স্বাস্থ্য ও আয়ু শিশু-বিবাহের সন্তানদের চেয়ে বেশী হইবারই কথা। সুতরাং বিধবা-বিবাহ-নিষেধক হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা উহার অনুমোদক মুসলমান সমাজের অধিকতর স্বজীবতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অবনত শ্রেণীর অনেক হিন্দু কেন খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহার প্রধান কারণ অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিবৃত হইয়াছে।

ছুঁৎমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফলে অবনত শ্রেণীর লোকেরা দলে-দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? ইসলাম ধর্ম্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। ডোম হউক, বাগ্দী হউক সে যে-দিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত সামাজিক অধিকার অন্যের সহিত সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে , এমন-কি একপাত্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অর্জ্জনের স্পষ্ট সহায়তা করেন। এককথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহার নাই। সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাল "অভয়-আশ্রমের" আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই তৃপ্তিলাভ হইল। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বাদ-বিচার (?) নাই—সেবক হইলেই হইল এবং অনেক সময় চামার-মেথর ভদ্রলোকের সন্তানগণের সহিত পাশাপাশি বসিয়া আহার-বিহার করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন আহার করিতে লাগিল তখন মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। শুধু তাহাই নহে, এইসমস্ত অবজ্ঞাত ও পদদলিত লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বাড়িল। হিন্দু-সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীবজন্তু অপেক্ষা ঘৃণা করে এবং কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। একটা বিড়াল আঁস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় মুখ দিয়া চক্‌চক্ করিয়া দুধ খাইতেছে, কখনও-কখনও-বা থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া খাইতেছে—ছুৎমার্গীদের ইহাতে কোনো আপত্তি হয় না—অম্লানবদনে সেই দুধ পান করে ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির কেহ রান্নাঘরের চৌকাঠ

উত্তীর্ণ হইলে একরশি তফাতে ভাতের হাঁড়ি অন্নব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, যে এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিরাজ করিতেছে।

বাংলাদেশে অজ্ঞতার পরিমাণ নির্দ্দেশার্থ রায় মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

বাংলাদেশ অজ্ঞতা-তমসাচ্ছন্ন—শতকরা ৫। ৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট। এইসমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যাহাতে প্রত্যেক গ্রাম অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিশেষতঃ বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গবর্ণমেন্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না।

শতকরা পাঁচ সাত জনে ও দশজনে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। তথাপি বঙ্গে নিরক্ষরদের সংখ্যার নির্ভুলতার জন্য বলা আবশ্যক, যে, বঙ্গে ৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হাজার-করা ১৮১ জন, এবং ঐ বয়সের নারীদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখিতে পড়িতে পারে ; স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র ধরিলে হাজারে ১০৪ জন অর্থাৎ শতকরা দশের কিছু বেশী লিখন-

উপসংহারে বক্তা-মহাশয় বলেন ঃ—

বাংলায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলায়—হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহ-নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০। ২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু-জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এখন আর কথায় চিঁড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে দেখাইতে হইবে যে, আমরা প্রকৃতই এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তুত। হিন্দুসভায় তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে "জলচল" করিতে হইবে! যদি সাহসে না কুলায় জানিলাম যে, আমাদের বক্তৃতা '৩ আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তরগ্রহণের একটি কারণ

"উচ্চ" বর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা, উদাসীনতা, অপমানকর ব্যবহার ও কোথাও-কোথাও নিষ্ঠুরতা "অবনত" শ্রেণীর লোকদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের একটি প্রধান কারণ, ইহা অনেকে বলিয়াছেন। ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমরা মনে করি, এই কারণসত্ত্বেও "অবনত" হিন্দুদের হিন্দুই থাকা উচিত, এবং তাঁহারা হিন্দু থাকিতেও পারেন, এবং ক্রমশঃ সামাজিক লাঞ্ছনা হইতেও আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন।

যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু হইয়া আধ্যাত্মিক কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না। আর্থিক ও সামাজিক কারণে হিন্দুর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণই এস্থলে আমাদের আলোচ্য।

হিন্দু মহাসভা যেরূপ ব্যাপকভাবে হিন্দুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাহার ফলে উহার গত অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং লালা লাজপৎ রায় উহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন, আমরা হিন্দু শব্দের সেই

ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব।

খৃষ্টীয় কোনো-কোনো দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে, তথায় পূর্ব্বে রোমান্ কাথলিক্ ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানগণ উৎপীড়িত হইত। তাহারা রোমান্ কাথলিক্দের গোরস্থানে স্থান পাইত না ; কখন-কখন তাহাদিগকে জীবিত অবস্থাতে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইত। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ান্রা অন্য-এক সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ান্দের প্রতি অত্যাচার করিত বলিয়া উৎপীড়িত সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই ; বরং উৎপীড়িতেরা নিজেদের মত ও বিশ্বাসকেই বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিপাদন-পূর্ব্বক নিজেদের দল পুরু করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই মুসলমান-দিগের মধ্যে এক দল লোক আফ্গানিস্থানে উৎপীড়িত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কারারুদ্ধ এবং দুজন প্রস্তরনিক্ষেপ দ্বারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যাচারের জন্য উৎপীড়িত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইস্লাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই ; বরং তাহারা এশিয়া ও ইউরোপে নিজেদের মতকেই প্রকৃত ইস্লাম বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডে দীর্ঘ কাল ধরিয়া রোমান্ কাথলিক্রা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত না ; প্রটেস্টান্ট্দিগের মধ্যে আংলিকান্ ভিন্ন অন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়িতে পাইত না। কিন্তু এরূপ কারণেও এইসকল উৎপীড়িত খৃষ্টীয়ানেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে নাই।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নিগ্রোগণ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা শ্বেতকায় খৃষ্টীয়ান্দের গির্জ্জায় উপাসনা করিতে পায় না, শ্বেতকায়দের গোরস্থানে তাহাদের মৃতদেহ প্রোথিত হয় না, শ্বেতকায়দের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পায় না, শ্বেতকায়দের হোটেলে তাহারা থাকিতে বা খাইতে পায় না, শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক রেলগাড়ীর কাম্রায় বা এক ট্রামে তাহারা ভ্রমণ করিতে পারে না, ভোজে শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের নিমন্ত্রণ ও পংক্তিভোজন হয় না, শ্বেতকায়দের সহিত তাহাদের বিবাহ অনেক রাষ্ট্রে বে-আইনী কাজ বলিয়া দণ্ডিত হয়, শ্বেতকায়েরা কখন-কখন বিচারের পূর্ব্বেই নিগ্রোদিগকে ফাঁসী দিয়া বা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু তথাপি আমেরিকার নিগ্রোরা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে না ; তাহারা সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছে ; নিজেদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে, এবং নিজেদের গির্জ্জায় নিজেদের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিতের দ্বারা উপাসনা ও ধর্ম্মসঙ্গত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেছে।

আমাদের দেশে যে সব জাতিকে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করা হয়, তাঁহাদিগকেও "উচ্চ" বর্ণের লোকদের সঙ্গে এক স্কুলে অনেক জায়গায় পড়িতে দেওয়া হয় না দেবমন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, তাঁহাদের সহিত পংক্তি-ভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদান হয় না, ইত্যাদি। এইসব কারণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া উৎপীড়িত নানা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ও খৃষ্টিয়ান্ নিগ্রোদের মতন নিজেদের ধর্ম্মেই থাকিয়া

ক্রমে-ক্রমে নিজেদের উন্নতি করিতে পারেন। "উচ্চ" বর্ণের দেবমন্দিরে ঢুকিতে না পাইলে তাঁহারা নিজেদের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারেন, "উচ্চ" বর্ণের পুরোহিতেরা তাঁহাদের বিবাহ না দিলে নিজেদের পুরোহিত তাঁহারা নিযুক্ত করিতে পারেন (বস্তুতঃ অনেক "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুর নিজেদের পুরোহিত আছে), ইত্যাদি। অবশ্য এইরূপ স্বাবলম্বী হইতে হইলে কতকটা শিক্ষার ও চিন্তাশক্তির এবং দল বাঁধিবার ক্ষমতার প্রয়োজন। দাসত্বমুক্ত নিগ্রোদের মধ্যে প্রথম প্রথম যত শিক্ষিত লোক ছিল, ভারতবর্ষের "অবনত" জাতিদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বা অনুপাত তাহা অপেক্ষা কম নহে। নিগ্রোরা যখন খুব সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারিতেছে, তখন আমাদের দেশের "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরা কেন না পারিবে? নিগ্রোরা একেবারে বর্ব্বর অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছে। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ আফ্রিকার নিগ্রোদের মতন অসভ্য অবস্থার লোক নহে। তদ্ভিন্ন, শ্বেতকায় ও নিগ্রোতে জাতিগত (racial) যে-প্রভেদ আছে, অস্মদ্দেশে (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ) ব্রাহ্মণে ও নমঃশূদ্রে সে প্রভেদ নাই।

কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন, ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য না করিলে যখন হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ হয় না, তখন অন্য জা'তের লোকেরা কেমন করিয়া সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক হিন্দু জা'তের নিজেদের পুরোহিত আছে, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে। তা-ছাড়া, আজকাল, স্যার্ হরিসিং গৌড় যে-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন, তদনুসারে কোনো হিন্দুর বিবাহ রেজিষ্টারী করা হইলেই তাহা নিশ্চিত আইনসঙ্গত বিবেচিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকুন বা না থাকুন। সুতরাং বিবাহের জন্য আর কোনো উদ্বেগের কারণ নাই।

অতএব আমরা বলি, ব্রাহ্মণদের বা অন্য "উচ্চ" বর্ণের লোকদের মুখাপেক্ষী না হইয়া এবং তাঁহাদের সহিত বিরোধও না করিয়া যে-কোনো হিন্দু-জা'তের লোকেরা হিন্দু থাকিয়াই উন্নত ও স্বাবলম্বী হইতে পারেন।

বস্তুতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে "ভদ্র-লোক" বলিয়া থাকেন ও অন্য সকলকে ঐ আখ্যা হইতে বঞ্চিত করিতে চান, তাঁহারাই সংখ্যায় অল্প, ও অপরেরাই সংখ্যায় বেশী (তাহা পরে দেখাইতেছি)। অতএব, যাঁহারা সংখ্যায় কম, তাঁহারা হিন্দুয়ানীর সমুদয় অধিকার ও মানসম্ভ্রম একচেটিয়া করিবেন, এবং অপরেরা তাহাতে বঞ্চিত থাকিয়াও নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, হিন্দুনামধারী সকল হিন্দুই হিন্দুত্বের গৌরব, মানসম্ভ্রম, অধিকার প্রভৃতি পাইবেন। যদি তাহা না হইয়া অধিকাংশ হিন্দুনামধারী ব্যক্তি ঐ গৌরবাদির অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তাহাও বর্ত্তমানে সংখ্যায় ন্যূন লোকদিগের উহাতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারিত।

হিন্দু-সমাজে কাহাদের সংখ্যা বেশী তাহা দেখাইবার জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি জা'তের লোক-সংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। জা'তের নাম সেন্সাস্ রিপোর্টে যেরূপ লেখা আছে, সেইরূপ দিলাম। এ বিষয়ে আমাদের নিজের কোনো দায়িত্ব নাই।

জা'ত	লোকসংখ্যা
চাষী কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)	২২,১০,৬৮৪
নমশূদ্র	২০,০৬,২৫৯
রাজবংশী	১৭,২৭,১১১
বাগ্‌দী	৮,৯৫,৩৯৭
বৈদ্য	১,০২,৯৩১
বাউরী	৩,০৩,০৫৪
ব্রাহ্মণ	১৩,০৯,৫৩৯
চামার ও মুচী	৫,৬৯,৯৬৬
ধোবা	২,২৭,৪৬৯
ডোম	১,৫০,২৬৩
গন্ধবণিক্	১,৪১,৮৮৬
গোয়ালা	৫,৮৩,৯৭০
হাড়ি	১,৪৮,৮৪৭
যোগী বা যুগী	৩,৬৫,৯১০
জালিয়া কৈবর্ত্ত (আদি কৈবর্ত্ত)	৩,৮৪,০৪৯
কামার (কর্ম্মকার)	২,৫৬,৮৮৭
কায়স্থ	১২,৯৭,৭৩৬
কুমার	২,৮৪,৬৫৩
মালো	২,২১,১৯৮
নাপিত	৪,৪৪,১৮৮
পোদ (পৌণ্ড্র)	৫,৮৮,৩৯৪
সদ্‌গোপ	৫,৩৩,২৩৬
সাহা	৫,৫৯,৭৩১
শুঁড়ি	৯২,৪৯২
সুবর্ণবণিক্	১,১৭,১২৩
সূত্রধর	১,৬৮,৫৭৭
তাঁতি ও তাতোআ	৩,১৯,৬১৩
তেলী ও তিলি	৩,৯৫,৯২৬

ইহা হইতে দেখা যাইবে, ভদ্রলোক-নামধেয় জা'তের লোকেরা সংখ্যায় অন্যান্য জা'তের লোকদের চেয়ে অনেক কম। উপরে সকল জা'তের উল্লেখ করা ও লোকসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। নতুবা "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা তুলনায় আরো কম দেখা যাইত।

কোনো সমাজের মধ্যে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারাই যদি জ্ঞানগৌরবে, সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে এবং সামাজিক মানসম্ভ্রম ও অধিকারে হীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সমাজ কখন উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারে না ; এই-হেতু হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর লোকদেরই সর্ব্ববিধ অধিকার পাওয়া উচিত।

দেশাচার ও লোকাচার-অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন জা'তের লোকদের সমাজে যে-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির দ্বারা কার্য্যতঃ ও ব্যবহারতঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জা'তদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান লোকাচার, দেশাচার ও শাস্ত্র-অনুসারে সকলের উপর ; কিন্তু তা বলিয়া নিরক্ষর রাঁধুনী-বামুন, ছাগ মাংস-বিক্রেতা বামুন, কলিকাতা-শহরে উৎকলীয় ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মজুর গাড়োয়ান ও কারিকর কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণের সম্মান পায় না। অন্য দিকে একটি দৃষ্টান্তও লউন। কারণ যাহাই হউক, লোকাচার ও দেশাচার-অনুসারে গোঁড়া লোকদের দ্বারা সুবর্ণবণিকেরা জলাচরণীয় জা'ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু তাহারা শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর এবং সচ্ছল অবস্থার লোক বলিয়া "অবনত" শ্রেণীভুক্ত নহে। বঙ্গে শিক্ষায় সুবর্ণবণিক্‌দের স্থান কিরূপ, তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

জা'ত	হাজারে কয়জন লিখন পঠনক্রম
বৈদ্য	৬৬২
ব্রাহ্মণ	৪৮৬
কায়স্থ	৪১৩

সুবর্ণবণিক্	৩৮৩
গন্ধবণিক্	৩৪৪
সাহা	৩২১
বারুই	২২৯
তেলী ও তিলী	২২৫
কামার	২০২
সদ্‌গোপ	২০০
নাপিত	১৫২
কৈবর্ত্ত চাষী	১৩৯
নমশূদ্র	৮৫

যে-কোন হিন্দু জা'ত শিক্ষায় অগ্রসর ও ধনশালী হইলে, ব্রাহ্মণসভার প্রতিকূলতাসত্ত্বেও তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

আমরা আগে দেখিয়াছি, যে, কোন-কোন খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সম্প্রদায় ও জাতি অপমান ও উৎপীড়নসত্ত্বেও খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই, বরং তাহারা স্বধর্ম্মে থাকিয়াই নিজের-নিজের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি ও দলবৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরাও হিন্দু থাকিয়াই ক্রমে-ক্রমে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে। তাহার জন্য তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি আবশ্যক।

এক্ষণে দুই-একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেকে বলিবেন, হিন্দুধর্ম্মে অনেক কুসংস্কার আছে এবং অনেক অযৌক্তিক মত আছে ; সুতরাং তাহা ত্যাগ করাই ভালো। আমরা স্বীকার করি, যে, হিন্দুধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মত অনেক আছে, এবং সেগুলি বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেইগুলি বর্জ্জন করিলেই ত হইল ; তাহার উপর আবার খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান হইবার কি প্রয়োজন আছে? শেষোক্ত ঐ দুই ধর্ম্মে এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মত আছে, এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে কুসংস্কার ও ভ্রম আছে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া কুসংস্কার ও ভ্রমপূর্ণ খৃষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কেমন করিয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য নানা দেশে বিস্তর শিক্ষিত লোক আছে, যাহারা খৃষ্টীয় কুসংস্কার ও ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় নাম ত্যাগ করে নাই। তাহারা খৃষ্টীয়ান্ বলিয়াই পরিচিত। তেম্‌নি হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার ও ভ্রম ত্যাগ করিয়াও হিন্দু থাকা যায়। বস্তুতঃ এখনই ত হিন্দুসমাজে হাজার-হাজার শিক্ষিত লোক আছে যাহারা অজ্ঞ লোকদের কুসংস্কার ও ভ্রম বর্জ্জন করিয়াছে। তাহা না হইলে লালা লাজপত রায় ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুমহাসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভায় উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিতেন না।

আর-একটা আপত্তি এই হইতে পাবে, যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বা ইস্‌লামের কুসংস্কার ও ভ্রমগুলি উহার অস্থিমজ্জাগত নহে, এইজন্য তৎসমুদয় বর্জ্জন করিলেও উক্ত দুই ধর্ম্মের সার শ্রেষ্ঠ অংশ অনেক থাকে ; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম ও কুসংস্কারগুলি উহার অস্থিমজ্জাগত, সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিলে হিন্দুধর্ম্মই ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা সত্য নহে। এই আপত্তির কোনো মূল্য নাই। তাহা দেখাইতেছি।

আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা আগে বলিয়াছি। তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার হইবার একটা কারণ এই যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্বে তাহাদের জন্মভূমি

আফ্রিকা হইতে ক্রীত বা হৃত দাসরূপে আমেরিকায় আনীত হইয়াছিল, এবং পশুর মত ব্যবহৃত হইত। যখন বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর দাসত্ব- প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রীরা বলিতে লাগিলেন, যে, দাসত্বপ্রথা খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্মত ; তাঁহারা বাইবেল্ হইতে উহার সমর্থক বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া দাসব্যবসায়ীদের ও দাসপ্রভুদের কার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ইহা সত্যও বটে, যে, বাইবেলে দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে পরিষ্কার কোনো উক্তি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। তাহাতে কেহই বলে না, যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মটাই মাটি হইয়াছে। বরং আগে যে-সকল পাদ্রী ও মিশনরী দাসত্বপ্রথার সমর্থন করিতেন, তাঁহাদেরই স্থানভুক্ত অন্য পাদ্রী ও মিশনরীরা এখন দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদকে খৃষ্টধর্মের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া দাবী করেন।

আর-একটা দৃষ্টান্ত লউন।

আগে খৃষ্টীয় দেশসকলে ডাইনী বলিয়া সন্দেহভাজন স্ত্রীলোকদিগকে জলে ডুবাইয়া বা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইত। বাইবেলে তাহাদের প্রাণবধের সমর্থক যে-উক্তি আছে, তাহা এইপ্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারের সমর্থনার্থ উদ্ধৃত হইত। কিন্তু এখন ডাইনীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস খৃষ্টীয় দেশসমূহ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং ডাইনীদিগকে তথায় পুড়াইয়া বা জলে ডুবাইয়া বা অন্য কোনো-প্রকারে মারিয়া ফেলা হয় না। তাহা হইলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মটা টিকিয়া আছে।

সেইরূপ "অস্পৃশ্যতা," কাহারও-কাহারও প্রদত্ত জলের বা অন্নের অগ্রহণীয়তা অসবর্ণ বিবাহের ও বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধতা, প্রভৃতি এখন হিন্দু-ধর্ম্মের সার অংশ বলিয়া গৃহীত হইতেছে বটে ; কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে লোকে এগুলি পরিত্যাগ করিবে, তখনও হিন্দু-ধর্ম্ম থাকিবে, এবং নির্ম্মলতম প্রবলতম ও সজীবতমভাবে থাকিবে, হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর সাহিত্য, এবং হিন্দুর অতীত ও আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক্ বলিয়া মনে হয়।

শ্রুতি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। শ্রুতিতে কোটি কোটি লোকের বংশগত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বরং অতি "নীচ" কুলের লোকদিগকে হিন্দুর শিরোমণিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন ও তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, পুরাণে কাব্যে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। অসবর্ণ বিবাহের ও বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্ত প্রাচীন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। "নীচ" কুলজাত লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে।

আধুনিক কালে দেখিতে পাই, যাঁহারা অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা মানেন না, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত ও গৃহীত। বিস্তর হিন্দুর এখন বিধবাবিবাহ হইতেছে। তাহারা হিন্দুই থাকিতেছে। হায়দরাবাদের কায়স্থ মহারাজা কিষণপ্রসাদের কৌলিক রীতিই হইতেছে একটি মুসলমান পত্নী গ্রহণ। তাহাতে উক্ত বংশের হিন্দুত্ব লোপ পায় নাই। মোগল রাজত্বকালে যে-সব রাজপুত রাজা মোগলকে কন্যা দিয়াছিল, তাহাদের বংশধর রাজারা হিন্দু বলিয়াই এখনও পরিগণিত ; তাহাদের পাতিত্য ঘটে নাই। নাম করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আধুনিক সময়ের দেশ-বিদেশে বিখ্যাত মৃত ও জীবিত অনেক লোক ব্রাহ্মণসভার ও দেশাচার ও লোকাচারের অনুচর না হইয়াও সর্ব্বত্র হিন্দু বলিয়াই গৃহীত হইয়া

থাকেন। অপ্রসিদ্ধ এইরূপ লোকের সংখ্যা ত আরও অনেক বেশী—শতগুণ বা সহস্র-গুণ বলিলেও চলে।

হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুর লোকাচার ও দেশাচারের ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, এবং তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর ভারতবর্ষজাত সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান্ হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসকলে এবং ভারতীয় সাধুসন্তদিগের বাণীতে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নিহিত আছে, তাহা অতুলনীয় হইলেও তাহা ব্যতীত অন্য কোন দেশের মহাপুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সেইসব উপদেশ গ্রহণের জন্য খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান হইবার আবশ্যক নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

জা'তে জা'তে ঝগড়া-বিবাদ ও রেষারেষির আমরা বিরোধী। কিন্তু যদি ঘটনা-চক্রে উহা অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে তের লক্ষ ব্রাহ্মণ, অন্যান্য জা'তের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কালক্রমে যে শুধু কুড়ি লক্ষ নমশূদ্রদিগের দ্বারাই কোণঠেসা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সময় থাকিতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণসকলের সুবিধাজনক যে-ধর্ম্ম, ভবিষ্যতে তাহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া অধিকসংখ্যক অন্যান্য বর্ণের লোকদিগের সুবিধাজনক যে-ধর্ম্মমত, তাহাই নিশ্চয় হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যাঁহারা এতকাল শূদ্র বা শূদ্রাধম বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা যে সবাই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা, ন্যূনকল্পে, বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কতকটা সুলক্ষণ; কিন্তু নিজেরা "উন্নত" হইতে চাহিলেও তাঁহারা অন্য সকলের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বা বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করিতে চাহেন না, ইহা দুর্লক্ষণ। সকলে জানিয়া রাখুন, সমগ্র হিন্দুসমাজ উন্নত না হইলে কোন জা'তই সম্যক উন্নত ও শক্তিশালী হইতে পারিবেন না, এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজের উন্নতি ও শক্তিমত্তার মানে হীনতম, অজ্ঞতম, দরিদ্রতম, অবনততমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি।

১৩৩৫ কার্ত্তিক

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর উহার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৮ এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৪৭৮ ছিল। গবর্মেণ্ট এবং জেলা বোর্ড ও ম্যুনিসিপালিটী সমূহের ইহা অপেক্ষা বেশী বিদ্যালয় আছে। কিন্তু বঙ্গের অন্য কোন বেসরকারী সমিতির পরিচালনার অধীন এতগুলি

বিদ্যালয় নাই। সমিতির বিদ্যালয়-গুলির মধ্যে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১২টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, ২৯৬টি বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬টি বালকদের প্রাথমিক নৈশ বিদ্যালয় এবং ৯৩টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৩৫৪৩, ছাত্রীদের ৩৯৩৫। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি হইতে ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। এই বিদ্যালয়টির ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। ইহা যশোহর জেলার মসিয়াহাটি গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী তিনটি গ্রামে সমিতির তিনটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কেবলমাত্র নমঃশূদ্রদের দ্বারাই অধ্যুষিত ৯৬টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাহারা মসিয়া-হাটিতে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলিতে চায়। প্রথমে তাহারা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটিকে একত্র করিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করে। পরে উহাকেই তাহারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করে। গ্রামের লোকেরা সবাই চাষী। তাহারা দিনান্তে মাঠের কাজ শেষ করিয়া আসিয়া অনেক সময় অনেক রাত্রি পর্যন্ত ইট ফেলিত এবং তাহা পুড়াইবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করিত। এইরূপে তাহারা দেড় লাখ ইট পুড়াইয়া বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করে। সমিতির মেথরদের স্কুল, লাইব্রেরী, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা, সংকীর্ত্তনের দল, অবৈতনিক চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত, ব্রতী বালকের দল, প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জজ চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি সমিতির কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী

হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" শব্দটির যে ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক নিজেকে হিন্দু মনে করিতে পারেন, এবং হিন্দু মহাসভার ও প্রাদেশিক যে-কোন হিন্দু সভার সভ্য ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। অন্য ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় ব্রাহ্মেরাও হিন্দু সভার সভ্য হইতে পারেন। অনেক ব্রাহ্ম বরাবর আপনাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু কথাটির প্রচলিত অর্থ অনুসারে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা মূর্ত্তির পূজা ও মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা করেন বটে ; কিন্তু হিন্দুবংশোদ্ভূত যে-সব লোক তাহা করেন না, উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারাও হিন্দুনামে অভিহিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ, ঐতিহাসিক সত্যের দিক্ দিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, যে, হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রীতি, মোটামুটি একহাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। তাহার পূর্ব্বে

হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অন্যবিধ রীতিই প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, ইহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে।

ময়মনসিংহের হিন্দু সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পত্র দ্বারা এবং পরে মৌখিক নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ আমি পাই। বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যও মনোনীত হইয়াছিলাম। তথাপি নানা কারণে সম্মিলনীতে যোগ দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, যদি কোন ব্যক্তি মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুপদবাচ্য হয় এবং নিজের ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও আচার বিন্দুমাত্রও গোপন বা পরিবর্ত্তন না-করা সত্ত্বেও অন্যতম সেবক বলিয়া কাজ করিতে আহূত হয়, তাহা হইলেও সে যদি সম্মিলনীতে যোগ দিতে না চায়, তাহাও ত এক প্রকার পার্থক্যাভিমান বিবেচিত হইতে পারে। এইজন্য সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম। আরও একদিন আগে গেলে ঠিক্ হইত। বিলম্বে পৌঁছায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ও সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ শুনিতে পাই নাই। বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটিতেও গোড়া হইতে যোগ দিতে পারি নাই। যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও বরাবর শ্রোতা থাকিবারই ইচ্ছা ছিল। তাহাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় যেরূপ তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু কিছু বলা উচিত মনে হওয়ায়, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে কিছু বলিয়াছিলাম। সে-সব কথা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু মহাসভা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সভা নহে, কিন্তু যদি অন্য কোন সভাসমিতির কোন প্রস্তাব, সংকল্প বা কার্য্য দ্বারা হিন্দুসমাজের ক্ষতি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তখন রাজনৈতিক বিষয়েও তাহার মত প্রকাশ করা উচিত। আমার এই ধারণা অনুসারে কোন কোন তর্কবিতর্কে যোগ দিয়াছিলাম। সমগ্রভারতীয় সর্ব্বসাম্প্রদায়িক কোন রাজনৈতিক সভা সমিতি এ পর্য্যন্ত সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে চান নাই। সুতরাং কোন প্রাদেশিক হিন্দু সভার পক্ষে সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিবার সংকল্প করা অনাবশ্যক বোধে আমি ঐরূপ প্রস্তাব সম্মিলনীতে পেশ্ ও আলোচনা করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলাম। এই কমিশন বর্জ্জন করা যে সকল ভারতীয়ের কর্ত্তব্য, এই মত আমি আমার ইংরেজী বাংলা উভয় কাগজে বরাবর ব্যক্ত করিয়া আসিতেছি এবং তাহা অপরিবর্ত্তিত আছে।

সম্মিলনীর কাজ বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিনিধি ও শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। চিক বা অন্য কোন রকম পর্দ্দার আড়ালে তাঁহারা বসেন নাই অল্পবয়স্ক লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে বলপ্রয়োগ হইয়াছিল, তাহা বেশী দূর গড়ায় নাই। সভাপতি মহাশয় নিজের পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গাম্ভীর্য্য ধীরতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সভার কাজ চালাইয়াছিলেন।

আমি বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশিকার মান পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। উত্তর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের একতার একটি কারণ ও নিদর্শন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তির উপর বর্ত্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে। গাছকে জমী হইতে আমূল উৎপাটিত করিলে যেমন গাছ বাঁচে না, বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতাকেও তেমনি প্রাচীন

সভ্যতার সহিত সম্পর্কশূন্য করিলে উহা জীবনশূন্য হইবে, অন্ততঃ আবহমানকালের ভারতীয় সভ্যতা বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে না। প্রাচীনের সহিত নবীন সভ্যতার যোগ রক্ষার উপায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ব্যতীত অবলম্বিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধারণ ইতিহাস, ধর্ম্মের সভ্যতার সাহিত্যের শিল্পের ইতিহাস, ভাল করিয়া জানিতে হইলে সংস্কৃত জানা চাই। ভারতীয় দর্শন সংস্কৃত না জানিলে ভাল করিয়া জানা যায় না। বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বাংলার সুলেখক হইতে হইলে কিছু সংস্কৃত জানা চাই। যাঁহারা বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় এমন কিছু কিছু লিখিতে চান, যাহাতে নূতন শব্দ রচনার প্রয়োজন, তাঁহাদের সংস্কৃত না জানিলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। এইরূপ নানা কারণে আমি শুধু হিন্দুদের নয়, অন্য সব ভারতীয়েরও সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক। হিন্দু ছাত্রদিগকে উহা শিখিতে বাধ্য করিলে তাহারা ধর্ম্মমূলক কোন আপত্তি তুলিবে না, অন্যেরা অমূলক হইলেও তাহা তুলিতে পারে। এইজন্য ব্যাপক অর্থে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের উহা অবশ্য শিক্ষিতব্য করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শিখাইবার প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উহা শিখিতে এখন যত কষ্ট হয় ও সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা সহজে ও কম সময়ে নিশ্চয়ই উহা শিখা যায়।

১৩৪২ মাঘ

হিন্দু মহাসভা ও জাতিভেদ

নাগপুর হইতে "হিতবাদ" নামক একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী খবরের কাগজ সপ্তাহে তিন বার বাহির হয়। ইহা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সম্পাদক অহিন্দু নহেন, হিন্দু ; ব্রাহ্ম সমাজের বা আর্য্য সমাজের লোকেরা যে-অর্থে হিন্দু সে-অর্থে হিন্দু নহেন, প্রচলিত অর্থে হিন্দু। এই কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

In the Subjects Committee of the Hindu Mahasabha Pandit Malaviya gave a ruling which will end in restricting the activities of the Sabha and its deliberations to a great extent. While ruling that the question of untouchablility was in order, Pandit Malaviya held that inter-caste marriages and the abolition of castes were outside the sphere of the Mahasabha. The Hindu Mahasabha. if it excluded questions between castes, will handicap the growth and popularity of the institution and will become an instrument for the use of those who are interested in keeping the *status quo*...

তাৎপর্য্য। হিন্দু মহাসভার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে তাহার সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেন, যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ও প্রস্তাব ধার্য্য করিবার অধিকার

মহাসভার আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহ চালান এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া মহাসভার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে। এই মীমাংসা সভার কর্ম্মিষ্ঠতা ও আলোচনা বহু পরিমাণে সীমাবদ্ধা করিবে। ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন উঠে বা বিবাদ ঘটে, তাহা যদি মহাসভা আলোচনার বাহিরে রাখিয়া দেন তাহা হইলে ইহার বদ্ধিষ্ণুতা ও লোকপ্রিয়তাতে বাধা পড়িবে, এবং হিন্দু-সমাজকে ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা যাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক, ইহা তাহাদেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে, জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিলে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুত্ব রক্ষা পাইবে না। আমরা তাহা মনে করি না। জন্মগত ও বংশগত জা'ত না মানিয়া যদি বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও সমাজ এবং মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে জন্মগত ও বংশগত জা'ত না মানিলে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজই বা কেন লোপ পাইবে? জন্মগত ও বংশগত জাত ছাড়া কি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের আর কোনই বিশেষত্ব নাই? আমি যেবার সুরাটে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলাম, সে-বার আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম, জাতহীন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভবপর (It is possible to imagine the existence of a casteless Hindu society)। ইহাতে ত তখন বা তাহার পরেও হিন্দু মহাসভার কোন গোঁড়া সভ্য কোন আপত্তি করেন নাই বা বিতর্ক তুলেন নাই।

যাহা হউক, জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদের উচ্ছেদ বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা মহাসভার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে বলিয়া মানিয়া লইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহও যে তাহার আলোচনার বহির্ভূত, ইহা কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতীত কালে হিন্দু সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অনুলোম বিবাহ ত বেশ চলিত ; প্রতিলোম বিবাহ তদপেক্ষা সংখ্যায় কম হইলেও তাহাও চলিত। উভয়বিধ বিবাহেরই দৃষ্টান্ত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কাব্যে পুরাণে পাওয়া যায়। তাহা হইলে কি আগেকার হিন্দুসমাজ হিন্দু ছিল না?

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত দার্জিলিঙ জেলায়, এবং স্বাধীন নেপালের হিন্দু-সমাজে ও অর্দ্ধ-স্বাধীন সিকিমের হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রিটিশ ভারতের নানা প্রদেশে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ, সংখ্যায় কম হইলেও, হইয়া থাকে। কলিকাতায় কালীঘাটে হরিশ চাটুজ্যের সড়কে ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে যে হিন্দু মিশনের কার্য্যালয় অবস্থিত, সেই হিন্দু মিশন একটি সুবিদিত প্রতিষ্ঠান। এই হিন্দু মিশন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন—কতকগুলি দিয়াছেন। হিন্দু সমাজে—অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজে—অসবর্ণ বিবাহ, হইলে তাহা ব্রিটিশ আইন অনুসারে রেজিষ্টরী হইতে পারে, এবং তাহা আইনসঙ্গত। জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদ হিন্দুসমাজ হইতে উঠাইয়া, দেওয়া হউক বা না হউক, হিন্দুসমাজের সংহতি, ঘননিবিষ্টতা, দলবদ্ধতা উৎপাদন, রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য এবং তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ সংরক্ষণের জন্য অসবর্ণ বিবাহ একান্ত আবশ্যক। এবং আর একটি সংস্কারও একান্ত অবশ্যক। তাহা অমুক জা'ত বড় ও শুদ্ধ এবং অমুক জা'ত ছোট ও অশুদ্ধ—এইরূপ ভেদজ্ঞানের ও তদনুরূপ আচরণের উচ্ছেদ। এইরূপ ভেদজ্ঞান হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহের উপদেশবিরুদ্ধ।

হিন্দু মহাসভা ও অস্পৃশ্যতা

পুনার অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন ও জাতিভেদের উচ্ছেদ এই দুটি বিষয়ের আলোচনা না করিলেও অস্পৃশ্যতা-সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি করবীর পীঠের শঙ্করাচার্য্য ডক্টর কুর্ত্তকোটি মহাসভার সমক্ষে উপস্থিত করেন। সর্ব্ব-সাধারণের জন্য অভিপ্রেত প্রতিষ্ঠানসমূহের ও স্থানসমূহের ব্যবহারে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের যে অধিকারহীনতা বিদ্যমান আছে, এই প্রস্তাব সেই অধিকারহীনতার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা অন্য হিন্দুদের মত তাহাদেরও অধিকার স্থাপন করিতে হিন্দুসমাজকে অনুরোধ করিয়াছে। মন্দিরাদি পূজার স্থান, কূপাদি জলাশয় প্রভৃতির ব্যবহারে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অন্য হিন্দুদের সমান অধিকার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রস্তাবটি যত দূর গিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া মতভেদ ও বাগবিতণ্ডা হইবে। তথাকথিত অস্পৃশ্য সকল জাতি মন্দিরের বাহির হইতে দেবদেবী-মূর্ত্তিকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পারে—অনেকে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে না ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহারা স্বয়ং স্বহস্তে দেবদেবী পূজা করিতে চাহিবে। বস্তুতঃ, বঙ্গে যে কোন কোন স্থানে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা হয়, তাহাতে কোথাও কোথাও সকল জাতির লোকদেরই পৌরোহিত্য করিবার, ভোগ রাঁধিবার, এবং এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবার অধিকার—শুধু কথায় নহে, কাজেও—স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দুসমাজ লোপ পায় নাই। বঙ্গের স্থানে স্থানে "তপশীলভুক্ত" জাতিদের এই যে দাবি স্বীকৃত হইয়াছে, অন্য সব প্রদেশেও সেইরূপ দাবি হইবে বা হইয়াছে, এবং তাহাও মানিয়া লইতে হইবে। মানিয়া লইলে হিন্দুসমাজের গৌরব, সংহতি ও শক্তি বাড়িবে।

—

অবনত হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্ভাবনা

হিন্দু সামাজিক প্রথা অনুসারে অবনত শ্রেণী-সমূহের হিন্দুরা বহু সামাজিক ও সাধারণ মানবিক অধিকার হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিয়া আসিতেছে, অনেক লাঞ্ছনা, অসুবিধা এবং কখন কখন উৎপীড়নও ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানের ও খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যাবৃদ্ধির তাহাই প্রধান কারণ। হিন্দুর সংখ্যার আপেক্ষিক হ্রাসেরও তাহাই কারণ। এই কারণে এখনও হিন্দুসমাজের ক্ষয় এবং অন্য দুই সমাজের বাড়তি চলিতেছে। কিছুকাল হইতে অবনত হিন্দুদের মধ্যে অনেকে আপনাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে বলিতেছেন হিন্দুসমাজে অন্য সব হিন্দু জাতিদের সহিত তাঁহাদের সাম্য স্বীকৃত ও স্থাপিত না হইলে তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের অন্যতম নেতা ডাঃ আম্বেদকর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। অন্য অনেক নেতা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। কিন্তু

হিন্দু সমাজে অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের মর্য্যাদা অপর সকল হিন্দুদের সমান না হইলে কতক অবনত হিন্দুর ধর্ম্মান্তরগ্রহণ অনিবার্য্য। হিন্দু-সমাজের ক্ষয় নিবারণ ও শক্তিরক্ষার নিমিত্ত অবনত হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ অনাবশ্যক করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সকল হিন্দু জাতির সামাজিক মর্য্যাদা সমান করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে সংখ্যাভুয়িষ্ঠ ও সংখ্যার দিক্ দিয়া বলিষ্ঠ রাখিবার জন্যই যে অবনত হিন্দুদের সাম্য আবশ্যক তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব রক্ষার নিমিত্ত তাহা আবশ্যক। গোরু মহিষ ছাগল ভেড়া গাধা ঘোড়া ইন্দুর বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী অস্পৃশ্য নহে। অথচ কতকগুলি জাতির মানুষ অশুদ্ধ বা অস্পৃশ্য, ইহা শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ নহে, হইতে পারে না।

এই হেতু পরম হিন্দু মহাত্মা গান্ধী শুধু অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নহে, জাতিভেদের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করিয়াছেন—কয়েক সপ্তাহ হইল ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হরিজন' কাগজে লিখিয়াছেন "Caste must go," "জাতিভেদকে বিদায় দিতে হইবে"।

অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত অন্য হিন্দুদের বিরোধ ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য গত ২৮শে ডিসেম্বর অবনত হিন্দুদের প্রতিনিধিগণের সহিত পুনায় হিন্দু মহাসভার নেতাদের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা-সভায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অবনত হিন্দুদের নেতারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং অবনত জাতিদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণ ও অর্থসংগ্রহের জন্য উভয় শ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিতে হইবে। অবনত জাতিদের অন্যতম নেতা রাজভোজ বলিয়াছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে হীন করিয়া রাখিবার জন্য যে-সমুদয় ব্যবস্থা আছে তাহা শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার সভ্যগণ বলিয়াছিলেন— ঐ সকল প্রস্তাব বিষয়- নির্ব্বাচনী সভায় আলোচনা করিয়া প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত করা হইবে।

হিন্দু মহাসভার যে-সকল সভ্য পুনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যদি বলিতে পারিতেন, যে, জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, যদি শিক্ষাদান প্রভৃতি দ্বারা অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসংগ্রহ-কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিতেন, এবং অবনত শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত কোন কোন গ্রন্থে যে-সব বচন আছে তাহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশের বিরুদ্ধ যদি বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবনত শ্রেণীর লোকদের মন আশান্বিত হইত।

কোন গ্রন্থে যদি লেখা থাকে, যে, অদ্বিজেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা সেই গ্রন্থের অগৌরব-জনক। কিন্তু তদ্দ্বারা বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ কাহারও ক্ষতি হয় না। বিস্তর অদ্বিজ হিন্দু ও অহিন্দু আজকাল বেদ পড়ে, কিন্তু কাহারও জিহ্বা কাটা যায় না। ঐরূপ বচন উঠাইয়া দিলাম, কেহ বালিলেই ভারতবর্ষে ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে ঐ বচনসংযুক্ত যত বহি আছে, তাহা হইতে উহা বর্জ্জিত হইবে না। সুতরাং বচনগুলি তুলিয়া দিতে বলার কোন সার্থকতা নাই।

১৩৪২ পৌষ

বোম্বাই প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও জাতিভেদ

বোম্বাই প্রাদেশিক হিন্দুসভার এবং বোম্বাই শহরে স্থিত তাহার শাখাসমূহের কর্ম্মীদের দ্বারা আহূত একটি কন্‌ফারেন্সে জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া পুনায় নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

Whereas the caste system, bassed on birth, as at present existing, is manifestly contrary to universal truth and morals, whereas it is the very antithesis of the fundamental spirit of the Hindu religion, where as it flouts the elementary rights of human equality, and whereas Varnashram of the shastras from which it derives its authority is to-day non-existent in practice, this All-India Hindu Mahasabha sessions declare their uncompromising opposition to the system and calls upon the Hindu Society to put a speedy end to it.

জন্মগত জাতিভেদের (caste-এর) উচ্ছেদে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা তাহাতে মত দিবেন কিনা, তাহা কিন্তু সন্দেহস্থল।

১৩৪৩ বৈশাখ

ক্ষত্রিয় কে?

সর্ যদুনাথ সরকার গত বৎসর ২৪শে ফাল্গুন তাঁহার দিব্য-স্মৃতি উৎসবের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

মহারাজ দিব্য এবং ভীম কৈবর্ত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার যুদ্ধব্যবসায়ী। বর্ত্তমানে বরেন্দ্র-ভূমিতে তাঁহাদের স্বজাতিগণ মাহিষ্য বলিয়া অভিহিত হন। আমরা যদি ভগবদ্গীতায় বিশ্বাস করি এবং গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের লোক সৃষ্ট হয় একথা মানি তবে এই সব কৈবর্ত্তকে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। যে দুইজন বীর প্রাণপণ করিয়া বরেন্দ্রী ভূমির অত্যাচারকারীকে দমন করেন, বিদেশী শত্রুকে তাড়াইয়া দেন, লক্ষ লক্ষ প্রজার, পুরুষ স্ত্রী-র প্রাণ মান রক্ষা করেন তাঁহারা গুণে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয় ছিলেন ; নামে যে জাতিই হউন না কেন, আসে যায় না।

সুতরাং আমরা যে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হিন্দুকে রেলওয়ের চারি শ্রেণীর গাড়ীর মত উচ্চ নীচ ভাগ করিয়া, প্রথম শ্রেণী শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয় শ্রেণী নীলবর্ণ, মধ্যম শ্রেণী খয়েরী বর্ণ, আর থার্ড ক্লাস হলদে রঙের পোঁচ দিয়া, মাথার উপর ভিন্ন ভিন্ন নাম লিখিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, তাহা চির-সত্য নহে, ঐতিহাসিক সত্যও নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজপুতদের মত বীর জাতি ভারতে আর কেহ নাই জগতেও বিরল। এই রাজপুতগণ নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব্ব করে

অপর জাতিকে ঘৃণা করে। পশ্চিম অঞ্চলে কোন লোককে ভীরু বলিতে হইলে চলিতে ভাষায় বলা হয় "সে তো বানিয়া" অর্থাৎ দোকানদার, বৈশ্যজাতি। অথচ এই বানিয়া জাতীয় লোক রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলের নেতা হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত রাজপুতানার ইতিহাসে অনেক পাইয়াছি।

সুতরাং আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্যই বলিয়াছেন—গুণাপূজাস্থানং ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" যদি গুণ দেখিয়া সম্মান করিতে হয়, তবে আজ আমরা বরেন্দ্রীবাসী বরেন্দ্রীপ্রবাসী সকলে মিলিয়া বরেন্দ্রী মাতার শ্রেষ্ঠ বরেণ্য সন্তান দিব্য ও ভীমের আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করি। এই উদ্যোগ শুভ হউক। সে যুগের ইতিহাসের লুপ্ত নিদর্শনগুলি উদ্ধার করিতে তরুণবৃন্দ আজ ব্রতী হউক।

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ

ঢাকা-ময়মনসিংহ ঋষি-সম্মেলন

ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ঋষি-নামধেয় চর্ম্মকার জাতির সম্মেলনে গত বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য বর্ণহিন্দুবংশীয় যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি তাঁহার অভিভাষণের গোড়ায় বলিয়াছেন ঃ—

"আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি আগ্রহের সহিত স্বীকার করিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইল আমি নিজেকে আপনাদেরই এক জন বলিয়া মানিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে বর্ণহিন্দু সমাজ আপনাদিগকে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা করিয়া আসিতেছে, আমি সে সমাজকে ন্যায়পরায়ণ হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং সেই সমাজে আপনাদের যতটুকু স্থান তাহার বেশী আমি পাইতে ইচ্ছা করি নাই। আপনারা আজ একতাবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দ পাইয়াছি।

বর্ণহিন্দুদের সমাজে আপনাদের কি স্থান তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই অতিশয় পীড়া অনুভব করি। আপনাদের বৃত্তিকে আমি মহৎ মনে করি। যে গোমাতার উপর মানুষের কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর ক'রে আপনারা তাহার সৎকার করেন। তাহার চামড়ার উপযুক্ত ব্যবহারে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আপনারা সমাজের সেবা করেন। চামড়া না হইলে আমাদের চলে না, কীর্ত্তনে খোল চাই, বিবাহে ও উৎসবে বাদ্য চাই, পরিধানে জুতা চাই এ সমস্ততেই চামড়ার আবশ্যক। চামড়ায় সমাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই চামড়া যাহাদের শ্রমে ব্যবহার-উপযোগী হইবে তাহারা অস্পৃশ্য। এই ব্যবস্থায় না আছে হৃদয়, না আছে বিচার।"

অভিভাষণটির অন্যান্য অংশও সারবান্। আর একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সকলেরই শিক্ষালাভ করা উচিত ; কিন্তু কেবল ক, খ, শিখিলেই অথবা দুইখানা বাংলা বই পড়িতে পারিলে বা দুই পাতা ইংরেজী পড়িতে শিখিলেই শিক্ষা পাওয়া হইলে বলা যায় না। কেবল উহাই শিখিলে শিক্ষা—শিক্ষা ত হয়ই না, বরঞ্চ কার্য্য করার শক্তি আরও লোপ পায় বলিয়া দেখিতেছি। লেখাপড়া শিক্ষা যখন কোনও একটা শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া হয়, তখন তাহা সার্থক হয়। শিল্পশিক্ষাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের সাহায্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আবশ্যকীয় জ্ঞানও লাভ হয়। এই ধরুন, মৃতপশুর চামড়া খসাইবার কাজ। এই কাজ করিতে করিতে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়িলে ছেলেরা শরীরতত্ত্বে জ্ঞান পাইতে পারে। শরীরের ভিতরকার কোন্ অংশকে কি বলে, কেমন করিয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃত ও মূত্রাশয় কাজ করে, খাদ্যবস্তু কেমন করিয়া হজম হয়, মাংসপেশীগুলি কোথায় কেমন ভাবে আছে, চক্ষু ও কান, নাক ও কণ্ঠ—এগুলির গঠন ও ক্রিয়া এই সমস্তই ক্রমে ক্রমে শিখিতে পারে

এবং ঐ সকল যন্ত্রের যত্ন কেমন করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিতে পারে। কত রকম হাড় আছে, তাহাদের সংখ্যা কি, কেমন করিয়া নানা অংশ যুক্ত হইয়া আছে—জোড়াই-এর প্রকার ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। শক্তি প্রয়োগ করিতে কেমন করিয়া অংশসকল গঠন করা হয় ও সাজান হয়, সে সকল জ্ঞান পাইয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারা যায়। বর্ত্তমান পুঁথি-পড়া শিক্ষা বদলাইয়া এই ধরণের শিক্ষা লইতে সকলকে গান্ধীজী বলিতেছেন। আপনাদের এই শিক্ষা সকলের আগে লইতে হয়, কেন না আপনাদিগকে অতি শীঘ্র সকলের সঙ্গে সমানে চলিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে আরও অধিক আগাইয়া যাইতে হইবে।"

ময়মনসিংহের পাটনী-সম্মিলনী

ময়মনসিংহ জেলার পাটনী-সম্মিলনীতে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত পাটনীদিগকে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইবার নিমিত্ত যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অন্য হিন্দুদের ও তাহাদের অবশ্য পালনীয়। তাঁহার বক্তব্যের তাৎপর্য্য এই ঃ—

(১) পাটনী সম্প্রদায়ের উপর যে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার ছাপ আছে তাহা দূর করিতে হইবে ; (২) তাহাদিগকে শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং জীবিকার্জ্জনক্ষম করিতে হইবে, (৩) তাহাদিগকে স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং (৪) সর্ব্বোপরি তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতি যে বড় হইয়াছিল, মধ্যযুগের আরবেরা যে বড় হইয়াছিল, এবং ইংরেজরা যে বড় হইয়াছে, তাহা বহু পরিমাণে তাহাদের নাবিকদের শক্তি ও সাহসের জোরে। আমরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়াছিলাম, এবং নাবিকদিগকে পায়ে ঠেলিয়াছি ; পরপদানত হইয়াছি। এখন বঙ্গের নদীগুলির খেয়াঘাটে পর্য্যন্ত অবাঙালী মাঝি বিরাজিত এবং বিদেশী ও দেশী যত ষ্টীমার বঙ্গে চলে, তাহার চালক-কর্ম্মীদের মধ্যে, পাটনী দূরে থাক্, অন্য কোন জাতির হিন্দুও নাই।

বিবাহ সংক্রান্ত

১৩১৮ চৈত্র
অসবর্ণ বিবাহ বিল

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে আইনসঙ্গত হয়, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তাহা পাশ হওয়া দূরে থাক্, সিলেক্ট-কমিটি দ্বারা বিবেচিতও হইল না। ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অন্যতম যুক্তি এই যে দেশের অধিকাংশ লোক ইহার সপক্ষে নহে। গবর্ণমেণ্ট যখন সংবাদপত্র আইন প্রভৃতি পাস্ করেন, তখন দেশের অধিকাংশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ত প্রকাশ করেনই না, ভ্রূক্ষেপও করেন না। ভারতগবর্ণমেণ্ট সুবিধামত নিজেচ্ছাচারী ও লোকেচ্ছাচারী হন।

—

১৩২৫ মাঘ
শ্রীযুক্ত পাটেলের বিল সম্বন্ধে রবিবাবুর মত

মহারাষ্ট্রদেশের নাসিক সহরের ভারত-সেবক নামক মরাঠি মাসিকপত্রের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই ঝাভেরভাই পাটেলের অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহবিষয়ক আইন সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রবিবাবু যে চিঠি লিখিয়াছেন, দেশহিতৈষী মাত্রের তাহা প্রনিধানযোগ্য। পত্রখানির মূলকথা যাহা তাহা "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক তাঁহার বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পত্রখানি নীচে মুদ্রিত হইলে।

Sir,—In answer to your Letter dated 8th December, I hasten to answer that the Hon. Mr. Patle's Bill has my heartiest support.

It is humiliating to find that some of our countrymen are opposing this Bill under the notion that it will injure Hindu Society if it is passed. They do not seem to consider that those who are already willing to accept social martyrdom should not have any further coercion, passive or active, from any governing power, to oblige them to observe against their will such conventions as are not based upon the foundatin of moral laws. To say that Hindu society cannot exist unless it has victims who are forcibly compelled to live the life of falsehood and cowardice, is tantamount to saying that it should not exist at all. Moreover, such an implication is a libel against the spirit of Hinduism, which all through its history has been accommodating differences of creeds and customs, allowing mixture of castes and making new social adjustments from the time of the Mahabharat until now when an alien Government has nearly succeeded in petrifying our social body with its rigid laws, depriving it of life's flexibleness and thus hastening its fatal stage of senility. No doubt, society everywhere looks upon with suspicion and treats with hostility those men who choose to think and act for themselves, who have an invincible love for intellectual and moral freedom. But the community, which goes beyond all limits of endurance, which takes every step to make it impossible for such men to live within its pale, the men who have the courage and honesty of their conviction and are therefore best-

fitted to fight for truth and righteousness, is doomed to breed interminable generations of slaves. Where the society is terribly effective in its weapons of persecution it is shameful to appeal to a foreign Government to stiffen by its sanction a social tyranny, to rob people of their right to the freedom of conscience, and in the next moment to ask from the same Government a wider political emancipation. Those who feel no compunction in invoking the organised power of the State to compel or help by its connivance a weak minority to submit to the worst form of social slavery, can certainly not be held as fit to claim a large share of such power.

Yours faithfully
(Sd.) Rabindranath Tagore.
Santiniketan, Dec. 19th, 1918.

তাৎপর্য্য।—

মহাশয়,

আপনার ৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রের উত্তরে আমি তৎপর হইয়া জানাইতেছি যে মাননীয় পাটেল মহাশয়ের বিলকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

আমাদের দেশের কতকগুলি লোক এই বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন এই ধারণায় যে যদি ইহা আইনে পাস্ হয় তবে হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও হীনতার পরিচায়ক। তাঁরা বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন না যে যারা ইতিমধ্যেই সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে তাহাদিগকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চারিত্র্যনীতি ভিন্ন অপর কোনোরূপ কৃত্রিম রীতি পালন করাইবার জন্য শাসকশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইবে না। হিন্দু সমাজে যদি এমন লোক না থাকে, যাদের বাধ্য হইয়া মিথ্যাচারে ভীরুতায় জীবনকে বলি দিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ উচ্ছন্ন যাইবে—এমন কথা বলাও যা, আর হিন্দুসমাজ একেবারেই আর তিষ্ঠিবে না বলাও তা, একই কথা। অধিকন্তু এরূপ আরোপ হিন্দুত্বের মর্ম্মাগত সত্যের অপমান ও অপযশ করা—হিন্দুত্ব ইতিহাসের আবহমান ধারায় সর্ব্ব ধর্ম্ম ও রীতিনীতির সমন্বয় সাধন করিয়া জাতি মিশ্রণ ও নব নব সামাজিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া আসিয়াছে—মহাভারতের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত যখন বিদেশী গভর্মেন্ট কঠিন আইনের বন্ধনে আমাদের সমাজশরীরকে একেবারে পাষাণ করিয়া তুলিয়া তার জীবনের নমনীয়তা হরণ করিয়াছে ও এইরূপে তাকে বার্দ্ধক্য ও জরার সাংঘাতিক অকথায় দ্রুত উপনীত করিয়া দিতেছে। যে-সব লোক নিজে চিন্তা করিয়া স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে চায়, যাদের বুদ্ধি ও আচরণের স্বাধীনতার প্রতি অপরাজেয় অনুরাগ আছে, তাদের সর্ব্বদেশের সমাজই সন্দেহের চক্ষে দেখে ও তাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, সত্য বটে। কিন্তু যে-সব লোকের ধারণা ও মত অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার সততা ও সাহসের জোর আছে তারাই সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের উপযুক্ত পাত্র ; যে সমাজ সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ রকম লোকদিগের নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকা অসহ্য ও অসম্ভব করিয়া তোলে, সে সমাজ অফুরন্ত দাসের বংশই লালন করিতে অভিশপ্ত হয়। যে দেশে সমাজই ভীষণ ভয়ঙ্কর রকমে তার অত্যাচার উৎপীড়নের অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ, সেখানে আবার বিদেশী গভর্মেন্টকে সেই সামাজিক অত্যাচার স্বীকার করাইয়া কঠিনতর করাইবার চেষ্টা, বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করিবার আয়োজন, এবং সেই সঙ্গে সেই গভর্মেন্টের কাছেই অধিকতর পলিটিক্যাল বন্ধনমুক্তি চাওয়া নিতান্তই লজ্জাহীন বেহায়ার কর্ম্ম। যারা রাষ্ট্রশক্তির বিধিবদ্ধ ক্ষমতার সাহায্য লইয়া তার সম্মতি বা সাহায্যে দুর্ব্বল অল্পসংখ্যক লোককে নিকৃষ্টতম সামাজিক দাসত্বে অবনত করিতে কিছুমাত্র গ্লানি বা ক্লেশ অনুভব করে না, তারা যে রাষ্ট্রশক্তির অধিকতর অধিকারের দাবী করিবার উপযুক্ত তাহা বলা যায় না।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন, ১৯এ ডিসেম্বর, ১৯১৮।

বিভিন্ন জা'তের বিবাহ সিদ্ধ করিবার আইন

হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন জা'তের লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে তাহা বৈধ বিবাহ বলিয়া যাহাতে গণিত হয়, তাহার জন্য বোম্বাইয়ের মাননীয় বিঠলভাই ঝাভেরভাই পাটেল মহাশয় বড়লাটের সভায় একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। এই বিল বা পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় এ নয়, যে, কাহাকেও জোর করিয়া ভিন্ন জা'তে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইবে। উদ্দেশ্য কেবল এই যে, যদি কেহ কেহ এরূপ বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা আইনের চক্ষে বৈধ পতি ও পত্নী বলিয়া এবং তাহাদের সন্তানেরা বৈধ সন্তান বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, হিন্দু বিধবার বিবাহ যাহাতে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার আইন বহুকাল হইল হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য দলে দলে বিধবার বিবাহ হয় নাই, এবং একজন বিধবাকেও কেহ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে বাধ্য করে নাই। পাটেল মহাশয়ের বিলের উদ্দেশ্যও বৈধতাসম্পাদন, জবর্‌দস্তী নহে। এই বিল যদি পাস্‌ হয়, এবং কোন হিন্দু যদি তদনুসারে ভিন্ন জা'তে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে একঘরে করিবার অধিকারও হিন্দুসমাজের থাকিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, এই বিলের বিরোধীরা হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দুজাতির ইতিহাস না জানিয়াও মহা পাণ্ডিত্যের ও গোঁড়ামির ভান করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জা'তের বিবাহের (অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় প্রকার বিবাহের) সমর্থক ও নিষেধক উভয় প্রকার বাক্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। সমর্থক শাস্ত্রকাররা অহিন্দু, আর নিষেধকাররা হিন্দু, এরূপ বলিবার অধিকার কাহারও নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ বিবাহের বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। বর্ণশঙ্করেরা যে সবাই ঘৃণিত হইতেন তাহাও নহে। ব্যাস ছিলেন বর্ণশঙ্কর, বৈশম্পায়ন ছিলেন বর্ণশঙ্কর, সুমন্ত্র ছিলেন বর্ণশঙ্কর। তাঁহারা কি ঘৃণিত ছিলেন, না এখন কেহ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে? নেপালে, সিকিমে, দার্জ্জিলিঙে এখনও ভিন্ন ভিন্ন জা'তের বিবাহ চলিত রহিয়াছে। যাহারা এরূপ বিবাহ করিতেছে, তাহাদের পিণ্ডলোপ হইতেছে না, ঐ সব অঞ্চলে হিন্দুসমাজ বলিয়া একটি জিনিষও লোপ পায় নাই। বড়োদা, কোল্‌হাপুর ও ইন্দোর রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু জাতের বিবাহ আইনসিদ্ধ। ঐ সব হিন্দুরাজ্যে ত হিন্দুসমাজ ওলটপালট হয় নাই।

কার্ত্তিক ১৩২৫

সম্মতির বয়স আইন

বর্ত্তমান আইন অনুসারে বালিকাদের সম্মতির বয়স ১২। বখ্‌শী সোহনলাল বিবাহিতা ও অবিবাহিতা উভয়বিধ বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ করিবার জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়া তাহার আলোচনা ও আবশ্যকমত

সংশোধন ও পরিবর্ত্তন জন্য সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত একটি কমিটি (Select Committee) নিয়োগের অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার্ উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট্ বলেন, যে, ইংলণ্ডে ১৩ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার জন্য খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তের হইতে ষোল বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার জন্য শাস্তি কিছু কম হয়। বখ্‌শী সোহনলালের প্রস্তাবিত আইনে কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের সম্বন্ধে অপরাধের জন্যও গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বিবাহিতা বালিকাদিগকে এই প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভূত করিতে গবর্ণমেণ্টের অধিকতর আপত্তি আছে। গবর্ণমেণ্ট দুই সর্ত্তে এই বিলের সমর্থন করিতে পারেন—১ম, বিবাহিতা বালিকাদিগকে ইহার অন্তর্ভূত করা হইবে না ; ২য়, ১২ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকাদের সম্বন্ধে অপরাধের দণ্ড ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের বিরুদ্ধে অপরাধের দণ্ড অপেক্ষা কম কঠিন হইবে।

স্যার্ উইলিয়ামের এইসব কথার পর, মিঃ এলান্ বিলের প্রবল সমর্থন করেন। তিনি বলেন, ভারতে এক পুরুষে বত্রিশ লক্ষ অল্প-বয়স্কা মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

মিঃ আম্‌জাদ্ আলী বলেন, যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে সব (ভারতীয়) স্বামীকে জেলে যাইতে হইবে। বক্তার এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, ইহা এ দেশের অল্প-বয়স্কা বিবাহিতা বালিকাদের অধিকাংশের অবস্থার সত্য আভাস দেয়।

স্যার্ উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট্ বলেন, যে, বিলের প্রস্তাবক বখ্‌শী সোহনলাল গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত দুটিতে সম্মতি জানাইয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ায় উহার পক্ষে ২৯ ও বিপক্ষে ৪১ জন ভোট দেওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়।

গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত অনুসারে পরিবর্ত্তিত বিলটির বিরুদ্ধেও এত "সভ্য" ভোট কেন দিলেন তাহার যুক্তিসঙ্গত বা নৈতিক কোন কারণ আমরা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। দুর্নৈতিক কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। বুঝিলাম, বিবাহিতা বালিকাদিগকে আইনের অন্তর্গত করিলে অনেক স্বামীর বিপদ আছে ও সামাজিক আপত্তি আছে। কিন্তু ঐ ৪১ জন "সভ্য" কি ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা অবিবাহিতা বালিকাদের উপর অত্যাচারের সমর্থন করেন?

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইন

"হিন্দুর শ্রেষ্ঠতা" ("Hindu Superiority") প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থের লেখক আজমের নিবাসী রায়সাহেব হরবিলাস সর্‌দা মহাশয় হিন্দু বাল্যবিবাহ-নিষেধক যে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে পাত্রীর ন্যূনতম বয়স বার এবং পাত্রের

ন্যূনতম বয়স ষোল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার কম বয়সে কোন বরকন্যার বিবাহ হইলে তাহা নাকচ হইবে, তাহা বিবাহ বলিয়া আইন অনুসারে সিদ্ধ হইবে না। কোন বালিকার অভিভাবক কোন বিশেষ কারণে তাহার বয়স এগার পূর্ণ হইবার পর ও বার পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া বিবাহ দিতে পারিবে।

পাত্রপাত্রীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স ষোল ও বার অত্যন্ত কম। যথাক্রমে একুশ ও আঠার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ হওয়া ঠিক্ মনে করি না। তবে লোকমতের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া পাত্র ও পাত্রীর ন্যূনতম বয়স আঠার ও চৌদ্দ করা যাইতে পারে। ইহাতেও শাস্ত্র লোকাচার প্রভৃতির দোহাই দিয়া অনেকে অনেক আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্র দেখিতেছি, হিন্দুসমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতির লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকের কন্যার বিবাহ পনর ষোল সতের আঠার বৎসর বয়সে হইতেছে। কোন কোন অভিভাবক কন্যার বয়স ঠিক্ যাহা তাহাই বলিতেছেন, অনেকে দুইচারি বৎসর কমাইয়া বলিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ঠিক বয়স বলিতেছেন, তাঁহাদেরও কোন-প্রকার সামাজিক লাঞ্ছনা, অসুবিধা, পাতিত্য ঘটিতেছে না। অতএব, অনেক স্থলে যেরূপ বয়সে কন্যাদের বিবাহ হইতেছে, আইনে তাহা অপেক্ষা কম বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে শাস্ত্র, দেশাচার, বা লোকাচার লঙ্ঘিত হইবে মনে করি না। ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্টে বিবাহিতা বালিকাদের বয়সের গড় কষিয়া লেখা হইয়াছে, যে, বঙ্গে উহা সাড়ে বার। সুতরাং ইহা হইতেও প্রমাণ হইতেছে, যে, বিলে যে বার বৎসর ন্যূনতম বয়স রাখা হইয়াছে, তাহা কম বই বেশী নয়।

আপত্তি উঠিতে পারে, যদি স্বভাবতই কন্যাদের বিবাহের বয়স অনেক স্থলে চৌদ্দরও বেশী হইয়াছে এবং গড়ে সাড়ে বার হইয়াছে, তাহা হইলে আইন করিয়া উহা বার রাখিবার কি দরকার? এই আপত্তি খণ্ডন কঠিন নয়। সাড়ে বার গড় হইলে কতকগুলি কন্যার বিবাহ তার চেয়ে বেশী বয়সে হয়, কতকগুলির তার চেয়ে কমে হয়। আইনের উদ্দেশ্য কম বয়সের শৈশব ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা। হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতির লোক বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত, তাঁহাদের মধ্যে চৌদ্দরও বেশী বয়সে কন্যার বিবাহ চলিতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল জাতির সকলের মধ্যে এখনও চলে নাই, এবং নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের মধ্যেও চলে নাই। উচ্চশ্রেণীর যে-সব পরিবারে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে কন্যার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের পাতিত্য ঘটিতেছে না, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। এবং যাহা ভাল লোকেরা চালাইবেন তাহাই ত দেশাচার ও লোকাচার হইবে; দেশাচার লোকাচারের পরিবর্ত্তন যুগেযুগে বরাবরই হইয়া আসিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে সুরীতি চলিতেছে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের পক্ষে তাহা কুরীতি ও অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না।

সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া হিন্দুরা মানিতে বাধ্য নহেন, মানেন না। হিন্দুদের সর্ব্বজনপূজিতা প্রাচীন-কালের সাধ্বী সতীদের বিবাহ কিরূপ বয়সে হইয়াছিল? সাবিত্রী সীতা সতী দময়ন্তী প্রভৃতি

কিরূপ বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন? বাল্যে বিবাহিতা না হইলেও তাঁহারা যদি, শুধু হিন্দু বলিয়া পরিচিতা নয়, হিন্দু দ্বারা পূজিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যসব হিন্দুকন্যাদের শৈশবে ও বাল্যে বিবাহ দিতেই হইবে এমন কেন মনে করা হয়?

আমরাও, অন্য অনেকের মত, আইন দ্বারা সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু উপদেশ ও আন্দোলনে যাহা নিবারিত হয় না, তাহার বিরুদ্ধে আইন অগত্যা করিতে হয়। যদি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া ধর্ম্মভয়ে কেহ চুরি না করিত, তাহা হইলে চুরির বিরুদ্ধে আইন করা আবশ্যক হইত না।

বাল্যবিবাহে সচরাচর বাল্যমাতৃত্ব ঘটে, এবং তাহাতে জননীর স্বাস্থ্যহানি ও অনেক সময় অকালমৃত্যু ঘটে। নূতন করিয়া এই কথার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। যাহাদের অবস্থা ভাল, বাল্যমাতৃত্বের কুফল কখন কখন তাহাদের বাড়ীতে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু অনিষ্ট সকল স্থলেই হয়। শিক্ষার, দেহমনের পূর্ণবিকাশের ব্যাঘাত সকল স্থলেই হয়। আমাদের জাতির লোকেরা যে শক্তিশালী ও দীর্ঘজীবী নহে, অনেক জাতির গড়পড়তা আয়ুস্কাল যে ৪৬ এবং আমাদের ২৩, বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব তাহার একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম কারণ বটে।

যে-প্রথা এরূপ অনিষ্টকর, তাহা উপদেশ ও আন্দোলন দ্বারা নিবারিত না হওয়ায়, তাহার বিরুদ্ধে আইন করা দরকার।

এরূপ আইন হিন্দুরাজ্য মহীশূর, বড়োদা, ভরতপুর ও কোটায় হইয়াছে। অশাস্ত্রীয় হইলে হিন্দুরাজ্যে এরূপ আইন হইত না। বড়োদায় আগে বয়স কম ছিল ; সম্প্রতি বিবাহের ন্যূনতম বয়স কন্যার চৌদ্দ ও বরের আঠার করা হইয়াছে।

আর-একটা আপত্তি এই, যে, হিন্দু রাজা হিন্দুর সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশী অহিন্দু রাজাকে তাহা করিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহার উত্তর এই, যে, বিদেশী রাজা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, চড়কে বাণফোঁড়া, প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারণ করিয়াছেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে কি? হিন্দুত্ব লোপ পাইয়াছে কি? যখন এইসব কুপ্রথা নিবারিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হিন্দুপ্রতিনিধি-বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা ছিল না ; এখন আছে। এবং তাহাতে "হিন্দুর শ্রেষ্ঠতা"র হিন্দু লেখক বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন, ও সভার অধিবেশনে উপস্থিত অধিকাংশ হিন্দু সভ্য এই প্রকার আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। আইন বিদেশী রাজা করিতেছেন না, বরং বিদেশী রাজার ইংরেজ ভৃত্যেরা তাহাতে বাধা দিতেছে।

আমাদের দেশের স্মৃতি শাস্ত্রগুলি কেহ যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে, সবগুলির সব সামাজিক বিধি এক নয়। তাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার সমাজের জন্য যাহা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেইরূপ বিধান দিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের হিন্দুদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার অধিকার আছে। এবং বস্তুতও আজকাল অতিনিষ্ঠাবান্ অনেক হিন্দুও এমন অনেক নির্দ্দোষ বা হিতকর কাজ করিয়া থাকেন, দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহার উল্লেখ কোন শাস্ত্রে নাই।

অতএব আইন দ্বারা বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথা নিবারণ কোন দিক্ দিয়াই অবৈধ নহে।

পাত্রের বয়স সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিলাম না, কারণ উহা ষোল বা আঠার বা একুশ করিলে শাস্ত্র, দেশাচার বা লোকাচার লঙ্ঘিত হইবে, ইহা কেহই বলিবেন না।

সর্‌দা মহাশয়ের বিলে আছে, যে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম বয়সের পূর্ব্বে কাহারও বিবাহ হইলে তাহা নাকচ ও অসিদ্ধ হইবে। আমরা ইহার পরিবর্ত্তে, বড়োদা রাজ্যের মত, ঐরূপ বিবাহদাতা অভিভাবকদের কারাদণ্ড বাঞ্ছনীয় মনে করি। শাস্ত্রসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ সহকারে যে হিন্দুকন্যার বিবাহ একবার হইয়া গিয়াছে, আইন তাহা নাকচ করিয়া দিলেও পুনর্ব্বার তাহার বর জোটা খুব কঠিন হইবে, কখন কখন অসম্ভব হইবে। সুতরাং আইনে ওরূপ কোন ধারা না থাকাই ভাল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া এগার বৎসরে কন্যার বিবাহের বিধি থাকারও আমরা বিরোধী। তাহা থাকিলে কার্য্যতঃ এগারই ন্যূনতম বয়স হইয়া দাঁড়ায়। তা ছাড়া সামাজিক বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদিগকে, বিশেষতঃ বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদিগকে, যত কম ক্ষমতা দেওয়া হয়, বিচারক যত কম করা হয়, ততই ভাল। এইজন্যও আমরা চাই, যে, আইনে নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম বয়সের যেন কোন ব্যতিক্রমস্থল না থাকে।

যাঁহারা বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা নিজেদের কথা প্রমাণ করুন। যাঁহারা বাল্যবিবাহ চান না, কিন্তু আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ নিবারণের বিরোধী, তাঁহারা অন্য প্রকারে উহা নিবারণের, নিশ্চিত ফলদায়ক (effectivc) উপায় নির্দ্দেশ করুন, এবং তাঁহারা স্বয়ং বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে বাক্যে, লেখায় ও কার্য্যে কি করিয়াছেন, প্রমাণসহ তাহা বলুন।

১৩৩৫ শ্রাবণ

বাল্যবিবাহনিষেধক আইন

রায়সাহেব হরবিলাস সরদা প্রণীত বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হওয়ার পর মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মহিলারা প্রকাশ্য সভা করিয়া ঐরূপ আইনের সমর্থন করিয়াছেন। ঠিক্ নাম মনে নাই, কিন্তু আরও কোন কোন জায়গায় ঐরূপ মহিলাসভা হইয়াছে। বঙ্গের মহিলারা কিন্তু এ পর্য্যন্ত নীরব।

ইহা লিখিত হইবার পর শুনিলাম ১লা শ্রাবণ এই বিষয়টির আলোচনার জন্য কলিকাতায় তাঁহাদের একটি সভা হইবে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মহিলাদেরও সভা করিয়া বাল্য বিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

১৩৩৬ কার্ত্তিক

বাল্যবিবাহ নিষেধক আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা মহাশয়ের বাল্যবিবাহ নিষেধক বিল পাস হইয়াছে। ইহার দ্বারা বালিকাদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স চৌদ্দ করা হইয়াছে। আঠার কিংবা ষোল হইলে আরও ভাল হইত। সুশ্রুতের মতে বালিকাদের পূর্ণ ষোল বৎসর বয়সের আগে মাতৃত্ব প্রসূতি ও সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর। বাল্যমাতৃত্ব নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় বাল্যবিবাহ নিবারণ।

এখনও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে বিলটি পাস হওয়া দরকার। তাহার পর বড়লাটের মঞ্জুরী চাই। দুই ই নির্ব্বিঘ্নে হইয়া যাইবে, মনে হইতেছে। তাহার পর গবর্ন্মেন্টকে এই আইনের তাৎপর্য্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম লোকদিগকে জানাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আজকাল অনেকস্থলেই বালিকাদের বিবাহ ১৪। ১৫ । ১৬ এবং তার চেয়েও বেশী বয়সে হয়। বঙ্গে অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বেশী প্রচলিত। তাহাদের মধ্যেও বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়িলে উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-কোন হিত আমরা চাই, তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এক্ষেত্রে তাহার মূল্য দিতে হইবে সকল বালিকার দৈহিক মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া এবং তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য পৌরুষ অর্জ্জন করিয়া। এই মূল্য সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককেই দিতে হইবে।

১৩৪৫ কার্ত্তিক

বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করাইবার চেষ্টা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা সমর্থনীয়।

হিন্দুদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারিবে এরূপ আইন কারইবারও চেষ্টা হইতেছে। এরূপ আইনেরও আবশ্যক আছে। তবে কারণগুলি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুসমাজে কোথাও বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা নাই। তাহা ভুল। পশ্চিমে বহু হিন্দুজাতির মধ্যে এই প্রথা আছে। তাহারা দ্বিজ নহে।

১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

বরপণ নিবারণার্থ বিল

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বরপণ নিবারণার্থ একটি বিল রচনা করিয়াছেন। তাহাতে ৫১ টাকা বা তত্তুল্য মূল্যের সামগ্রীর বেশী যৌতুক দেওয়া ও লওয়া দণ্ডনীয় করিয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় কন্যাকে প্রদত্ত গহনাপত্রকে যৌতুকের সামিল করেন নাই। এই স্বেচ্ছার ভিতরই ফাঁকির ফাঁক রহিয়াছে। ফাঁকির কোন উপায় থাকা উচিত নয়। বিবাহটা কেনাবেচার ব্যাপার নয়, জীবনের মহত্তম অনুষ্ঠান, এই ধারণা না জন্মিলে শুধু আইনের দ্বারা বরপণ কুপ্রথার উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু কিছু প্রতিকার হইতে পারে যদি আইনটায় ফাঁকি দিবার ফাঁক কিছু না থাকে।

যাহারা কন্যার বিবাহে কন্যাশুল্ক লয়, বাঁকুড়ায় তাহাদিগকে "পাঁঠী-বেচা" বলে। টাকা দিয়া বর ক্রয়কে সেইরূপ "পাঁঠা কেনা", এবং যাহারা বরপণ গ্রহণ করে তাহাদিগকে "পাঁঠা-বেচা" বলা যাইতে পারে।

১৩৩৫ চৈত্র

মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথা নিবারণ

স্বার্থান্বেষী দুষ্টলোকদের যথেষ্ট বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাদ্রাজে ব্যবস্থাপক-সভার ডেপুটী প্রেসিডেন্ট ডাঃ শ্রীমতী মথুলক্ষ্মী রেড্ডী, তাঁহার দেবদাসী প্রথা-নিবারণ বিলটি পাশ করাইয়া আইনে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মাদ্রাজ প্রদেশে দেবতার মন্দিরগুলি এতদিন যেভাবে বারবনিতালয়ের সামিল হইয়া তত্রস্থ দেশবাসীর ঘোর লজ্জার কারণ হইয়া ছিল তাহা আর অধিক দিন থাকিবে না। দেশী মহীশূর রাজ্য সর্ব্বপ্রথমে দেবতার নামে এইভাবে বালিকাদের উৎসর্গ করার প্রথা রদ করে। ইহা প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর জন্যও অবিলম্বে এইরূপ আইন প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এই বালিকা-উৎসর্গের আসল তাৎপর্য্য কি তাহা বোম্বাইয়ের নায়ক-মারাঠা-মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ দুইটির অংশ-বিশেষে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে অজ্ঞ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের মনে এরূপ একটা ধারণা আছে যে তাহাদের পূজ্য দেবতাদের মন্দিরে নৃত্য-গীতের জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত না থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং এই দেবতার মন্দিরে বালিকাদের রাখা হয়। এই কার্য্যের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া অথবা তাহাদিগকে সুবিধামত নিযুক্ত করা যায় না বলিয়া কুমারীদিগকে উৎসর্গ করা হয়। মন্দিরের কার্য্যের জন্য কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট জাতির কুমারীদেরই নির্ব্বাচিত করা হয়। কোনও কুমারী একবার উৎসর্গী-কৃত হইলে সারাজীবনে আর বিবাহ করিতে পারে না। ইহার জন্য এই-সকল বালিকাদিগের এক একটা ঝুটা বিবাহ দেওয়া

হয় ; এইরূপ বিবাহের অভিনয় হইয়া গেলে অপর কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সাহসী হয় না। কারণ, এই ধরণের বিবাহ হইয়া গেলে এই-সকল বালিকারা দেবতাদের বিবাহিতা পত্নী বা সেবিকা দাসী বলিয়া গণ্য হয়। যে জাতি হইতে এই সকল বালিকা সংগৃহীত হয় সেই জাতির স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই কুৎসিত বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে ; সম্ভবতঃ এইভাবে বহুদিন যাবৎ দেবতার নামে মেয়েদের উৎসর্গ করার ফলে এই বংশানুক্রমিক বা জাতিগত বেশ্যাদলের সৃষ্টি হইয়াছে ও আজিও সৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষা ও সংস্কার-মাহাত্ম্যেও এই-সকল কুমারী বালিকারা মন্দিরের দাসী হইয়াও অতি জঘন্য দেহ-বিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করে। বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বংশে বংশে একই কাজ করিয়া এক একটা জাতি গড়িয়া তোলে এই সকল মেয়েরাও তেমনি একটা স্বতন্ত্র বেশ্যাজাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। উচ্চ নীচ অন্য সকল জাতিই ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তথাকথিত অতি নিম্ন জাতীয় লোকেও দেবতার নামে এভাবে কুমারীদের উৎসর্গ করিতে ঘৃণাবোধ করে। উৎসর্গ-উৎসবের মিথ্যা অভিনয় সত্ত্বেও এই জাতীয় স্ত্রীলোকেরা যথাসময়ে এই জাতিগত বৃত্তি অবলম্বন করিতে ছাড়ে না। তাহাদের মনে দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া পবিত্র বা উচ্চভাবের লেশমাত্র থাকে না ; এবং এই কুৎসিৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহারা দেবতাদের অভিশাপের ভয় করে না। আসলে এই উৎসর্গ অর্থেই বেশ্যাবৃত্তি-অবলম্বন বুঝায়। সুতরাং এই ব্যাপারের সহিত পবিত্রতা ও ভক্তিভাবের বিন্দুমাত্র যোগ আছে উহা যেন কেহ মনে না করেন।

বহু দেবতাতে বিশ্বাস অজ্ঞতার ফল, কিন্তু দুর্নীতিমূলক না হইতেও পারে। দেবতাদের কাজে কুমারী-উৎসর্গ ব্যাপারটাও গোড়ায় দুর্নীতিমূলক ছিল না। ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবতার পুরোহিতদের সমান পর্যায়ে তাহাদের স্থান ছিল। কিন্তু নানা কারণে দেবদাসীরা জঘন্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। উপরোক্ত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটুকু দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই কুৎসিৎ প্রথা প্রচলনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেরও কিছু হাত আছে।

যে সকল দরিদ্র অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার এই প্রথার কবলে পড়িয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই দেহ-বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দেবতার কাজে ইহাদের কন্যারা উৎসর্গীকৃত হয় বলিয়া পরিবর্ত্তে ইহাদের জন্য লাখেরাজ জমি ও মাসহারার ব্যবস্থা আছে। যদি ইহারা কুমারীদের উৎসর্গ করিতে বিরত হয় তাহা হইলে তাহাদের ইনাম বাজেয়াপ্ত করা হয়।* গত শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'ইনাম কমিশন' ভূস্বামীদের দ্বারা এই সকল দেবদাসীদিগকে প্রদত্ত সনদ অনুযায়ী ইনাম ইহাদিগকে ভোগ করিতে দেন এই কারণে যে, ইহারা মন্দিরের কার্য্য-নির্ব্বাহে সাহায্য করে। এইভাবে গবর্ণমেন্ট গৌণভাবে এই প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দায়ী।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের স্থল বিশেষ ব্যতীত এই প্রথা ভারতের অন্যত্র কখনই প্রচলিত ছিল না।

* শ্রীমতী মথুলক্ষ্মী রেড্ডীর খসড়ায় এই-সকল ইনাম যাহাতে বাজেয়াপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে—প্রঃ সঃ

সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস

১৩১০ জ্যৈষ্ঠ

নাগপুরে বাঙ্গালী।

গত জানুয়ারী মাস হইতে প্লেগের প্রকোপে পড়িয়া নাগপুর নানা প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক নরনারী দিনে দিনে কাল কবলে প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রাণভয়ে বিহ্বল হইয়া সহস্র সহস্র অধিবাসী সপরিবারে উদ্যানে, ময়দানে, শস্যক্ষেত্রে, পল্লীপথে সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। নগর জনশূন্য। প্রসিদ্ধ এতওয়ারী (রবিবার) বাজার শ্মশান সমান পড়িয়া আছে। রোগীর সেবক নাই, মৃতের বাহক নাই, রোগীর চিকিৎসক নাই। পীড়া হইলে কেহ নিকটে যায় না রোগী শয্যায় শুইয়া জলাভাবে মরিয়া গেলেও কেহ বারিবিন্দু মুখে দিবার থাকে না। পীড়ার ভীষনাকার দর্শনে সকলেই সংজ্ঞাহীন। সুস্থ, অসুস্থ সকলেই প্রাণ ভয়ে ত্রস্ত। জানুয়ারী হইতে অদ্যাবধি এই ক্ষুদ্র নগরে সপ্তসহস্রাধিক নরনারী শমন ভবনে প্রেরিত হইয়াছে। আজকাল প্লেগের প্রভাব খুব হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ভারতেশ্বরের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ১লা জানুয়ারী তারিখে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ান ক্লাব হইতে ৺হরিনাম সংকীর্ত্তন বাহির করা হয়। পরে প্লেগের আবির্ভাবে হরিনামই প্রবাসী বাঙ্গালীর একমাত্র আশ্রয় স্থান হইয়া উঠে এবং আবাল-বৃদ্ধ সকলে নগরের পথে পথে খোল করতাল লইয়া হরিনাম কীর্ত্তনে দশদিক প্রফুল্লিত করেন। ভগবানের নামে শমনভয় তিরোহিত হয়। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন ভগবানের অপার অনুকম্পায় অত্রস্থ কোন প্রবাসী বাঙ্গালী প্লেগাক্রান্ত হন নাই। এই বিপদ্‌কালে সকলে আপনার প্রাণ লইয়া ব্যস্ত ; কিন্তু আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উক্ত ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ান ক্লাব হইতে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকগুলি রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তবে যতদূর আশা লইয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছিল, ততদূর ফললাভ ঘটে নাই ; তাহার কারণ, লোকে পীড়া হইলে ভয়ে বলিতে চাহে না, পাছে সেগ্রীগেশ্যান-ক্যাম্পে ধরিয়া লইয়া যায়। যাহারা ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে তাহারা বেশ সুফল পাইয়াছে। ক্রমশঃ ঔষধে লোকের বিশ্বাস জন্মিতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু নৃপালচন্দ্র মজুমদার বি. এ. সহকারী সম্পাদক, উক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ইনি এই বিপদ্ কালে যেরূপ সেবার ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে অত্রস্থ বাঙ্গালীগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। ঔষধ বিতরণ উপলক্ষে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় এবং ক্লবের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ বিশেষ আর্থিক সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে রত্নবিশেষ।

১৩২৫ বৈশাখ

হিতসাধনমণ্ডলীর প্রদর্শনী।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী নানাপ্রকারে সমাজের হিত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি লোকশিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগীর সেবা, রোগনিবারণ, নানা উপায়ে গরীব লোকদের আয় বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে অঋণী করা, কৃষির উন্নতি, প্রভৃতি বিষয়ে কত কাজ করিবার আছে, বঙ্গে ও অন্যত্র কি করা হইয়াছে, কি কি উপায় অন্যত্র অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ছবি দ্বারা, মানচিত্র দ্বারা, ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা দ্বারা, সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইবার জন্য হিতসাধন-মণ্ডলী একটি সমাজ-সেবা-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ইহা খুব সুফলপ্রদ হইয়াছে, এবং ইহা দেখিবার পর সমাজসেবার প্রতি লোকের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রদর্শনীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউটে দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখন সেগুলি কিছুদিন ভারতসভা-গৃহে প্রদর্শিত হইবে। তাহার পর প্রদর্শিত সব জিনিষের এক প্রস্থ নকল প্রস্তুত করিয়া ভারতসভা প্রদর্শনীটিকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করেন।

১৩৩২ মাঘ

সমগ্র ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্স

কংগ্রেসের অধিবেশন যেখানে হয়, সেখানে সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবার একটি প্রথা বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। কানপুরে এবার সমাজসংস্কারের জন্য কোন সভার অধিবেশন হয় নাই। কিন্তু উদারনৈতিক সংঘের কলিকাতায় অধিবেশনের সঙ্গে সমাজসংস্কার সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজসংস্কার কেন হওয়া উচিত, তাহার কারণ অনেক। পুরুষ ও নারীর উভয়ের প্রতি ন্যায্য সমান ব্যবহারের জন্য উহা আবশ্যক, নারীর কল্যাণার্থ উহা আবশ্যক, শিশুমঙ্গলের জন্য উহা আবশ্যক অবনমিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জাতিসমূহের উন্নতি ও তাহাদের সহিত সপ্রেম ও ন্যায্য ব্যবহারের জন্য উহা আবশ্যক, সমাজ-রক্ষার জন্য উহা আবশ্যক—এইরূপ নানা কারণ বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন, সমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে রা স্বাধীনতা লাভ করা ও রক্ষা করা অসম্ভব। ইহা অনুভব করিয়া মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকবণের উপর এত জোর দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন, বালবিধবাদের আবার বিবাহ দিবার সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্মভূমি গুজরাটেও নারীর অবরোধ-প্রথা নাই, এবং তিনি উহার সমর্থনও করেন না। কিন্তু আজকাল কংগ্রেস্ যাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে,

কেহ কেহ সমাজসংস্কারের বিরোধী না হইলেও উহার একান্ত আবশ্যকতায় হয়ত তেমন বিশ্বাস করেন না। সম্ভবতঃ সেইজন্য কানপুরে অন্য নানা সভার স্থান ও কালের অভাব না হইলেও সমাজসংস্কার সভার জন্য সময় ও স্থান হয় নাই।

কলিকাতার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ। পণ্ডিত মহাশয় অনেক খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। আধুনিক জগতে অন্য মহৎ জাতিসমূহের সহিত একত্র অগ্রসর হইতে হইলে যে ভারতীয় সমাজের সুসংহত হওয়া দর্‌কার তাহাও তিনি প্রদর্শন করেন।

১৩৩২ বৈশাখ

তারকেশ্বরের শুদ্ধির জন্য চিত্তরঞ্জনের আত্মবলিদান

তারকেশ্বর তীর্থকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত এইরূপ বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই আত্মবলিদান প্রতিশ্রুতির হোমশিখায় বঙ্গের নানা স্থান হইতে শত শত ব্যক্তি আপনাদিগকে আহুতি দিতে আসিয়াছিল। ফলে সতীশ গিরি মহান্তের দক্ষিণ হস্ত প্রভাত গিরিকে মহান্ত করিয়া তাহার সহিত একটা রফা করা হয়, যদিও চিত্তরঞ্জন প্রাণ দেন নাই, এবং তারকেশ্বরের কালিমাও দূর হয় নাই। সম্প্রতি আদালতে এই রফা বেআইনী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের আত্মবলিদান ও এত লোকের আহুতি বাজে খরচ হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ অপব্যয় সাতিশয় শোচনীয়।

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভা যে-প্রচেষ্টার ফল, আমরা তাহার সমর্থন করি। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যে, হিন্দু মহাসভার অগ্রসর সভ্যেরা যাহা করিতে চান, গোঁড়া সভ্যদের সংখ্যাধিক্য-ও প্রভাব-বশতঃ তাহা তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারেন না। তথাপি এই মহাসভা দ্বারা অনুমোদিত প্রস্তাবসকলে সমালোচনার যোগ্য কিছু থাকিলে তাহার সমালোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি।

সাধারণ পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি ব্যবহার করিবার ও তাহা হইতে জল লইবার অধিকার জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই আছে, ইহা মহাসভা

স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাসভার প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজ করিতে মহাসভা কাহাকেও বাধ্য করিতে পারেন না। এইজন্য যেখানে-যেখানে প্রয়োজন হইবে, তথায় "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদের জন্য স্বতন্ত্র জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া মহাসভা অন্যায় করেন নাই, ইহা স্বীকার করিতেপারি। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা মহাসভার উচিত ছিল, যে, অদ্যাবধি যে-সকল স্থানে সকল জাতির লোক একই জলাশয় ব্যবহার করিতেছেন, সেখানে নূতন করিয়া কেহ গোঁড়ামিবশতঃ "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদিগকে তাহা ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবেন না, এবং কোনস্থানেই "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের জন্য স্বতন্ত্র জলাশয় খনন করিয়া না দিয়া কেহ তাহাদের সাধারণ জলাশয় ব্যবহারে বাধা দিতে পারিবে না। অবশ্য আমরা ইহা জানি, যে, মহাসভা একটা মত প্রকাশ করিলেই যে হিন্দুসর্ব্বসাধারণ তাহা মানিয়া চলিবেন, এরূপ সম্ভাবনা কম। তথাপি যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, মহাসভার তাহাই বলা উচিত।

মহাসভা কলিকাতার অধিবেশনে "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদিগকে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়াছেন। এরূপ একটা প্রস্তাব ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ধার্য্য করিবার সার্থকতা বুঝিলাম না। বেদ বহুকাল হইল ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং ছাপা হইয়াছেও "ম্লেচ্ছ" লোকদিগের দ্বারা ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত দেশে। এখন এদেশেও বেদ ছাপা হইয়াছে। উহা হিন্দুদের সকল জা'ত এবং অহিন্দু সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ইচ্ছা করিলেই পড়িতে পারে, এবং অনেকে পড়িতেছেও। সুতরাং "কেজো" পরামর্শ বা অনুরোধ হিসাবে মহাসভার প্রস্তাবটির কোনোই সার্থকতা ও মূল্য নাই। তাহা ছাড়া, বেদের সংহিতা ও উপনিষদে যদি মূল্যবান্ প্রাণপ্রদ জিনিষ থাকে, তাহা হইলে হিন্দু সামজের অধিকাংশ লোককে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখাটা যে কিরূপ সুবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক, তাহা বলিতে হইবে না। হিন্দু-মহাসভা খৃষ্টীয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি কাহাকেও বেদপাঠ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু নিজেদের ঘরের লোক যাঁহারা, সেই অগণিত হিন্দুকে তাঁহারা বেদপাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিত চান।

ফরিদপুরে হিন্দুত্ব

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে, ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল কন্‌ফারেন্সের) এবং প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে অস্পৃশ্যতার ও জল-অনাচরণীয়তার প্রতিবাদ হইয়াছে, এবং সকল জা'তের বেদপাঠ করিবার অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সকল হিন্দু জাতির পুরুষ ও নারীদিগকে বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বহস্তে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অধিবেশনে হিন্দুসভা সকল শ্রেণীর ও জাতির হিন্দুর এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অপর সকলের বেদ অধ্যয়ন করিবার

অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, সকল হিন্দুর সাধারণ দেবমন্দিরে ও বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ ও তাহা ব্যবহার করিবার এবং সাধারণ জলাশয় ব্যবহার করিবার সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু অন্য যে-কোন হিন্দুর ছোঁয়া জল পান করিতে পারেন বলিয়াছেন, এবং পুরোহিত ধোবা ও নাপিতেরা জাতিনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর কাজ করিতে অধিকারী বলিয়াছেন—বলিয়াছেন, যে, কোন হিন্দুর ইহাতে আপত্তি করা উচিত নহে।

বিধবাবিবাহ-সম্বন্ধে এই অধিবেশনে বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু বিধবাদের আদর্শ হইলেও, কোন হিন্দু বিধবা-বিবাহ করিলে তাঁহাকে বা তাঁহার স্বামীকে জাতিচ্যুত বা হিন্দুর কোন অধিকার বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

"অনেক হিন্দু নারী উৎপীড়িত ও গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত হইতেছেন, এবং তজ্জন্য অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে দুঃখপূর্ণ হীন জীবন যাপন করিতে হইতেছে ও কখন-কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইতেছে ; এইজন্য প্রাদেশিক হিন্দুসভা সকল হিন্দুকে এইরূপ অত্যাচার নিবারণ করিতে এবং অত্যাচারিতাদিগকে হিন্দু সমাজে রাখিতে ও সকলপ্রকার সাহায্য দিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

তদ্ভিন্ন হিন্দুসভা প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও গ্রামে হিন্দুস্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠন করিতে ও তাহাদের দ্বারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল অত্যাচারিত ও দুঃস্থ লোকের সাহায্য করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ব্যায়ামাদি দ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য- ও বল বৃদ্ধির দিকেও হিন্দুসভা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীর গীতাপাঠের ঔচিত্য হিন্দুসভা উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং অনেক হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে বলিয়া হিন্দুসভা, যে-সব হিন্দু অন্য ধর্ম্মগ্রহণের পর আবার হিন্দু হইতে চান, তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের পর আবার সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

১৩৩৫ শ্রাবণ

বিহারে পর্দাপ্রথার লোপ চেষ্টা

বিহারের হিন্দু পুরুষ ও নারীরা নারীদের অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

অনেক জিনিষের আরম্ভ হয় বাংলা দেশে, কিন্তু পরে কাজ হয় অন্যত্র। যেমন, বিধবাবিহবিষয়ক আন্দোলন আরম্ভ করেন ও প্রথমে বিধবার বিবাহ দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। কিন্তু বঙ্গে এই কাজ খড়ের আগুনের মত নিবিয়া গিয়াছিল। এখন আবার চেষ্টা ও কাজ চলিতেছে। ভারতবর্ষের যে-সব প্রদেশে পর্দ্দা আছে, তন্মধ্যে বঙ্গে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। নিজেদের মধ্যে তাঁহারা উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। অন্য কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও উহা কমিয়াছে। বাংলাদেশ

গ্রামপ্রধান ; ইহাতে বড় সহর খুব কম। বঙ্গে গ্রামসকলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে পর্দ্দা বেশী নাই, আগেও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের পর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে এবং তাহার পরে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে অবরোধপ্রথা আরও শিথিল হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি না করিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দিলে তাহাতে সুফল হইবে না। ইহাতে সত্য আছে। কিন্তু পর্দ্দা তুলিয়া না দিলেও আবার স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইবে না। বঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের একটা প্রধান ব্যয় গাড়ী রাখিবার বা ভাড়া করিবার খরচ। তদ্ভিন্ন, ইহাও বিবেচ্য, যে, শিক্ষার মানে শুধু বই পড়া ও মুখস্থ করা নহে। নিজের নিজের চোখ কান প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা শিক্ষার প্রধান উপায়। পর্দ্দা থাকিতে নারীদের এই প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ শিক্ষা অসম্ভব।

শিক্ষা না দিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়ায় যে সব স্থলে বিপদ ঘটিবেই, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের নিরক্ষর স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় বাহিরে পরিশ্রম করিয়া রোজগার করিতে হয়। তাহাতে সচরাচর তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের চরিত্রভ্রংশই ঘটে, বলা যায় না। যে-সব স্থলে তাহা ঘটে, তাহার জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষেরা প্রধানতঃ দায়ী। এই কারণে, স্ত্রীস্বাধীনতাকে নিরাপদ করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীচরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষদের সুশিক্ষা ও তাহাদের চারিত্রিক উন্নতি আরও বেশী দরকার। আবার, নারীচরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনের ও পুরুষদের চারিদ্রিক উন্নতির একটি উপায় অবরোধপ্রথা লোপ। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য অবরোধপ্রথা বিনষ্ট করিতে হইবে, অবরোধপ্রথা বিনষ্ট করিবার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে।

বাঢ়ে সতীদেহ

বিহারে বাঢ়ে একটি ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর চিতার আরোহণ করেন। এই কার্য্যে যাহারা তাঁহার সহায় হইয়াছিল, পাটনা হাইকোর্টের বিচারে তাহাদের শাস্তি হইয়াছে। যাহারা কোন প্রকার আত্মহত্যায় সাহায্য করে, তাহাদের শাস্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

স্বামীর মৃত্যু হইলে পতিপ্রাণা সতীর আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু পতির চিতায় আপনাকে দগ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা আদর্শ নহে। ইহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ; হিতকর নহে। প্রাপ্তবয়স্কা সন্তানবতী বিধবা নারী পবিত্রস্বভাবা হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া পরিবারবর্গের ও জনসাধারণের হিতসাধন করিলে উচ্চতম আদর্শের অনুসরণ করা যায়। বালবিধবাদের বিবাহ বাঞ্ছনীয়।

দৈহিক বলপ্রয়োগ, লোকমতের চাপ, আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনা প্রভৃতি কারণে যে অনুমরণ ও সতীদাহ ঘটে, তাহা ত সর্ব্বথা নিন্দনীয় বটেই, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় অনুমরণও ভাল নয়।

স্বামীর চিতায় স্ত্রীর দাহ, স্বামীর সমাধিতে স্ত্রীর সমাধি অসভ্য যুগে সকল মহাদেশেই প্রচলিত ছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের নিজের কোন "গৌরব" নাই, অগৌরবও ভারতবর্ষের একচেটিয়া নহে। কিন্তু এই কলঙ্ক ভারতের নিজস্ব, যে, এই প্রথাকে ধর্ম্মের আসন দেওয়া হইয়াছিল, এবং ইহা ভারতবর্ষের সভ্য যুগেও প্রচলিত ছিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

বৃদ্ধের বালিকা-বিবাহ নিষিদ্ধ

আহমদাবাদে এক ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ ১৫ বৎসরের এক বালিকার পিতাকে টাকা দিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী করে। ইহারা জৈন। বালিকার অবশ্য মত ছিল না কয়েকটি জৈনযুবক এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করে। তাহারা দরখাস্ত করিবার পর বালিকার মাতা ও দুই বড় ভাইও দরখাস্তে যোগ দেয়। বিচারক এই বিবাহ নিষেধ করিয়া দিয়া মা ও দুই বড় ভাইকে কন্যাটির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জজ তাঁহার রায়ে বলেন, "বিবাহার্থী লোকটার উকীল আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে, আমি তার সাধারণ বিবাহযোগ্যতার বিরুদ্ধে যেন কিছু না বলি। আমি এই মোকদ্দমায় কেবল তাহার সঙ্গে এই কন্যাটির বিবাহ বিষয়েই বিবেচনা করিব। সে বিষয়ে আমার মত এই, যে, মেয়েটির ইহার সঙ্গে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

আমাদের যুবসংঘ, তরুণসংঘ, ছাত্র সংঘ প্রভৃতির ইহা হইতে কিছু শিখিবার থাকিতে পারে।

১৩৪০ আশ্বিন

মহেশচন্দ্র আতর্থী

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশের নারীরক্ষকদের মধ্যে প্রধানতম কর্ম্মীর তিরোভাব হইল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যেরূপ উৎসাহ ও সাহসের সহিত এই কাজ করিতেন তাহা যুবকদের মধ্যেও অল্পই দেখা যায়। তিনি অনেকগুলি হিন্দু-বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। "সঞ্জীবনী" সত্যই লিখিয়াছেন ঃ—

বাংলা দেশে যাঁহারা নরসেবাপরায়ণ ও ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মবীর বলিয়া বিখ্যাত মহেশচন্দ্র আতর্থী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা শোকদগ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় তিনি দেহত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র জেনারেল পোষ্টাফিসে কাজ করিতেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নারীরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

১৮৯১ সালে গিরিজা নাম্নী একটি বালিকা বেথুন স্কুলে পড়িত। কোন যুবক তাহাকে বিপথগামিনী করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে একদিন গিরিজা যখন স্কুলের গাড়ী হইতে নামিতেছিল, তখন ঐ যুবক তাহাকে আক্রমণ করে। মহেশচন্দ্র নিকটেই থাকিতেন, তিনি বালিকার উদ্ধারের জন্য দৌড়াইয়া যান। যুবক তাহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করে। তিনি রক্তাক্ত কলেবর হন, তবু বালিকাকে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি বালিকাকে যুবকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র বহুদিন ছুরিকাঘাতের জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কপালে গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল।

নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বাংলার বহু জেলায় গমন পূর্ব্বক বহু অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বহু নারীহরণকারীকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডনীয় করিয়াছিলেন।

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ

অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্‌বে

গত ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়—বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে, অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্‌বে (Karve) মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন তাঁহার লোকহিতকর দীর্ঘজীবনের আশী বৎসর পূর্ণ হয়। কলিকাতাতেও একাধিক সভা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রবাসীর সম্পাদককে অধ্যাপক মহাশয় সম্বন্ধে রেডিয়োতে বলিতে হইয়াছিল। তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও কাজের বৃত্তান্ত বলা ছিল। এই ভাষণ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় প্রধানতঃ পুনার হিন্দু-বিধবা-নিবাস (Hindu Widows' Home) এবং ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণস্বরূপ ও প্রধান পরিচালক বলিয়া বিদিত। তদ্ভিন্ন আরও কোন কোন প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপিত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ প্রতিষ্ঠান "মহারাষ্ট্র গ্রামশিক্ষণ মণ্ডল"। এই সমিতির উদ্দেশ্য, মহারাষ্ট্রে যে-সব গ্রামে জেলা-বোর্ড প্রভৃতির বিদ্যালয় নাই, সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইতিমধ্যে ২৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিকে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার মাসিক সত্তর টাকা পেন্স্যন হইতে মাসিক পনর টাকা চাঁদা দেন, এবং আশীর উপর বয়সেও প্রত্যহ পুনার এক একটি পাড়া বাছিয়া লইয়া পদব্রজে তিন ঘণ্টা ধরিয়া এক পয়সা ও তদধিক ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। তিনি এখনও দশ মাইল হাঁটিতে পারেন ও হাঁটেন।

তাঁহার সব প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, যদিও সবগুলির জন্যই মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা সংগৃহীত হয়, কিন্তু সবগুলিরই বৃহৎ স্থায়ী ফণ্ড তিনি জমা করিতে পারিয়াছেন এবং প্রায় সবগুলিরই নিজের জমির উপর নিজের ঘরবাড়ী আছে।

১৯৩২ সালে বোম্বাইয়ে তাঁহার ভারতীয়

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় আমাকে অভিভাষণ পাঠ এবং পদবী-সম্মান বিতরণ করিতে হয়। তখন তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভাস্কর কারবের সহিত পুনা যাই এবং তাঁহাদের বাড়ীতে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত মাধ্যাহ্নিক আহার করি। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনাস্থিত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর শ্রীমতী কমলাবাঈ দেশপাণ্ডে (প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পীএইচ-ডী) ডাল ভাত তরকারি রাঁধিয়া খাওয়ান। কার্‌বে মহাশয় খাইতে পারেন পন্দ নয়। শ্রীমতী কমলা বাঈ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রনেতা নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকর মহাশয়ের কন্যা।

অধ্যাপক কার্‌বে এখন যেমন পূর্ব্বেও তেমনি নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সানন্দে দৈহিব পরিশ্রম পর্য্যন্ত করিতেন। যখন পুনা শহর হইতে চারি মাইল দূরে একটি গ্রামে হিন্দু বিধবা-নিবাস স্থাপিত হয়, তখন পুনা হইতে সেই গ্রামে যাইবার রাস্তা ছিল না, যানবাহন ছিল না, বাজার ছিল না, প্রতিষ্ঠানটির কোন অর্থবলও ছিল না। তখন কার্‌বে মহাশয় পুনার ফার্গুসন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া প্রত্যহ বিকালে হাঁটিয়া সেই গ্রামে যাইতেন ও রাত্রে সেখানে থাকিতেন। কারণ, জনবিরল স্থানে বিধবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক রাখিবার টাকা ছিল না। গ্রামে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পাওয়া যাইত না। সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয় খাদ্য শস্য ও তরকারি আদি প্রত্যহ পুনার বাজার হইতে কিনিয়া নিজে মাথায় ও কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেন। সন্ধ্যার পর ও পরদিন প্রাতে বিধবাদিগকে পড়াইতেন। তাহার পর চারি মাইল হাঁটিয়া পুনায় কলেজে যাইতেন।

এই রকম একটি মানুষ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীতে দুর্লভ।

১৩৪৭ বৈশাখ

হিন্দু কন্‌ফারেন্সে সমাজসংস্কার

কয়েক বৎসর হইতে হিন্দু মহাসভার এবং অন্য কোন কোন হিন্দু সভার উদ্যোগে যে-সব কন্‌ফারেন্স হইতেছে, তাহাতে সমাজসংস্কার-সমর্থক নানা প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু প্রস্তাব অনুসারেণ কাজ হইলে তাহার ফল কি হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ক বিধিব্যবস্থাও হওয়া আবশ্যক। একটি দৃষ্টান্ত লউন। সম্প্রতি পাবনায় এবং গত দুই-এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গের একাধিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সে ভিন্ন ভিন্ন জা'তের (caste এর) মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। আমরাও অবশ্য তাহার সমর্থন করি। কিন্তু এরূপ মিশ্র বিবাহের সন্তানদের জা'ত কি হইবে? তাহাদের কি এক একটা নূতন জা'ত হইবে? এরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বঙ্গের কোন কোন জা'ত এইরূপ মিশ্র বিবাহ হইতে উৎপন্ন। যদি মিশ্র বিবাহের সন্তানদিগকে

লইয়া নূতন নূতন জা'ত গড়া হয়, তাহা হইলে এরূপ সমাজ-সংস্কারে জাতিভেদ প্রথার একতা-বিনাশক শক্তি নির্মূল ত হইবেই না, অধিকন্তু মিশ্র বিবাহের সন্তানদিগকেও অসুবিধায় ফেলা হইবে। এই জন্য আমাদের মনে হয়, হয় জাতিভেদ ঠিক্ বজায় রাখিতে হইবে, নয় ভাঙিয়া দিতে হইবে ; মধ্যপন্থা নাই, দুনৌকায় পা দিলে চলিবে না।

সমাজের নানা রূপ

১৩১৯ বৈশাখ

[বাঙালী যুবকদের নানাবিধ গুণ]

অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বাঙ্গালীর ছেলে দলবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিবার শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা স্বার্থত্যাগ, নারীকে মাতৃজাতি বলিয়া সম্মান করা, সাহস, এবং পরসেবার জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ করা, ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে স্নানের সময়ও বাঙ্গালী যুবকদের এইসকল গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের নিকট এই ভিক্ষা করি যে আমাদের মধ্যে এইসকল গুণ বাড়িতে থাকুক।

১৩২৭ ফাল্গুন

মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা।

সহযোগিতা-বর্জ্জকেরা মদ্যপান নিবারণের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইহার সুফলও হইতেছে। উৎসাহের আতিশয্যবশতঃ কেহ সুরাপায়ীদিগকে কোনও প্রকার শারীরিক বাধা যেন না দেন; তাহা হইলে এই চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে।

মিতপান এবং সুরা ক্রয় ও বিক্রয় নিষেধ।

প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে সুরাপান এবং মত্ততা কিছু ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে, যে সুরাপান আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা ও রীতি নহে ; হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুরাপানের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধি আছে। পাশ্চাত্য দেশসকলে বহু শতাব্দী ধরিয়া সুরাপানের সামাজিক প্রচলন ছিল, এবং এখনও অনেক দেশে আছে ; হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রে সুরাপান যে-ভাবে নিষিদ্ধ আছে, পাশ্চাত্য দেশসকলের স্বীকৃত খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রে তদ্রূপ নিষেধ নাই। তথাপি বহু পাশ্চাত্য দেশে ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ক্রয় ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ সুরাপানের দৈহিক ও নৈতিক কুফল। "মিতপান" বলিয়া কোন, অভ্যাস যদি সকল বা অধিকাংশ মদ্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হইত, এবং যদি উহা দৈহিক ও মানসিক অনিষ্টকর না হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য মদ্যপায়ী সমাজে মিতপানের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে আইন দ্বারা ঔষধরূপে ব্যতীত সুরার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হইত না। ঔষধের জন্যও সুরার ব্যবহার অনাবশ্যক, অনেক বড় ডাক্তারের এই মত ; কিন্তু অন্য অনেকের মত ইহার বিপরীত। এ বিষয়ে আমাদের মতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ব্যবহার (তাহার নাম "মিতপান" বা আর যাহাই দেওয়া হউক) যে

সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, উহা যে একটা ব্যসন বিশেষ, এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশ সকলের অভিজ্ঞতায় ইহা বুঝা যাইতেছে। তাহারা কেহ বা নিষেধবিধি (Prohibition) চালাইয়াছে, কেহ বা সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মাতালের ও মাতলামীর ওকালতী কোথাও কেহ করে না, কিন্তু "মিতপায়ী"র ওকালতীর কথা এখনও কখন কখন ভারতেও শুনা যায়। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, দুঃখের বিষয়। সুরাপানের ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার কারণ, কিম্বা আর কোনও কারণ আছে, জানি না।

সুরার বিজ্ঞাপন

বিলাতে ও ভারতে ইংরেজদের কাগজে এখনও মদের বিজ্ঞাপন বাহির হয় ; কেন না ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ক্রয় বিক্রয় উহাদের দেশে এবং ভারতে এখনও বেআইনী হয় নাই, এবং সুরাপান এখনও উহাদের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু ভারতীয়দের কোন কাগজে মদের বিজ্ঞাপন দেখিলে বড় বিসদৃশ ঠ্যাকে ; কারণ সুরাপান আমাদের দেশের শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ। অথচ এমন কোন কোন ভারতীয় ইংরেজী ও বাংলা কাগজে মদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যাহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীরা মদ্যপায়ী নহেন এবং মদ্যপানের বিরোধী। এরূপ বিজ্ঞাপনের সপক্ষে একমাত্র সত্য যুক্তি এই আছে যে, তাহা হইতে কিছু টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য একটা যুক্তিও পড়িয়াছি। তাহা মোটামুটি এইরূপ। অমুক অমুক বিখ্যাত লোক মদ্যপায়ী, মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়া অমুক বিখ্যাত লোক বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, এবং কতকগুলা লোক ত মদ খাইবেই ও উহার চাহিদা (demand) থাকিবেই ; অতএব উহার বিজ্ঞাপন না ছাপিলে কিছু অর্থের অপ্রাপ্তি ছাড়া আর কি ফল হয়? আফিঙের দোকানের ও গুলির আড্ডার বিজ্ঞাপন ছাপা ঠিক্—এইরূপ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে ; যদিও আমরা স্বীকার করি, যে, ভারতবর্ষের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে সুরাপায়ী যত আছে বা ছিল, আফিং-খোরের সংখ্যা সম্ভবতঃ তার চেয়ে কম এবং গুলিখোরের সংখ্যা আরও কম। কিন্তু আফিংখোর ও গুলিখোরদের মধ্যে একজনও বিখ্যাত লোক নাই বা ছিল না, এমন নয়। বিখ্যাত লোকদের মধ্যে ব্যভিচারী কুস্থানগামী লোক একেবারে বিরল নহে, এবং সামাজিক অপবিত্রতার সহিত সংগ্রামে এখনও কোন দেশের সংস্কারকেরা জয়ী হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি কুস্থানগুলার বিজ্ঞাপন ছাপিতে হইবে? আমরা অবশ্য সুরাপান, আফিংসেবন, গুলিসেবন ও উল্লিখিত কুস্থানসমূহে গমন, নৈতিকআদর্শ-অনুসারে সমশ্রেণীস্থ মনে করি না ; কেবল আমাদের যুক্তিটা বিশদ করিবার জন্য সকলগুলার উল্লেখ করিলাম।

বিজ্ঞাপন ছাপিবার দায়িত্ব।

সাধারণতঃ বিজ্ঞাপন ছাপিবার রীতির সমর্থন দুটি যুক্তির দ্বারা করা যায়। বিক্রেতার ও ক্রেতার মধ্যে, কর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তা ও কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে, যিনি যাহা চান এবং যিনি তাহা দিতে পারেন উভয়ের মধ্যে, বিজ্ঞাপন দ্বারা যোগ স্থাপিত হয়। এই যোগ স্থাপন সভ্যসমাজের কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য আবশ্যক। ইহা না হইলে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কাগজওয়ালারা কিছু টাকা পান, এবং তজ্জন্য তাঁহারা যেরূপ কম দামে পাঠকদিগকে কাগজ দিতে পারেন, বিজ্ঞাপনের আয় না থাকিলে তত সস্তায় দিতে পারিতেন না। এই দুটি যুক্তির কোনটিই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবার মত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন, অন্য প্রকার আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন, মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, দুর্নীতির পরিপোষক পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নয়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত রকমের বিজ্ঞাপন বাছাই করা সুসাধ্য নহে। যে-সব বহিকে আমরা নৈতিক হিসাবে খারাপ বলিয়া মনে করি ও জানি, তাহার বিজ্ঞাপন সহজেই বাদ দিতে পারি ও দিয়া থাকি ; কিন্তু বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সব বই কোন সম্পাদক বা কার্য্যধ্যক্ষ পড়িয়া তাহার পর বিজ্ঞাপন ছাপা-না-ছাপা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন না। এত অবসর কাহারো নাই। যদি এইজন্য বহি পড়িবার নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার বেতন বিজ্ঞাপন-বিভাগের আয় হইতে উঠিবে না ; কেন না, এই কারণে বেশী হারে বিজ্ঞাপনের দাম দিতে কোন ব্যবসায়ী রাজী হইবেন না। বহি পড়িয়া তাহার পর বিজ্ঞাপন ছাপিতে গেলে বিলম্বও হইবে। অথচ নূতন বহির বিজ্ঞাপন খুব শীঘ্র বাহির হওয়া চাই। সুতরাং এই উপায়ও অবলম্বন-যোগ্য নয়।

কেহ কেহ ঔষধের ও অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্যের অত্যুক্তিপূর্ণ বা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে প্রতারণা করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইয়া থাকে। ইহাদের বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নহে। কিন্তু কোন্ ঔষধে কি ফল হয় বা না হয়, কোন্ বিজ্ঞাপনদাতার কাজ কথা অনুযায়ী হইতেছে বা না হইতেছে, সকল স্থলে তাহা খবরের কাগজের কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে জানা বা নির্ণয় করা অসম্ভব ও অসাধ্য। তথাপি, প্রতারণার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে এরূপ বিজ্ঞাপন না ছাপা যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৩২৮ ভাদ্র

খুলনায় দুর্ভিক্ষ

খুলনায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং সে অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সবিস্তার খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। অনাহারে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতেছে, তিনি আমাদের নিকট

তাহার প্রমাণ দাখিল করিয়াছেন ভদ্রশ্রেণীর বহু কুলবধূ পর্য্যন্ত বিবস্ত্রা—গরীব সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। গ্রামের ভিতর স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিতে যান্, তখন তাঁহারা ঝোপের আড়ালে বা ঘরের ভিতরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। দূর হইতে একখানা কাপড় ফেলিয়া দিলে তাহা পরিধান করিয়া তবে সম্মুখে আসিতে সমর্থ হন। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য এই যে, অধিকাংশ লোকই প্রায় উলঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন যাঁহারা কোন রকমে নূতন বা পুরাতন কাপড় বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহার ৯২ অপার সার্কুলার রোড, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠাইতে পারেন। চারি আট আনা পয়সার জন্য সন্তান বিক্রয়ও চলিতেছে। যিনি যত বেশী পারেন, সাহায্য করুন।

১৩৩০ চৈত্র

সোনার ভারতের অজানা ঐশ্বর্য্য

'অ'

ছোট ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা দুই-একটি দোকান দেখিতে পাই। অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীরা হাটে অথবা নিকটবর্ত্তী বড় গ্রামে বা সহরে যাইয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবাসী কখনও ভাবিয়া দেখে না, কি করিয়া দূরদেশবর্ত্তী আয়না-বা চিরুনীনির্ম্মাতার প্রস্তুত জিনিস তাহার হস্তে আসিয়া পড়িল। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রয় করা অর্থে জাপানী আয়না বা ম্যান্চেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার মধ্যে কোনো জটিলতা আছে। কি বিরাট্ বাণিজ্যযন্ত্রের সাহায্যে তাহার ধানপাটের পরিবর্ত্তে সে শত শত দ্রব্যের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাসী চাষার জ্ঞানের অতীত। সে জানে, টাকা পাই ও টাকা দিয়া কিনি।

অতি পুরাকালে গ্রামের বাহিরে প্রস্তুত দ্রব্য গ্রামবাসীর হস্তে প্রায় কখনও আসিত না. গ্রামের অন্তর্গত ব্যক্তিগণই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরস্পরের সকল অভাব মোচন করিত—যথা, কেহ চাষ-করিত, কেহ কাপড় বুনিত, কেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইত, কেহ বা মৎস্যজীবী ছিল। আবার অপর কেহ শিক্ষা বা পৌরোহিত্য সর্‌বরাহ করিত। এইরূপেই গ্রামের জনসংঘের জীবন কাটিত।

তখন জীবনে অভাব ছিল অল্প, কেননা মানুষের আকাঙ্ক্ষা আজ-কালকার মত সে-যুগে এত শত শত হাত বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সমবায়ের পথ বাহিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত ; কিন্তু আজ সুদূর জাপানে তাহার জন্য আয়না ও চিরুনী তৈয়ার

হয় ; জার্ম্মানীতে তাহার আলোয়ান বোনা হয়, ও ইংলণ্ড তাহার বস্ত্র সর্‌বরাহ্ করে। এ এক বিরাট্‌তর সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিত্র। কিন্তু এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝিয়াছে?

বিরাট্‌তর ও জটিলতর হইলেই যে ইহা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত তাহার প্রমাণ কি? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রেলে জাহাজে মাল আসার মধ্যেই কি মানুষের জীবনে সুখ আনয়ন করার কোনো প্রকৃতিগত ক্ষমতা আছে? না এ এক বিরাট্ ও জটিলতাময় বে-বন্দোবস্তের চিহ্ন মাত্র? আরও অল্পস্থল ব্যাপিয়া দেশের মধ্যেই কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করা যায় না? অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়া ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইয়া অবস্থার উন্নতি হয় না কি?

কে এসকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? কেই বা শুনিবে? গ্রামবাসীর—দেশবাসীর—সম্বন্ধে জ্ঞানী মূক, দেশবাসী জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের গুহার বাসিন্দার মতই সংকীর্ণভাবে জীবন কাটাইতেছে। অজ্ঞানতা তাহাকে অদৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়া রাখিয়াছে। সোনার ভারতের সোনা ভারতবাসীর চক্ষে অবাস্তব—কেননা ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষায় অন্ধ।

সহরের মধ্যে সহর

অ

আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের মধ্যে আর-একটি সহর আছে। এই সহরের লোকেদের নিজেদের দোকান-পাট থিয়েটার বায়োস্কোপ গির্জ্জা পাঠশালা ইত্যাদি আলাদা করিয়া আছে। ইহারা নিউইয়র্কে বাস করে অথচ করে না। ইহাদের জীবনযাত্রা নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নহে। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, আনন্দ ও আর্ত্তনাদ, সবই ইহাদের নিউইয়র্কের মধ্যে থাকিলেও বাহিরে।

আড়াই লক্ষ নিগ্রো তাহাদের কালো চাম্‌ড়ায় ঢাকা সুখ দুঃখ ভালবাসা হিংসা সু ও কু ভরা জীবন এই সহরে কাটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কবি শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্ণ কিছুরই অভাব নাই। শুধু নাই সেখানে সাদা চাম্‌ড়া। সভ্য বিশ্বপ্রেমিক আমেরিকান্ তাহার কালো সহরে সহকর্ম্মী ও সহনাগরিক নিগ্রোকে একঘরে করিয়া রাখিয়া নিজ 'উৎকৃষ্টতা' বজায় রাখিতেছে।

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইরূপ সহরের ভিতর একটি করিয়া বড় কালো-সহর আছে। এই পাঁচটি স্থলেই এক লক্ষের বেশী নিগ্রো কোণঠাসা হইয়া দিন কাটায়। জাতির উৎকৃষ্টতা ও অধমতার মাপকাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার উচ্চ জীবননির্ব্বাহ-প্রণালীতে ছায়া ফেলিবারও অধিকার নাই।

একঘরে করিয়া রাখাই একমাত্র অত্যাচার নহে। ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার না পাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, বিনা বিচারে ফাঁসি যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা, সাদা হোটেলে ও রেস্তরাঁয় আহার না পাওয়া ইত্যাদি বহু সভ্যতার ধাক্কা

আমেরিকার নিগ্রোকে সাম্‌লাইতে হয়! এইসব অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সমস্বরে এই অত্যাচারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহারা অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বলকায় অজ্ঞ ভারতবাসীর মত নহে। ইহাদের শরীরে শক্তি ও মস্তকে শিক্ষাজনিত চিন্তা আছে। অনেকেই যুদ্ধের সময় সৈনিকের কার্য্য করিয়াছে। কাজেই আমেরিকার উচ্চ শ্বেতাঙ্গমহলে আজকাল লুকাইয়া মদ্যপান করিবার চিন্তা ছাড়া আরও একটি গভীরতর দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়াছে। নিগ্রোগণ শান্ত বলিয়া খ্যাত নহে। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বেও প্রায় পঁচিশবার নানা স্থলে নিগ্রো-বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে! বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার পরে এবং ১৮৬১ খৃঃ অব্দের অন্তর্বিগ্রহের পূর্ব্বে আরও বারোটি নিগ্রোবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। অন্তর্বিগ্রহের একটি কারণ ছিল, নিগ্রো দাসদিগকে মুক্তি দান। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্বপ্রথা খুব প্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণের সহিত শত্রুতা করিয়া দাস-প্রথা দূর করিতে মনস্থ করে। লিঙ্কল্‌নের মুক্তির পরোয়ানা (Emancipation Proclamation) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাসার ফল ও কত দূর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা, তাহা বলা শক্ত। দাসত্বপ্রথা দূর করিয়া উত্তর রাষ্ট্রসমূহের মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১,৫০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতি করেন। এই মুক্তির পরে "১,৫০০,০০০,০০০ ডলারের কৃষ্ণ হস্তিদন্ত" নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় না। "গৃহপালিত পশু" হইতে নিগ্রো "গৃহ হইতে বহিষ্কৃত পশু" হইয়া দাঁড়াইল মাত্র।

আজ নিগ্রোগণ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এসকল অত্যাচার দূর করিবে। পূর্ব্বে অপরাধী অথবা নিরপরাধী নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্বেতাঙ্গ প্রভু প্রহার ও অনেক সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে যথেচ্ছা ও যাহার দ্বারা ইচ্ছা শাস্তি দান বা লিঞ্চিং সচরাচর ঘটিত। কিন্তু আজকাল লিঞ্চিং প্রায় আর হয় না, হয় দুই পক্ষের লড়াই। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোকে প্রহার করিয়া নিজেও প্রহৃত হইতেছে। সম্ভব, ইহাতে উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।

১৩৩৫ কার্ত্তিক

অভয় আশ্রম

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের কেন্দ্রস্থান। ইহার সভ্যেরা অভয়, সত্যবাদিতা, প্রীতি, অস্তেয়, কর্ম্মিষ্ঠতা, শুচিতা, ও দেশভক্তির প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। স্বাজাতিকতা প্রচার ; হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব বৃদ্ধি ; অস্পৃশ্যতা ও বংশগত জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন ; ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যান্য সামাজিক কুরীতির উচ্ছেদ সাধন ; বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, দেশের ধন বিদেশীদের দ্বারা শোষণ নিবারণ এবং আনুষঙ্গিক আর্থিক দাসত্ব নিবারণ, এবং এই

সকল উপায়ে দেশকে স্বরাজ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত হাতে সুতা কাটা ও হাতের তাঁতে কাপড় বোনা প্রচলিত করা; এবং জাতীয় ভাবে শিক্ষা বিস্তার;—ইহা আশ্রমের কার্য্যতালিকা।

আশ্রমের কাজের দ্বারা যে গরীব লোক উপকৃত হয়, তাহার প্রমাণস্বরূপ ১৯২৭ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে ঐ বৎসর পারিশ্রমিক বাবতে তন্তুবায়েরা ২৮৫০০, সুতা কাটুনীরা ২৭০০০, সূচীর কারুকার্য্যের জন্য মহিলারা ১৭৩৬, রজকেরা ৩২৩৩ এবং দরজিরা ৬০৫৬ টাকা আশ্রমের নিকট হইতে পাইয়াছেন।

আশ্রম কাপড় রঙ্গাইবার ও ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করিবার কাজে ক্রমাগত উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন।

আশ্রমের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে চারি বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার হাঁসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অবনত শ্রেণীসমূহের যুবকদের ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হয়।

আশ্রমের সভ্যেরা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও জাতি মানেন না। রন্ধনের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন না; মেথর প্রভৃতি সকল জাতির লোকের সহিত একত্র ভোজন করেন। সকল জাতির হাঁসপাতালের রোগী নমঃশূদ্র পাচকের রান্না এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে। জাতিভেদের সমর্থক আমরা নহি, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহারা জাতি মানে, তাহারা অভয় আশ্রমের হাঁসপাতালের সুবিধা হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, জাতিভেদের সমর্থন না করিয়া আশ্রম এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়, মনে করি।

কুমিল্লায় আশ্রমের শিক্ষায়তন ছাড়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। দুটি লাইব্রেরী আছে। চাষ, এবং দুধের জন্য গোপালনও আশ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার চাষের জমীর পরিমাণ ও গাভীর সংখ্যা ইহার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

১৩৪২ ফাল্গুন

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিকারচেষ্টা

লক্ষ্ণৌতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে—সকলে নহে—এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে যত মানুষ থাকে তাহাদের পুষ্টির জন্য আবশ্যক খাদ্য জন্মে না এবং চাষের উপযোগী সব জমীতে খাদ্য উৎপন্ন করিলেও সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য জন্মিবে না, অতএব যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহাররূপ কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধি কমাইতে বা বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এই পরামর্শের পক্ষপাতী নহি। এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন কোন দেশে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইতেছে—রাশিয়াতে তাহার অনুকূল আইনও আছে। এবম্প্রকার যুক্তি ও মনোভাব

অতঃপর, সকল শিশুকে পালন করিবার সামর্থ্য না থাকিলে কতকগুলিকে বধ করিতে হইবে, এইরূপ মতেরও সৃষ্টি করিতে পারে।

চাষের যোগ্য সমুদয় জমীর চাষ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমীর ফলন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন খাদ্য ও অন্যবিধ ধন সকল লোকের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা খাদ্যাভাব দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। নানাবিধ পণ্যশিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা লোকদিগকে ধনী করিয়া সেই ধনের সাহায্যে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানীও করিতে পারা যায়। মানুষদের জীবনযাত্রা প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হয় ও সংস্কৃতির দিকে তাহাদের ঝোঁক যত বাড়ে, তাহাদের সন্তানবৃদ্ধি তত কম হয়। অতএব, এই দিকে মন দেওয়া উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিরোধের পরামর্শে এবং যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে ফল এই হয়, যে, এই সব উপায় কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা অবলম্বন করে ও তাহাদের বংশ কমিতে থাকে এবং অশিক্ষিত লোকেদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তাহাতে সংস্কৃতির অবনতি হয়, জাতির উন্নততর স্তরের ক্ষমতা ও প্রভাব কমিয়া যায়।

১৩৪৩ শ্রাবণ

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের এগার-বারটি জেলার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক স্থানে বৃষ্টি হওয়ায় ধানের ক্ষেতে রোওয়া-পোঁতার কাজ করিবার নিমিত্ত শ্রমিকের আবশ্যক হওয়ায় শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের কিছু সুবিধা হইয়াছে। তাহা কিন্তু অল্প সময়ের জন্য—ক্ষেতের বর্ত্তমান কাজ হইয়া গেলেই তাহারা আবার অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে। ভদ্রলোকশ্রেণীর লোকদের এই সাময়িক সুবিধাও হয় নাই। তাহাদের অভাব ও কষ্ট সমানই চলিতেছে। খাদ্যের ও বস্ত্রের, এবং অনেকের চালের খড়েরও, অভাব অনুভূত হইতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায় হইলেও তাঁহাদের এই কাজ প্রশংসনীয় হইত। কিন্তু তাঁহাদের জন্মস্থান ও নিবাস বাঁকুড়ায় নহে বলিয়া তাঁহাদের পরিশ্রম আরও প্রশংসনীয়। তাঁহাদের পৃথক পৃথক রিপোর্টে বাঁকুড়ায় আশু ও স্থায়ী উন্নতির জন্য তাঁহারা যে-সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এ-বিষয়ে গবর্ন্মেন্টের এবং বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদের, উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে আন্দোলন জাগাইয়া রাখা আবশ্যক এবং উভয় পক্ষকে সমুদয় উপায় বার-বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা তাহা করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরাও এই বিষয়ের কিছু আলোচনা মধ্যে মধ্যে করিয়াছি—গত কয়েক মাসের মধ্যে করিয়াছি, এবং ১৩৩০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা" শীর্ষক

প্রবন্ধে ও ১৩৩১ সালের বৈশাখের "ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির উন্নতির উপায়" ও "বাঁকুড়ার উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে করিয়াছি। ১২। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে কিছু বিস্তারিত আলোচনাই করিয়াছিলাম। সেই জন্য প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি প্রায় আট-পৃষ্ঠা-ব্যাপী, শেষোক্তটি সচিত্র ও প্রায় ষোল-পৃষ্ঠা-ব্যাপী। কেহ সমগ্র বিষটির আলোচনা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চাহিলে হয়ত এই প্রবন্ধগুলিও পড়া আবশ্যক হইতে পারে।

১৩৪৬ চৈত্র

সরস্বতী-পূজার বিস্তার ও বিদ্যানুরাগবৃদ্ধি

অনেক বৎসর হইতে বাংলা দেশে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সরস্বতী-পূজা খুব অধিক সংখ্যায় হইতেছে, অন্য কোন প্রদেশে এত হয় না। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে যে, বাঙ্গালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুরাগী হইতেছেন। সর্বভারতীয় স্টাটিসটিক্সে প্রকাশ, মোট জনসংখ্যার শতকরা যত জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালয়ে যায়, তাহার সংখ্যা বঙ্গে সর্বোচ্চ নহে, অন্য কোন কোন প্রদেশে তদপেক্ষা বেশী। বঙ্গের টাকায় এবং বাঙালীর প্রদত্ত সুযোগে ডাঃ রামন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, নোবেল প্রাইজ পাইলেন, ডাঃ কৃষ্ণন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইলেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইলেন। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় না যে, বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যাভক্তি খুব বাড়িয়াছে।

গিরিশচন্দ্র, রঙ্গালয়ে ও জাতীয় আন্দোলনে পতিতা নারী

প্রাসঙ্গিক কথা

রামানন্দ তাঁর পত্রিকায় বিশেষভাবে পতিতোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেননি। সুতরাং পতিতা নারীকে স্টেজে নামিয়ে নৃত্যগীত করানো যে তাঁর দুচক্ষের বিষ ছিল, তা এই সংকলন গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকাতেই লিখিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোকমন্তব্যে একেবারে সম্মার্জনী প্রয়োগ করে লিখেছিলেন: "আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই, [গিরিশচন্দ্র কি অশ্লীল নাটক লিখতেন?] বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখন যাই নাই।" সুতরাং জাতীয় আন্দোলনে 'বেশ্যা ভলান্টিয়ার' শুনেই তিনি আঁতকে উঠেছিলেন এবং গণিকাদের দ্বারা কোনো সৎকার্য করা সম্ভব কিনা সে-বিষয়েও সন্দিহান ছিলেন।

১৩২৩ ভাদ্র

কলিকাতার রঙ্গালয়

কলিকাতার দেশী থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে এই আপত্তি অনেকবার করা হইয়াছে, যে সেখানে অভিনয় দেখিতে শুনিতে গিয়া অনেকের নৈতিক অবনতি হয়। যাঁহাদের নৈতিক শুচিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাঁহারা ওরূপ জায়গায় অভিনয় দেখিতে যাইতেই পারেন না। এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধেও অবশ্য নানা কথা শুনা যায় ; কারণ মানুষ আমোদের পথে বাধা সহ্য করিতে পারে না। আমরা এসব কথার যুক্তিযুক্ততা এখন আলোচনা করিব না। অন্য এক দিক্ দিয়া থিয়েটারগুলির বিচার করিব।

দিয়াশলাই প্রধানতঃ দু রকমের পাওয়া যায়। এক রকম দিয়াশলাইয়ের কাঠী যেখানেই ঘস, জ্বলিয়া উঠিবে। আর এক রকমের দিয়াশলাইয়ের কাঠী কেবল উহার বাক্সের পাশে ঘষিলে জ্বলে। প্রথম প্রকারের দিয়াশলাই হঠাৎ জ্বলিয়া যাইতে পারে বলিয়া উহা বিপজ্জনক ; এই জন্য উহার ব্যবহার আজ-কাল কম। তা ছাড়া উহা যাহারা প্রস্তুত করে, তাহাদের এক রকম অতি ভীষণ ব্যাধি হয় ; তাহাকে ইংরেজীতে চলিত কথায় "ফসী জ" (phossy jaw) বলে। এই পীড়ায় চোয়ালের হাড়খানা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা যখন অধ্যাপক পেড্‌লারের নিকট রসায়ন পড়িতাম, তখন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মানবহিতৈষী কাহারও, যেখানে-সেখানে জ্বলে, এরূপ দিয়াশলাই ব্যবহার করা উচিত নয় ; কারণ উহা ক্রয় করিলে মানুষের "ফসী জ" নামক ভীষণ ব্যাধি উৎপাদনে সাহায্য করা হয়।

বঙ্গের পেশাদারী রঙ্গালয়ে যাহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাজ করে, সাধারণতঃ বলিতে গেলে তাহাদের নৈতিক অধঃপতনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। একথা ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সাধুশীলা কোন নারী এইসব রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হয় না, হইতে পারে না। তাহাদের নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য। সুতরাং এরূপ রঙ্গালয় যত বাড়িবে, অভিনেত্রীর কাজ করিবার জন্য ততই বেশীসংখ্যক ভ্রষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোকেরও দরকার হইবে। এরূপ তর্ক উঠিতে পারে, যে, কলিকাতার থিয়েটারের অভিনেত্রী কি ভাল হইতে ও থাকিতে পারে না? তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করা যায় যে ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় কি? দেখা যায় এই যে অভিনেত্রীরা যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এবং যে অবস্থায় তাহারা কাজ করে, তাহাতে চরিত্র ভাল হওয়া ও থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহারা আমোদের জন্য থিয়েটারে যান, তাঁহারা, অজ্ঞাতসারে, পরোক্ষভাবে, নিজেদের সুখের জন্য, কতকগুলি স্ত্রীলোককে অপবিত্র জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অভিনেত্রীদের নৈতিক দুর্গতিই একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে। তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যনাশ এবং আয়ুর হ্রাসও অবশ্যম্ভাবী। ইহার জন্যও থিয়েটারের দর্শকেরা পরোক্ষভাবে দায়ী।

অধ্যাপক পেড্‌লার যেরূপ কারণে আমাদিগকে যেখানে-সেখানে-জ্বলনশীল দিয়াশলাই কিনিতে নিষেধ করিয়াছিলে, আমরা তার চেয়ে অনেক গুরুতর কারণে সর্ব্বসাধারণকে কলুষিতচরিত্রা অভিনেত্রীদের

অভিনয় না দেখিতে অনুরোধ করি। অবশ্য শুধু ইহাতেই প্রতিকার হইবে না। নারীগণকে, বিশেষতঃ বিধবাদিগকে, দুঃখ দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে হইলে আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা আলোচ্য নহে।

১৩২৫ আষাঢ়

পাপের ব্যবসা

কলিকাতায় সম্প্রতি পুলিশ একপ্রকারের খুব ভাল কাজ করিতেছেন। দুষ্ট স্ত্রীলোকে পাপ-ব্যবসা দ্বারা লাভবান হইবার জন্য শিশু বালিকা ক্রয় করে, এবং দুর্বৃত্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বালিকা ও যুবতীদিগকে ছলে বলে কৌশলে কুস্থানে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। পুলিশ এইরূপ অনেক বালিকা ও যুবতীকে উদ্ধার করিতেছেন, এবং দুর্বৃত্ত লোকেরা কোন কোন স্থলে দণ্ডিত হইয়াছে। এই বালিকা ও যুবতীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই আছে। যাহাদের অভিভাবক জানা আছে ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাদিগকে যদি অভিভাবকেরা গ্রহমন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যাহারা পাপে প্রবৃত্ত হয় নাই, কিম্বা যাহারা এখনও নিতান্ত অল্পবয়স্ক, তাহাদিগকে লইতে কোনও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। যাহারা ভয়ে বা পাশব বলে পরাস্ত ও অভিভূত হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাদিগকেও অভিভাবকগণ আবার সদাচার অবলম্বন করিবার সুযোগ দিলে তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল হয়, না দিলে অমঙ্গল হয়। অভিভাবকগণ এই সুযোগ না দিলে, তাহারা আত্মহত্যা, পাপব্যবসা অবলম্বন, কিম্বা কোন উদ্ধার-আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ, এই তিনের কোন একটি উপায় অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম উপায়টি ত উপায়ই নয়। দ্বিতীয় উপায় পাপের পন্থা ; ইহা অবলম্বন তাহাদের ও সমাজের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের কারণ। তৃতীয় উপায় সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, উদ্ধারাশ্রমগুলি প্রায় সবই খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের। কেহ বুঝিয়া সুঝিয়া ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, আদি যাহাই হউন, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু নিরুপায় হইয়া একধর্ম্মের লোকের অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের আশ্রিত হওয়া কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর নহে। এই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোকদের দ্বারা চালিত এরূপ যথেষ্টসংখ্যক আশ্রম থাকা উচিত যাহাতে অভিভাবক বা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারীরা আশ্রয় পাইতে পারে, এবং সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার মত শিক্ষা পাইতে পারে। তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের চালিত আশ্রমে এই-সকল স্ত্রীলোকের আশ্রয় লওয়া ও পাওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

অসচ্চরিত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত পুরুষেরা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় না, অধিকন্তু টাকা ও পদমর্য্যাদা থাকিলে তাহারা সর্ব্বত্র সমাদর পায় ; অথচ নারীদের নিজের কোন দোষ না

থাকিলেও কেবলমাত্র তাহারা ঘটনাচক্রে কুস্থানে গিয়া পড়িলে বা দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা স্পৃষ্ট ও অপহৃত হইলে, কিম্বা অন্যে তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিলে, তাহারা সমাজকর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইবে, ইহা পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। অসচ্চরিত্র পুরুষ যেমন প্রশ্রয় পায়, অসচ্চরিত্রা নারীও তেমনি প্রশ্রয় পাক্ ইহা কোন প্রকৃতিস্থ লোক চায় না। কিন্তু যে-সব বালিকা বা স্ত্রীলোকের কোন দোষ নাই, কিম্বা কোন অনিবার্য্য কারণে পদস্খলন হইয়া থাকিলেও যাহারা অনুতপ্ত ও সৎপথে থাকিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে কোন সহৃদয় সমাজহিতৈষীর পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলে নারীর প্রতি যে কঠোর বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, তাহার কারণ, অংশতঃ, নারীচরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে রাজী আছি। কিন্তু, নারী পুরুষের সম্ভোগের জিনিষ, এই কুভাব হইতে যে একটা কলুষিত ঈর্ষ্যা পুরুষের হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা যে অনেক স্থলে অত্যাচরিতা নারীদের বর্জ্জনের কারণ ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

সামাজিক অপবিত্রতা দমনের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, নারীদের সুশিক্ষা হইলে সে চেষ্টা আরও সহজে সফল হয়। অনেক সময় দুষ্ট লোকেরা এই বলিয়া বালিকা ও নারীদের ভুলাইয়া আনে যে তাহাদের পিতা বা মাতা পীড়িত, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছেন ও পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এরূপ স্থলে, যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা নিশ্চয়ই চিঠি দেখিতে চায়, বা চিঠির অপেক্ষা করে; সুতরাং তাহাদিগকে ঠকান যায় না। যাহারা লিখিতে পড়িতে পারে, তাহারা ঘটনাক্রমে কুস্থানে নিরুপায় হইয়া পড়িলেও কোনপ্রকারে আত্মীয়দিগকে চিঠি লিখিয়া নিজের অবস্থা জানাইতে পারে। নারীর সুশিক্ষা যে কেন দরকার, তাহার আরও অনেক কারণের মধ্যে ইহা একটি। সত্য বটে, পাশ্চাত্য দেশে লিখনপঠনসমর্থ নারীরাও প্রতারিত ও কুস্থানে নীত হয় ; কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের গঠন ও অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে সাধারণতঃ চাকরী করাইয়া দিবার লোভ দেখাইয়া ঐরূপ গরীব মেয়েদের ঠকান হয়। আমাদের দেশে যে-সব বালিকা ও নারী প্রতারিত হয়, তাহাদের প্রতারিত হইবার উপায় এরূপ নয়।

নিতান্ত ঘরকুনো হইয়া থাকাতেও এদেশের মেয়েরা কোন অপরিচিত স্থানে বা অচিন্তিত নূতন অবস্থায় পড়িলে দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই কারণে অবরোধপ্রথার কঠোরতা নারীচরিত্রে দৃঢ়তা জন্মিবার অন্তরায় ; সারা জীবন ঘরের মধ্যে থাকিলে বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মে না। নারীচরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়াসে অবরোধপ্রথা সমর্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু নারী বিপদে পড়িলে দেখা যায়, এই অবরোধপ্রথাই তাহাকে আত্মরক্ষায় ও আত্মোদ্ধারে কতটা অক্ষম করিয়াছে। নারী পুরুষের সম্ভোগের বস্তু, এই নিকৃষ্ট ভাব ও তজ্জনিত ঈর্ষ্যাও অবরোধপ্রথার মূলে আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতেছে এবং বর্ত্তমানে যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতেও দেখা যাইতেছে, যে, অবরোধপ্রথা নিরপরাধা নারীদিগকে পিশাচ ও পিশাচীদের কবল হইতে রক্ষাকরিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। অবরোধের অন্য দোষ দেখান অপ্রাসঙ্গিক হইবে ; নতুবা দেখান যাইত ইহাতে

কলিকাতায় নারীর মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ ভয়ানক হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ-সকলে পুরুষ অপেক্ষা নারী মরেন কম। কলিকাতায় নারী মরেন পুরুষের দেড়গুণ।

কলিকাতায় বিস্তর লোক পরিবারবর্গ হইতে দূরে বাসা করিয়া থাকে. তাহারা পারিবারিক জীবনের সুপ্রভাব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকের পতন হয়। কলিকাতায় বাড়ীভাড়া ও বাসা-খরচ যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এখানে সপরিবারে থাকা ক্রমশঃ আরও কঠিন হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠে যে-সকল স্থান আছে, সেগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া, তথা হইতে প্রত্যহ সস্তায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, এখন যাহারা মেসে থাকিয়া আফিস করে, বা অন্য প্রকারে বাসা করিয়া থাকে, এরূপ বিস্তর লোক সপরিবারে থাকিতে পারে। তাহাতে সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। সেরূপ ব্যবস্থা কখনো হইবে কি না, বা কখন্ হইবে বলা যায় না। নারী প্রধানতঃ পুরুষের সম্ভোগের বস্তু, এই জঘন্য ভাবটি দূর না করিলে, বিবাহিত জীবনে অসংযম পরিহার না করিলে, নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দিলে, এবং গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানবের শ্রেয়স্কর কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার নারীর উপর না পড়িলে, সামাজিক অপবিত্রতা সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে না।

কলিকাতায় যাহারা দাসীবৃত্তি করে, এবং যাহারা পাচক ও চাকরের কাজ করে, তাহাদের মধ্যে পাপ প্রবল আকারে বিদ্যমান। চাকর বা পাচক এবং "ঝী"দের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রচলিত, তাহা একটু খবর লইলেই বুঝা যায়। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বা অন্য কোন নূতন আইন করিয়া বিবাহ প্রচলিত করিলে মানবের কল্যাণ হয়। নতুবা এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কেবল যে নিজেরাই কলঙ্কিত জীবন যাপন করে তাহা নয়, অন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষদেরও পতনের কারণ হয়।

বালিকা ও যুবতী বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের সামাজিক বাধা সামাজিক অপবিত্রতার একটি কারণ। সকলের বিবাহ না হইতে পারে, কিন্তু সকলেই যাহাতে সৎপথে থাকিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন, অন্নবস্ত্রের জন্য যাহাতে কাহাকেও অন্যের গলগ্রহ হইতে না হয়, তাহার মত শিক্ষা সকলে পাইলে প্রভূত অমঙ্গল নিবারিত হয়। জ্ঞানের ও সমাজের হিতসাধনের আনন্দ মানুষের মনকে পূর্ণ রাখিলে নিকৃষ্ট সুখের মোহ হ্রাস পাইয়া লুপ্ত হয়।

১৩২৮ শ্রাবণ

'বেশ্যা ভলান্টিয়ার"

উপরের দুটা কথা যে লিখিয়া ছাপিতে হইল, ইহা অতিশয় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে রাজপথে মিছিলে এবং প্রকাশ্যসভায় বেশ্যা স্বেচ্ছাসেবকের আবির্ভাব হওয়ায়, অগত্যা ইহার উল্লেখ করিতে হইল। সমাজ যাহাদের পাতিত্যের জন্য সম্পূর্ণ বা অংশতঃ দায়ী, পুরুষজাতি যাহাদের

দুর্গতির জন্য সম্পূর্ণ্ বা অংশতঃ দায়ী, যাহাদের হিতের জন্য কিছু করি নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিবার নিমিত্ত এই বিষয়টির উত্থাপন করি নাই। দেশের সেবা করিবার অধিকার তাহাদেরও আছে. কিন্তু তাহারা পাপের ব্যবসা পরিত্যাগ না করিলে অন্য দেশসেবক ও দেশসেবিকাদের সাহচর্য্য করিতে তাহারা অধিকারী নহে। তাহাতে সমাজের অমঙ্গলই হইবে. অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও নেতা মহাত্মা গান্ধী। তিনি সাধুপুরুষ। তিনি পুণঃপুণঃ রলিয়াছেন, অসহযোগ প্রচেষ্টার ভিত্তি ও লক্ষ্য জাতীয় অনুতাপ, জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত, এবং জাতীয় আত্মশুদ্ধি। ইহার সহিত যেমন কোন হিংসাদ্বেষ, জড়িত হওয়া উচিত নহে, তেমনি কোন প্রকার দুর্নীতি অপবিত্রতার ইহার সহিত সংস্রব থাকিতে পারে না। সিগারেট বিড়ি খাইতে খাইতে যে-সব পতিতা স্ত্রীলোকে মিছিলে বা সভায় ভলন্টিয়ারের কাজ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত, আত্মশুদ্ধিচেষ্টার কোন লক্ষণই ত দেখা যায় নাই। অতএব যাঁহারা তাহাদিগকে উৎসাহ বা প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীকে ও তাঁহার প্রচেষ্টার প্রকৃতিকে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া সন্দেহ হয়।

একই নৈতিক আদর্শ অনুসারে পুরুষনারী উভয়ের বিচার করিতে হইবে, সত্য। কিন্তু এবিষয়ে সাম্যের মানে এ নয়, যে, যেহেতু আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও দুর্বৃত্ত পুরুষেরাও সার্ব্বজনিক প্রচেষ্টায় কর্ম্মী হয় বা স্বার্থ সিদ্ধি ও খ্যাতির জন্য তাহাতে যোগ দেয়, অতএব পাপ যাহাদের ব্যবসায় এরূপ নারীদিগকেও নিষ্কলঙ্কচরিত্র ভদ্র যুবকদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। সাম্য অন্যদিক্ দিয়া স্থাপন করিতে হইবে ; অসচ্চরিত্র পুরুষদিগকেও সার্ব্বজনিক প্রচেষ্টা হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অসচ্চরিত্রতার পঙ্কে পুরুষ ও নারী উভয়কেই নিমজ্জিত করিয়া সাম্য স্থাপন করিতে হইবে না! পুরুষদের মধ্যে যাহাদের পাপ গুপ্ত আছে বলিয়া নানাদেশে যাহারা ভদ্রসমাজে স্থান পায়, তাহাদের নজীর অনুসারে, যে-সব স্ত্রীলোকের পাপ ঢাকা নাই, তাহারাও ভদ্রসংসর্গে আসিবার অধিকার পাইতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ পতিতা নারীদের সংশোধক হইবার উপযুক্ত। তাঁহারা সে চেষ্টা করিলে দেশের পরম কল্যাণ হয়। কিন্তু মিছিলে ও সভায় তাহাদিগকে প্রকারান্তরে আপনাদের ইস্তাহার জারী করিবার অধিকার দান সংশোধনের পথ নহে।

১৩২৯ পৌষ

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এই আলোচনা হওয়া উচিত, যে থিয়েটারগুলির সংস্কার ও উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে। এই সংস্কার ও উন্নতি নানাবিধ। তাহার মধ্যে নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে। কোন কোন ধর্ম্ম-মূলক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দ্বারা কাহারও কাহারও উপকার হইয়া থাকিলেও,

থিয়েটার গুলির দ্বারা অনেকের যে চারিত্রিক অধোগতি হইয়াছে, এবং দেশের নৈতিক হাওয়া কলুষিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বলা যায় না ; কিন্তু প্রশ্নটি আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিনয়ের উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। থিয়েটার গৃহগুলি এবং তাহার আসনাদি এরূপ হওয়া দরকার, যাহাতে মানুষের স্বাস্থ্যনাশ না হয়। সমস্তরাত্রিব্যাপী অভিনয় আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

১৩২৯ পৌষ

গণিকাদের দ্বারা সৎকার্য্য করান

মানুষের মন যখন উত্তেজিত থাকে, তখন কোন, বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহাতে লোকে মন দেয় না, কিম্বা, মন দিলেও, বলে, আলোচকদের কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে। উত্তেজনা থামিয়া গেলে, এরূপ কিছু না ঘটাই উচিত।

কিছু কাল আগে বোম্বাই প্রদেশে এই আলোচনা হয়, যে, নারীরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন কি না। পুনায় ইহা আলোচনা করিবার জন্য পুরুষদের যে সভা হয়, তথাকার ভদ্রমহিলারা পতাকাহস্তে দল বাঁধিয়া রাস্তায় গান করিতে করিতে সেই সভাস্থলে উপস্থিত হন। মহাত্মা গান্ধীর গত জন্মদিনে বোম্বাইয়ের গুজরাতী মহিলারা জেলে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য রাস্তা দিয়া দল বাঁধিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে ভদ্রমহিলাদের এই প্রকার মিছিল এই কারণে সম্ভব হয়, যে, তথায় নারীদের অবরোধ-প্রথা নাই।

বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব প্রবল, তখন কোথাও কোথাও পতিতা নারীদের মিছিল বাহির হইয়াছিল। বোম্বাই অঞ্চলের মত হিন্দু ভদ্রমহিলাদের মিছিল বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। যাহা হউক, যদি হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয়। আমরা এখন অন্য কথা বলিতেছি। উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে বিপন্ন হওয়ায় যখন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বয়সের লোক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন নারীদের দলও তাহাতে ছিল, কিন্তু তাঁহারা পতিতা নারী। ভদ্রমহিলারা কোথাও রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, জানি না। সদনুষ্ঠানের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহ প্রশংসনীয় কাজ। এইরূপ কাজ করিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। কোন মানুষই এমন নাই, যাহার সব চিন্তা কল্পনা কথা কাজ প্রবৃত্তি পাপাত্মক। ভাল কাজ করিয়া ভাল হইবার অধিকার যেমন পুরুষের আছে, তেমনি নারীরও আছে। পুরুষদের বেলায় দেখিতে পাই, যে, দুশ্চরিত্র পুরুষদের দান গৃহীত হইয়া থাকে, এবং তাহারা সৎকার্য্যের জন্য দান সংগ্রহও করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের অধিকার নাই, একথা কেহ বলে না, বরং এরূপ কাজ করিলে লোকে

তাহাদের প্রশংসাই করে। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা যে কাজ করিতে পারে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা সেরূপ সংকাজ কেন করিতে পাইবে না? তবে, তাহারা যদি ভিক্ষার ব্যপদেশে নিজেদের কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায়, তাহারা পথ বন্ধ অবশ্যই করা উচিত।

সত্য বটে, দুশ্চরিত্রা নারীদিগকে পতিতা বলা ও মনে করা হয়, (এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত,) কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে পতিত মনে করা ও বলা হয় না, কিন্তু তাহারাও বাস্তবিক পতিত। অতএব পতিত পুরুষদের সৎকর্ম্ম করিবার যে অধিকার আছে, পতিতা নারীদেরও তাহা থাকা উচিত। কেহ চিরপতিত বা চিরপতিতা নহে, সকলেরই উদ্ধার আছে ও হইবে।

কিন্তু যাঁহারা পতিতা নারীদের মঙ্গল চান, তাঁহাদের একটি কর্ত্তব্য আছে। গণিকাদের সৎচেষ্টার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বিপন্নের সাহায্য বা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, তাঁহাদের গণিকাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বলা ও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে, পাপ-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা না করিলে তাহারা অধোগতি হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইলে, কোন কাজের দ্বারাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে এই বাজে তর্ক উঠিতে পারে, যে, বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, প্রভৃতি গণিকাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি কেহ গণিকাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গণিকাই থাকিয়া যাও ; তাহা হইলেও তোমরা মুক্তির অধিকারী হইবে"?

এস্থলে এই ন্যায্য যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে ত কেহ বলে না, যে, তাহারা সচ্চরিত্র না হইলে কেবল দান বা দানসংগ্রহ দ্বারা তাহাদের মুক্তি হইতে পারে না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সমাজ পুরুষদের সম্বন্ধে যদি কোন অবহেলা করে, যদি তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয়, বা তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বা আদর্শ পোষণ করে, তাহা হইলে নারীদের সম্বন্ধেও তাহাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সমাজে বেশ চলিয়া যায়, তা বলিয়া কি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদিগকেও সমাজে চালাইতে হইবে? নরনারীর সাম্যের মানে এ নয়, যে, উভয়ের দুর্নীতিকে সমান প্রশ্রয় দিতে হইবে। সেই সাম্য বিধানই কল্যাণকর, যাহাতে পুরুষ ও নারীর সাধু জীবনের ও আদর্শের সমান আদর করা হয়, এবং পুরুষ ও নারীর অসাধুতাকে সমান গর্হিত মনে করিয়া উভয়ের সম্বন্ধেই সমান কঠোরতা অবলম্বিত হয়। অতএব, দুশ্চরিত্র পুরুষেরা যাহাতে সমাজে দুশ্চরিত্রা নারীদের মতই অনাদৃত ও নিন্দিত হয়, তাহাই করিতে হইবে ; দুশ্চরিত্রা নারীরা যাহাতে দুশ্চরিত্র পুরুষদেরই মত সমাজে প্রশ্রয় পায়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

বাংলাদেশে নারীর অবরোধ-প্রথা থাকায় এখানকার বালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বাধা মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ্র অপেক্ষা বেশী। সেইজন্য ভারতের ঐ-সকল ও অন্যান্য প্রদেশে এবং যে যে দেশী রাজ্যে নারীর অবরোধ নাই সেখানে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীদের সদনুষ্ঠান যেরূপ বাড়িতেছে, বঙ্গে সেরূপ বাড়িতেছে না। ইহা বাঙালীদের একটি লজ্জার কারণ হইয়া আছে। ইহার উপর আরও লজ্জার কারণ এই হইতেছে, যে, বাঙালী পতিতা নারীরা সৎকর্ম্মের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহ কার্য্যে বাঙালী ভদ্রমহিলাদের চেয়ে অধিক অগ্রসর, দেখা

যাইতেছে। গণিকারা জীবনের কোন সৎ-আদর্শ-বিষয়ে ভদ্রমহিলাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা কি কোন সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয়? অথচ খবরের কাগজে ইহাও দেখিয়াছি, যে, কলিকাতার কোন শরহতলীতে গণিকাদের সভায় সভাপতি হইয়া একজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে দলবদ্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিবার কাজে উৎসাহিত করেন এবং এরূপ কাজের শৃঙ্খলা বিধানের ভার গ্রহণ করেন। যদি এরূপ ভিক্ষা করা ভাল কাজ হয়, তাহা হইলে ঐ সভাপতি ভদ্রমহিলাদের এরূপ সভা করিয়া তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করিবার চেষ্টা কেন করেন নাই? যদি উহা মন্দ কাজ হয়, তাহা হইলে গণিকাদিগকেও কি মন্দ কাজে লাগান উচিত? তাহাদিগকে কেহ ত প্রকাশ্য সভায় চুরি ও খুন করিতে বলে না? তর্ক উঠিবে সামাজিক প্রথা বশতঃ ভদ্রমহিলাদের এরূপ ভিক্ষা দ্বারা দানসংগ্রহে বাধা আছে। আছে তাহা জানি ; সেইজন্যই ত এত কথা লিখিতে হইতেছে। কিন্তু যে-বাধা থাকায় কোনও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভদ্রমহিলাদের চেয়ে গণিকাদের কার্য্যসৌকর্য্য অধিক হয় ও পদবী শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা উপযুক্তরূপ সাবধানতার সহিত দূর করিবার চেষ্টা কেন করা হয় না?

বস্তুতঃ, যে-সব কাজ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভদ্রনারীরা করেন, সেরূপ কিছু বঙ্গে নারীদের দ্বারা করাইতে হইলে পতিতা নারীদের সাহায্য লইতে হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্পকালের জন্যও শ্রেষ্ঠতা দিতে হয়, ইহা বাঙালী সমাজের খুব লজ্জার বিষয়।

শেষে আর একটা কথা বলা দর্‌কার। ব্রাহ্মসমাজে ও খৃষ্টিয়ান সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেয়ে কম ; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়া হিন্দুনারীদের সমান স্বাধীনতা বাঙালী ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীদের নাই। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীরা এই কারণে এবং বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রভাব ও বিরুদ্ধভাব অতিক্রম করিতে পারেন না বলিয়া, নারীদের দক্ষিণ ভারতের, নারীদের মত স্বাধীনভাবে তাঁহারা শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন ন।।

১৩২৯ মাঘ

গণিকাদের দ্বারা সৎকর্ম্ম করানো

শ্রীমন্মথমোহন দাস

পৌষ সংখ্যার প্রবাসীর ৪২৭—৪২৯ পৃষ্ঠায় "গণিকাদের দ্বারা সৎকার্য্য করান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। এরূপ উদারতা ও সহানুভূতির প্রসঙ্গ বাঙ্গালা দেশে আর কোন পত্রিকা করেন বলিয়া জানি না। আশাকরি তাঁহারা প্রবাসীর পদাঙ্কানুরসরণ করিয়া দেশের সামাজিক বহুমুখীন সমস্যার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে দু একটি আশার কথা বলিতে চাই।

প্রবাসীতে লেখা হইয়াছে, "বোম্বাই অঞ্চলের মত হিন্দু ভদ্রমহিলাদের মিছিল বাংলা দেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। যদি হইয়া থাকে আনন্দের বিষয়।" (৪২৮ পৃষ্ঠা তৃতীয়

প্যারা)। গত বৎসর মিছিল করা, সভা করা, ও পিকেট্ করার জন্য ছোট ছোট ছেলেদের যখন বরিশাল জেলার পিরোজপুরের কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন ববিশালের সুপ্রসিদ্ধ দেশ-সেবক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সেখানে থাকিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার উন্মাদনাপূর্ণ বক্তৃতায় অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী জননী ভগিনী ও ব্যথার ব্যথী নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া ছেলেদের স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য জেলের দ্বারে ও বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিরোজপুরের হিন্দু-মহিলারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও নৌকা হইতে খালের পাড়ের বাসায় মশারী ঢাকা দিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের অসঙ্গত লজ্জার আবরণ হঠাৎ মোচন হইল শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, সংশয়ান্বিতও হইয়াছিলাম, পরে জানিলাম উহা সত্যই ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে স্বামী ও অন্যান্য স্বদেশ-সেবক কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করায় শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্ত, আরো কতিপয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে আদালতে, উকীল-মোক্তারদের লাইব্রেরীতে, অসহযোগিতা (Non-Co-Operation) প্রচার করিতে যাইয়া নিজে কয়েক ঘন্টার জন্য বন্দী হইয়াছিলেন।

পুণ্যব্রতা-নারী-শক্তিতে শ্রদ্ধেয় শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এবং এই শক্তির জাগরণকে দেশের ও দলের কাজে নিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার অনুপ্রেরণাপূর্ণ আহ্বান, সফল হইতেছে, এই বরিশাল নগরে। তিনি প্রথমে পতিতা নারীদের ভিতরে এই সাধু জাগরণ আনিয়াছিলেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ সময়ে মিছিলের সঙ্গে বাহির হইত। সহরের বহুলোক আমরা ইহার নিন্দা করিয়াছি। এই অনন্যগতি নারীদের সুব্যবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধী বলিয়া গেলেন, পরে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী প্রভৃতি আসিয়া তাহাদের ডাকিয়া অনেক আশা ভরসা দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কয়েকজন হীন পথ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আর হইল না। দুইটি স্ত্রীলোক নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল, তারা দেশী কাপড়ের বোঝা লইয়া গৃহে গৃহে ফিরিয়া বিক্রী করিত। ইহাতেও কত লোক কত কি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, সেই একটি রমণী সম্পূর্ণরূপে কুসঙ্গ ও বিলাসচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ্ আশ্রয়লাভের প্রার্থিনী হওয়ায়, ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূত-চরিত্র শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় প্রমুখ কতিপয় দেশহিতৈষী নিরাপদস্থানে একটি বাসা ভাড়া করিয়া উহাকে পতিতাশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। ঐস্থানে ঐ রমণী আর-একটি বৃদ্ধাকে লইয়া ভদ্রভাবে বাস করিতেছে এবং চর্‌কার সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। আশা করি ইহাদের পন্থা আরো অনেক অভাগিনী অনুসরণ করিতে পারিবে।

হিন্দু ভদ্রমহিলাদের সম্মিলন সহরের এক এক কেন্দ্রে হইতেছে এবং তাঁহাদের ভিতরে দেশপ্রীতি ও লোকপ্রীতির আশ্চর্য্য উন্মেষও হইয়াছে, ঐ শরৎ-বাবুর উপদেশে ও জীবনের আদর্শে। শরৎ-বাবুর আহ্বানে দলে দলে ভদ্রমহিলাগণ মিলিত হইতেছেন। বিশেষ বিশেষ দিনে মিছিল করিতেছেন, পথে পথে উলুধ্বনি করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-সেবকগণ জয়ধ্বনি করিতেছে। শুধু তাহা নহে। ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া চর্‌কার সূতা প্রস্তুত করাইতে ও খদ্দরের কাপড় ব্যবহার করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, সময় সময় কংগ্রেসের জন্য মহিলা সভ্য সংগ্রহ করিতেছেন, চাঁদা তুলিতেছেন। সম্প্রতি উত্তর-বঙ্গের প্লাবন-পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য চাউল পয়সা ও কাপড় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া সময় সময় স্কুল-কলেজের ছেলেদের নিকট বয়কট প্রচার ও বিলাতী বস্ত্র ব্যবসারীদের দোকানে দোকানে পিকেট্ করিয়াছেন, হয়ত আবার করিবেন।

হিন্দু মহিলাদের, বালিকা ও বৃদ্ধা নির্ব্বিশেষে, এই-প্রকার প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করা ও অন্যান্য কার্য্য করাটা হিন্দু সমাজের বহুসংখ্যক লোকের কাছে ভাল লাগিতেছে না, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই সমালোচনা করিতেছেন। শরৎ বাবু একদিন আমার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন স্ত্রী-শক্তির জাগরণ হইয়াছে, ইঁহাদিগকে অবরোধে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জো নাই, ইঁহারা দলে দলে যাত্রাগান শুনিতে অভিনয় দেখিতে, ঘোড়দৌড় ও সার্‌কাস্ দেখিতে যাইতেছেন, কই অভিভাবকগণ তো আর ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ

করিতেছেন না, অনেক যুগের অবরোধের পর এই মুক্তধারা ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন পুরুষদের কর্ত্তব্য এই ধারাকে দেশ ও দশের হিতসাধনে পরিচালিত করা। তাই জীবনের বিশেষ ব্রত বলিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, নারী-শক্তির প্রভাবে পুরুষকে সংযত ও শোধিত হইতে হইবে, ইত্যাদি।

ভদ্র মহিলাদের এবম্বিধ সদনুষ্ঠানের কথা "বরিশাল-হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ও কখন কখন কলিকাতার "Servant" পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহুস্থানের পত্রিকা হইতে বহুসংবাদ প্রবাসীর "দেশ-বিদেশের কথা"র মধ্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকে অথচ আপনার এরূপ মহানুভূতি আছে যে-বিষয়ে, তাহার কথা ঐসকল পত্রিকা হইতে গৃহীত ও উদ্ধৃত হয় না কেন বুঝিতে পারিলাম না। সম্প্রতি Servant পত্রে প্রকাশিত ভদ্রমহিলাদের কার্য্য সম্বন্ধে একটি সংবাদ এই সঙ্গে কাটিয়া পাঠাইলাম। যে-সকল মহিলা এই কার্য্য পরিচালনায় অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের নামও আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। যথা—স্বর্গীয় হরকান্ত সেন মহাশয়ের বৃদ্ধা স্ত্রী, ডাক্তার আনন্দমোহন রায় এল-এম্-এস্ মহাশয়ের পত্নী, দেশসেবক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-বধূ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী, সার্‌ভেন্ট পত্রিকার প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের মাতা ও পত্নী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্তের মাতা ও ভগ্নী ইত্যাদি। ইঁহাদের সঙ্গে বহু ভদ্রমহিলা মিছিল করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের সঙ্গে প্রবীণ স্বেচ্ছা- সেবকগণ উপস্থিত থাকেন। ইঁহারা এখানে একটি বঙ্গনারী-সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে "সারস্বত বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় নূতন আদর্শে পরিচালিত হইতেছে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া পত্র শেষ করিতেছি। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিন্দা গঞ্জনা ও লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় নাই। মফঃস্বলের ব্রাহ্মনারীগণ জুতা মোজা পরিয়া স্বামী পিতা ও ভ্রাতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, গাড়ীর দরজা খোলা রাখিয়া যাতায়াত করিতেন, আর পথের লোক কত কি ব্যঙ্গ করিত। আর আজ হিন্দু মহিলাগণ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল মন্দিরে গমন ও ভ্রমণের জন্য নহে। দেশহিতসাধনেরই জন্য। আর প্রথম যুগে যাঁহারা নিন্দিতা হইতেন তাঁহারাই পশ্চাতে রহিলেন। কাজেই 'প্রবাসীর' শেষ কথাটার যুক্তি এখন আর খাটে না। পশ্চাৎপদ হওয়ার আরো কারণ আছে। প্রবাসীর কথাগুলি আবার ভাবিবার জন্য এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—"শেষে আর একটা কথা বলা দরকার। ব্রাহ্মসমাজে ও খৃষ্টীয় সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেয়ে কম ; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়া হিন্দুনারীদের সমান স্বাধীনতা বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীদের নাই। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীরা এই কারণে এবং বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রভাব ও বিরুদ্ধভাব অতিক্রম করিতে পারেন না বলিয়া, নারীদের, দক্ষিণ ভারতের নারীদের মত, স্বাধীনভাবে তাঁহারা শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না।" বরিশালে যেমন হিন্দুনারীদের অভ্যুদয় হইতেছে, হয়ত বাঙ্গালা দেশে আরো অনেকস্থানে এইরূপ হইতেছে। প্রবাসী পত্রিকায় বিষয় প্রকাশিত হইলে ও সুধীগণের সহানুভূতি পাইলে ভদ্র নারীগণের এ-সকল কর্ম্মোৎসাহ আরো বাড়িবে আশা করি।

১৩৩৩ শ্রাবণ

পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে গিরীশচন্দ্রের মত

বৈশাখ মাসের বঙ্গবাণীতে "গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখকের সহিত পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে গিরীশচন্দ্রের কথোপকথনের রিপোর্ট আছে। একস্থানে গিরীশ-বাবু বলিতেছেন ঃ—

দেখ, যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্চে বলেন, তাঁদের আমি একটা কথা বল্‌তে চাই। যা হোক ত্যাগ করুন আর যাই করুন, এই বেশ্যা মূর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে। তাদের ত্যাগ করা কিম্বা ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার? যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য কোনও অবতার পুরুষই এদের ত্যাগ বা ঘৃণা কর্‌তে শেখাননি—তাঁরা এদের জীবন উন্নত ক'রে দিয়েছেলেন। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ কর্‌বার দম্ভ করি না, কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটি নূতন পথে চালিত কচ্চি—যে পথে তারা ইচ্ছা কর্‌লে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে, উচ্চ চিন্তা কর্‌তে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্য লোককে প্রলোভিত কর্‌তে ক্ষান্ত থাক্‌বে। আমি তো তাদের অর্থার্জ্জনের একটা সুগম পথ খুলে দিয়েছি—অভিনয় কর্‌তে এরা উচ্চ চিন্তা উচ্চভাবের আবৃত্তি ও অভিব্যক্তি করে, কিন্তু বল্‌তে পার এইসব রুচিবাগীশরা এদের সংস্কার কর্‌বার কি চেষ্টা করেছেন?

গিরীশ-বাবুর এই মত পড়িবার অনেক আগে আমরা পেশাদার অভিনেত্রীদের কাজের এই ভাল দিক্‌টা দেখাইয়াছিলাম, যে, তাহারা সুযোগ পাইলে ও ইচ্ছা করিলে ইহার সাহায্যে পাপপথ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন তাহা করিয়াছে, করিতে উৎসাহিত হইয়াছে, বা করিবার সুযোগ পাইয়াছে?

তার পর গিরীশ-বাবু "রুচিবাগীশদের" সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

ছেলে-বেলা এঁরা বেশ্যা ও বদমায়েস গুণ্ডাকে ভিন্ন চ'খে দেখে এসেছেন ও ঘৃণা কর্‌তে শিখেছেন। এঁদের মনে সত্য সত্য এইরকম একটা ধারণা দৃঢ় হ'য়ে আছে যে, যারা বেশ্যা ও গুণ্ডার সংস্রবে আসে—তারা জহন্নামে যায়। এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিছে, তা নয়। বাস্তবিকই বেশ্যার কুহকে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে, বেশ্যার কুটিল চাউনিতে অনেক যুবক বিপথগামী হ'য়েছে এই সব সত্য কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ে নাটক দেখার নাম তো বেশ্যার সংস্রবে আসা নয়। রঙ্গালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আছে—রঙ্গমঞ্চে কোনও রূপ অভদ্র বা অসভ্য ব্যবহারে শাসন আছে এবং যারা অভিনয় করে তারা নিজ নিজ চরিত্র play কর্‌তেই ব্যস্ত—তারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন কর্‌তেই চেষ্টিত,—রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার অবসর তাদের কোথায়? ভাল নাটক অভিনীত না হ'লে অন্য কথা। তবে আমার মনে হয় যে, বেশ্যা ও গুণ্ডা আমাদের সমাজের একটি বিষম সমস্যা। এদের শুধু ঘৃণা ও উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌বে না। এরা একদিকে পিশাচ পিশাচী, আবার অন্যদিকে চালিত হ'লে এদের দ্বারা সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে। থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান ছাড়া এদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

কিন্তু সেই "দাঁড়াবার জায়গা" তাহাদিগকে "অন্যদিকে চালিত" এমন ভাবে করিতেছে কি, যাহাতে "সমাজের অনেক হিত হ'তে পারে?" "রঙ্গালয়ে যুবকদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার অবসর" অভিনেত্রীদের না থাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরে যে-সকল আছে, তাহাতে অনেক যুবকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অস্বীকার করিবার জো নাই।

প্রবন্ধটির শেষে পেশাদার থিয়েটারের

পেশাদার অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত গিরীশ-বাবুর কথোপকথনের কিছু আভাস আছে. নীচে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একবার এই হলঘরে কতকগুলি অভিনেত্রী আসে—সে-সময় স্বামীজী (আমেরিকায় যাবার অনেক আগে) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের বলেছিলাম—তোরা একবার সরলপ্রাণে তাঁকে (পরমহংস রামকৃষ্ণকে) ডাক্—তাঁর আশ্রয় নে—দেখ্‌বি আর তোদের ভয় নেই। স্বামীজী আমাকে ও-সব গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তি, ইত্যাদি ব'লে প্রতিবাদ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তখন উত্তেজিতভাবে ঠাকুরের নামের গুণ ও ঠাকুর যে পতিতপাবন, তা বল্‌তে লাগলাম। ভগবানের নাম যে একবার নেয়, দুনিয়াতে তার আর কোনও ভয় নেই। এইসব যখন বলচি, তখন স্বামীজী উঠে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে বল্লেন, "জি সি—dangerous doctrine preach কর্‌চো। আমি জানি নামের গুণ, আমি জানি তিনি পতিতপাবনা, তিনি দুর্ব্বল পতিত তাপিতদের জন্য এসেছিলেন—কিন্তু"—স্বামীজী ছলছল চক্ষে বলিলেন, I love purity—পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্র প্রচার কর"—এই বলিয়া গিরীশবাবু বলিলেন, "স্বামীজীর সেই দিব্যমূর্ত্তি আমার চখের সাম্‌নে ভাস্‌চে।"

১৩৪৪ আষাঢ়

সিনেমাতে নৃত্য

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সিনেমাতে নৃত্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। যাহাতে পাশববৃত্তি উত্তেজিত হয় বা প্রশ্রয় পায়, এরূপ নৃত্য সাতিশয় নিন্দনীয়। সিনেমার ফিল্মে অনেক সময় গল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-রহিত নৃত্য দেখান হয়। অনেক স্থলে তাহা সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ। নৃত্যকে সম্পূর্ণ সুনীতি সঙ্গত ও সুরুচিসঙ্গত রাখিতে হইলে কটিদেশের অব্যবহিত নিম্নস্থানীয় দেহাংশের সঞ্চালন ও ভঙ্গীসমূহ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়। অনেক সময় কেবল দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বালিকা ও কিশোরীদের এরূপ নৃত্য দেখান হয় যাহা বাই-নাচের কতকটা অনুকরণ। ইহা নিন্দনীয়। নৃত্য সুরুচিসম্মত হইলেও যে-সব সভার কাজের সহিত নৃত্যের কোনই সঙ্গতি, সংলগ্নতা ও সম্পর্ক নাই, তথায় তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনুচিত।

প্রসঙ্গ নারীনিগ্রহ, নারীর অধিকার

প্রাসঙ্গিক কথা

সংস্কার আন্দোলন মূলত নারীকেন্দ্রিক। সংস্কারকেরা পুরুষের দুঃখে নয়, নারীর দুঃখেই বিচলিত ছিলেন। তাঁদের চোখের সামনে মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু ছবি ঘোরাফরা করত। তার মধ্যে কোটি কোটি লাঞ্ছিত নির্যাতিত পুরুষের ছবি ছিল না। রামানন্দ নারীনিগ্রহের নানাদিক যথা নিষ্ঠুর পণপ্রথা, শিশুপত্নী হত্যা ও নারীর উপর অন্যবিধ অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। এইসঙ্গে তিনি নারীর অধিকার রক্ষার জন্য যেসব প্রচেষ্টা হয়েছিল, তাদের বিবরণ বিস্তৃত আকারে দিয়েছেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ, নির্মলনলিনী ঘোষ, সরলা দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতির মন্তব্য *প্রবাসী-তে* উৎকলিত হয়েছে। দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত নারীর সতীত্ব বিষয়ে মহাত্মা গান্ধির মন্তব্য রামানন্দকে বিস্মিত ও বিরক্ত করেছে। মহাত্মার অহিংসার বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর মতে নারীর সতীত্বনাশ হলে তাদের পক্ষে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। রামানন্দ বলেছেন: 'ইহার ন্যায্যতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যদি কোন একজনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে যিনি নারীরত্ন তাঁহাকেই করিতেই হইবে, এরূপ কেন মনে করিব?'' রামানন্দ অহিংসা শব্দটিকে ও বস্তুটিকে ফেটিশ (fetish)-এ পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং অত্যাচারী পুরুষের মৃত্যু ঘটলে সমাজের উপকার, এমনই মনে করতেন। তা ছাড়া অহিংসায় বিশ্বাসী নারীরা কেন অস্ত্র ব্যবহার শিখতে ও প্রয়োগ করতে পারবেন না, তা তাঁর বোধগম্য নয়। লেখাটি শেষ করেছেন এই বলে: "মহাত্মাজী যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সতী নারীর জীবন অপেক্ষা তাঁহার আততায়ী নরপশুর জীবনের মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।" ('সতীত্ব রক্ষার উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত', ১৩৪৫ মাঘ, *প্রবাসী)*।

নিগৃহীতা নারী

১৩২০ ফাল্গুন
[পণপ্রথার বলি]

একটি ১৪ বছরের মেয়ের একজন "শিক্ষিত" যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। ছেলের বাবা যে পণ চায়, মেয়ের বাবা তাহার সমস্তটা যোগাড় করিতে না পারিয়া শেষে নিজের বসতবাটীটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার বিবাহের জন্য পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহহারা হইতেছেন, এই চিন্তা বালিকাকে ব্যাকুল করে। সে বাপমাকে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্তি দিবার জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। নিষ্ঠুর সামাজিক রীতির যূপকাষ্ঠে এই যে নিরপরাধ উন্নতমনা পিতৃমাতৃভক্ত বালিকাটি আপনাকে বলি দিল, তাহাতেও কি আমাদের চেতনা হইবে না? অনেকে এই বলিয়া অহঙ্কার করেন যে অন্য অনেক জাতির বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, কিন্তু হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। হিন্দু বিবাহের মন্ত্র হইতে যে আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাতে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু অধুনা যেরূপ পণ লইয়া বিবাহ চলিতেছে, তাহা অতি তামসিক ও জঘন্য। ইহা একটা জাতীয় কলঙ্ক।

প্রতিকার যুবকদের হাতে। বিবাহ কি, প্রেম কি, পৌরুষ কি, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন। শুনিয়াছি, বঙ্গসাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত। তবে, বাঙ্গালী অনেক যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্থপিশাচ, কাপুরুষ কেন? অনেকে বলিবেন, তাহারা কি করিবে? এটা তাদের বাপ-মায়ের দোষ। আমরা বলি, এক দিকে যেমন ছেলের ধর্ম্মবুদ্ধির উপর হস্তক্ষেপ করা বাপমায়ের পক্ষে অকর্ত্তব্য, অপর দিকে তেমনি যুবকদেরও একমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বাপমাও যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তাহা করা উচিত নয়। কিন্তু বিদ্রোহী হইবার পূর্ব্বে ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহার প্রেরণায় পিতা মাতা বা অন্য গুরুজনের অবাধ্য হইতে যাইতেছেন, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধি, না প্রবৃত্তি, না খেয়াল।

যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হায়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপমাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি? বঙ্গের যুবকেরা নানা প্রকারে আপনাদের পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন। এই সামাজিক কুরীতির সহিত সংগ্রামেও তাঁহারা জয়ী হউন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

১৩২৩ শ্রাবণ

কেরোসিনের কৃপা।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীদের মত ভাল জাতি আর নাই, এবং আমরা বাঙালীরা আবার ভারতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ভারতবাসীরা কোন গুণেই শ্রেষ্ঠ নহে, কিম্বা বাঙালীরা কোন বিষয়েই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অগ্রণী নহে, ইহা আমাদের মত নয়। আমাদের কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। কিন্তু আমাদের অহঙ্কার আমাদিগকে আমাদের দোষের প্রতি যে অন্ধ করিয়া রাখে, ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, ও দুঃখের বিষয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেই অনেক নারী কেরোসিন তেলে পরিধানের কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাতে কি আমাদের কোন দোষ নাই? আমরা কি এই-সব নারীহত্যার জন্য দায়ী নহি? পুড়িয়া মরাটা একটা সুখের ব্যাপার নয়, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। কোন পুরুষের যদি সন্দেহ হয় তিনি ধুতিতে পিরানে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন ; অন্ততঃ উনানের আগুনে বা প্রদীপের শিখায় একটা আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া দেখিতে পারেন। জীবন নিতান্ত অসহ্য না হইলে মানুষ পুড়িয়া মরে না।

কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে ২। ৪ টা মেয়ে মরিল, তাহাতে কিবা আসিয়া যায়? জীবনটাকে এত তুছ মনে করা, ইহাই যে ভীষণ ব্যাধি, আর, ২। ৪ টা যে মরে, সে-ত কেবল রোগের বাহ্যলক্ষণ মাত্র। সমাজ যে পচিতেছে, ইহা তাহারই চিহ্ন। বহুমূত্র রোগীর শরীরের কোন একটা জায়গায় একটা দুষ্ট ব্রণ হইলেই সুচিকিৎসক বুঝেন, যে রোগীর শরীরের রক্ত দূষিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ করেন ; তিনি সমস্ত শরীরটা পচিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন না।

যাহারা এইরূপে আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা প্রায়ই অল্পবয়স্কা। সম্প্রতি কেবল একটি ৪০ বর্ষবয়স্কা মহিলার আগুনে পুড়িয়া মরার খবর কাগজে বাহির হইয়াছে। বালিকাদের জীবন আনন্দে আশায় পূর্ণ হইবারই কথা ; মানুষের বয়স বাড়িলে তবে দুঃখে নৈরাশ্যে জীবন একান্ত দুর্বিষহ বোধ হইবার কথা। বালিকা বা তরুণীরা যে আত্মহত্যা করে, তাহার কেবল দুটি কারণ থাকিতে পারে। তাহাদের অল্পবয়সে বিবাহ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মন কেমন করে ; নূতন জায়গায় মন বসে না, মনটা পালাই-পালাই করে। বালিকারা শ্বশুরবাড়ী গেলে পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সঙ্গীদের বিরহে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া থাকে। অনেক শ্বাশুড়ী ননদ ও স্বামী এসব কথা ভুলিয়া যায়। শ্বাশুড়ীর নিজের মেয়েটির উপর টান থাকে, কিন্তু বধূরূপিণী অন্য বাড়ীর মেয়েটিও যে তেমনি একটি স্নেহের পাত্রী বালিকা, তাহা অনেক শ্বাশুড়ীর মনে স্থান পায় না। বরং বধূর বাপমায়ের সত্য বা কল্পিত (অধিকাংশস্থলেই কল্পিত) যত দোষত্রুটি বধূ বেচারীর নানা গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও শাস্তির কারণ হয়। তাহার উপর অনেকস্থলে অপূর্ণদেহা স্ত্রীর

উপর স্বামীর অত্যাচার আছে। এই-সমস্ত কারণে অনেক বালিকা বধূ বড় দুঃখিনী। শিক্ষা পাইলে এবং মুক্ত বাতাসে নানা কাজের মধ্যে বড় হইলে, মানুষের মন শক্ত হয়, দুঃখ সহ্য করিতে পারে। সংসারটা যে কত বড় জায়গা, জীবন যে কিরূপ অমূল্য জিনিষ ও কত বৈচিত্র্যপূর্ণ হইতে পারে, তাহা জানা থাকিলে, কোন না কোন উপায়ে দুঃখমুক্তির আশা থাকে, এবং এই আশা মানুষকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু বঙ্গের অনেক গৃহে বালিকাবধূরা উৎপীড়িত হয়, জীবন আঁধার দেখে, আশার আলোকের একটি কিরণও তাহাদের চোখে পড়েনা তাহাদের মনও এমন শক্ত নয় যে দুঃখ সহিতে পারে। সুতরাং তাহারা কেরোসিনের শরণ লয়।

শৈশবে ও বাল্যে বিবাহ বন্ধ করা আরো নানা কারণে উচিত। তাহার উপর বালিকাদের আত্মহত্যা নিবারণের জন্য এপ্রথা উঠাইয়া দেওা অবশ্য কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্তযৌবনা বধূর শ্বশুরালয়ে যাওা ত এখনও উঠাইয়া দেওা কর্ত্তব্য ; ইহাকে একটা গুরুতর সামাজিক নিন্দার কারণ বলিয়া গণ্য করা উচিত। তাহার পর শিক্ষা দ্বারা মেয়েদের মনটাকে সবল প্রশস্ত করা চাই তাহা হইলে তাহারা সামান্য বা গুরুতর কারণে আত্মহত্যাই একমাত্র গতি মনে করিবে না। ভাল বই পড়িতে পারিলে মানুষ অনেক দুঃখদৈন্যে সান্ত্বনা পায়, ও তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিলেও দুঃখিনীদের মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদিগকে নিজেদের ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে সমর্থ করে, এবং জীবনের যে অন্ততঃ একটা সার্থকতা আছে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে।

শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ। বাঙালী অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে হিষ্টীরিয়া রোগের এত প্রাদুর্ভাবের একটি কারণ এই যে তাঁহাদের মুক্ত বাতাসে চলাফিরা কাজ করার সুযোগ না থাকায় শরীর সুস্থ সবল নয় স্নায়ুমণ্ডল (nervous system) প্রকৃতিস্থ নয়। একটু কষ্ট হইলেই, একটু বিরক্তির কারণ হইলেই অনেকেই মূর্চ্ছা যান, অজ্ঞান অবস্থায় হাত পা ছুড়িতে থাকেন। ক্লেশ অবসাদ ও বিরক্তি সহ্য করিবার এই যে অক্ষমতা, ইহা আত্মহত্যারও কারণ। সেইজন্য মেয়েদের মুক্ত বাতাসে চলিবার ফিরিবার কাজ করিবার সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশিয়া চিত্তবিনোদন করিবার সুযোগ করিয়া দেওা একান্ত আবশ্যক। নারীদের যতটুকু স্বাধীনতা মহারাষ্ট্রে পঞ্জাবে ও অন্য কোন-কোন প্রদেশে আছে, তাহা বাঙালীর মেয়েদিগকে কেন যে দেওা হয় না, বুঝিতে পারি না। তাহাদের স্বভাব চরিত্র ঐ-সব প্রদেশের নারীদের চেয়ে নিকৃষ্ট, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে কি ইহাই বলিতে হইবে, যে, বাঙালী পুরুষেরা ঐ-সব প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে এত দুর্বৃত্ত যে বাঙালীর মেয়ে রাস্তা ঘাটে বাহির হইলেই তাহাদের লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বেশী? কিম্বা বাঙালী পুরুষেরা ঐ-সব প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে এত কাপুরুষ ও ভীরু যে তাহারা নারীদিগকে পথে ঘাটে মাঠে লাঞ্ছনা ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না? এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি? নারীদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের একটা বাধা দেশাচার। কিন্তু তাহাও দার্জিলিং, কার্সিয়ং, মধুপুর গিরিডি, বৈদ্যনাথে ভাঙিয়া গিয়াছে। ঐসব জায়গায় ভদ্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন। নারীদের মঙ্গলের জন্য, দেশের কল্যাণের নিমিত্ত, নারীদিগকে আকাশ, মাঠ, ঘাট,

নদী, মানুষের মুখ, প্রকৃতির নানা রূপ দেখিতে দেওা হউক। যাঁহাদের গাড়ী জুড়ী মোটর আছে, তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরাই পথ দেখান। তাঁহাদের পক্ষে ইহা করা সোজা ; কারণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা পায়ে হাঁটিতেছেন। যাঁহাদের পয়সা নাই, গাড়ী খঘো নাই, তাঁহারাই বা এরূপ নিন্দা গ্রাহ্য করিবেন কেন? ভগবান হাঁটিবার জন্য পা দিয়াছেন। টাকা আছে বলিয়া, কিম্বা দারিদ্র্য গোপন করিবার জন্য, পা দুখানার ব্যবহার না করিয়া অসুস্থ হইব ও দুর্ব্বল থাকিব, ইহার মত অদ্ভুত বোকামি আর কি হইতে পারে?

১৩২৯ পৌষ

বরপণ ও কন্যার স্ত্রীধন

যাহারা ছেলের বিবাহে পণ আদায় করে এবং যে ছেলেরা নিজে তাহার সমর্থন করে, বা নিজেও দাবী করে, কিম্বা এরূপ দাবীতে বাধা না দেয়, তাহাদিগকে মশা, ছারপোকা ও জোঁক বলিলে তাহাদিগকে গালি দেওয়া হয় না, বরং সম্মানই করা হয়। কারণ মশা, ছারপোকা ও জোঁক যে রক্ত শোষণ করে, তাহা তাহাদের স্বভাব, তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার শক্তি ও স্বাধীন বুদ্ধি তাহাদের নাই। কিন্তু মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তি আছে, ভালমন্দ জ্ঞান আছে, ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। তাহা সত্ত্বেও মানুষ যদি নিকৃষ্ট প্রাণীর মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা নীচ হইয়া যায়। কারণ, মশা প্রভৃতি যাহা করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে জীবনযাপন করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই বলিয়াই করে, তজ্জন্য তাহারা দোষী নয়। কিন্তু মানুষ যদি মশা, ছারপোকা ও জোঁকের মত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই ঐ সকল জীব অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় হইয়া যায়।

এইজন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বরপণ আদায়ের সমর্থন কোন-মতেই করা যায় না।

নরনারীর প্রেমেরই পরিণতি দাম্পত্য সম্বন্ধ। সেই প্রেমের রীতিই এই, যে, পুরুষ নিজের পুরুষকার ও প্রেমের দ্বারা নারীর হৃদয় জয় করিবে। তাহার পরিবর্ত্তে যদি কোন পুরুষ বা তাহার জন্য অন্য কেহ নারীর পক্ষ হইতে খোসামোদ সাধ্যসাধনা ও মূল্য চায়, সে ব্যক্তি কাপুরুষ ও নীচাশয়।

এই দিক্ দিয়াও বরপণ-প্রথা অতীব নিন্দনীয়।

কিন্তু বরপণ যেমন নিন্দনীয়, কন্যার পিতার পক্ষে কন্যাকে আত্মনির্ভরে অসমর্থ রাখাও তেমনি অতিশয় গর্হিত আচরণ। আমাদেব দেশে সচরাচর কন্যাদিগকে অশিক্ষিত রাখা হয়। কৃষক প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের বাড়ীর মেয়েরা তাহাদের কৌলিক কাজে সহায়তা করে, এবং বাড়ীর বাহিরে গিয়াও রোজ্‌গার করে। অবশ্য শিক্ষা তাহাদের জন্যও প্রয়োজন, যদিও শিক্ষা না পাইলেও তাহারা কিছু অর্থাগমের কাজ করে। যে-সকল শ্রেণীর

লোকেরা মাঠে বা অন্যত্র শারীরিক শ্রমের কাজ করে না, তাহাদের কন্যাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন চিরকালই ছিল, এখনও আছে। অধিকন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দুবালিকাদের শিক্ষার জন্য যে-সব বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহার কর্তৃপক্ষেরা হিন্দু শিক্ষয়িত্রী পাইলে ব্রাহ্ম চান না, ব্রাহ্ম পাইলে খৃষ্টিয়ান্ চান না। সুতরাং যদি হিন্দু বালিকারা শিক্ষিতা হন, তাহা লইলে তাঁহাদের বিবাহ হইতেছে না বলিয়া পিতামাতাকে ঘোর বিপন্ন ও উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, পিতামাতাকে নিরুদ্বেগ করিবার জন্য কোন কন্যার স্নেহলতা হইতেও হয় না। কিন্তু পিতার অবস্থা ভাল হইলেও অধিকাংশ স্থলে তিনি শিক্ষার জন্য যত কিছু ব্যয় তাহার পুত্রের নিমিত্তই করেন, কন্যার জন্য করেন না ; করিলেও পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ের তুলনায় সামান্যই করেন। এরূপ স্থলে, ন্যায় অনুসারে, পিতা যখন কন্যার বিবাহ দেন, তখন শিক্ষার ব্যয়ের সমান মূল্যের সম্পত্তি তাহাকে লেখাপড়া করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভ্রম-নিবারণের জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যে, সম্পত্তি কন্যার স্ত্রীধনরূপে তাহাকেই দিতে হইবে, জামাতাকে বা বৈবাহিককে নহে। যে সঙ্গতিপন্ন পিতা কন্যাকে সুশিক্ষিত করিবে না, অথচ কন্যাকে স্বেচ্ছায় স্ত্রী ধনও দিবে না, তাহার গলায় গামছা দিয়া বৈবাহিক যদি খুব টাকা আদায় করে, তাহা হইলে বৈবাহিকের ব্যবহারে নিন্দা করিব বটে, কিন্তু ইহাও বলিব, যে, কর্ত্তব্যবিমুখ পিতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

অনেক সঙ্গতিপন্ন পিতা জামাতাকে নিজব্যয়ে শিক্ষা দিয়া চাকরী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, প্রভৃতি কাজের যোগ্য করিয়া তুলেন। ইহাতেও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য ঠিক্ করা হয় না। সকলের চেয়ে বড় সম্পত্তি তাহা যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না এবং যাহা মানুষকে আত্মনির্ভরক্ষম করে। নারীর পক্ষে সাধারণ বিদ্যা ও পরা বিদ্যা এবং নানাবিধ কারুকার্য্য এই শ্রেণীর সম্পত্তি। টাকা কড়ি জমি জায়গা যদি দিতে হয়, কন্যাকেই তাহার স্ত্রীধনরূপে দেওয়া উচিত, এবং তাহার উপর তাহাকে শিক্ষাও দেওয়া উচিত। শিক্ষা পাইলে স্ত্রীধন রক্ষার ক্ষমতাও বাড়ে। অধিকন্তু কেহ যদি জামাতার শিক্ষার ব্যয় দিতে চান, দিতে পারেন। কিন্তু শ্বশুরের ব্যয়ে শিক্ষালাভ করায় কাহারও গৌরব বা পুরুষকার বাড়ে না, কন্যার মনেও স্বামীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্ভব না হইতে পারে।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল নয়, তাঁহাদের পক্ষে কন্যাকে সুশিক্ষিত করা আরো দর্কার। সুশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ যতদিন না হয়, ততদিন তিনি আত্মনির্ভরক্ষম হইয়া থাকিতে পারেন ; যদি কখনও বিবাহ না হয় তাহা হইলেও তাঁহাকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতে হয় না। শিক্ষিতঅশিক্ষিত পুরুষ-নারী সকলের পক্ষেই বিবাহ স্বাভাবিক ও শ্রেয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহিত হওয়া কল্যাণকর নহে।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে, তাঁহাদের কন্যাদিগকেও সুশিক্ষিত করা উচিত বলায় অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করেন, যে, পুত্রদের শিক্ষা দেওয়াই কঠিন, তাহার উপর কন্যাদের শিক্ষা দিতে বলিলে বোঝাটা দুর্বহ হইবে, কিন্তু "কন্যাদায়" নামক জিনিষটি অপেক্ষা কি ইহা দুর্বহ হইবে? "কন্যাদায়"-গ্রস্ত পিতাকে যে উদ্বেগ ও অপমান সহ্য করিতে হয়, কন্যাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টাতে অন্ততঃ সে উদ্বেগ ও অপমান নাই। "কন্যাদায়" কথাটার মধ্যেই মাতৃজাতির প্রতি এমন একটা অপমান নিহিত

রহিয়াছে, যাহাতে সমাজের মাথা হেঁট হওয়া উচিত। গরীব পিতামাতাও যে কন্যাকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক গরীব ব্রাহ্ম দেখাইয়াছেন, এবং কাহার ও কাহারাও শিক্ষিতা কন্যা বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের ভরণপোষণেরও সহায় হইয়াছেন।

"কন্যাদায়গ্রস্ত" পিতা ঋণ বা ভিক্ষা করিয়া যদি "বিপদ্" হইতে উদ্ধার পান, তাহার দ্বারা সামাজিক কুপ্রথা এবং মাতৃজাতির অপমানের সমর্থন করা হয় ; এবং নিজেকেও অপমানিত হইতে হয়। পুত্রের শিক্ষার জন্য অনেকে ঋণ করেন বা অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। কন্যার জন্যও তাহা করিলে "কন্যাদায়" হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ঋণ বা ভিক্ষা করার মত অগৌরব তাহাতে থাকিবে না, এবং তাহার দ্বারা কোন সামাজিক কুপ্রথার সমর্থনও করা হইবে না। অধিকন্তু অসময়ে ইহা কাজে লাগিতেও পারে ; কারণ কন্যাদের পিতৃমাতৃভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পুত্রদের চেয়ে কম নহে।

বরেরা যতদিন কাপুরুষ ও "নীচাশয়" থাকিবে, বরপণ ততদিন থাকিবে। কন্যারা যত দিন অশিক্ষিতা ও আত্মনির্ভরে অসমর্থা থাকিবেন, বরপণ ততদিন থাকিবে। কন্যারা সুশিক্ষিতা ও তাহার ফলে আত্মনির্ভরসমর্থা ও তেজস্বিনী হইলে বরেরা শায়েস্তা হইবে, এবং তাহাদের কাপুরুষতা লজ্জা পাইবে। কন্যাদের সুশিক্ষা ভিন্ন বরপণ-প্রথা বিনষ্ট হইবে না।

মা-লক্ষ্মীরা সুশিক্ষিতা হইয়া সমাজের ভূষণ হউন। "কন্যাদায়" কথাটা বাংলা-ভাষার অভিধানে অপ্রচলিত শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত হউক। পিতামাতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য আত্মহত্যা কেন শেষ অবলম্বন হইবে?

দেশ-বিদেশের কথা

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

বাংলায় নারী নির্য্যাতন

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন বাড়িয়াই চলিয়াছে। নির্য্যাতনকারী দুর্ব্বৃত্ত-দল কিরূপ বে-পরোয়াভাবে তাহাদের অত্যাচার চালাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি হইতেই বুঝা যাইবে। এই সংবাদটি পড়িলে মনে হয় দেশ সম্পূর্ণভাবে অরাজক হইয়াছে—

রংপুর জেলার তিস্তার দরবারু মাঝি তাহার স্ত্রী স্বর্ণদাসী ও একটি নাবালিকা কন্যাসহ দুইটি ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। দুর্ব্বৃত্তগণ স্বর্ণদাসীর উপর অত্যাচার করিবে এই আশঙ্কায় গ্রামস্থ হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীগণ দরবারু মাঝিকে তাহার স্ত্রী স্বর্ণদাসীকে উপযুক্ত আশ্রয় স্থানে রাখিবার পরামর্শ দেয়। তদনুসারে সে তাহার স্ত্রীকে কাউনিয়ার খেতা মাঝির বাড়ীতে রাখিয়া আসে। দুর্ব্বৃত্তগণ ১৫। ২০ জন রাত্রিতে গিয়া উক্ত খেতা মাঝির বাড়ী চড়াও করে। গৃহস্বামী ও অন্যান্যকে আহত করিয়া স্বর্ণদাসীকে স্কন্ধে করিয়া তিস্তানদীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল রেলওয়ে পার হইয়া ৩। ৪ দিন বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। কাউনিয়ার সর্‌কারী দারোগা অতিকষ্টে স্বর্ণদাসীকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তিস্তার শুটকি বন্দর হইতে উদ্ধার করেন। রংপুরে ডাক্তারী পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পর আশ্রয়দাতা খেতা মাঝির বাড়ীর দরজা বাঁধিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ পোড়াইয়া দিয়াছে। স্বর্ণদাসী ও খেতা মাঝি

বর্ত্তমানে গৃহহারা ও পথের ভিখারী। দুর্ব্বৃত্তগণ আরও বলিতেছে যে, স্বর্ণদাসী ও তাহার আশ্রয়-দাতা খেতা মাঝিকে যে-কেহ, যে-কোনোপ্রকারে সাহায্য করিবে তাহারও গৃহদগ্ধ ও সর্ব্বনাশ করিবে। কয়েকজন আসামী-গণের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে। নির্য্যাতিতা স্বর্ণদাসী ৮। ১০ জনের নাম করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে।

স্বাঃ—শ্রী খড়্গনারায়ণ দেবশর্ম্মা, সম্পাদক কুড়িগ্রাম, ক্ষত্রিয় শাখা-সমিতি ও নারীরক্ষাসমিতি।

যশোহর, ২৪ পরগণা, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি নানা জেলা হইতেও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারের কথা দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও নারীনির্য্যাতনের ভয়াবহ কাহিনী পাঠ করিলে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্তেরা, কোনো-কোনোস্থলে গ্রামের জমিদারেরাও ইহাদের সহায়ক, নারীহরণ করিয়া গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ঘুরাইয়া, এক বাড়ী হইতে গ্রামান্তরে অপর বাড়ীতে ফিরিয়া নির্ভীক ও নির্লজ্জভাবে সমাজের বুকের উপর ব্যভিচার করিতেছে।

১৩৩২ আষাঢ়

শিশুপত্নী-হত্যা

কলিকাতার শাঁখারিটোলার এক ময়রার আট বৎসরের একটি মেয়েকে যোগেন্দ্রনাথ খাঁ বিবাহ করে। দু-বৎসর পরে মেয়েটি যখন দশ বৎসরের, তখন যোগেন্দ্র উহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসে। ভালো দিন ছিল না বলিয়া যোগেন্দ্রের শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে পাঁচ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলে। শিশু মেয়েটি দুই রাত্রি স্বামীর কামরায় থাকিয়া তৃতীয় রাত্রিতে কোন মতেই তথায় যাইতে চায় নাই। তাহার মা যোগেন্দ্রকে পান দিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করায়, লোকটা দরজা বন্ধ করে। কতক্ষণ পরে একটা গোঁগানি শব্দ শোনা যায়। দরজা খুলাইবার পর দেখা গেল, মেয়েটি উবুড় হইয়া রক্তাক্ত দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে ;—তাহার মাথা নোড়া দিয়া ছেঁচিয়া ভাঙিয়া ফেলায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি কেন স্বামীর ঘরে শুইতে চায় নাই, কেনই বা তাহার স্বামী তাহাকে মারিয়া ফেলিল, তাহা বলা অনাবশ্যক।

আদালতের বিচারে যোগেন্দ্রের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। নিহত শিশু-বালিকাটির পিতা মাতার কোন শাস্তি হয় নাই। অনেকটা দেশাচার ও লোকাচারের দোষেও শিশুটির প্রাণ গিয়াছে বলিয়া সমাজেরও শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু সমাজকে শাস্তি দিবার ত কোন উপায় নাই। তাহা হইলেও দেশের ধার্ম্মিকতম ও মহত্তম লোকেরাও অনুভব করিবেন, যে, তাঁহারা এবং দেশের অন্যসব লোকেরা—সকলেই—এইরূপ ঘটনার জন্য অল্পাধিক-পরিমাণে দায়ী। কারণ মহৎ লোকেরা ও আমরা সাধারণ লোকেরা, যে দেশাচার ও লোকাচার, যে বাল্যবিবাহ প্রথা, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে ধারণা, স্ত্রীদের উপর স্বামীদের "অধিকার"-সম্বন্ধে যে ধারণা, এবং স্ত্রীলোকদের যে হীন অসহায় অবস্থা দেশে বিদ্যমান থাকায় এরূপ হৃদয়বিদারী, অরুন্তুদ,

লজ্জাকর, নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের উচ্ছেদসাধনার্থ যথোচিত চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। অতএব অপরাধ ও লজ্জা আমাদের সকলেরই।

যাঁহারা গোঁড়ামির ভয়ে বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইতে চায় না, তাহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ বালিকা বধূদের যন্ত্রণা, অপঘাত-মৃত্যু, আত্মহত্যা ও অকাল-মৃত্যু বন্ধ হইয়া যাইবে বা কমিবে, আমাদের এমন কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে, যে, বয়স বাড়াইয়া দিলে অনতিবিলম্বে বিবাহের বয়সও বাড়িবে, এবং অতি অল্পবয়স্কা নববধূর পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয় বা স্বামীর শয়নকক্ষ-গমনে কিছু বাধা জন্মিবে। তাহার পিতামাতা তাহাকে বিলম্বে পাঠাইবার একটা খুব ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও প্রকাশ্য কারণ দেখাইতে পারিবে। এইজন্য, যখন সম্মতির বয়সসম্বন্ধীয় বিল আবার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইবে, তখন গোঁড়ারা বাধা না দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।

যোগেন্দ্র যাহা করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত বিশেষণ অভিধানে নাই। পশুরা এরূপ কাজ করে না ; পিশাচ আছে কি না জানি না, থাকিলেও তাহারা এমন কাজ করে বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং পাশব ও পৈশাচিক উপযুক্ত বিশেষণ নহে। যাহা হউক, উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ওরূপ নরাধমের কাজ আর কাহারও দ্বারা না হয়, দেশে সেইরূপ অবস্থা আনয়নের চেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের করাই বিধেয়। হইতে পারে যে, ঠিক এইরূপ ঘটনা বিরল কিম্বা এই একবার মাত্র প্রথম ঘটিল। কিন্তু দুই-এক মিনিটে বালিকাপত্নী হত্যাই হত্যার একমাত্র প্রকার নহে ; হত্যা আরও অনেক-রকমে হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাও ঠিক্, যে, যত বালিকা বধূ বালিকা মাতার মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশ মৃত্যু কেহ জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘটায় না ; কিন্তু অকাল মৃত্যু যে-প্রকারেই ঘটুক, তাহা শোচনীয় ; তাহা মৃতের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় এবং তাহা সমাজের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় ও ক্ষতিকর।

যত বালিকা ও তরুণীর কাপড়ে আগুন লাগাইয়া বা অন্যপ্রকারে আত্মহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হয়, তাহা কোন-কোনটি আত্মহত্যা নহে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্য-সত্য আত্মহত্যা যাহারা করে, তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর পশ্চাতে যেসব দুঃখের কথা থাকে, তাহা সব সময় প্রকাশ পায় না। আমরা অনেকবার বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, যে, পাশ্চাত্য দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে বেশী, স্ত্রীলোকদের মধ্যে কম ; আমাদের দেশে ঠিক্ তাহার বিপরীত। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য এরূপ নহে, যে, বাঙালী পুরুষেরা আরও বেশী-করিয়া আত্মহত্যা করিয়া এ-বিষয়ে নারীদিগকে পরাস্ত করুক। উদ্দেশ্য এই, যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ ও ব্যবস্থার উন্নতি হইয়া স্ত্রীলোকদের জীবন এরূপ আনন্দময় হউক, যে, তাঁহাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি লোপ বা খুব বেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হউক।

সংবাদপত্রে অহরহ পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ পড়িয়া মন দুঃখে লজ্জায় আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার উপর গৃহাভ্যন্তরে নারীর দুঃখময় জীবনের কথা ভাবিলে, প্রতিকারের উপায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা কঠিন হইয়া উঠে। বঙ্গে নারীজীবনের কথা ভাবিয়া পুনর্জ্জন্মবিশ্বাসী কাহারও আর এ-ইচ্ছা হয় না, যে, যিনি একবার এদেশে নারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার

তিনি নারী হইয়া এই দেশেই জন্মগ্রহণ করুন ; —এ-জন্মে যে অল্পসংখ্যক বাঙালী মহিলা সৌভাগ্যবতী ছিলেন, ইহার পরের জন্মে তাঁহাদের যদি সে-সৌভাগ্য না ঘটে! যাঁহারা এ-জন্মে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আবার বাঙালীর মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করুন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কেহই এ-কামনা করিবেন না।

বাংলা দেশে নারীজন্মের দুঃখের জন্য আমরা আপনাদিগকেই প্রধানতঃ দোষী করিতেছি। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্টকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিতে পারি না। নারীদের শিক্ষার জন্য যাহা করা উচিত, গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহার অতি সামান্য অংশই করিয়াছেন। সামাজিক যে-যে কুপ্রথার জন্য নারীদের দুর্দ্দশা হয়, তাহার বিলোপ সাধনের জন্য কিম্বা তাহার অনিষ্টকারিতা কমাইবার জন্য গবর্ণ্মেন্ট্কে আজকাল উদ্যোগী ত দেখা যাইতেছেই না, বরং সম্মতির বয়স-সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনার সময় সর্কারী সভ্যদের প্রতিকূলতায় নারীহিতৈষীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। একথা বলিবার জো নাই, যে, গবর্ণ্মেন্ট্ সামাজিক বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন করিয়া এবং আরও অনেক আইন করিয়া গবর্ণ্মেন্ট্ একসময় সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার গবর্ণ্মেন্ট্ সম্মতির বয়স বাড়াইয়া দিয়া ন্যূনকল্পে চৌদ্দ করিয়া দিলে দেশের মঙ্গল হইবে! এরূপ আইন করিলে দেশে কোন বিদ্রোহ যা বিপ্লবের আয়োজন কেহ করিবে না, জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। বস্তুত সম্মতি-আইনের সংশোধন-চেষ্টা বেসর্কারী সভ্যদের পক্ষ হইতে হইয়াছিল ও হইবে। গবর্ণ্মেন্ট্ এ-বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেই ত নারীহিতৈষীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাহাতে গবর্ণ্মেন্ট্কে দোষ দিবার কোন কারণ থাকিবে না।

১৩৩২ অগ্রহায়ণ

নারীর উপর অত্যাচার

নারীর উপর অত্যাচার কেবল যে বঙ্গের—প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের—পল্লীগ্রাম অঞ্চলে হইতেছে তাহা নহে, দিন-দুপরে কলিকাতা সহরেও হইতেছে। এই অবস্থা যেমন লজ্জাকর, তেমনি শোচনীয়। সেদিন প্রমথনাথ হালদার নামক এক ভদ্রলোকের পনর বৎসর বয়স্কা কন্যাকে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা তাহার পিতাকে জখম করিয়া রাস্তা হইতে গাড়ী করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। গুণ্ডাদের সহায়ক বলিয়া অভিযুক্ত এক পশ্চিমা স্ত্রীলোক ও একজন মিঠাইয়ের দোকান-ওয়ালা ধৃত হইয়াছে। একজন মুসলমান রিক্‌শা-ওয়ালা (মানুষ-টানা-গাড়ীওয়ালা) ও তাহার তিন সহচর আরোহী একজন ভদ্রমহিলাকে বলাৎকার করার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছে।

মফঃস্বলের ও কলিকাতার ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের জানা উচিত, যে, সকল সম্প্রদায়ের সব রিক্‌শা-ওয়ালা সৎ ও বিশ্বাস- যোগ্য নহে। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে মহিলারা যেন চেনা লোক দেখিয়া তবে তাহাদের যানে আরোহণ করেন।

১৩৩২ পৌষ

সুহাসিনীর মৃত্যু

রংপুর জেলার গাইবাঁধায় যে সুহাসিনীর উপর অত্যাচারের কাহিনী অনেক বার সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, যাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগের একটা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বোধ করি এখনও হয় নাই, সেই সুহাসিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের লোকেরা, সমাজের লোকেরা, দেশের লোকেরা, গবর্মেণ্ট তাহাকে যে শাস্তি দেয় নাই, দিতে পারে নাই, সেই শান্তি এখন সে পাইয়াছে। সে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে নারীরক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

বিশেষ সমাচারপূর্ব্বক নিবেদন এই, যে পিতা ভগবান আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ্য আপনারাই ; এবং আপনারা যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। এখানে আসার পরে শ্বশুরের কাজ গিয়াছে। তাঁহাকে একঘরে করেছে, এবং এইরূপ হয়েছে, যে, জীবনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা হাতে না খেয়েই এই ; খেলে কি হত জানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আমার মত হতভাগিনী দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। এখন এমন অবস্থা, ইঁহাদের না খেয়ে মরিবার উপক্রম। *** আমার সংসারে একতিল শান্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা এই, যে, কোন আশ্রমে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিই। ইহা আমার মনের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। ইহাতে আমার স্বামীরও অমত হইবে না। যদি ভাল বোঝেন, আমার স্বামীর দ্বারা কিম্বা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। *** বাচালতার জন্য ক্ষমা চাই। পত্র-পাঠ আপনার অভিমত বা জানাইবেন।

ইতি—সুহাসিনী

সুহাসিনীকে একাধিকবার হরণ করিয়া লইয়া দুর্বৃত্তেরা তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ; সুহাসিনী বার-বার পলাইয়া আসিয়াছিল। দুবৃত্তেরা তাহাকে প্রহার করিয়া, হাতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া, দাঁত ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া,—নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া—তাহাকে সতীত্ব ও পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে বার-বার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তা, সাহস, মানসিক শক্তি ও সতীত্বনিষ্ঠা সহকারে এই বালিকা নিজের দেহ-মন-আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। তাহার উপর দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের নানা চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরে ছিল। সে সাধারণ শিক্ষাও বিশেষ কিছু পায় নাই ; শিক্ষা, সদুপদেশ, দেহমনের পূর্ণবিকাশ, অন্তঃপুরের বাহিরের জগতের অভিজ্ঞতা, কোন সুবিধাই তাহার হয় নাই ; বাল্যকালেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তথাপি সতী ও বীরাঙ্গনাদিগের মধ্যে তাহার সম্মানিত অতি উচ্চ আসন চিরকাল প্রতিষ্ঠিত

থাকিবে ; পবিত্রতার ও আদর্শনিষ্ঠার পূজা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন এই বালিকা সহৃদয় ন্যায়বান্ লোকদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবে।

কিন্তু ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, সভ্যতাভিমানী বাংলাদেশে, সুহাসিনীর উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা হইয়াছিল, এবং পুনরায় অন্য কোন বালিকার উপর হইতে পারে ; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, কল্পিত বা অংশত সত্য রাজনৈতিক বিপ্লবচেষ্টা দমনের জন্য গবর্মেণ্ট্ ভয়বিহ্বলচিত্তে নানা অঘটন ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু বালিকাদের উপর নারীদের উপর পাশব অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার দমনের ও নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট বিশেষ কোন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করা উচিত মনে করেন নাই ; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, দেশের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দল নারীনিগ্রহ সমস্যার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ মনস্তাপ ও লজ্জার বিষয় এই, যে, যে-বালিকা তাহার সতীত্ব, দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য সর্ব্বত্র পরম-প্রীতি ও সম্মানের পাত্রী হইবার যোগ্য ছিল, তাহার ও তাহার স্বামী ও পরিজনবর্গের সামাজিক নিগ্রহ হইয়াছিল, এবং নানা-প্রকার নির্য্যাতন নিগ্রহ ও সামাজিক লাঞ্ছনার ফলে ভগ্ন-দেহে ভগ্ন হৃদয়ে মূর্চ্ছাদি রোগে ক্লিষ্টা তাহার অকালে মৃত্যু হইয়াছে। যে সামাজিক ব্যবস্থা, মুসলমান-সংশ্রব তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটা সত্ত্বেও, তাহার মত মহীয়সী নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিল, তাহা অতি ঘৃণিত ও লজ্জাকর। যাহারা তাহার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গস্বরূপ তাহার স্বামী ও (জ্যেষ্ঠতাত) শ্বশুরকে ভোজ দিতে বাধ্য করিয়া ছিল, তাহারা অতি অধম নীচ হৃদয়হীন ও নির্লজ্জ। যে সামাজিক প্রথা অনুসারে ইহার পরেও সুহাসিনীর হাতের অন্নজল, সমাজের লোকে দূরে থাক্, তাহার পরিবারস্থ লোকেরাও গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই, তাহা অতি ঘৃণ্য ও পৈশাচিক। একদিকে সুহাসিনীর দৃঢ়তা, সাহস ও সতীত্ব যেমন বঙ্গ নারীকুলের চিরগৌরবের ও চির আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে, অন্য দিকে তেম্‌নি সমাজের লোকের হৃদয়হীনতা, ন্যায়বুদ্ধির অভাব ও কাপুরুষতা আমাদিগকে চিরকাল কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। কাপুরুষ, হৃদয়হীন, অন্যায়কারী আমরা আত্মসংশোধন ও সমাজ-সংশোধন করিয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে না পারিলে কখনও স্বাধীন হইতে পারিব না ; রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিদেশীর অনধীনতা কোন-প্রকারে ঘটিলেও মানুষ হইতে পারিব না।

১৩৩৫ ফাল্গুন

বঙ্গে নারী-নিগ্রহ

বাংলা দেশে নারীর উপর অত্যাচার খুব বেশী হয়। বাংলা গবর্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অত্যাচার দমনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়া সরকারপক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হয়, যে প্রতিকারের বিশেষ কোন

ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের নাই। অবশ্য, সেরূপ অভিপ্রায় না থাকিবার কোন রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারে। তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, কিন্তু ঠিক্ কিছু বলা যায় না।

এই লজ্জাকর ও জঘন্য অবস্থাকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আর একটা কারণে পরিণত করিতে আমরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সেইজন্য বঙ্গের কোন কোন হিন্দু সংবাদপত্রের মুসলমানদের কৃত এইরূপ দৌরাত্ম্যের উপর বেশী জোর দেওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি, যদিও সংখ্যা দ্বারা সঞ্জীবনীতে ইহা সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখান হইয়াছে, যে, মুসলমান-নামধারী দুর্বৃত্ত লোকেরাই বেশী পরিমাণে এইরূপ কাজ করে। অন্যদিকে দু' একজন অভিযুক্ত, মুসলমান বিচারে খালাস পাইলে তাহা হইতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব বা অধিকাংশ অভিযোগ মিথ্যা, অনেক মুসলমান কাগজের এইরূপ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টাও অসঙ্গত ও অনুচিত মনে করি। সকল ধর্ম্মের ও জাতির নারীদের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষিত হওয়া চাই, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দুর্বৃত্তের শাস্তি দ্বারা চরিত্র-সংশোধন আবশ্যক।

নারীরক্ষা

১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

নারীরক্ষা-সমিতি

বঙ্গের নানাস্থান হইতে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে, নারীর উপর অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ ক্রমাগত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় একটি নারীরক্ষা সমিতির একান্ত আবশ্যক ছিল। সুখের বিষয়, পাঠকগণ অন্য পৃষ্ঠায় দেখিবেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য কেবল কলিকাতায় স্থাপিত একটি এরূপ সমিতি দ্বারা সমুদয় বাংলাদেশের নারীকুলের রক্ষা হইতে পারে না। সকল সহর ও গ্রামে এইরূপ সমিতি বা তাহার শাখা চাই।

নারীর ধর্ম্ম ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে সমাজে অনেক গভীর ও ব্যাপক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। নারী যে পুরুষের অন্যতম ভোগ্য বস্তু মাত্র, এই নীচ ধারণা লুপ্ত হওয়া আবশ্যক। তাহার জন্য পুরুষদের সুশিক্ষার আবশ্যক। নারীদেরও শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের ও পুরুষদের শ্রদ্ধার ও সম্ভ্রমের পাত্রী হইতে পারেন।

সমাজের মধ্যে এই ভাবটি বদ্ধমূল হওয়া দরকার, যে, যে পুরুষ নারীর রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত নহে, তাহার বিবাহ করিয়া পরিবারী হইবার কোন অধিকার নাই। নারী-রক্ষারূপ পবিত্র ও একান্ত আবশ্যক কার্য্যের জন্য দেহের বল ও মনের বল দুইই চাই—বিশেষ করিয়া মনের বল। সাহস না থাকিলে গায়ের জোর এবং অস্ত্রশস্ত্র কিছুই কাজে লাগে না। আবার গায়ের জোর এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস ও দক্ষতা না থাকিলে, শেষ পর্য্যন্ত শুধু সাহসেই কার্য্য উদ্ধার হয় না। অন্য অস্ত্র প্রকাশ্যভাবে সংগ্রহ করিবার ও রাখিবার সুযোগ যাঁহাদের নাই, তাঁহারা লাঠি ব্যবহার করিতে শিখুন। এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আমরা অনেক মাস ধরিয়া লাঠি খেলায় দক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের লেখা লাঠিখেলা-বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

শুধু পুরুষদের গায়ের জোর ও মনের জোরে কাজ হইবে না ; মহিলাদেরও দৈহিক বল ও সাহসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁহারা অস্ত্র-ব্যবহার দ্বারা কখন কখন দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধি বিফল করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদয় সংবাদ কেহ সংগ্রহ করিয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা প্রকাশ করিব। যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে শান্তিকে ঘোড়ায় চড়াইয়াছিলেন, যখন তিনি তাঁর দেবী চৌধুরাণীকে পুরুষের যত ব্যায়াম ও অস্ত্রচালনা শিখাইয়াছিলেন, তখন বাঙালীর তাহা নূতন লাগিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক মহিলাদের অশ্বারোহণ বা অস্ত্রচালনা নূতন নহে এবং অস্বাভাবিকও নহে ; প্রত্যুত ইহা একান্ত আবশ্যক। আমরা জানি, কোনও অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুটি বালিকা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট লাঠি খেলা শিখিতেছেন, এবং তাঁহাদের "দম" ও দক্ষতার প্রশংসাও শুনিয়াছি।

আমরা আগে বালবিধবার বিবাহ প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, যে-কোন দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক্ বাল বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত।

নারী নির্য্যাতন বন্ধ করিতে হইলেও, বিধবাবিবাহের প্রচলন একান্ত আবশ্যক। কেহ যদি নারী নির্য্যাতনের সমুদয় ঘটনার বিবরণ পড়িয়া অত্যাচরিতা গণের (Sic) বিধবা কয়জন, তাহা গণনা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে, বিধবার সংখ্যাই বেশী। অনেক স্থলে বালবিধবার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর, রক্ষক স্বামীর অভাবে সুরক্ষিতা হন না, অথচ নানা প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে বাড়ীর বাহিরেও আসিতে হয়। তখন তাঁহারা দুর্ব্বৃত্ত লোকদের লোভের বস্তু হইয়া পড়েন। অনেক স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান বটে ; কিন্তু হিন্দু সমাজেও দুর্ব্বৃত্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ দুর্ব্বৃত্তেরা নামে হিন্দু বা নামে মুসলমান হইলেও তাহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নহে, এবং তাহারা সুযোগ পাইলেই সম্প্রদায়ের বিচার না করিয়া নারীর সর্ব্বনাশ (Sic) চেষ্টা করে। এই জন্য দেখা যায়, যে, মুসলমান বদ্‌মায়েস্ মুসলমান নারীরও, হিন্দু বদ্‌মায়েস হিন্দু নারীরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। যেখানে যেখানে সম্ভব হইবে, স্থানীয় নারীরক্ষা-সমিতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সভ্য থাকিলে ভাল হয়।

মুসলমান সমাজে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় ধর্ষিতা নারীর ও বিবাহ হয় এবং সমাজে স্থান হয়। ইহা ন্যায্য ব্যবস্থা। হিন্দু সমাজেও ইহার প্রচলন সর্ব্বতোভাবে বৈধ এবং বাঞ্ছনীয়। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মতও বটে। ধর্ষিতা হিন্দু নারীর ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান না হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দ্বিবিধ হয়। নিগৃহীতা নারী হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পতিতাদের শ্রেণীভুক্ত হন, কিম্বা কোন মুসলমানের পত্নী হন। অনেক সময় তিনি যদি কোন মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচারিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বিবিধ ফলের মধ্যে যাহাই ঘটুক, তাহা দ্বারা সমাজের অকল্যাণ হয়। হিন্দু সমাজের অকল্যাণ ত হয়ই ; মুসলমান সমাজেরও হয়। কারণ, এরূপ বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা (marriage by Capture) অনুসৃত হয়। যে সমাজে ঐ প্রথা অনুসৃত হয়, তাহা সভ্যতার ও সুনীতির নিম্নস্তরেই আবদ্ধ থাকে। আপেক্ষিকভাবে ইহাতে হিন্দু সমাজের আর একপ্রকার ক্ষতি হয়। যেসকল হিন্দু বিধবা এইপ্রকারে মুসমলানের পত্নী হন, তাঁহারা দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই বিবাহিতা হন ও সন্তানের জননী হন। সুশ্রুতের মত ষোল বৎসরের কম বয়সের নারীর মতো হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তদূর্দ্ধ বয়সের মাতার সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও আয়ুষ্মান্ হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম ; ২। ৪ টা ব্যতিক্রম স্থল দেখাইয়া ইহা অপ্রমাণ করা যায় না। হিন্দু বিধবাদের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। চলিত থাকিলে তাঁহারা অনেকেই বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হইতে পারিতেন। পূর্ণবয়স্কা যে সব হিন্দুবিধবা কোন-না-কোন প্রকারে মুসলমান-সমাজভুক্ত হন, তাঁহাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হয়। সামান্য বিবেচিত হইলেও হিন্দু সমাজের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতার ইহা একটি কারণ।

১৩৩৬ বৈশাখ

খড়্গাবাহাদুর সিংহের সম্মান

হীরালাল আগরওয়ালা নামক এক ব্যক্তি একটি নেপালী বালিকার সর্ব্বনাশ করে এবং তাহাকে নিজের ও নিজের পাপসহচরদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় স্বরূপে ব্যবহার করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গাবাহাদুর সিংহ হীরালালের প্রাণবধ করেন। বিচারে খড়্গাবাহাদুরের আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য দেশী ও ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা বড়লাটের নিকট আবেদন করে। দুইবৎসর কারাবাসের পর খড়্গবাহাদুর খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার আত্মোৎসর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার টাউনহলে সভা হইয়াছিল। জনতা সমুদয় হল পূর্ণ করিয়া বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই সভাস্থলে দেখিলাম না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এই মর্ম্মের কথা বলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষায় খড়্গাবাহাদুরের মত আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই তাঁহাকে সম্মান দেখান হইবে। ইহা সত্য কথা। স্বরাজ্যদলের একজন নেতার মুখনিঃসৃত এই উক্তির মূল্য আছে। এপর্য্যন্ত স্বরাজ্যদল প্রভূত অর্থ, অনুচর ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইয়া আসিয়াছেন। তাহার কোন অংশ নারীরক্ষা-কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে কিনা জানি না। এপর্য্যন্ত যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভবিষ্যতেও যদি হয়, তাহা কল্যাণকর হইবে। কারণ, প্রতি সপ্তাহেই খবরের কাগজে বহুসংখ্যক নারীর চরম দুর্গতির সংবাদ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, ইহা লজ্জার বিষয় হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র যে আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। নারীরক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়, হিন্দুর জীবন-মরণ ইহার সহিত জড়িত।

১৩৪০ শ্রাবণ

"নারীহরণের প্রতিকার"

নারীর উপর পাশব অত্যাচার বঙ্গের মুসলমানদের ও হিন্দুদের একটি অতীব লজ্জাকর ও দুঃখজনক কলঙ্ক। অত্যাচার হইয়া যাইবার পর সকল সম্প্রদায়ের লোকের একযোগে অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা ত করাই উচিত ; কিন্তু অত্যাচারের উপক্রম হইবা মাত্র তাহাতে বাধা দেওয়া আরও আবশ্যক।

যে-নারীর উপর অত্যাচার হইতে যাইতেছে, তিনি নিজে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া এবং অন্য লোকেও অস্ত্র ব্যবহার করিয়া বা না-করিয়া যে এরূপ বাধা সফল ভাবে দিতে পারেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ঘটনাগুলি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকায় লোকের মনে থাকে না। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

এইরূপ পঞ্চাশটি দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়া "নারী হরণের প্রতিকার" নাম দিয়া একটি বহি প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য আট আনা, ডাক মাশুল আলাদা। এই বহিখানি লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী নারী ও পুরুষ মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহা "কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও গ্রাম দুহালিয়া, পোঃ আঃ দুয়ারাবাজার, জিলা শ্রীহট্ট, ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।"

১৩৪৩ অগ্রহায়ণ

নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে বঙ্গমহিলাদের সভা

বঙ্গে যে বহুসংখ্যক নারী পৈশাচিকভাবে নিগৃহীত হইতেছেন, তাহার প্রতিরোধকল্পে কি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনার মিমিত্ত, শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী কিরণ বসু, শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর আহ্বানে, গত ১৯শে আশ্বিন কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির হলে বাঙালী মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি বলেন—

বাংলা দেশে নারীর উপর যেরূপ অত্যাচার চলিতেছে, অন্য দেশে এইরূপ হইলে তথাকার লোকেরা পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী জাতি, বিশেষভাবে বাংলার নারীরা, একেবারে নিশ্চল। বাংলা দেশ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। খোর্দ গোবিন্দপুরে একটি নারীর উপর যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা কি বাংলার নারীজাতির কলঙ্ক ও অপমান নহে?

আজকাল দেশাত্মবোধ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বৃদ্ধি পাওয়াও উচিত ; সুতরাং পল্লীগ্রামের নারীদের উপর অত্যাচারে যদি বাংলার নারীদের প্রাণ কাঁদিয়া না উঠে এবং এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যদি তাহারা বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে নারীজাতির পক্ষে অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে! দিনের পর দিন যখন এইরূপ হইতেছে, তখন দেশের নারীদের এই বিষয় সচেতন হওয়া উচিত এবং অন্তরের সহিত এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

ইহার পর এই সভায় নিম্নমুদ্রিত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা দেশে যেরূপ দিনের পর দিন অসহায় নারীদিগের উপর দারুণ পৈশাচিক অত্যাচার হইতেছে, তাহার জন্য গবর্মেণ্টের বিশেষভাবে কঠোরতর শাস্তির বিধান করা উচিত- এবং যেখানে দলবদ্ধভাবে অত্যাচার হয়, সেখানে যে যে গ্রামের লোকের দ্বারা এইরূপ অত্যাচার সঙ্ঘটিত হয়, সেই সেই গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা (পিউনিটিভ ট্যাক্স) ধার্য্য করা হউক এবং পুলিস যাহাতে এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণের জন্য বিশেষ সতর্কভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করে, সেজন্য তাহাদের উপর সরকারের বিশেষ আদেশ দেওয়া উচিত। অপর পক্ষে এই সভা গ্রামে গ্রামে যাহাতে নারীদের রক্ষার জন্য রক্ষিদল সংগঠিত হয়, সেজন্যও দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছে।

(২) খোর্দ গোবিন্দপুরে আমাদেরই একটি ভগ্নী, বাংলা মায়ের এক দুর্ভাগিনী কন্যা, বর্ষীয়সী ও বহু সন্তানের জননী কুসুমকুমারীর উপর যে অমানুষিক, নির্লজ্জ ও পৈশাচিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেরূপ দুঃসাহসের সহিত প্রকাশ্যভাবে দলবদ্ধ হইয়া এই অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া

প্রত্যেক নরনারীই স্তম্ভিত হইবেন। এই মোকদ্দমায় অপরাধীগণের প্রতি যে-দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অপরাধের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইয়াছে। এজন্য এই সভা আশা করিতেছে যে, গবর্মেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া অত্যাচারীদের যথোচিত দণ্ডবিধানের দ্বারা বাংলার নারীগণের মান-সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হউন।

(৩) বাংলা দেশের প্রত্যেক রমণী তাঁহাদের ভগ্নীগণের উপর যে সকল অত্যাচার হইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া, কলিকাতায় ও মফস্বলে, পল্লীতে পল্লীতে, ইহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা ও আন্দোলন আরম্ভ করিবেন এবং যদবধি না এই অত্যাচার নিবারিত হয়, তদবধি দৃঢ়ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে থাকিবেন। এই সভা বাংলা দেশের ভগিনীগণের নিকট সনির্ব্বন্ধভাবে ইহাই অনুরোধ করিতেছে।

(৪) জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত নারী মাত্রেই নারী, এবং যাহারা অত্যাচার করে তাহারা অত্যাচারী ; সুতরাং এস্থলে সম্প্রদায় বা জাতির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সভায় নারীগণের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি যে, নারীর উপর অত্যাচারী কর্ত্তৃক অত্যাচার-ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোনমতেই সঙ্গত নহে।

যাঁহারা এই প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করেন ও সমর্থন করেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও বক্তৃতার কোন কোন অংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন :

আজ ১৫ বৎসর হ'ল এই পাপ বৃদ্ধি হওয়ায় এই পাপ দূর করবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এই পাপ দূর করবার জন্যে বাঙালীকেই বদ্ধপরিকর হ'তে হবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যুবকগণের দ্বারা রক্ষীর দল সংগঠন ক'রে দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার দমন করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা আর রক্ষা নেই, কেহই আর নিরাপদে বাস করতে পারবে না। বাংলার পল্লীতে আমাদের ভগিনীদের মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কোন্ দিন কোন্ পরিবারের মেয়ে, বধূ, মা'র সর্ব্বনাশ হবে, তার কিছুই ঠিক নাই। এই অরাজক অবস্থার প্রতিবিধান না করলে আর রক্ষা নেই। গত ১৫ বৎসর গবর্মেণ্টেরই গণনা অনুসারে দেখা যায়, দশ হাজারেরও বেশী নারী নিগৃহীত হয়েছে। গবর্মেণ্ট তার দমনের জন্য কি করেছেন? এতদিন ত কিছুই করেন নি, এ-বৎসর মাত্র বেত্রাঘাত-দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। গবর্মেণ্ট ঠগীর অত্যাচার নিবারণ করেছেন, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ বন্ধ করেছেন। আর নারীর উপর এই অত্যাচার নিবারণ করবার কি তাঁদের উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য নেই? দেশে সন্ত্রাসনবাদ দমনের জন্যে গবর্মেণ্ট অর্ডিনান্স, নির্ব্বাসন, সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেছেন। বাংলার নারীদিগকে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে আপনার গৃহপরিবারে বাস করতে সমর্থ করবার জন্যে গবর্মেণ্টের যে কর্ত্তব্য আছে তা কবে সাধন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হবেন? আমাদের মনে হয়, যেখানে এরূপ নির্য্যাতন হয় সেখানে পিউনিটিভ পুলিস স্থাপন করা উচিত।

নারীনির্য্যাতনের যে-সব ভয়াবহ পৈশাচিক নারকীয় ঘটনা ঘটছে, ভাষা নেই যে তার পৈশাচিকতা ভাল করে বলি ; ভাষা নেই যে মনের অব্যক্ত ক্ষোভ, রোষ প্রকাশ করে বলি। শিশুদের বুকে লাথি মেরে তাদের অজ্ঞান ক'রে মাকে তাদের কোল থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা, এই সব নারকীয় কাহিনীর কথা সকলেই আমরা জানি ; কিন্তু আমরা দিব্য আরামে আহার বিহার ক'রে, নারী সমিতির মীটিং ক'রে বেড়াই। কেন যে পাগল হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে যাই না এই সব পৈশাচিক ঘৃণ্য ঘটনা দমন করবার ব্যবস্থা করতে, তা জানি না। কেন ছুটি না দেশের লোককে এ বিষয়ে সচেতন করতে? মন একেবারে অসাড়, জড় হয়ে পড়েছে তাই বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাই। কিংবা হয়ত ভাবি ওসব ত ঐ পাড়াগাঁয়েই হয়, আমাদের তাতে মাথা ঘামাবার কি দরকার? এই যদি আমাদের মনোভাব হয়, তবে ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্রীমতী শান্তা দেবী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় ইহার পোষকতা করিয়া বলেন, প্রত্যেক নারীর কাছে একটি ছোরা থাকা আবশ্যক।

বঙ্গের কংগ্রেসদলভুক্ত পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে বড় এবং কারাগারের অভিজ্ঞতাশালিনী শ্রীমতী মোহিনী দেবী দ্বিতীয় প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন, এবং নিখিলভারত নারীসম্মেলনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীমতী রমা দেবী কর্ত্তৃক তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। তিনি বলেন :

একদিন ভারতের ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অসামান্যা রূপসী চিতোরেব রাণী পদ্মিনী তাঁর রূপের নেশাকে ধিক্কার দিয়ে অগ্নিশিখায় রূপকে ছারখার করে ফেলেছিলেন, পাছে পরের হাতে দেহকে বিকিয়ে দিতে হয়! তাঁরই সঙ্গে বহু নারী দিলে আপনাকে বিসর্জ্জন আত্মসম্মানকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আমরা নিজেদের শিক্ষিত এবং সভ্য বলে গর্ব্ব ক'রে থাকি ; শুধু গর্ব্ব করা নয় সেই সঙ্গে তারই দোহাই দিয়ে সমাজের বুকের উপর নানা ভাবে বিচরণ করি। কিন্তু সত্যই কি আমরা কোনও মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করবার মতন নিজেকে এবং সমাজকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছি? বলতে লজ্জা এবং ঘৃণায় মাথা নত হয়ে যায় যে আজও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারীকে আশ্রয় খুঁজতে হয়, নিবেদন জানাতে হয় সভ্য সমাজের দ্বারে গিয়ে, তবু প্রতিকার হয় না।

ভারতের নারীজাতির মহাসম্মিলনীর বৈঠকে দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা ধনী মহিলারা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নারীহরণের প্রতিবাদ করা তাঁরা যুক্তিসঙ্গত বা বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন নি। বাংলার ঘরের সামান্যা শিক্ষিতা হিন্দু রমণী বাংলার নির্য্যাতিতা নারীদের করুণ কাহিনী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্মুখে প্রতিকারের আশায়। ভারতের মহাসম্মিলনীর যাঁরা সভ্যা, তাঁহারা অধিকাংশ ধনী-ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাঁরা দীন দরিদ্র অসহায়দের খোঁজ রাখেন খুব কমই। কাজেই এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্যের যথার্থ সার্থকতা হওয়া সম্ভব নয়, যতদিন না তাঁরা ঐ অহসায় দীনদুঃখীদের সঙ্গে মিলিত হয় তাদের অভাব অভিযোগ মেটাতে সমর্থা হবেন।

আরও আশ্চর্য্য মনে হয়, এত বড় পাশবিকতা ঘটা সত্ত্বেও আজ বাংলায় বা ভারতের মুসলমান শিক্ষিত সমাজে এমন নারী অথবা পুরুষ নেই কি, যাঁরা এর প্রতিকারের জন্য প্রতিবাদ অথবা চেষ্টা করতে পারেন? যদি থাকেন, তবে আজ তাঁরা নীরব কেন? নারীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে জাতিভেদ, দ্বেষ, হিংসা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলার পাশবিক আচরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবক আমায় বলেছিলেন, "হিন্দুর অত্যাচার মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী।" তাঁর এই ধারণা ভুল হলেও আমি এই কথা বলতে আজ বাধ্য হচ্ছি যে, সংখ্যার তুলনা না করে যদি আমরা কার্য্যটির পানে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব যে, হিন্দু-মুসলমানে কিছু আসে যায় না। যে কার্য্য ঘটে যাচ্ছে তা গর্হিত এবং অন্যায় কিনা, সেই দেখে বিচার করাটাই কর্ত্তব্য বলে মনে করি। হিন্দুই করুক বা মুসলমানই করুক, কার্য্যটি যে অত্যন্ত জঘন্য এবং নীচতার পরিচায়ক সে-বিষয় কোন সমাজই আজ, আশা করি, অস্বীকার করবেন না, এবং এই পাপ-প্রবৃত্তির নেশা দিনের পর দিন যে নিম্ন গতির দিকে চলেছে, তাও শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়, আশা করি, বিবেচনা ক'রে দেখবেন। অন্যায়কে অন্যায় ব'লে মেনে নেওয়ার মধ্যে লজ্জার কারণ থাকে না, বরং তাকে না-মানাটাই কাপুরুষতার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্ত্রীলোকের প্রতি এই যে ঘোরতর অত্যাচার, এরই প্রতিবাদ স্বরূপ আজ আমরা এইখানে উপস্থিত হয়েছি, রাগ-বা বিদ্বেষ-বশে মিলিত হই নি। মিলিত হয়েছি নিজেদের আত্মমর্য্যাদা ইজ্জত রক্ষার অভিপ্রায়, মিলিত হয়েছি অসম্ভব আঘাত ও বেদনায় জর্জ্জরিত হয়ে।

যে শাসকের একচ্ছত্র শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আজ আমরা নারীরা বাস করছি, সেই শাসকের নিকট দাবী করতে এসেছি সুবিচার এবং সতর্কতার সুদৃষ্টি যার সাহায্যে নারীজাতি তাদের আত্মসম্মান ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে রেখে শান্তিতে বাস করতে পারে।

আর চাই শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সচেতন মনোভাব। তাঁরা আজ ভুলুন তাঁদের আত্মাভিমান, ভুলে যান তাঁদের জাতাভিমান। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর নারীর ইজ্জত ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁদের শক্তি নিয়োগ করুন। তবেই তাঁদের সৎশিক্ষার মহত্ত্ব ও সার্থকতা।

আজ নারীদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ, তাঁরা এই কার্য্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হোন, সাড়া দিন, যদি আজ তাঁরা এই ব্যথা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে থাকেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি শ্রীমতী কুমুদিনী বসু কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন ঃ

আজ আমরা এখানে যে-কাজের জন্যে সমবেত হয়েছি, অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এর অনেক পূর্ব্বেই আমাদের সে-কাজ করা উচিত ছিল। মানুষের তখনই সব চাইতে বড় বিপদ এসে যায়, যখন সে আত্মবিস্মৃত হয়। বিশ্ববিস্মৃত হলেও বরং কোন মতে চললেও চলতে পারে, কিন্তু আত্মবিস্মৃতের এ-সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব! আমাদের এদেশের মেয়েদের এখন সেই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা ভুলতে ভুলতে ভুলেই গেছি যে, যে-কোন নারীর অপমানে অত্যাচারে অবিচারে আমাদের প্রত্যেকেরই অংশ আছে, এর সঙ্গে আমাদের প্রতি জনেরই মান-মর্য্যাদা জড়ানো। না, আমরা তা ভাবি না। যেমন বাড়ীতে একটা কঠিন যন্ত্রণাকর রোগে যদি কেউ বৎসরের পর বৎসর ধরে শুষতে থাকে, তার যন্ত্রণা জ্বালা সর্ব্বদা চোখে দেখে বাড়ীর ছোট ছেলেটির সুদ্ধ মন কঠিন হয়ে ওঠে। সদাসর্ব্বদাই নারীধর্ষণের দুঃসম্বাদ পেতে পেতে তেমনই আমাদের অতি-অভ্যস্ততার ফলে আমাদের মনের কাছে থেকে এর ভয়াবহতা অনেক দূরে চলে গেছে। এমনই হয়। হীনতার আবেষ্টন বহুদিন থাকতে থাকতে মানুষের মনের সমুদয় সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তাকে হীন ক'রে দেয়। একদিন যে মশা মারতে পারত না, সঙ্গদোষে একদিন হয়ত সে অনায়াসে নররক্তপাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের অবস্থাও অনেকটা তাই হয়েছে। যে দেশের স্বামী পত্নীহরণকারীকে দণ্ড দেবার জন্য দণ্ডকারণ্য থেকে বেরিয়ে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিপর্ব্বত নদনদী অতিক্রম করে অত্যাচারীর সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপনিবাসে পৌঁছে তাকে উচ্ছেদ ক'রে ছেড়েছিলেন, সেই দেশের স্বামীপুত্র বাপভাইরা আজ জড়পুত্তলিকা হয়ে মা-বোন-মেয়ের নিকৃষ্ট লাঞ্ছনা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। তাঁদের ঘরের মা-বোন-মেয়েরাও বেশ সহজভাবেই তা সমর্থন করে চলেছেন। কোন গোলমালই নেই। মা-বোনেরা যদি জিদ করেন, পুরুষরা কি এতখানি কাপুরুষ হয়ে থাকতে পারে? পশুমাংসলোলুপ কসাইয়ের চাইতেও অধম নারীমাংস-লোলুপ কি তা হ'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে এমন করে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিতে পারত? গবর্ন্মেণ্ট না হয় বিদেশী গবর্ন্মেণ্টই, তাই ব'লে কি এমন ঢিলে হাতে এদের জন্য শিথিল দণ্ড ধারণ ক'রে অর্দ্ধনিশ্চেষ্ট থাকতে পারতেন? যাদের বিপদ, তাদেরই এখন থেকে অবহিত হতে হবে। তা না হ'লে সত্যকার কাজ হবে না। গবর্ন্মেণ্টকে বিশেষভাবে এজন্য অনুরোধ চারিদিক দিয়েই জানাতে হবে। পল্লীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, মেয়েদের মানসিক উন্নতি ও দৈহিক বলাধান যাতে হয়, তার জন্য গ্রামে গ্রামে সুব্যবস্থা করবার আয়োজন মেয়েদের খুব চেষ্টা ক'রেই করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা নরনারী উভয় পক্ষেরই যাতে হয়, শহরের স্কুলকলেজে তার ব্যবস্থা এবং গ্রামে গ্রামে তার বন্দোবস্ত সঙ্ঘবদ্ধ নারীদের পক্ষ থেকেই করতে হবে। আর সবার উপর এই নারীসঙ্ঘকে হিন্দুমুসলমান শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত পরিবার থেকে মহিলাদের সমভাবে গঠিত ক'রে তুলতে হবে। কাউন্সিলে পর্য্যন্ত জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বলেছেন, "নারীধর্ষণ ব্যাপারটাকে হিন্দুরা হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের আলোতে বড় ক'রে দেখছেন, আসলে এটা এত বড় কিছু

নয়!" এ কি অদ্ভুত মনোভাব? কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাঁর ধর্ম্মমত তাঁর স্রষ্টাপুরুষকে যে নাম দিয়েই ডাকতে শেখাক, এমন কথা ভাবতে পারলেন কি করে? অথচ সরকারী হিসাবে পাওয়া যায়, ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা মুসলমান নারীদের মধ্যে বেশী। অতএব হিন্দু মুসলমান বলে নয়, মোটের উপর এদেশের আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া হয়ে গেছে মোটা। মেয়েদের দুর্দ্দশায় প্রাণ কাঁদে না, গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে না। নিজেদের পরম কর্ত্তব্যটাকে চরম ব্যবস্থায় নরম ক'রে ফেলে শিক্ষিত মুসলমান নেতারা নিশ্চিন্ত হলেন, আর হিন্দুরা হয়ত ভাবলেন, "এই পথ ধরে আবার হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ-বহ্নি যদি উর্দ্ধশিখ হয়। যেতে দাও।" চমৎকার সমন্বয়। এখন যাদের বিপদ, সেই হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের একচিত্ত হয়ে ভাবতে হবে, কঃ পন্থাঃ? শুধু ভাবলে হবে না, ভেবে উপায় নির্দ্ধারণ করতেও হবে। আমার মনে হয়, আমাদের সামনে এই সমস্যাটিই সর্ব্বপ্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে। মুসলমান শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে একটি সম্মিলিত মহিলা সঙ্ঘ তৈরি করা এবং একযোগে পল্লীগ্রাম গিয়ে মেয়েদের ভিতর আত্মরক্ষার জন্য দৈহিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপদেশ প্রধান, স্কুল বা পাঠশালা সংস্থাপন ইত্যাদি যথার্থ জনহিতকর কাজ হাতে কলমে করা। শুধু শহরের হলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেই হবে না, কাগজে লিখলেও না। তবে, এ-দুটির আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র এই চতুর্থ প্রস্তাবটির সমর্থন এবং শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায় ইহার পোষকতা করেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন ঃ

গবর্ন্মেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন দ্বারা কোন ফল হইবে না এবং এইরূপ আবেদন-নিবেদন তিনি পছন্দও করেন না। বাংলা দেশে এই নারীনির্য্যাতনের মূলে রহিয়াছে পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীরুতা। যত দিন পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীরুতা দূর না হইবে, তত দিন এই নারীনির্য্যাতনের কোন প্রতিকার হইবে না। নারীদের নিজেদের বীর হইতে হইবে, এবং সন্তান, স্বামী ও ভাইদের বীর করিতে হইবে। বাঙালী নারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে সাহসের সাধনা করা। পৌরুষ কথাটি শুধু পুরুষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নহে, নারীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সভার উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার কার্য্যবিবরণ জানিতে পারি নাই। পূজার ছুটি শেষ হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

মহিলাদের এই কনফারেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্ত্তিক সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছিল। আবশ্যক বোধে বিস্তৃততর বৃত্তান্ত দেওয়া হইল।

নিখিল-ভারত নারীসম্মেলন

নারীরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের উদ্যোগ করিতেছেন। কুচবিহারের রাজমাতা ইন্দিরা মহারাণী তাহার সভানেত্রী হইবেন, কাগজে এইরূপ দেখিলাম্।

নিখিল-বঙ্গ মহিলাকর্ম্মী সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

গত ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার আলবার্ট হলে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ প্রমুখ মহিলাদের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ মহিলাকর্ম্মী-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সম্মেলনের সভানেত্রীর কর্ত্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় মানবসভ্যতা ও নারীদের সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার বক্তব্য মূলতঃ তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য মহিলাসম্মেলনে তাঁহার সমুদয় বক্তৃতাটির অনুলেখন দিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা যথাযথ অনুলিখিত হয়ও নাই। শেষের দিকে তিনি বলেন :

প্রজারা যাতে আপনাদের হীন অবস্থা বুঝতে না পারে এবং প্রতিবাদ না করে—সেজন্য একেশ্বর রাজারা যেমন প্রজাকে জ্ঞান দিতে কুণ্ঠিত হয়, তেমনি একেশ্বর আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই পুরুষেরা নারীদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করে এসেছে এবং মূঢ়তার জগদ্দল পাথর মেয়েদের উপর চাপিয়েছে। এতে পুরুষেরা ঠকেছে। কারণ, আজ যে আমরা দেশকে উন্নতির পথে, সামনের দিকে টানতে চাচ্ছি, তা বাধা দিচ্ছে এই মূঢ়তা ও অজ্ঞতা আমাদের মেয়েদের মধ্যে। এ পুরুষেরই কৃতকর্ম্মের ফল। নারীদের জগদ্ব্যাপী জাগরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেছে। প্রাচ্য মহাদেশে সর্ব্বত্র এই জাগরণ দেখা দিয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে, মেয়েদের পিছনে ফেলে রেখে সমগ্র দেশের ক্ষতি হয়েছে। দেখেছি পারস্যে রাজশাসনের নূতন আইন হয়েছে—যাতে মেয়েরা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ ক'রে নিজেদের গৌরবময় স্থান অধিকার করে। জাপানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছে। সেখানকার বীরাঙ্গনাদের কীর্ত্তি দেখলে পুলকিত হ'তে হয়। চীনের মেয়েরা দেশকে বাঁচাবার জন্য ঘরের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছে। মা যেমন সন্তানকে বাঁচাবার জন্য বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেই রকম মেয়েরা যখনই দেখেছে যে তাদের ভাই পুত্র সন্তান বিপন্ন তখনই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে রণাঙ্গনে। গিয়ে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হয়নি। স্পেনে যারা যুদ্ধ করছে তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোক। এ-কথা বললে ভুল হবে যে, তাহ'লে কি তারা নারীধর্ম্ম পরিত্যাগ করে পুরুষের চিত্তবৃত্তি ধার করে কাজ চালাচ্ছে। ধারে কোন বড় কাজ চলে না। মেয়েদের মেয়েই থাকতে হবে—এটা বিধাতার বিধান। কিন্তু এ-কথাও বলা ভুল ও অশ্রদ্ধেয় যে মেয়েরা কেবল গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

সভ্যতা জিনিষটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। সেই কাজে নারীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

যে নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে পুরুষের সভ্যতা চলেছে, সেটা আজ টলমল করে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশ, যেখানে এই সভ্যতার বড় কেন্দ্র, সেখানে এই বিনাশের শক্তি এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আজ বড় বড় মনীষীরা সন্দেহ করছেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতা বিনাশের পথে চলেছে—তার কারণ কি? কারণ এই সভ্যতা একপেশে, এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। এটা পুরুষের, নারীর স্থান এতে নেই। এই যে নিষ্ঠুরতার উপরে গড়া পুরুষের সভ্যতা, এ টিঁকতে পারে না। আজকের দিনে তার

হিসাব-নিকাশের পালা পড়েছে। আর ঠিক এই সময় মেয়েরা বাইরে এসেছে। যদি সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে না যায়—যদি এ টিঁকে থাকে, তবে এখন থেকেই মেয়েদের দায়িত্ব সুরু হ'ল। মেয়ে আর পুরুষে মিলে যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠবে তাতে বাঁচবার মন্ত্র দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষের চিত্তবৃত্তির এবং নারীর হৃদয়বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে—তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা। তার উদ্যোগ হয়েছে এতদিনে। মেয়েরা এতদিন তাদের দীনতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়েরা এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে—তবে তাদের তা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে। তাদের অজ্ঞতা, অন্ধকার দূর করতে হবে। যেখানে অজ্ঞতা— সেখানে তোমাদের অর্ঘ্য দিও না। আজকের দিনে তোমাদের জাগতে হবে। শক্তিকে দীপ্ত, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে ; কেননা নূতন যুগ এসেছে। এ-কথা আর বলতে পারবে না যে, তোমরা বোকা, মূঢ়, মূর্খ—অকেজো। একথা বলতে লজ্জা কোরো যে তোমরা, ভারতের নারীরা অবনত। জগতের আহ্বান তোমাদের এসেছে। যুগসঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা তোমাদের তুচ্ছ করতে হবে এবং জ্ঞানের বুদ্ধির দীপ্তিতে তোমাদের উজ্জ্বল হ'তে হবে। যদি তোমরা যোগ্য হও, দেখবে আর কেউ কখনও তোমাদের অপমান ও অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

শ্রীমতী মোহিনী দেবীর অভিভাষণ

মহিলা কর্ম্মী সম্মেলনে তাঁহার প্রাণস্পর্শী অভিভাষণে নানা কথার মধ্যে শ্রীমতী মোহিনী দেবী অন্য কোন কোন দেশের নারীদের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন :

বিগত সত্যাগ্রহে ভারতের নারীবৃন্দও তাঁদের কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ ও প্রাণশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন সে ত আপনাদের অবিদিত নেই। আপনাদের নিকটে আমার এই নিবেদন যে বাংলা দেশের এই প্রাণশক্তিকে কর্ম্মপথে অগ্রসর করে দিতে সাহায্য করুন। আমাদের সমগ্র সঙ্ঘশক্তিতে যদি দলবদ্ধ হয়ে আমরা দাঁড়াই তাহলে এমন কোন্ ক্ষমতা আছে যে আমাদের বাধা দিতে সমর্থ? আমাদের অত্যাচারের প্রতিকারে আমরা অসহায়, আমাদের নিগ্রহ দূর করতে আমরা অপারগ? আজ সমস্ত কুটীরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যতদূর সাধ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন না করলে এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে না।

আমাদের কর্ত্তব্যের কথা বলতে গেলেই সর্ব্ব-প্রথমে মনে পড়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কত অসহায় নারীর নিগ্রহের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। এ আমাদের বড় লজ্জা, বড় বেদনা। কেন আমরা এর প্রতিকারহীন কলঙ্কের কালিমা বয়ে বেড়াই? দুর্ব্বৃত্ত সকল দেশে সকল যুগেই অত্যাচারের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, সবলের স্বেচ্ছাচারিতায় দুর্ব্বল লাঞ্ছনা ভোগ করে কিন্তু বাংলা দেশের নারীরা তাদের অবলা নাম সার্থক করতে যেমন শোচনীয় নিগ্রহ সহ্য করেন, এমনটি আর জগতের কোথাও দেখা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের সংবাদপত্র এ কাহিনীতে ভরপুর। কিন্তু আমাদের সেদিকে কি দৃষ্টি আছে? খোর্দগোবিন্দপুরের ঘটনার পুনরভিনয়ের আশঙ্কা আমাদের নেই? সুতরাং এর আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা 'অবলা উদ্ধার' করতে 'নারীরক্ষা সমিতি' গঠন করেন, তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করে বাঙ্গালা দেশের নারীশক্তিকে এ কথা জানাই যে, এর হীনতার দায় হতে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করুন, নিজেদের আত্মরক্ষার পথ নিজেরাই বের করুন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এনে পরিবারের আবহাওয়া বদল করে, নারীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রসারে দুর্ব্বৃত্ত দলন করুন, যাতে নারীনিগ্রহ আর সমস্যা



শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ

না হয়ে থাকে। ভুলবেন না যে, নারীনিগ্রহকারীর জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, সে নরপশু। তাদের হাত হতে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হলে নিজেদেরই বলসঞ্চয় করতে হবে।

শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষের অভিভাষণ

মহিলা কর্ম্মী সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ তাঁহার সারগর্ভ ও মননশীলতাপরিচায়ক অভিভাষণের গোড়ার দিকে বলেন :

আমাদের সম্মুখে আজ বহু সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সকল সমস্যাকে যদি এড়িয়ে চলি, আমাদের আচরণে ভীরুতা প্রকাশ পাবে। কত যে দুঃখ আমাদের চারিদিকে জমে উঠেছে দিনে দিনে, তার অন্ত নেই। এদেশে এমন মানুষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রয়েছে, যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই মাথা গুঁজবার পর্য্যাপ্ত স্থানটুকু পর্য্যন্ত নেই। জীবন তাদের কাছে দুর্ব্বহ অভিশাপ। মৃত্যু তাদের কাছে অসহনীয় দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রাম আজ ত সাত লক্ষ শ্মশানের সামিল। সেই শ্মশানে অবর্ণনীয় যাতনার মধ্যে যারা জীবন যাপন করে, মানুষের চাইতে কঙ্কালের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বেশী।

'কাল কি খাব'—এই দুশ্চিন্তা অগণিত মানুষের মনের উপরে জগদ্দল পাথরের মত অহরহ চেপে আছে। রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভাগা বেকারের দল অবসন্ন দেহ আর বিষণ্ণ চিত্ত নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; খেতে না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ চুরি ক'রে জেলে যাচ্ছে, নয় ত পতিতাদের দলে নাম লেখাচ্ছে।

দুঃখের শেষ এইখানেই নয়। আমাদের জীবনের গতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত। এক সঙ্গে মিলে সভাসমিতি করা বিপজ্জনক—একশ চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে বুনো মহিষের মত শিং উঁচিয়ে। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে আইন চোখ রাঙায়, কলমের আগায় লিখতে গেলে জরিমানা দিতে হয়, বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কারা-প্রাকার শুধু আমাদের দেহকে আটকে রাখবার জন্যে তৈরি হয় নি ; আমাদের মনকে বেঁধে রাখবার জন্যে প্রাচীরের অভাব নেই। কর্ত্তারা যতটুকু ইচ্ছা করেন শুধু ততটুকু খোরাক সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের মনের আঙিনায় এসে পৌঁছতে পারে। যা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত নয়, তা জানবার কোন অধিকার নেই আমাদের। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দেখিয়ে পুলিস যখন আমাদের ছেলেমেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর বিনা বিচারে তাদের আটক করে রাখে, নালিশ জানাবার কোন স্থান খুঁজে পাই না। আমাদের অবস্থা ক্রীতদাসের মতই শোচনীয়। আমরা বেঁচে নেই, টিকে আছি।

আমাদের পরাধীনতা কেবল রাজনীতির আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের অর্থহীন নিয়ম-কানুনগুলিও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। আজ কোটি কোটি নরনারায়ণ সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে আছে। সাধারণের কূপ তারা ছুঁতে পায় না, মন্দিরের দরজা তাদের মুখের উপরে বন্ধ হয়ে যায়, ইস্কুলে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে গেলে বর্ণ-হিন্দুরা আপত্তি জানায়।

যে অর্থহীন বিধিনিষেধ অস্পৃশ্যতার আধিপত্যকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সেই বিধিনিষেধের জন্যই অবরোধ-প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। পর্দ্দার অন্তরালে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাদের যাপন করতে হয় বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে—খাওয়ার পরে রাঁধা, আর রাঁধার পরে খাওয়া ছাড়া যাদের অন্য কর্ম্ম নেই, বৃহত্তর জগতের বিশাল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে যাপন করে বন্দিনীর অভিশপ্ত জীবন, তাদের দুর্ভাগ্য সত্যই অপরিসীম।

এই যে জগৎ-জোড়া দুঃখ—যার মূলে রয়েছে মানুষের দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতাপ্রিয়তা আর উৎকট

অর্থলোভ —এই দুঃখের অবসান ঘটানো একেবারেই অসম্ভব নয়। মানুষের হৃদয়হীনতা পৃথিবীকে নরক ক'রে তুলেছে। মানুষেরই ভালবাসা তাকে স্বর্গ ক'রে তুলবে। মানুষের ভীরুতার উপরেই অন্যায় দাঁড়িয়ে আছে ; মানুষেরই দুর্জ্জয় সাহস তার অবসান ঘটাবে।

কিন্তু কেবল পুরুষকে দিয়ে এই নূতন জগৎ সৃষ্টির কোন আশা নেই।

বঙ্গে মহিলাদের কর্ত্তব্য

বঙ্গে পুরুষদের কর্ত্তব্যের যেমন অন্ত নাই, মহিলাদের কর্ত্তব্যেরও তেমনই অন্ত নাই। মহিলারা নানা প্রকারে দেখাইয়াছেন যে. সাহসের অভাবে যে তাঁহারা কোন কাজ করিতে অসমর্থ এমন অপবাদ তাঁহাদের সকলকে দেওয়া চলে না। এই জন্য আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, বঙ্গনারীগণ সকলেই ভীরু এরূপ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ তাহা বলিতেছি না, আশা করি মহিলারা তাহা বিশ্বাস করিবেন। আমাদের বক্তব্য, আপাততঃ কিছু কাল মহিলারা রাষ্ট্রনীতি-ঘটিত কাজ পুরুষদের হাতে রাখিয়া দিন। মহিলারা এখন কিছু কাল বালিকাদের ও নারীদের অজ্ঞতা দূর করিবার এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

বঙ্গের নারীগণকে এরূপ অনুরোধ করিবার কারণ ইহা নহে, যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বা জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আবশ্যক অন্যান্য সার্ব্বজনিক কার্য্যের ক্ষেত্রে পুরুষেরা একাই এখন যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বা কখনও করিতে পারিবেন। পুরুষেরা একা এখন তাহা করিতেছেন না এবং কখনও করিতে পারিবেন না। নারীদের সাহায্য আবশ্যক হইবে। কিন্তু নারীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা অতি অল্প হইতেছে। মহিলারা নিজে এই কাজে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ না করিলে নারীসমাজের অজ্ঞতা দূর হইবে না, এবং অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তিও বাড়িবে না। তাঁহাদের অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন না।

আমরা ইহা জানি ও বুঝি, যে, কোন দেশেই রাষ্ট্রশক্তি সকল বয়সের সকল পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অকপট সমর্থক না হইলে এবং এরূপ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট রাজস্ব ব্যয় না করিলে, সে দেশে কি পুরুষদের কি স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা যায় না এবং ইহাও সত্য, যে, কোন দেশের গবর্ন্মেণ্ট স্বজাতীয় না হইলে এবং সেই দেশের অধিবাসীরা স্বশাসক না হইলে, সেখানে রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাবিস্তারে উল্লিখিত ভাবে আনুকূল্য করে না। কিন্তু আমাদের দেশে কবে জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট স্থাপিত হইবে, কবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় যতটা হয়, ততটা আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কি পুরুষ সমাজে কি নারীসমাজে, জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা স্বরাজলাভের চেষ্টা যেরূপে যতটা সাফল্যলাভের সম্ভাবনার সহিত হইতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

এরূপ বলিবার অর্থ ইহা নহে, যে, সকলে আগে মহাবিদ্বান হউন, তার পর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী হইবেন। ইহা আমরা জানি, যে, নিরক্ষর বা পুস্তকগত বিদ্যার অতি অল্প অধিকারী কোন কোন লোকও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব ব্যতিক্রমস্থল ছাড়িয়া দিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, অন্ততঃ সাধারণ লিখনপঠনের ক্ষমতা এবং ভূগোল, ইতিহাস ও হিসাবের সাধারণ জ্ঞান সকলের থাকিলে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে চেষ্টার সাফল্য অধিক হইবার সম্ভাবনা।

রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্যই জ্ঞানের আবশ্যক এমন নয়। জীবনের সকল রকম কাজের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন —গৃহস্থালীর কাজের জন্যও দরকার।

শিক্ষিতা মহিলারা বিশেষ করিয়া নারী-শিক্ষার বিস্তারে মনোযোগী হইলে, আরও এই একটি সুবিধা হয়, যে, প্রত্যেক অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিতে পারেন ; পুরুষেরা তাহা পারেন না।

১৩৪৫ মাঘ

বঙ্গে নারীনিগ্রহ ও কংগ্রেস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-মহিলা-সম্মেলন সম্প্রতি নারীনির্যাতন নিবারণ করিবার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে কংগ্রেস-সভাপতি আলবার্ট হলের একটি সভায় বঙ্গে নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে খুব স্পষ্টবাদিতার সহিত একটি বক্তৃতা করেন। এ-বিষয়ে কংগ্রেসপক্ষীয় লোকদের তাহাই প্রথম মত প্রকাশ। আমরা তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম। কংগ্রেসমহিলা-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটি দ্বিতীয় শুভলক্ষণ।

কংগ্রেসী মহিলারা, এবং পুরুষেরাও, যদি ন্যূনকল্পে কিছু কিছু অর্থসাহায্য নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যালয় কলিকাতায় ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ও মহিলাদিগের সভায় গৃহীত প্রস্তাব সার্থক হয়। আশা করি তাঁহারা সকলেই কিছু সাহায্য করিবেন।

সতীত্ব রক্ষার উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত

গত ৩১শে ডিসেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেনঃ—

'I have oftem remarked in these columns that definite rules govern the development of the non-violent spirit in us. It is a strenuous effort. It marks a revolution in the way of thinking and living. If my correspondent and the girls of her way of thinking will revolutionize their life in the

prescribed manner, they will soon find that young men, who at all come in contact with them, will learn to respect them and to put on their best behaviour in their presence. But if perchance they find, as they may, that their very chastity is in danger of being violated, they must develop courage enough to die rather than yield to the brute in man. It has been suggested that a girl who is gagged or bound so as to make her powerless even for struggling cannot die as easily as I seem to think. I venture to assert that a girl who has the will to resist can burst all the bonds that may have been used to render her powerless. The resolute will gives her the strength to die.

"But this heroism is possible only for those who have trained themselves for it. Those who have not a living faith in non-violence will learn the art of ordinary self-defence and protect themselves form indecent behaviour of unchilvalrous youth."

পঞ্জাবের কোন কোন দুর্বৃত্ত যুবক কোন কোন ছাত্রীকে অভদ্রভাবে বিরক্ত করে, আক্রমণের উপক্রম করে, এইরূপ অভিযোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিকট চিঠি আসায়, সেই উপলক্ষে তিনি ইংরেজী "হরিজন" কাগজে যে প্রবন্ধ লেখেন, উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি তাহা হইতে গৃহীত। তাঁহার কথাগুলির তাৎপর্য্য এই ঃ—

"অহিংস ভাবের বিকাশ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে হয়। তাহা আত্যন্তিক প্রবল-চেষ্টাসাপেক্ষ। ইহা চিন্তা ও জীবন যাপন ধারায় বিপ্লব সূচিত করে। যদি আমার পত্রলেখিকা ও অন্যান্য বালিকারা ব্যবস্থানুযায়ীরূপে তাঁহাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যে-সব যুবক তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে তাহারা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, এবং তাঁহাদের সম্মুখে খুব ভাল ব্যবহার করিবে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাঁহাদের সতীত্বনাশের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে মানুষের পাশবতার নিকট পরাজয় না মানিয়া মরিবার সাহস তাঁহাদিগকে বিকশিত করিতে হইবে। যদি কোন বালিকার মুখ বন্ধ করা বা হাত-পা বাঁধিয়া ফেলা হয়, তথাপি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে মরিবার শক্তি পাইবেন।

"কিন্তু এই শৌর্য্য কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁহারা এতদর্থে আপনাদিগকে শিক্ষিত করিয়াছেন। অহিংসাতে যাঁহাদের জীবন্ত বিশ্বাস নাই, তাঁহারা সাধারণ আত্মরক্ষার বিদ্যা শিখিবেন এবং নারীদের প্রতি সম্মানহীন যুবকদের অশ্লীল আচরণ হইতে তদ্দ্বারা আত্মরক্ষা করিবেন।"

প্রাণপণ করিয়া সতীত্ব রক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে সমুদয় ভদ্রব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত একমত। কোন পশুপ্রকৃতি মানুষের দ্বারা কোন সতী নারী আক্রান্ত হইলে, তিনি তাহার আক্রমণে বাধা দিবেন ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। এমন অবস্থা হইতে পারে যে, এই বাধাদান-প্রক্রিয়ায় আক্রমণকারী পশুবৎ মানুষটা এবং আক্রান্তা সতী নারী উভয়েরই বা দুইয়ের এক জনের মৃত্যু ঘটিবে। গান্ধীজী বলিতেছেন, এমত অবস্থায় অহিংসায় জ্বলন্ত বিশ্বাসবতী সতী নারীকেই মরিতে হইবে। ইহার ন্যায্যতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যদি কোন এক জনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে যিনি নারীরত্ন তাঁহাকেই মরিতে হইবে, এরূপ কেন

মনে করিব ? যদি অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত ভাবে পশুবৎ মানুষটার মৃত্যু ঘটাইলে নারীরত্নের সতীত্ব ও প্রাণ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করি। আক্রমণকারী পশুবৎ মানুষকে বধই করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি না। তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে তাহাকে আঘাত করিতে হইবে। সেই আঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও এরূপ আঘাত অপরাধ নহে। আমরা "অহিংসা" শব্দটিকে ও বস্তুটিকে একটি ফেটিশে (fetishএ) পরিণত করিবার পক্ষপাতী নহি। যদি কেহ বলেন যে, "জীবন ও মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই," তাহা হইলে আমরা বলিব, সে উপদেশ কেবল সতীনারীর পক্ষেই সত্য নহে, তাহা পশুবৎ পুরুষের পক্ষেও সত্য। সে মরিলে বরং মানবসমাজের এই উপকার হইবে যে, তাহার দ্বারা আর কোন নারীর উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা ঘটিবে না, এবং তাহারও এই উপকার হইবে যে, তাহার পাশবতা ও পাপ বাড়িয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে, সতী নারীরত্ন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার দৃষ্টান্তে ও আচরণে সমাজ উপকৃত হইবে।

যাঁহারা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে সাধারণ আত্মরক্ষা-বিদ্যা—বোধ হয় অস্ত্রব্যবহার—শিখিতে ও প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। সতীত্ব রক্ষার জন্য অহিংসায় বিশ্বাসবতী নারীরা কেন অস্ত্রব্যবহার করিবেন না, আক্রান্ত হইলে কেন ও কি প্রকারে কেবল মরিবেনই, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আমরা অহিংসার সারবস্তুতে, অহিংসার প্রাণে, বিশ্বাস করি। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা বা ইচ্ছা করা বা কার্য্যতঃ অনিষ্ট করা হিংসা, এবং তাহার অভাব অহিংসা। অস্ত্রব্যবহার বা রক্তপাত করিলেই তাহা হিংসাপদবাচ্য হয় না। ডাক্তার যে অস্ত্রব্যবহার ও রক্তপাত করেন, তাহাতে কখন কখন রোগীর মৃত্যু হইলেও, তাহা হিংসা নহে এই জন্য যে, ডাক্তার রোগীর অনিষ্ট করিবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেন না। সতী নারী আক্রমণকারী পশুবৎ পুরুষের অনিষ্ট করিবার জন্য তাহাকে আঘাত করেন না, আপনার সতীত্ব রক্ষার জন্য করেন, পশুটাকে পাপ হইতে নিরস্তকরণ দ্বারা তাহার কল্যাণই করেন। আঘাতের ফলে যদি পশুটার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গলই হয় ; কারণ তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহার আরও অধোগতি নিবারিত হয়। এই হেতু সতীত্ব রক্ষার জন্য কোনও নারী আক্রমণকারী কোন পুরুষকে আবশ্যকমত আঘাত করিলে (সে আঘাতে মানুষটার মৃত্যু হইলেও), আমরা তাহাকে হিংসা মনে করি না, বলি না।

মহাত্মাজী যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সতী নারীর জীবন অপেক্ষা তাঁহার আততায়ী নরপশুর জীবনের মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।

নারীর অধিকার

১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ

[পতিপ্রেমে 'সতী' হওয়ার ঔচিত্য

সম্প্রতি কলিকাতার একটি বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা স্বামীর সাঙ্ঘাতিক পীড়া হওয়ায় নিজ পরিহিত বস্ত্র কেরোসিন তৈলাক্ত করিয়া স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরেন। তাহার মিনিট পনের পরে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। ইহাতে অনেকে মহিলাটিকে "সতী" বলিয়া তিনি যে স্থানে আত্মহত্যা করিয়াছেন, সেই স্থানটির পূজা করিতেছেন। যাঁহারা এইরূপে আত্মহত্যা করেন, তাঁহাদের পতিপ্রেম, সাহস ও যন্ত্রণা-সহিষ্ণুতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকারে আত্মহত্যা করাই যে এই সকল গুণের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার ইহা আমরা স্বীকার করি না। সহমরণ, অনুসরণ, বা অগ্রমরণ ব্যতীত পতিপ্রেম দেখান যায় না, বা পতিপ্রেম দেখাইবার উহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা ইহাও আমরা স্বীকার করি না। মরিলেই পতির প্রতি, তাঁহার জীবনব্রতের প্রতি, তাঁহার ঔরসজাত সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য করা হইল, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহা মনে করিতে পারেন না। যাঁহারা বিধবাদের পুড়িয়া মরার এত প্রশংসা করেন, তাঁহারা বিপত্নীক হইলে পত্নীপ্রেমের পরিচয় স্বরূপ পুড়িয়া মরেন না কেন? না, যন্ত্রণাপূর্ণ তথাকথিত উচ্চ আদর্শটা নারীদের জন্য রাখাই বেশী সুবিধাজনক? এইরূপ লেখার জন্য অনেকে অহিন্দু বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু অহিন্দু কে তাহা শাস্ত্রের বিধি না জানিলে বলা বৃথা। এই জন্য আমরা রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীতে উক্ত মহাত্মার সংগৃহীত সতীদাহ বিষয়ক শাস্ত্ররচনাদির বিচার পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি। উহার উপর কথা বলিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা আর্য্যত্বের বড়াই লইয়াই থাকুন।

১৩২৫ শ্রাবণ

বিবাহিতা-নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের একটি আঠার বৎসরের বিবাহিতা নারী, যে-কারণেই হউক, স্বামীর ঘর করিতে চায় নাই। স্বামী তাহাকে স্ত্রীরূপে পাইবার জন্য নালিশ করে। নীচের আদালতে স্ত্রীলোকটির উপর এই হুকুম হয় যে তাহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। স্ত্রীলোকটি ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্ট বলিয়াছেন, যে, মানবসভ্যতা এখন যে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ঘর করে না বলিয়া আমরা তাহাকে জেলে পাঠাইতে পারি না। ঠিক বিচার হইয়াছে। স্ত্রী স্বামীব ঘর না করিলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন, এবং তাহাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু জোর করিয়া দাম্পত্য অধিকার স্থাপন করিতে চাওয়া বা তাহাকে

জেলে পাঠান বর্ব্বরতা। অনেক স্বামী ত স্ত্রীকে লইয়া ঘর করে না ; কিন্তু এরূপ আইন ত কোথাও নাই, যে, স্ত্রী আদালতে নালিশ করিয়া স্বামীকে তাহার সহিত বাস করিতে বাধ্য করিবে, নতুবা স্বামীকে জেলে যাইতে হইবে।

১৩২৮ কার্ত্তিক

নারীর কার্য্য

রক্ষা নারীর কার্য্য। দেশহিতৈষণা নারীর হৃদয়ে স্থান পাইলে তাহা রক্ষা পাইবে। স্থান যে পাইয়াছে, তাহার নানা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। মৌলানা মহম্মদ আলীর গ্রেপ্তারের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী দৃঢ়তার সহিত স্বামীর কার্য্য করিতেছেন। স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তিনি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আলী-ভ্রাতাদের বন্দনীয়া জননী বৃদ্ধ বয়সে হাজার হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। ধৃত অপর একজন মুসলমান নেতার মাতা তাঁহাকে স্বধর্ম্মে দৃঢ় থাকিতে বলিয়াছেন, এবং জানাইয়াছেন, যে, "তুমি যদি গবর্ণমেণ্টের কাছে ক্ষমা চাও, তাহা হইলে আমাকে আর মুখ দেখাইও না।"

১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর বক্তৃতা

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি পাশ্চাত্য নানা দেশে যে-সব কারণে যতটা জন্মিয়াছে, ভারতবর্ষে সে-সব কারণের আবির্ভাব এখনও পাশ্চাত্য দেশ-সকলের মত হয় নাই। যদি সে-সব কারণের পূর্ণ বিকাশ এখানে হয়, তাহা হইলে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি মনোভাব ঠিক পাশ্চাত্য কোন কোন শ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের মত হইবে কি-না বলিতে পারি না। আমরা যতটা জানি ও অনুমান করিতে পারি, বর্ত্তমানে পুরুষদের প্রতি বঙ্গনারীদের মনের ভাব সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশসকলে পুরুষদের প্রতি নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসিনীদের (ফেমিনিষ্টদের) মনের ভাবের মত নহে। কিন্তু আমরা পুরুষ মাত্র। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর মত সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের থাকিবার কথা নহে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতাটিতে পুরুষদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহের অভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু সেজন্য নিকৃষ্টজাতীয় মনুষ্য আমরা তাঁহার সহিত তর্ক করিবার সাহস রাখি না। কেবল আমাদের মন্তব্যের কয়েকটি প্রমাণ তাঁহার বক্তৃতা হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। একথা আগেই

বলিয়া রাখি, তিনি পুরুষ জাতির যে-সব দোষ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা অংশতঃ নিশ্চয়ই সত্য, সর্ব্বৈব সত্য কি না সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

"এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাংলার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।"

ইহা কি সত্য?

"বাংলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব।"

"পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশেই নারীকে ব্যবহার করিযাছে—নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই।"

বঙ্গনারীর জাগৃতি বিষয়ে পুরুষেরা "বিশেষ কোন সাহায্যই" করে নাই, ইহা কি ঐতিহাসিক তথ্য?

"নারীর মনের ভাব পুরুষ কোন দিন অনুভব করে নাই।"

ইহা সত্য হইলে পৃথিবীর (ও বাংলা দেশের) পুরুষলিখিত সকল কাব্যের নারী-চরিত্র-বর্ণনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

"ক্রমশঃ অধিকার প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে সভানেত্রী মহাশয়া বলিতেছেন ঃ—

"পাশ্চাত্যের নারীগণ দীর্ঘ-দিনের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহাদের অবস্থায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। সহস্র অত্যাচার, অনাচার ও বঞ্চনার সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় নারীদের পক্ষে প্রত্যেক বার নূতন শাসনসংস্কারে কোন-না কোন প্রদেশের নিউনিসপালিটী, সিনেট, আইন-সভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।"

এই কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে স্বীকার্য্য। কিন্তু ভ্রমও আছে। ইংলণ্ডে নারীর অধিকারলাভ-প্রচেষ্টা বর্ত্তমান শতাব্দীতে কতকটা জয়যুক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে আমাদের মহিলারা গত শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে অধিকার পাইয়াছিলেন, কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডে এখনও তাহার কোন কোনটি ইংরেজ মহিলাদের করায়ত্ত হয় নাই। সামাজিক কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় নারীদের স্থান পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে উচ্চে আগে হইতেই ছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এখানে হইতে পারে না। দু-একটা কথা বলি।

পরমাত্মায় মাতৃত্ব আরোপ পাশ্চাত্য দেশে বা প্রাচ্যে প্রচলিত সেমিটিক কোন শাস্ত্রে আছে কি? ঐরূপ কোন শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাণী নারীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে কি? ভারতীয় শাস্ত্রে আছে।

সভানেত্রী মহাশয়া বলিতেছেন, "জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি নিজেদের কর্ম্মসমিতি প্রভৃতি শুধু পুরুষের দ্বারাই গঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যদিও বহুক্ষেত্রে এই সকল পুরুষ অনেক নারী অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে হীন।" জাতীয় মহাসভার কর্ম্মসমিতির অতীত বা বর্ত্তমান কোন মহিলা সভ্যের অস্তিত্ব শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী কি অবগত নহেন? কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ অনেক পুরুষ কংগ্রেসওয়ালাও কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতিতে স্থান পান না। কিন্তু তাহার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের কোন দুরভিসন্ধি বা পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই আছে বলিতে পারি না। তা ছাড়া আরও একটা কথা বিবেচনা করা চাই। আজকাল শুধু কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিই কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতির সভ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে স্বার্থত্যাগ কার্য্যে-প্রমাণিত সাহস এবং যখন-তখন অম্লানবদনে জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে।। "চাচা আপন বাঁচা" নীতির

অনুসরণকারী পুরুষ ও নারীরা কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিতে খুব শ্রেষ্ঠ হইলেও কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতিতে তাঁহাদের স্থান নাই।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী যে বলিয়াছেন, "জাতির মঙ্গলের জন্য যদি বিশেষ কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তবে সে নারীর," ইহা অতি সত্য কথা। "পুরুষের বেকার সমস্যা অপেক্ষা নারীর বেকার সমস্যা আরও গুরুতর," ইহাও ঠিক কথা। "স্ত্রীলোকের নীতিবিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপনে"র "মূল কারণ" সব স্থলে "আর্থিক দুর্দ্দশা" যদি না-ও হয়, তাহা হইলেও অনেক স্থলে উহাই যে প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্থিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত স্ত্রীলোক অনেক সময়ই পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতিত হয়—ইহার ফল ব্যভিচার, ইহার ফল বেশ্যালয়। সুতরাং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে একজন বেকার কিম্বা জীবিকাহীন স্ত্রীলোক থাকিবে না ; আদর্শ সমাজে পুরুষ যদি কোন নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় তবে আইনানুসারে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে ; প্রলুব্ধকারী পুরুষের গায়ে কুশের আঁচড়টি লাগিবে না, আর প্রলুব্ধ নারীই শুধু সমাজের শাসনদণ্ড ভোগ করিবে, আর এরূপ হইতে পারিবে না। প্রলুব্ধ নারীর এই শাসন তাহার নিজ মঙ্গলের জন্যও নহে—পুরুষেরই স্বার্থ-রক্ষার জন্য। কেন-না পূর্ব্বে সে পুরুষেরই সম্পত্তি-বিশেষ ছিল। নারীর দেহ এবং মনের উপর পুরুষের যে অধিকার সৃষ্ট হইয়াছে তাহা তখনই গুরুতর আঘাত পায় যখন নারীর মুক্তির জন্য এবং সমাজকে নিষ্কলুষ করিবার জন্য কোন কঠোর আইন প্রস্তাবিত হয়। পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর— এই মনোবৃত্তিই নারীকে কাম ও লালসার পসারিণীতে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গেও পুরুষের জন্য উর্ব্বশী ও রম্ভার সৃষ্টি হইয়াছে। যত প্রকারে পুরুষ নারীকে আপন প্রয়োজনে ব্যবহারের বস্তু বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। আইনের অস্ত্রে সজ্জিত ও কবির কল্পনায় সমর্থিত সমাজ পুরুষকে এই অধিকার দিয়াছে।

এগুলি খাঁটি সত্য কথা এবং পুরুষসমাজের পক্ষে দারুণ লজ্জার কথা।

নিম্নমুদ্রিত কথাগুলিতে সভানেত্রী কংগ্রেসের যে খুঁত ধরিয়াছেন তাহা অমূলক নহে।

শৌণ্ডিকালয়গুলি পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু বেশ্যালয়গুলি নারী-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। বিগত শীতকালে লাহোরে নিখিল-ভারত এবং নিখিল-এশিয়া নারীসম্মিলনী নামক দুইটি মহিলা সভার প্রত্যেকটিতেই মদ্য নিবারণের দাবি উপেক্ষা না করিয়াও বেশ্যালয় ধ্বংসের প্রচেষ্টাকেই কার্য্যসূচীর একটি প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মদ্য নিবারণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বেশ্যালয়গুলি রাখার কুফল সম্বন্ধে এতটুকুও দৃষ্টি দেয় নাই। পুরুষচালিত গবর্ণমেণ্ট যখন বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়া নিজ তহবিল পূর্ণ করে, আর পুরুষদের পরিচালিত ভারতের জাতীয় মহাসভা যখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-বাণীও উচ্চারণ করে না, তখন ভারতের নারীদের উচিত অবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত চেষ্টায় চৈনিক কবি ডাঃ লীউয়ের প্রস্তাবিত একটি নিখিল-বিশ্ব গণতন্ত্রসভা গঠন করা। পৃথিবীর পবিত্রতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই গণতন্ত্রের পরিষদসমূহে নারীরই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা।

অভিভাষণে নারীর মূল অধিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, মোটের উপর তাহা সমর্থনযোগ্য। স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যতঃ এরূপ দাঁড়াইতে পারে, যে, সধবা বা বিধবা বধূ পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় বংশ হইতেই সম্পত্তি পাইবেন। তাহা অসাম্যমূলক হইবে না, যদি পুরুষরাও ঠিক্ সমভাবে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সম্পত্তির অধিকারী হন। স্বামীর আয়ে সধবা অবস্থায় স্ত্রীর সমান অধিকার

থাকিলে, স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় তাঁহার আয়ে ও স্ত্রীধনে স্বামীর সমান অধিকার থাকা সাম্যমূলক ব্যবস্থা হইবে।

আজকাল রাজনৈতিক মুক্তিসাধনেই পুরুষদের—এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক নারীরও—ব্যগ্রতা দেখা যায়। সেইজন্য শ্রীমতী সরলা দেবী আত্মার মুক্তি আনয়নের প্রতি শ্রোত্রীদিগকে অবহিত হইতে বলিয়া যথার্থ নেত্রীর কাজ করিয়াছেন।

নারী-মহাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

নিখিল-বঙ্গ নারী-মহাসম্মেলনে যে-যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা মোটের উপর সমর্থনযোগ্য। বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিবাহবিচ্ছেদ জিনিষটার প্রতি আমাদের মনেরও বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকায় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার হয় পুরুষরা ত অনেকে স্ত্রী পরিত্যাগ করেই, সুতরাং, তাহাদের কথা বলা অনাবশ্যক। অনেকে মনে করেন, হিন্দু সমাজে বা হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু নানাজাতির হিন্দুর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে। তাহারা নিম্নশ্রেণীর বলিয়াই অহিন্দু নহে। এবং "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি যে শ্লোকের দ্বারা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করা হয়, তাহাতেই ত অবস্থাবিশেষে সধবা স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ আমরা অনুমোদন করি না। যাহাদের পারিবারিক প্রথা ও রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং কৃষ্টি (কালচ্যর) পৃথক, তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে সন্তানদেরও অনিষ্ট হয় তবে যদি হিন্দুবংশজ খ্রীষ্টিয়ানবংশজ মুসলমানবংশজ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঔদ্বাহিক আদান প্রদান করিতে চায়, তাহারা ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে তাহা করিতে পারে।

বাংলা দেশে নারীহরণের বাহুল্যের দিকে নারীমহাসম্মেলন কেন মন দিলেন না, তাহা বন্ধ করিতে কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না, এবং পাপকার্য্যের জন্য বালিকাদিগকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার ব্যবসা বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন হইলেন না, জানি না। বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য দেশের লোকদের ও গবর্ন্মেন্টের একান্ত চেষ্টা করা আবশ্যক। এবিষয়ে একটি আলাদা প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থাপিত ও গৃহীত হইলে ঠিক হইত।